আরোগ্য-নিকেতন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আরোগ্য-নিকেতন

প্রকাশ ভবন
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৫৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৬২
তৃতীয় মুদ্রণ—চৈত্র, ১৩৬২
চতুর্থ মুদ্রণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩
পঞ্চম মুদ্রণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪
ষষ্ঠ মুদ্রণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫
সপ্তম মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৬৮
অষ্টম মুদ্রণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬
নবম মুদ্রণ—ফাল্গুন ১৩৭৮
প্রকাশক :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীগোপাল ঘোষ
শ্রীকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
এগার টাকা

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু

করকমলেষু—

ফাল্গুন

১৩৫৯

আরোগ্য-নিকেতন

সূচনা

আরোগ্য নিকেতন অর্থাৎ চিকিৎসালয়। হাসপাতাল নয় দাতব্য চিকিৎসালয়ও নয়—দেবীপুর গ্রামের তিন পুরুষ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী মশায়দের চিকিৎসালয়।

স্থাপিত হয়েছিল প্রায় আশি বৎসর পূর্বে। এখন ভাঙা-ভগ্ন অবস্থা; মাটির দেওয়াল ফেটেছে, চালার কাঠামোটার কয়েকটা জায়গাতেই জোড় ছেড়েছে—মাঝখানটা খাঁজ কেটে বসে গেছে কুঁজো মানুষের পিঠের খাঁজের মতো। কোনো রকমে এখনও খাড়া রয়েছে,—প্রতীক্ষা করছে তার সমাপ্তির; কখন সে ভেঙে পড়বে সেই ক্ষণটির পথ চেয়ে রয়েছে।

অথচ যেদিন স্থাপিত হয়েছিল সেদিন স্থাপন-কর্তা জগদ্বন্ধু কবিরাজ মহাশয় তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ঠাকুরদাস মিশ্রকে বলেছিলেন, বুঝলে ঠাকুরদাস, "যাবৎ চন্দ্রার্ক মেদিনী" বলব না—তবে···আমাদের বংশের বসতি এখানে যতকাল থাকবে ততকাল এ আটন, এ পাট পাকা হয়ে রইল। হেসে বলেছিলেন—দম্ভ মনে করিস না ভাই, দম্ভ নয়। হাত দুখানি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলেছিলেন, অক্ষয় লাভের কারবার। যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে! পুরানো ঘিয়ের মতো—যত দিন যাবে তত দাম বাড়বে। বলতে গেলে সংসারে শ্রেষ্ঠ লাভের কারবার। দেনা-পাওনা—দেওয়া-নেওয়া দুই দিকেই শ্রেষ্ঠ লাভ মিলবে এখানে, অথচ দুই পক্ষের কেউ ঠকবে না।

জগদ্বন্ধু মহাশয়ের বন্ধু ঠাকুররদাস মিশ্র ছিলেন একেবারে হিসেবনবিশ বিষয়ী লোক, পেশায় জমিদারের গোমস্তা। তিনি বড় বড় অঙ্ক বুঝতেন, মামলা মকদ্দমা বুঝতেন, দলিল আরজি জবাব বুঝতেন, কিন্তু এই সব তত্ত্ব বুঝতেন না। তিনি বক্রভাবেই বলেছিলেন—নাড়ী টিপে আর গাছগাছড়া তুলে এনে ছেঁচে পিষে শুকিয়ে পাঁচন-বড়ি দিলেই পয়সা। টাকায় অন্তত চোদ্দ আনা লাভ তোমার বাঁধা—সে বুঝলাম। কিন্তু—রোগীর লাভ? ওটা কী করে বললি জগ? তোর লাভ-রোজকার রোগীর খরচ, সে দেনা করেও করতে হবে। তার তো ধনে-প্রাণে মরণ।

বাধা দিয়ে জগদ্বন্ধু মশায় বলেছিলেন—তুই বাঁকা পথে হাঁটিস মিশ্র। পয়সার কথাটা পরের কথা। যে লাভ বললাম সে লাভ পয়সার নয়, অথচ ওইটাই সংসারে শ্রেষ্ঠ লাভ। একপক্ষের লাভ আরোগ্যলাভ, অন্যপক্ষের লাভ সেবার পুণ্য। জানিস? বিশ্বসংসারে আরোগ্যলাভই হল শ্রেষ্ঠ লাভ। যক্ষরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে

যে সব প্রশ্ন করেছিলেন তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল—লাভানামুত্তমং কিম্—? সংসারের লাভের মধ্যে সর্বোত্তম লাভ কী? যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—'লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যম্' অর্থাৎ আরোগ্যলাভই সংসারের শ্রেষ্ঠ লাভ।

সেদিন ঠাকুরদাস মিশ্র হেসেছিলেন। বলেছিলেন—শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না জগ। তা সে গঙ্গার চরের নালতের শাক হলেও না। ও তোর ধম্মপুত্ত যুধিষ্ঠিরের সংস্কৃত শোলোকেও কবরেজদের টাকার লাভের হিসেব ধরা পড়বে না। কথা শেষ করে জগদ্বন্ধুকে বেশ এক হাত নেওয়ার আনন্দে হো-হো করে হেসেছিলেন তিনি। কিন্তু কিছুদিন পরই হঠাৎ বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মাস তিনেক পঙ্গু হয়ে থেকে ওই জগদ্বন্ধু মশায়ের চিকিৎসাতেই আরোগ্যলাভ করে বলেছিলেন—তুই ভাই আমাকে জীবনদান করলি, তুই জেনে রাখিস ভাই যে, যদি কোনোদিন দরকার হয় আমি তোর জন্যে জীবন দেব।

হেসে জগদ্বন্ধু মশায় বলেছিলেন—তা হলে—লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যম্—কথাটা স্বীকার করলি আজ?

মিশ্র হেসেই বলেছিলেন—হ্যাঁ, তা করলাম।

পরদিন মিশ্র নিজে জগদ্বন্ধু মশায়ের আরোগ্য-নিকেতনে এসে একটা কাঠির ডগায় ন্যাকড়া জড়িয়ে তেল-সিঁদুরের লালরঙে নিজের হাতে দেওয়ালে মোটা হরফে লিখে দিয়েছিলেন—লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যম্।

আরোগ্য-নিকেতন নামকরণ তখন হয় নাই। তখন এ অঞ্চলের লোকেদের কতক বলত—'মশায়ের হোথা', কতক বলত—'মশায়ের কোবরেজখানা'।

আরোগ্য-নিকেতন নামকরণ হয়েছিল পুরুষান্তরে জগদ্বন্ধু মশায়ের ছেলে জীবন-মশায়ের আমলে। তখন কালান্তর ঘটেছে। একটি নতুন কাল শুরু হয়েছে। দেশের কেন্দ্রস্থল নগরে নগরে তার অনেক আগে শুরু হলেও এ অঞ্চলে তখন তার প্রারম্ভ। জীবনমশায় তাঁদের চিকিৎসালয়ের নামকরণ করে বড় একটি কাঠের ফালির উপর কালো হরফে 'আরোগ্য-নিকেতন' নাম লিখে বারান্দার সামনে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়—জগদ্বন্ধু মশায় যে ঘরখানি করেছিলেন সে ঘরেরও অনেক অদলবদল করেছিলেন। তক্তাপোশের উপর ফরাসের ব্যবস্থা যথাযথ রেখে তার সঙ্গে চেয়ার টেবিল বেঞ্চি জুড়ে দিয়েছিলেন।

আজও দেখতে পাবেন। নড়বড়ে টেবিল, হাতলভাঙা চেয়ার এখনও আছে। বেঞ্চিখানা শক্ত। সেটা আজও নড়ে না।

আরোগ্য-নিকেতনের জীর্ণ পতনোন্মুখ ঘরখানি—ওই নামলেখা কাঠের ফলক—এমন কি জীবনবন্ধু মশায়কেও দেখতে পাবেন, সেখানে গেলে।

যাবেন, মহানগরী থেকে শতাধিক মাইল। চলে যাবেন বড় লাইনের ট্রেনে। ...জংশনে নেমে পাবেন একটি অপরিসর শাখা-রেলপথ। মাইল দশেক গিয়ে পাবেন একটি সমৃদ্ধ গ্রামের স্টেশন। চারিদিকে দেখতে পাবেন কালান্তরের সুস্পষ্ট পরিচয়। দেখতে পাবেন, একখানা ট্যাক্সি, একখানা মোটর বাস, সাইকেল রিকশা, গোরুর গাড়ি। স্টেশন থেকে এই আরোগ্য-নিকেতন দূর পথ নয়, সামান্য পথ, এক মাইলের কিছু উপর ; প্রয়োজন হলে গোরুর গাড়ি একখানা নেবেন কিংবা সাইকেল রিকশা। কিন্তু তার চেয়ে হেঁটে যাওয়াই ভালো। দেখতে পাবেন ভাঙাগড়ায় বিচিত্র গ্রামখানিতে পুরাতন-নূতনের সমাবেশ।

পাকা লাল কাঁকরে তৈরী সড়ক ধরে যাবেন। দেখবেন প্রাচীন কালের জমিদারদের বড় বড় নোনাধরা পাকা বাড়ি। ভাঙা বাগান। ধসে-পড়া পাঁচিল। শ্যাওলা-পড়া মন্দির। পুকুরের ভাঙা ঘাট। পুরানো মন্দির। চারিদিকেই দেখবেন ধূলি-ধূসরতা ; আবর্জনার স্তূপ। পতিত জায়গায় আগাছার জঙ্গল। এরই মধ্যে এক জায়গায় পাবেন এক পুরানো বৃদ্ধ বট ; শাখা-প্রশাখা জীর্ণ ; গোড়াটা বাঁধানো ; তাতেও দেখবেন অনেক ফাটল। একটি গ্রামের ষষ্ঠীতলা। এর পরই এই রাস্তাটি শেষ হয়েছে, মিশেছে প্রশস্ত একটি পাকা সড়কের সঙ্গে। লালমাটি ও নুড়ি-জমানো রাস্তা, রাস্তার দুপাশে দোকান। এইটিই হল বাজারপাড়া। প্রাণস্পন্দনে মুখরিত। মাল-বোঝাই গোরুর গাড়ির সারি চলেছে, মানুষ চলেছে, কোলাহল উঠছে, গন্ধও এখানকার বিচিত্র। বাজারটা দিন দিন বেড়ে চলেছে। চা-মিষ্টান্নের দোকান পাবেন ; ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করলে এখানে ঢুকে পড়বেন। নবগ্রাম মেডিকেল স্টোর্সের পাশেই আছে সবচেয়ে ভালো চা-মিষ্টির দোকান। খুব খুঁজতে হবে না, নবগ্রাম মেডিকেল স্টোর্সের ঝকঝকে বাড়ি, আসবাব, বহু বর্ণে বিচিত্র বিভিন্ন ঔষুধের বিজ্ঞাপন আপনার দৃষ্টি অবশ্যই আকর্ষণ করবে। বুশশার্ট-প্যাণ্টপরা হরেন ডাক্তারকে গলায় স্টেথোসকোপ ঝুলিয়ে বসে থাকতেও দেখতে পাবেন। ভালো চায়ের দোকানটা ঠিক এর পাশেই।

এখান থেকেই আবার উত্তরমুখী একটি শাখাপথ পাবেন। রাস্তাটি খুব পরিসর নয় ;—একখানি গাড়ি যায়, দুপাশে দুসারি লোক বেশ স্বচ্ছন্দে চলতে পারে।

একটু, বোধ হয় সিকি মাইল, চলবেন ছায়াচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে ; দুপাশে চার-পাঁচটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর পাড়ের উপর আম, জাম, শিরীষ, তেঁতুলের গাছগুলি দুপাশ থেকে পল্লব বিস্তার করে পথটিতে ছায়া ফেলেছে। একটি পুকুরে একটি ছোট বাঁধা ঘাটও পাবেন। এখান থেকে বের হলেই পাবেন উন্মুক্ত প্রান্তর। এখানে দেখবেন

বিচিত্র দৃশ্য। নতুন বাড়িঘর, একেবারে নতুন কালের ফ্যাশন, নতুন কালের ইঞ্জিনীয়ারিংএর নিদর্শন। ক্যানেল আপিস তৈরি হয়ে গেছে। আশেপাশে ছোট ছোট কোয়ার্টার। এ দিকে নতুন ক্যানেল তৈরি হচ্ছে। এর পরই পাবেন আর একদফা বাড়ির সারি; গুটিকয়েক ছোট ইমারতকে ঘিরে বড় বড় ইমারত তৈরি চলেছে। চারিদিকে ভারা বাঁধা, রাজমজুর খাটছে, মজুরনীরা গান গাইছে আর ছাদ পিটছে। হ্যাট-কোট-প্যান্ট-পরা-ইঞ্জিনীয়ার ঘুরছে সাইকেল হাতে নিয়ে। ওই ছোট বাড়িগুলি এখানকার হাসপাতাল। ছোট হাসপাতালটি, ডাক্তার-কম্পাউণ্ডারের ছোটখাটো দুটি কোয়ার্টার; আরও ছোট কয়েকটি কাঁচা বাড়ির বাসা, এখানে থাকে নার্সেরা। একটু দূরে একটি ছোট ঘর দেখবেন—সেটি মতিয়া ডোমের বাড়ি। আর ওই অর্ধসমাপ্ত বড় ইমারতটি—ওটিও হাসপাতালের ইমারত, এ অঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে।

এ সব দেখে থমকে দাঁড়াবেন না। নতুন গঠনের মধ্যে আশা আছে, ভবিষ্যৎ গড়ছে—সুতরাং মনে মোহের সঞ্চার হবে, স্বপ্ন জেগে উঠবে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে; সেই স্বপ্নে ভোর হয়ে পড়বেন, আরোগ্য-নিকেতন পর্যন্ত যেতে আর মন উঠবে না।

চলে যাবেন এগিয়ে, এই সব নতুন কালের ঝকঝকে ইমারতগুলিকে বাঁয়ে রেখে চলে যাবেন। আরও মাইলখানেক পথ যেতে হবে। দুধারে শস্যক্ষেত্র; মাঝখানে লাল কাঁকর-দেওয়া ওই একখানি গোরুর গাড়ি যাওয়ার মতো আঁকাবাঁকা পথটি। মাইলখানেক পর গ্রাম দেবীপুর; এই গ্রামেই আছে পুরাতন আরোগ্য-নিকেতন।

শ্রীহীন গ্রাম দেবীপুর, দারিদ্র্যের ভারেই শুধু নিপীড়িত নয়, কালের জীর্ণতাও তাকে জীর্ণ করে তুলেছে। লক্ষ্য করে দেখবেন—গ্রামের বসতির উপরে যে গাছগুলি মাথা তুলে পল্লব বিস্তার করে রয়েছে তার অধিকাংশই প্রবীণ প্রাচীন, নতুন গাছের লাবণ্যময় শোভা কদাচিৎ চোখে পড়বে। জীবনের নবীনতার ধ্বজা হল নতুন সতেজ গাছের শ্যামশোভা। প্রথমেই চোখে পড়বে—ঝড়ে-শুয়ে-পড়া শূন্যগর্ভ বকুলগাছতলায় ধর্মঠাকুরের আটন। তার পরেই পাবেন একটি কামারশালা; অবশ্য কামারশালাটির অস্তিত্ব অনেক আগে থেকেই অনুভব করবেন আপনি। কামারশালার ঠং-ঠং শব্দ দেবীপুরের দক্ষিণে—ওই নতুনকালের বসতি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠছে যে প্রান্তরে—সেই প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। ইমারতের দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলছে।

কামারশালে দেখবেন চাষীদের ভিড়, গলিত লোহার ফুলকি। তারপরই গ্রাম

শুরু। শান্ত ছোট গ্রাম। বাঁশের বনে শিরীষগাছের মাথায় পাখি ডাকে। নানা ধরনের পাখি।

কুহু—কুহু—কুহু!

চোখ—গে-ল! চোখ—গে-ল!

কৃষ্ণ কো-থা হে!

বউ কথা কও!

কা—কা—কা! ক-কৃ ক-কৃ ক-কৃ।

মধ্যে মধ্যে বড় অর্জুনগাছের মাথার উপরে চিল ডেকে ওঠে—চি—লো! চি—লো! পথের উপর শালিকের ঝাঁকের কলহ-কলরব—ক্যা-ক্যা করকর কিচিরমিচির কট-কট কট-কট; তারপরই লেগে যায় ঝাপটাঝাপটি।

মানুষের দেখা পাবেন কদাচিৎ। যা দু-একজন পাবেন তারা দেহে জীর্ণ, মনে ক্লান্ত, দৃষ্টিতে সন্দিগ্ধ। আপনাকে দেখেও কথা বলবে না। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে যাবে, কিছু দূর গিয়ে পিছন ফিরে আবার তাকাবে। কে? বামপন্থী না দক্ষিণপন্থী? ভোট চায়? না, চাঁদা?

সেকালে অর্থাৎ যখন আরোগ্য-নিকেতন প্রথম স্থাপিত হয়েছিল তখন ধারা ছিল অন্যরকম। দেশের অবস্থাও ছিল আর-এক রকম। গোলায় ধান ছিল, গোয়ালে গাই ছিল, ভাঁড়ারে গুড় ছিল, পুকুরে মাছ ছিল। লোকে এক হাতে পেট পুরে খেত—দুহাতে প্রাণপণে খাটত। দেহে ছিল শক্তি মনে ছিল আনন্দ। সে মানুষেরাই ছিল আলাদা। একালের মতো জামা জুতো পরত না; হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরে অনাবৃত প্রশস্ত বক্ষ দুলিয়ে চলে যেত। ধবধবে কাপড় জামা চকচকে জুতোপরা আপনাকে দেখলে হেঁট হয়ে নমস্কার করে বলত—কোথা থেকে আসা হচ্ছে বাবুমহাশয়ের? কোথায় যাওয়া হবে প্রভু?

আপনি বলতেন—আরোগ্য-নিকেতন।

—ওঃ! তা নইলে—আপনাদের মতো মনুষ্য আর কোথা যাবেন ই গেরামে! তা চলে যান। ওই সামনেই দেখছেন—মা-কালীর থান, বাঁয়ে চন্দ মশায়ের লটকোনের দোকান—ডাইনে ভাঙবেন—দেখবেন বাঁধানো কুয়ো; সরকারী কুয়ো, তার পাশেই জীবনমশায়ের কবরেজখানা, অর্থাৎ আরোগ্য-নিকেতন। লোকে লোকারণ্য। গাড়ির সারি লেগে আছে। চলে যান।

আজ কিন্তু সেখানে মানুষজন পাবেন না। লোকারণ্য কথাটা আজ অবিশ্বাস্য এমন কি হাস্যকর বলেই মনে হবে। সকালের দিকে দুজন বড় জোর ছ-সাত জন

রোগী আসে, হাত দেখিয়ে চলে যায়; আরোগ্য-নিকেতনে আজ আর কোনো ওষুধ পাওয়া যায় না; ওষুধের আলমারিগুলি খালি পড়ে আছে। বার্নিশ চটে গেছে, ধুলোয় সমাচ্ছন্ন। দুটো-তিনটের কব্জা ছেড়ে গেছে। যারা হাত দেখাতে আসে তারা হাত দেখিয়ে ওষুধ লিখে নিয়ে চলে যায়, তারপর বাকি সময়টা স্থানটা প্রায় খাঁ-খাঁ করে।

অপরাহ্নের দিকে গেলে দেখতে পাবেন জীবনবন্ধু মশায় একা বসে আছেন। দেখতে পাবেন উত্তর-দক্ষিণে প্রায় পঁচিশ হাত লম্বা একখানা খোড়ো কোঠা-ঘর। প্রস্থে আট-দশ হাত। সামনে একটি সিমেন্ট-করা বারান্দা, সেটা এখন ফেটে প্রায় ফুটিফাটা হয়ে গিয়েছে, মধ্যে মধ্যে খোয়াও উঠে গিয়েছে, তিন পাশের স্বল্পগভীর ইটের ভিত ঠাঁই ঠাঁই বসে গিয়েছে। ধুলো জমে আছে চারিদিকে। শুধু বারান্দার দুই কোণে দুটি রক্তকরবীর গাছ সতেজ সমারোহে অজস্র লাল ফুলে সমৃদ্ধ হয়ে বাতাসে দুলছে। ওই গাছ দুটির দিকে চেয়ে বসে আছেন বৃদ্ধ 'মশায়'। প্রায় সত্তর বছর বয়স;—স্থবির, ধূলিধূসর;—দিক-হস্তীর মতো প্রাচীন। এককালের বিশাল দেহের কাঠামো কুঞ্চিত দেহচর্মে ঢাকা; বক্ষপঞ্জর প্রকট হয়ে পড়েছে, মোটা মোটা হাত—তেমনি দুখানি পা, সামনে দেখবেন প্রকাণ্ড আকারের অতিজীর্ণ একজোড়া জুতো, পরনে ময়লা থান-ধুতি—তাও সেলাই-করা; শোভা শুধু শুভ্র গজদন্তের মতো পাকা দাড়ি-গোঁপ; মাথার চুলও সাদা—কিন্তু খাটো করে ছাঁটা।

পুরানো আমলের একখানা খাটো-পায়া শক্ত তক্তাপোশের উপর ছেঁড়া শতরঞ্চি বিছিয়ে বসে থাকেন। ফুলে-ভরা গাছ দুটির দিকে চেয়ে শুধু ভাবেন। নানা ভাবনা। বিচিত্র এবং বহুবিধ।

ভাবেন—মানুষের চেয়ে গাছের আয়ু কত বেশী! ওই করবীর কলম দুটি তাঁর বাবা লাগিয়েছিলেন—সে প্রায় ষাট বৎসর হল! আজও গাছ দুটির জীবনে এতটুকু জীর্ণতা আসে নাই।

ভাবনায় ছেদ পড়ে যায় তাঁর। কে যেন কোথায় অস্বাভাবিক বিকৃতস্বরে কী যেন বলছে। চারিদিকে তাকিয়েও কাউকে দেখতে পান না। পরক্ষণেই হাসেন তিনি। হাটকুড়ো জেলের পোষা শালিক পাখিটা আশেপাশে কোনো গাছে বসে আছে, গাছতলায় পথে কাউকে যেতে দেখে কথা বলছে। বলছে—মাছ নাই! মাছ নাই! মাছ নাই!

পাখিটা সাধারণ পাখি থেকে খানিকটা ব্যতিক্রম। পোষমানা পাখি—ছাড়া পেয়ে উড়ে গেলে আর ফেরে না। প্রথম প্রথম বাড়ির কাছে আসে—উড়ে বেড়ায় —চালে বসে—উঠানেও নামে—কিন্তু খাঁচাতে আর ঢোকে না। এ পাখিটা কিন্তু

ব্যতিক্রম। ওকে সকালে খাঁচা খুলে ছেড়ে দেয়, পাখিটা উড়ে যায়, আবার সন্ধ্যার সময় ঠিক ফিরে আসে। খাঁচার দরজা খোলা থাকলে একেবারে খাঁচায় ঢুকে পড়ে। না থাকলে—খাঁচার উপর বসে ডাকে—মা—মা—মা! বুড়ো, বুড়ো, অ-বুড়ো!

বুড়ো হল হাটকুড়ো জেলে। হাটকুড়োর স্ত্রী ওকে বুড়ো বলে ডাকে। সেইটা পাখিটা শিখেছে। ওই পাখিটা বোধ হয় কাছেই কোথাও এসে বসেছে, জীবন দত্তকেই দেখে ডেকে কথা বলছে। মানুষের দর্শনে পাখিটা জীবনে সার্থকতা লাভ করেছে। অন্তত লোকে তাই বলে। বলে—পূর্বজন্মের সাধনা-কিছু আছে। কেউ বলে—মানুষই ছিল পূর্বজন্মে, কোনো কারণে শাপগ্রস্ত হয়ে পক্ষী হয়ে জন্মেছে।

জীবনমশায় দাড়িতে হাত বোলান। সঙ্গে সঙ্গে হাসেন। জীবন, জন্মান্তর সম্পর্কে বিশ্বাস এ যুগে উলটে-পালটে গেল। তাই তিনি কোনো ভাবনাই ভাবেন না। ঘন ঘন হাত বোলান তিনি দাড়িতে। এক-একবার খুব ছোট করে ছাঁটা মাথার চুলের উপর হাত বোলান, বেশ লাগে। হাতের তালুতে সুড়সুড়ি লাগে।

সঙ্গে সঙ্গে ভাবেন, মুখুজ্জে তো এখনও এল না!

সে এলে যে দাবা নিয়ে বসা যায়। কালসমুদ্রের খানিকটা—অন্তত রশিখানেক—কাগজের নৌকায় পরমানন্দে অতিক্রম করা যায়। সেদিন শ্রাবণের অপরাহ্ণ। মশায় পথের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। আকাশে মেঘ জমে রয়েছে। ঘুনি-ঘুনি বৃষ্টি পড়ছে, উতলা হাওয়া বইছে; অপরাহ্ণেই ছায়া এমন গাঢ় হয়েছে যে সন্ধ্যা আসন্ন মনে হচ্ছে। কিন্তু সেতাবের সাদা-ছাউনি-দেওয়া ছাতা এর মধ্যেও বেশ দেখা যাবে; বয়স হলেও জীবনমশায়ের চোখ বেশ তাজা আছে। ইদানীং সুচে সুতো পরাতে চশমা সত্ত্বেও একটু কষ্ট হলেও দূরের জিনিস—বিশেষ করে কালোর গায়ে সাদা কি সাদার মধ্যে কালো ছাতার মতো বড় জিনিস—চিনতে কোনো কষ্ট হয় না তাঁর। দেহ সম্পর্কে ভালো যত্ন নিলে এটুকু দৃষ্টিহানিও বোধ হয় হত না। সেতাবের দেহও ভালো আছে। মধ্যে মধ্যে সেতাবের নাড়ী তিনি পরীক্ষা করে দেখেন। বুড়োর যেতে এখনও দেরি আছে। নাড়ীর গতি কী!

জীবনমশায়, নাড়ীর মধ্যে, কালের পদধ্বনি অনুভব করতে পারেন। এটি তাঁর পিতৃ-পিতামহের বংশগত সম্পদ। তাঁরা ছিলেন কবিরাজ। তিনি প্রথম ডাক্তার হয়েছেন। কবিরাজি অবশ্যই জানেন। প্রয়োজনে দুই মতেই চিকিৎসা করে থাকেন। তবে এই নাড়ী দেখাই তাঁর বিশেষত্ব। নাড়ীর স্পন্দনের মধ্যে রোগাক্রান্ত জীবনের পদক্ষেপ থেকে রোগীর রোগের স্বরূপ এবং কালের দ্বারা আক্রান্ত জীবনের পদক্ষেপ থেকে কাল কতদূরে তাও তিনি বুঝতে পারেন।

নিদান হাঁকায় জীবনমশায়ের নাম ছিল—আজও আছে।

নাড়ী দেখে বহুজনের মৃত্যু তিনি পূর্বাহ্লেই ঘোষণা করেছেন তাঁর চিকিৎসক জীবনে। একের পর এক রোগীর কথা পলকে পলকে মনে উঠে মিলিয়ে যায়। এই মনে পড়াটার গতি অতি অস্বাভাবিক রকমেই দ্রুত। থেমে গেল এক জায়গায়। সুরেন মিশ্রের ছোট ছেলে শশাঙ্কের মৃত্যুঘোষণার কথায়। মনে পড়ল শশাঙ্কের ষোড়শী বধূর সেই বিচিত্র দৃষ্টি; তার সেই মর্মান্তিক কথাগুলি!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি।

কত মৃত্যু, কত কান্না, কত নীরব মর্মান্তিক শোক তিনি দেখেছেন। রোগীর জীবনান্ত ঘটেছে—তিনি ভারী পায়ে স্থির পদক্ষেপে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা তিনি করেছেন, কিন্তু জেনেই যে, চেষ্টা ব্যর্থ হবে। মনকে প্রস্তুত রেখে করেছেন; এমন রোগীর বাড়ি থেকে চলে আসতেন—ভাবতে ভাবতেই পথ চলতেন। তখন পথে অতি অন্তরঙ্গ-জনও চোখে পড়ত না। রোগের কথা, চিকিৎসার কথা ভাবতেন; কখনও কখনও মৃত্যুর কথাও ভাবতেন। মশায়ের ভাবনামগ্ন চিত্ত তখন বিশ্বলোক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পাতার পর পাতা উলটে যেত। তাই বাইরের দৃষ্টিপথে মানুষ পড়েও পড়ত না। বহু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে দূরের গ্রামে, রোগীর মৃত্যুর পর বাধ্য হয়েই সেখানে প্রতীক্ষা করতে হত; শোকবিহ্বল পরিবারটির মধ্যে বসে থাকতেন অচঞ্চল হয়ে, গুমোটে ভরা বায়ুপ্রবাহহীন গ্রীষ্ম-অপরাহ্নের স্থির বনস্পতির মতো। লোকে এই সব দেখে ডাক্তারদের বলে থাকে—ওরা পাথর। খুব মিথ্যে বলে না তারা। পাথর খানিকটা বটে ডাক্তারেরা। মৃত্যু এবং শোক দেখে চঞ্চল হবার মতো মনের বেদনাবোধও নষ্ট হয়ে যায়। মনে ঘাঁটা পড়ে; গাড় হারিয়ে যায়। শশাঙ্কের মৃত্যু-রোগে মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ঘোষণা করতে গিয়ে আঘাত তিনি পেয়েছেন—কিন্তু চিকিৎসকের কর্মে কর্তব্যে ত্রুটি তিনি করেন নি। তাঁর নিজের পুত্র—।

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। নিজের পুত্রের হাত দেখেও তিনি তার মৃত্যু ঘোষণা করেছিলেন। তিন মাস আগে থেকে বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। একথা তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন। ছেলে ছিল ডাক্তার, তাকেও ইঙ্গিতে বুঝিয়েছিলেন। আজ ভাবেন—কেন বলেছিলেন একথা?

চিকিৎসা-বিদ্যায় পারঙ্গমতার দম্ভে?

তাই যদি না হবে, সত্যকে ঘোষণা করে মনের কোণে আজও এমন বেদনা অনুশোচনা সঞ্চিত হয়ে রয়েছে কেন? ওই স্মৃতি মনের মধ্যে জেগে উঠলেই একটি 'ছি-ছি-কার' সশব্দে মর্মস্থল থেকে বেরিয়ে আসে কেন? 'পরমানন্দ মাধব'কে মনে

পড়ে না কেন? উদাস দৃষ্টি তুলে মশায় তাকিয়ে থাকেন আকাশের নীলের দিকে। অথচ জানাতে হয়, বলতে হয়। তার বিধি আছে। চিকিৎসকের কর্তব্য সেটা। তার ক্ষেত্র আছে।

এক

উনিশ শো পঞ্চাশ সাল—বাংলা তের শো ছাপ্পান্ন সালের এক শ্রাবণ-অপরাহ্নে জীবনমশায় এমনি করেই তাকিয়ে ছিলেন আকাশের দিকে। পথের উপর থেকে কেউ যেন তাঁকে ডাকলে।

—প্রণাম গো, ডাক্তার জ্যেঠা।

—কে? মতি! কোথায় যাবি রে?

মতি কর্মকার কয়লার ধুলোমাখা আটহাতি কাপড়খানা পরেই কোথায় হনহন করে চলেছে। গোষ্ঠ কর্মকারের ছেলে মতি। গোষ্ঠ ডাক্তারকে বড় ভক্তি করত। ডাক্তারও তাকে ভালোবাসতেন। গোষ্ঠ অনেকগুলি ওষুধ জানত। সন্ন্যাসীদত্ত ওষুধ। রঘুবর ভারতী ছিলেন বড়দরের যোগী। এসব ওষুধ তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিল সে। ডাক্তারকে গোষ্ঠ ওষুধগুলি দিতেও চেয়েছিল। ডাক্তার নেন নি। তবে অনেক রোগীকে তিনি পাঠিয়ে দিতেন গোষ্ঠের কাছে। বিশেষ করে দুদিন অন্তর জ্বরের জন্য। বড় পাজী জ্বর ওটা। পালাজ্বর অর্থাৎ একদিন অন্তর জ্বর—তবু ওষুধ মানে। কিন্তু ঐ দুদিন অন্তর জ্বর—ও ওষুধ মানে না। মানাতে অন্তত দীর্ঘদিন লাগে। কুইনিন ইনজেকশনও মানতে চায় না। অথচ ওই রঘুবর ভারতীর ওষুধে একদিনেই বন্ধ হয়ে যাবে। আগে গোষ্ঠ দিত, এখন মতিই দেয়, জ্বরের নির্দিষ্ট দিনে একটা হলুদমাখা ন্যাকড়ায় একটা জলজ গাছের পাতা কচলে রস বার করে বেঁধে শুঁকতে দেয়। তাতেই জ্বর বন্ধ হয়। হবেই বন্ধ। বিচিত্র দ্রব্যগুণ-রহস্য! অতি বিচিত্র! এই রোগী পাঠানো নিয়েই গোষ্ঠের সঙ্গে ডাক্তারের অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। এদেশের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা চিকিৎসা-প্রণালী প্রচলিত ছিল—বিস্ময়কর ফলপ্রদ চিকিৎসা! একবার তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল এই চিকিৎসা-প্রণালী জানবার, কিন্তু—। কিন্তু তাঁর গুরুর নিষেধ ছিল। তিনি বলেছিলেন—ডাক্তারি যখন শিখেছ, তখন ওদিকে যেয়ো না। যার গুণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে জান না, তাকে প্রয়োগ কোরো না।

মতি কর্মকার বললে—একবার আপনার কাছেই এলাম জ্যেঠা।

বাঁচলেন মশায়। একজন কথা বলবার লোকের জন্য তিনি অধীর হয়ে উঠেছিলেন। এবার তক্তাপোশে ভাল করে বসলেন তিনি, পুরানো তাকিয়াটাকে টেনে নিয়ে বললেন—আয় আয়। বোস। কী খবর বল ?

—একবার আমার বাড়িতে যেতে হবে।

—কেন ?

—মাকে একবার দেখতে হবে।

কী হল মায়ের ?

—আজ্ঞে, মাসখানেক হবে, পুকুরঘাটে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল, তা পরেতে খুবই বেদনা হয়, নিয়ে গিয়েছিলাম হাসপাতালে। তখন দেখে বেঁধেছেঁদে ছেড়ে দিয়েছিল, বলেছিল,—দিন কতক ওঠাহাঁটা কোরো না, সেরে যাবে। তাই গিয়েও ছিল। কিন্তু আবার আজ দিন আষ্টেক হল বেদনাটা চাগিয়ে উঠেছে ; দিনরাত কনকন করছে। আবার নিয়ে গেলাম হাসপাতাল—তা বললে, এক্স-রে করতে হবে, সে না হলে কিছু বলতে পারবে না। তা—সে তো অনেক খরচ—অনেক ঝঞ্ঝাট ! তাই বলি, যাই জ্যেঠার কাছে।

হাসলেন জীবনমশায়। বেচারী মতি ! বুড়ো মা গলায় কাঁটার মতো লেগেছে। মায়ের উপর মতির গভীর ভালোবাসা। মায়ের প্রতি তার এই ভক্তির জন্য লোকে তাকে বুড়ো খোকা বলে। মায়ের কষ্টও সে দেখতে পারছে না—আবার এক্স-রে করানোও তার পক্ষে অনেক ঝঞ্ঝাট। অগত্যা এসেছে তাঁর কাছে।—তা বেশ, কাল সকালে যাব।

—আজ্ঞে না, একবার চলুন এখুনি। বুড়ী চীৎকার করছে আর গালাগাল করছে আমাকে। বলছে, নিজের মেয়ে হলে এমনি অচিকিৎসেতে ফেলে রাখতে পারতিস ?

বলতে বলতে খানিকটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মতি। বললে—সারা জীবন মায়ের অযত্ন করি নাই, আজ মা আমাকে—কেঁদে ফেললে মতি।

ডাক্তার বললেন, চল তবে। দেখে আসি।

খালি গায়েই বেরিয়ে পড়লেন মশায়। মতি ব্যস্ত হয়ে বললে—আপনার ছাতা ?

—ছাতা লাগবে না, চল। এই ফিনফিনে জলে—এতে ছাতা লাগে না। ভারী পায়ে ডাক্তার হাঁটেন ; গতি একটু মন্থর। মতি ছুটে চলে গেল।—আমি যাই জ্যেঠা, বাড়িতে খবরটা দিই গে।

—যা।

এগিয়ে গিয়ে মতি বাড়িটা একটু পরিষ্কার করে ফেলবে। ছেলেপুলেগুলোকে সামলাবে। বোধ হয়, মতির মা ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে আছে, সেখানা পালটে তাড়াতাড়ি একখানা ফরসা কাপড় পরাবে। ডাক্তারের অজানা তো কিছু নাই।

বাড়ির দোরে গিয়ে গলা ঝাড়লেন ডাক্তার। তারপর ডাকলেন—মতি!

মতি সাড়া দিলে—আজ্ঞে, এই যাই।

তার মানে—আরো খানিকটা অপেক্ষা করুন ডাক্তার জ্যেঠা। এখনও প্রস্তুত হতে পারি নাই। দাঁড়ালেন ডাক্তার, ভালোই হল, বরাবর সামনে দেখা যাচ্ছে সোজা কাঁচা সড়কটা। এই পথেই সাদা কাপড়ের ছাউনি দেওয়া ছাতা মাথায় দিয়ে আসবে সেতাব মুখুজ্জে। এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে নেভানো লণ্ঠন আর দাবার পুঁটুলি। কই সেতাব?

মতি ডাকলে—আসুন জ্যেঠা।

বৃদ্ধা কাতর হয়ে পড়েছে। মতি ঠিক বলেছে—জেরবার হয়ে পড়েছে বুড়ী। হাঁটুটা ফুলেছে। স্ফীত স্থানটার উপর হাত দিলেন ডাক্তার। রোগী কাতরে উঠল, ডাক্তার চমকে উঠলেন। জ্বরও হয়েছে যেন! হাঁটু থেকে হাত তুলে বললেন—হাতটা দেখি!

নাড়ী ধরে বসলেন ডাক্তার।

—জ্বর কবে থেকে হল?

মতি বললে—জ্বর তো হয় নাই জ্যেঠা।

—হয়েছে। নাড়ী দেখতে দেখতেই বললেন ডাক্তার।

মতির মা ঘোমটার ভিতর থেকেই ফিসফিস করে বললে—ও বেথার তাড়সে গা খানিক জ্বর-জ্বর করছে। বেথা সারলেই ও সেরে যাবে।

—হ্যাঁ, ব্যথা সারলেই জ্বর সারবে, জ্বর সারলেই ব্যথা সারবে।

—না-না জ্বরের ওষুধ আমি খাব না। জ্বর আমার আপনি সারবে। আপুনি আমাকে পায়ের বেদনার ওষুধ দেন। জ্বরের চিকিৎসের দরকার নাই। ও কিছু নয়। কুনিয়ান খেতে নারব—ফোড় নিতেও নারব। ওপোস দিতে—বুড়ী থেমে গেল। না খেয়ে থাকতে পারব না বলতে বোধ করি লজ্জা পেল।

ডাক্তার হেসে বললেন—উপোস তোমাকে করতে হবে না। সে আমি বলব না তোমাকে। তুমি তো আমার আজকের রোগী নও গো। নতুন বউ থেকে তোমাকে দেখছি আমি। সেবার পুরানো জ্বর—সে তো আমিই সারিয়েছিলাম। গোষ্ঠ আমার কাছে কবুল খেয়েছিল। রাত দুপুরে হেঁসেল থেকে মাছ ভাত বের

করে তোমাকে খাওয়াত সে। সে আমি জানি। তাতেই আমি তোমার জন্যে পোরের ভাতের ব্যবস্থা দিয়েছিলাম।

হাসতে লাগলেন ডাক্তার।

ঘোমটার মধ্যে জিভ কেটে লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে গেল মতির মা। গোষ্ঠ তাকে চুরি করে খাওয়াত না, সে নিজেই চুরি করে খেত। একদিন স্বামীর কাছেই ধরা পড়েছিল। তার পরদিনই গোষ্ঠ ডাক্তারের কাছ থেকে পোরের ভাতের ব্যবস্থা এনেছিল।

ডাক্তার বললেন—তা বলো না কী খেতে ইচ্ছে?

চুপ করে রইল মতির মা। এরপর আর কী উত্তর দিতে পারে সে? লজ্জায় তার মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ছি! ছি! ছি!

—বলো, লজ্জা কোরো না। যা ইচ্ছে হয় খেয়ো। যা খুশি। মতির দিকে তাকিয়ে বললেন—মায়ের যা খেতে ইচ্ছে খেতে দিবি, বুঝলি?

—আর ওষুধ? শঙ্কিতভাবেই প্রশ্ন করলে মতি। চাপান কি কিছু?

—কিছু না। খেতে দে বুড়ীকে ভালো করে। কালীমায়ের স্থানের মৃত্তিকা লাগিয়ে দে। বাস্।

মতির মা-ও মাথার ঘোমটা খানিকটা কমিয়ে দিলে। বললে—যাতনায় পরান যে বেরিয়ে যাচ্ছে আমার।

—তবে আগুনের সেঁক। শত বৈদ্য সম অগ্নি; ওর চেয়ে বেদনার আর ওষুধ হয় না। নুনের পুঁটলি করে সেঁক দে। ওতেই যা হয় হবে।

—ওতেই যা হয় হবে? ওষুধ দেবেন না? যা খুশি তাই খাব? আমি তাহলে আর বাঁচব না? পরিপূর্ণভাবে ঘোমটা খুলে মতির মা এবার ডাক্তারকে প্রশ্ন করে নিষ্পলক দৃষ্টিতেই তাঁর দিকে চেয়ে রইল। বিচিত্র সে দৃষ্টি! কঠিনতম প্রশ্ন সে দৃষ্টিতে সমুদ্যত হয়ে রয়েছে! জীবনের শেষ প্রশ্ন!

এমন দৃষ্টির সম্মুখে কেউ বোধ হয় দাঁড়াতে পারে না। পারে তিন প্রকারের মানুষ। এক পারে বিচারক—যাকে প্রাণদণ্ড দিতে হয়। আসামী যদি তাকে প্রশ্ন করে—আমাকে মরতে হবে?—তবে বিচারক বলতে পারে—হ্যাঁ, হবে।

আর পারে জল্লাদ—যে ওই দণ্ড হাতে তুলে দেয়।

আর পারে চিকিৎসক।

জীবনমশায় সেকালে বলতে পারতেন। অবশ্য প্রবীণ রোগীকেই সাধারণত বলতেন—আর কী করবে বেঁচে? দেখলেও অনেক, শুনলেও অনেক, ভোগ

করলেও অনেক, ভুগলেও অনেক। এইবার যারা রইল তাদের রেখে—। প্রসন্ন হাসি হাসতেন।

তাঁর বাবা জগৎমশায় শেষটায় বলতেন, গোবিন্দ! গোবিন্দ! হরিনাম করো, ইষ্টনাম করো। নামের তরী বাঁধা ঘাটে।

তাঁর ডাক্তারী বিদ্যার গুরু রঙলাল ডাক্তার ছিলেন বিচিত্র মানুষ। রোগীর সামনে সচরাচর মৃত্যুর কথা বলতেন না; তবে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—Medicine can cure disease but cannot prevent death; বলেই লম্বা পা ফেলে রোগীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেন।

আজ জীবন ডাক্তার মতির মায়ের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললেন—তাতেই বা তোমার দুঃখ কিসের গো। নাতিপুতি ছেলে বউ রেখে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে। পার তো চলে যাও তীর্থস্থানে।

কথার মাঝখানেই মতি বলে উঠল—এই দেখুন ডাক্তার জ্যোঠা, কী বলছেন দেখুন। হাঁ গো, সে টাকা আমাদের আছে?

—কেন? এই তো দশ ক্রোশ পথ, ট্রেনে যাবি, বাড়ি ভাড়া করে রেখে আসবি। কীই বা খরচ? কাটোয়াতে ভিড় বেশী, অনেক পূর্ববঙ্গের লোকজন এসেছে—তার চেয়ে উদ্ধারণপুর ভালো। পাড়াগাঁ—গঙ্গাতীর, সারবার হলে এক মাস গঙ্গার বাতাস গায়ে লাগালেই সব ভালো হয়ে যাবে। নিত্য গঙ্গাস্নান করবে, দেখবি মায়ের নবকলেবর হয়ে যাবে। না হয়—

কথা অসমাপ্ত রেখেই ডাক্তার বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হাত দুখানি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—মতি, জল দে হাতে।

দুই

মন খারাপ হল না ডাক্তারের। মতির মায়ের বয়স হয়েছে, বয়সের অনুপাতে দেহ অনেক বেশী ভেঙেছে। বাত-জ্বর, পেটের গোলমাল—নানানখানা রোগ তো আছেই। তার উপর এই আঘাতে পায়ের হাড়ে আঘাত লেগেছে। ভেঙেছে। হয়তো বা শেষ পর্যন্ত আঘাতের স্থানটা পাকবে। একমাত্র ছেলে, বউ, কয়েকটিই নাতি-পুতি, তা যাক না বুড়ী; এ তো সুখের যাওয়া। বুড়ীর যেতে ইচ্ছে নাই। ডাক্তার এক নজরেই বুঝতে পারেন। মৃত্যুর কথা শুনলে চমকে ওঠে না—এমন লোক বোধ হয় সংসারে খুব কম। তবু বলেন এই কারণে যে, মানুষের এগিয়ে যাওয়ারও তো সীমা নেই।

বেচারী মতির মা পিছনে পড়ে আছে অন্ধকারের মধ্যে। তাকে দোষ দিতে পারবেন না। ছেলে, বউ, নাতি, নাতনী, ঘর-সংসার—বড় জড়িয়ে পড়েছে বুড়ী।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।

বুড়ী সেই সনাতন 'আশ্চর্য' হয়ে উঠেছে আজ। কিন্তু যেতে হবে বুড়ীকে। আর যাওয়াটাই ওর পক্ষে মঙ্গল। হ্যাঁ মঙ্গল। নইলে দুর্ভোগের আর অন্ত থাকবে না।

জীবন ডাক্তারের দেহখানা খুব ভারী। পা দুটো মাটির উপরে দেহের ওজনে জোরে জোরেই পড়ে। ডাক্তার পথ দিয়ে চলেন—পাশের বাড়ির লোকেরা জানতে পারে ডাক্তার চলেছেন। এই শ্রাবণ মাসের ফিনফিনে বৃষ্টিতে পিছল এবং নরম মেটে রাস্তার উপর সন্তর্পণে পা ফেলে চলতে হবে। চোখ রাখতে হবে মাটির উপর। দুটোই ডাক্তারের পক্ষে বিরক্তিজনক। কিন্তু উপায় নাই—পিছল পথে পা ফসকালে অঙ্গ আর থাকবে না। পৃথিবীকে মানুষ বলে—মা, সবুজ ঘাসে আর ফসলে ঢাকা দেখে বলে—কোমলাঙ্গী; একবার পড়লেই ভুল ভেঙে যায়। আপন মনেই ডাক্তার হাসেন।

আরে—আরে—আরে! ডাক্তার থেমে গিয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। পথের ধারে একটা ডোবার মুখে এই অনাবৃষ্টির বর্ষায় সামান্য পরিমাণে খানিকটা জল জমেছে—দুটো ছেলেতে পরমোৎসাহে তাই ছেঁচতে শুরু করেছে। কাদা-গোলা জল ছিটিয়ে রাস্তার ওইখানটা কর্দমাক্ত করে তুলেছে।

ছেলে দুটো থেমে গেল। জীবনমশায় এখানে সর্বজনমান্য।

—কী করছিস? হচ্ছে কী?

—মাছ গো। এই এতু বড়ি একটা ল্যাঠা মাছ!

—তুই তো মদন ঘোষের ব্যাটা ?

—হি গো, মদনার ব্যাটা বদনা আমি।

ডাক্তার হেসে ফেললেন, বললেন—শুধু মদনার ব্যাটা বদনা ? তুই মদনার ব্যাটা—বদনা ঠ্যাটা ! পাজীর পা-ঝাড়া ! উল্লুক !

—ক্যানে ? কী করলাম আমি ?

—কী করলি ? এবার কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ করে ডাক্তার বললেন, এমনি করে বাবার নাম, নিজের নাম বলতে হয় ? ছি ! ছি ! ছি ! বলতে হয়—আজ্ঞে হ্যাঁ, শ্রীমদনলাল ঘোষের ছেলে আমি, আমার নাম শ্রীবদনলাল ঘোষ। বুঝলি ?

বদন ঘাড় কাত করে মাথাটা কাঁধের উপর ফেলে দিলে। খুব খুশী হয়েছে বদন। ডাক্তার বললেন—আর এটি ? এটি কে ?

ছেলেটি বেশ সুশ্রী। সুন্দর চেহারা। এ গ্রামের বলে মনে হচ্ছে না। ডাক্তারের কথার উত্তরও দিলে না। বদন বললে—ও আমাদের গাঁয়ে এসেছে। সরকারদের বাড়ি। মামার বাড়ি এসেছে।

—আচ্ছা ! অহীন্দ্র সরকারের মেয়ে অতসীর ছেলে ?

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে দিলে দুবার।—হ্যাঁ।

ডাক্তার বললেন—জলে ভিজো না, বাড়ি যাও। সর্দি হবে। জ্বর হবে। মাথা ধরবে।

বদন বললে—আপুনি ভিজছে ক্যানে ?

ডাক্তার কৌতুকে সশব্দেই হেসে উঠলেন। বললেন—আমি ডাক্তার রে দুষ্টু। অসুখ আমাকে ভয় করে। যা—বাড়ি যা। চল, আমার সঙ্গে চল।

ছেলে দুটোকে সঙ্গে নিয়েই তিনি ফিরলেন। সেতাব না এসে থাকলে এদের নিয়েই একটু আমোদ করবেন। চলতে চলতে বললেন—জানিস, আমড়া খেলে অম্বল হয়, অম্বল হলে জ্বর হয়। কিন্তু ডাক্তারেরা খায়। লোককে বলি আমড়া খাই আমরা, লোককে বলি খেয়ো না আমড়া।

আরোগ্য-নিকেতনের বারান্দায় ইতিমধ্যেই সেতাব মুখুজ্জে কখন এসে বসে আছেন। ডাক্তারকে দেখে তিনি বললেন, গিয়েছিলি কোথা ? আমি এসে ভাবি গেল কোথায় ! নন্দ কি ইন্দির দুজনের একজন পর্যন্ত নাই।

ছেলে দুটোকে ছেড়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন, যা—বাড়ি যা তোরা। সেতাবকে বললেন, গিয়েছিলাম মতি কর্মকারের বাড়ি। মতির মায়ের হুকুম এসেছে। বোস, চায়ের জন্য বাড়িতে বলে আসি। কল্কেয় টিকেটা ধরিয়ে দে তুই, ইন্দির বাইরে গিয়েছে।

একেবারে সাত-আটটা কল্কেতে তামাক সাজা আছে। এ ছাড়াও তামাক-টিকে আছে। খাওয়া-দাওয়ার পরই নন্দ সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে। তারপর প্রয়োজনের সময় ইন্দির থাকলে ইন্দির, না থাকলে ডাক্তার বা সেতাব নিজেরাই কেউ দরকার-মতো কল্কেতে আগুন দিয়ে নেন। এখন দুজনে বসবেন দাবাতে। কতক্ষণ চলবে কে জানে! বাড়িতে ভাত ঢাকা থাকবে। তবু তো আগেকার কালের শক্তিও নাই—উৎসাহও নাই।

চায়ের বরাত করে তামাকের টিকে ধরিয়ে নিয়ে দাবায় বসলেন দুজনে। খেলাটা হঠাৎ যেন জমে উঠল। সেতাবের মন্ত্রীটা ধাঁ করে মেরে বসলেন মশায়। ওদিকে আকাশে মেঘও বেশ জমেছে, বৃষ্টি ও বেশ সুর ধরেছে; ঝিপ-ঝিপ করে বৃষ্টি নেমেছে, বৃষ্টি খানিকটা হবে বলে মনে হচ্ছে। নীরবেই খেলা চলছিল, সেতাব মুখুজ্জে বললেন—ভিতরে চল জীবন—গা শিরশির করছে।

—শিরশির করছে? কেন রে? আমার তো বেশ আরাম বোধ হচ্ছে!

—তোমার কথা আলাদা। এত চর্বিতে শীত লাগে কখনো? আমার শরীরটাও ভালো নাই।

—জ্বর হয় নি তো? দেখি হাত?

—না, হাত দেখতে হবে না। ওই তোর বাতিক। আমি নিজেও জানি হাত দেখতে। দেখেছি নাড়ী গরম একটু হয়েছে। ও কিছু নয়; চল ভেতরে চল। সেতাব সরিয়ে নিলেন হাতখানা।

ডাক্তার কিন্তু ছাড়লেন না, হাত বাড়িয়ে একরকম জোর করে সেতাবের হাতখানা টেনে নিলেন। হ্যাঁ, বেশ উত্তাপ হাতে! কিন্তু নাড়ী অনুভব করার সুযোগ পেলেন না। সেতাব মুখুজ্জে হাতখানাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছেন।

—ছাড়, হাত ছাড়, জীবন। হাত ছাড়।

—পাগলামি করিস নে সেতাব। নাড়ী দেখতে দে।

—না। চীৎকার করে উঠলেন সেতাব।

—আরে, হল কী তোর? আরে! বিস্মিত হয়ে গেলেন জীবন ডাক্তার।

—না-না-না। ছেড়ে দে আমার হাত। ছেড়ে দে। ঝটকা মেরে ডাক্তারের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সেতাব উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর নিজের লণ্ঠনটা একপাশে নামানো ছিল। সেটা জ্বালাবার অবকাশও ছিল না; নেভানো লণ্ঠনটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লেন দাওয়া থেকে।

—সেতাব, ছাতা, তোর ছাতা।

এবার সেতাব ফিরলেন। ছাতাটি নিয়ে লণ্ঠনটি জ্বালাতে জ্বালাতে বললেন—নিজের নাড়ী দেখ তুই। তুই এইবার যাবি আমি বললাম। লোকের নাড়ী দেখে নিদান হেঁকে বেড়াচ্ছিস, নিজের নিদান হাঁক।

সেতাব চলে গেলেন সেই বৃষ্টির মধ্যে।

ডাক্তার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেতাব মধ্যে মধ্যে এমনি অকারণে রেগে ওঠেন। অকারণ ঠিক নয়, নিজের চাল ভুল হলে মনে মনে রাগেন নিজের উপরেই, তারপর একটা যে-কোনো ছুতোতে ঝগড়া করে বসেন। উঠেও চলে যান। ফেরানো তাঁকে যায় না, পরের দিন ডাক্তার যান তাঁর বাড়ি। গেলেই সেতাব বলেন—আয়—আয় বোস। এই যাব বলে উঠেছিলাম আর তুইও এলি।

ডাক্তার একটু হেসে বাড়ির ভিতরে যাবার জন্যে ঘুরলেন; ডাক্তারখানার দরজা বন্ধ করতে গিয়ে কিন্তু থমকে দাঁড়ালেন। আজ সেতাবের রাগটা প্রচ্ছন্ন বিকার নয় তো? উত্তাপে অল্প জ্বর মনে হল—। কিন্তু নাড়ী দেখতে তো দিলেন না সেতাব। ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত করে তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ভাবছিলেন—যাবেন এখুনি সেতাবের বাড়ি।

ফল নেই। তাই যদি হয় তবে সেতাব কিছুতেই তাঁকে হাত দেখতে দেবেন না, বরং আরও বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠবেন।

আর এই বৃষ্টিতে ভিজে অনিষ্ট? সে যা-হবার হয়েছে।

মৃত্যু-রোগের একটা যোগাযোগও আছে, যা বিচিত্র এবং বিস্ময়জনক।

পরের দিন।

সাধারণত ডাক্তার বেশ একটু দেরিতে ওঠেন। আজ কিন্তু উঠলেন সকালেই। সমস্ত রাত্রি ভালো ঘুম হয় নি। সেতাব সম্পর্কেই দুশ্চিন্তা একটা বাতিকের মতো তাঁকে চঞ্চল করে রেখেছিল। কত উদ্ভট চিন্তা। তাঁর অভিজ্ঞতায় যত বিচিত্র রোগলক্ষণ উপসর্গ তাঁর চোখে পড়েছে, তিনি যেন উপলব্ধি করেছেন—সেই সব উপসর্গের লক্ষণ তিনি সেতাবের আচরণের সঙ্গে মিলিয়ে পেয়েছেন সেদিন। যত দেখেছেন ততই যেন মিলেছে। মনে মনে অনুতাপ হয়েছে, সেতাবকে তিনি জাপটে ধরে জোর করে ঘরে বন্ধ করে রাখলেন না কেন? ওই বর্ষণের মধ্যে যেতে দিলেন কেন? প্রচ্ছন্ন বিকার নিয়ে জ্বরই খুব খারাপ, তার উপর এই বর্ষায় ভিজে যদি সর্দিটা প্রবল হয় তবে যে অসাধ্য হয়ে উঠবে।

বয়স সেতাবের হয়েছে, জীবনে বন্ধনও নাই। বন্ধন বলতে স্ত্রী—কিন্তু সে স্ত্রী এমনই সক্ষম ও আত্মপরায়ণা যে, সেতাবের অভাবে তার বিশেষ অসুবিধা ঘটবে

না। সেতাবের অভাব অনুভব করলেন তিনি নিজে। সেতাব না হলে তাঁর দিন কাটে না। তিনি থাকবেন কাকে নিয়ে ?

সকালে উঠেই তিনি সেতাবের বাড়ি যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। ডাক্তারগিন্নীও সকালেই ওঠেন। এবং তাঁর বিচিত্র স্বভাবের বিচিত্রতম অংশটুকু এই প্রথম প্রভাতেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে। নাম তাঁর দুর্গা। দুর্গা প্রভাতে ওঠেন যুদ্ধোদ্যতা দশপ্রহরণধারিণীর মতো। মেজাজ সপ্তমে উঠেই থাকে ; সেই মেজাজে বকেঝকে বাড়িটাকে সন্ত্রস্ত করে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে আশ্চর্যভাবে ধীরস্থির হয়ে আসেন। ডাক্তার দেরিতে ওঠেন যেসব কারণে ওটা তার মধ্যে একটা প্রধান কারণ। গিন্নি স্থির হলে নিশ্চিন্ত হয়ে গাত্রোত্থান করেন তিনি।

ডাক্তার-গিন্নী অনেক আগেই উঠে বাসনমাজা-ঝিকে তিরস্কার করছিলেন, বালি এবং করকরে ছাই দিয়ে বাসনমাজার জন্য। ওতে বাসনের পরমায়ু কতদিন ? সংসারে যাঁরা সিদ্ধপুরুষ, মৃত্যু যাঁদের ইচ্ছাধীন, তাঁদের মাথায় ডাণ্ডা মারলে তাঁরাও মরতে বাধ্য হন। ও তো নির্জীব কাঁসার গেলাস। বালি দিয়ে দুবেলা ঘষলে ও আর কতদিন। কাঁসার দাম যে কত দুর্মূল্য হয়েছে সেও তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। ডাক্তার উঠে আসবার সময় কেশে গলা পরিষ্কার করে সাড়া দিয়ে নামলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন—আমি বেরুচ্ছি একবার মাঠে। সকাল-বেলা উঠেই প্রথম কথাটি তাঁকে মিথ্যে বলতে হল। নইলে গিন্নীর দৃষ্টি এবং হুঙ্কার ভস্মলোচন ভস্মকারিণীর মতো প্রখর এবং ভীষণ হয়ে উঠবে।

ছাতাটি নিয়ে বেরিয়ে সোজা এসে উঠলেন ওই বড়বাজারে গ্রামখানিতে। সদর রাস্তা থেকে ছোট পথ ধরে সেতাবের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং ডাকলেন।

—সেতাব !

সেতাবও তখন উঠেছেন। ঘরের ভিতর তক্তাপোশের উপর বসে তামাক খাচ্ছেন। বাইরে ডাক্তারকে দেখে হেসে বললেন—এসেছিস ?

ডাক্তার ঘরে ঢুকে তক্তাপোশের উপর বসে বললেন—যাক। জ্বর-টর নাই তো ? মুখ দেখে মনে হচ্ছে ছেড়ে গিয়েছে।

সেতাব হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন—দেখ।

—দেখব ? হাসলেন ডাক্তার।

—দেখ। নিদান একটা হাঁক দেখি। আর তো পারছি না। জীবনে ঘেন্না ধরে গেল।

ডাক্তার হেসে বললেন—তা কাল রাত্রে বুঝেছি। যে রাগ তোর আমার উপর !

সেতাব ওদিক দিয়েই গেলেন না, বললেন, কাল রাত্রে বুড়ী আমাকে যা বকলে, সে তোকে কী বলব? এক মুঠো মুড়ি পর্যন্ত খেতে দিলে না রে। বললাম সর্দিতে গা গরম হয়েছে, জীবন আমাকে দুধ-মুড়ি খেতে বলেছে। ঘি ময়দা থাকলে চারখানা গরম লুচি সব থেকে উত্তম। ঘরে ঘি-ময়দা আছে, বুঝলি—জেনেই আমি বলেছিলাম। বাজারে ময়দা মেলে না—আমার জমিতে মন দুই গম হয়েছিল, সে পিষিয়ে ময়দা করিয়ে রেখেছি। বাড়ির দুধ হয়-না হয়-না করেও সের দেড়েক হয়। তার সব সরটুকু জমিয়ে বুড়ী ঘি করে। একদিন সরের মুখ দেখতে পাই না। কালই বিকেলে সর গালিয়েছেরে! তা তোকে কী বলব, আমাকে নো ভূতো নো ভবিষ্যতি, তোর পর্যন্ত বাপান্ত করে ছাড়লে। এই সকালে খিদেতে পেট জলছে খাণ্ডব দাহনের মতো।—কী করব—বসে বসে তামাক টানছি। এর চেয়ে যাওয়াই ভালো। কী হবে, বেঁচে!

ডাক্তার হাতখানা এবার টেনে নিলেন—স্পর্শমাত্রেই বুঝলেন জর ছেড়ে আসছে। বললেন—জর ছেড়ে আসছে। কাল রাত্রে গিন্নী খেতে না দিয়ে ভালোই করেছে। কয়েক মুহূর্ত নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন—আজ সকাল সকাল ঝোল-ভাত খা। এখন বরং চায়ের সঙ্গে কিছু খা। আর জর হবে বলে মনে হচ্ছে না।

—কিছু খা! সেতাব রুক্ষ স্বরে বলে উঠলেন—কিছু খা! ঠাকুরসেবা নাই? সে কে করবে?

—কাউকে বল না, করে দেবে।

—দেবে? একালের কোন ব্যাটা এসব জানে, না এতে মতি আছে! আছে এক মুখ্যু ডাঙ ওই ঠ্যাঙবাঁকা চাটুজ্জেদের ছেলে। তা এখন তার কাছে যায় কে? যদি ব্যাটা বুঝতে পারে যে আমি খেয়েছি তবে এক বেলাতেই আট আনা চেয়ে বসবে।

—তাই দিবি। শরীর আগে না পয়সা আগে! খিদেয় তোর পেট জলছে—আমি বুঝতে পারছি, তুই খা। আমি বরং ব্যবস্থা করছি। আমাদের গ্রামের মিশ্রদের কাউকে পাঠিয়ে দোব, বুঝলি। খা তুই, পেট ভরে খা। চায়ের সঙ্গে মুড়ি ফেলে নাস্তা কর।

সেতাব এবার চুপিচুপি বললেন—তুই বল না, একটু হালুয়া করে দিক। ময়দা চাললেই সুজি বেরুবে। চিনি অবিশ্যি নাই, তা ভালো গুড় আছে। খেজুর গুড়ের পাটালিও আছে ওর ভাঁড়ারে। বুঝলি, রোজ রাত্রে দুধের সঙ্গে ভাত খায় আর ওই পাটালি বার করে। ভাবে, আমি ঘুমিয়ে গিয়েছি। আমি সাড়া দিই না, কিন্তু গন্ধ পাই। বল না ওকে।

ডাক্তার হেসে ফেললেন।

খাওয়ার বিলাসে সেতাব চিরকাল বিলাসী, একটু ভালোমন্দ খেতে ভালোবাসেন বলে ওঁর স্ত্রী নাম দিয়েছে বালকদাসী। বলে, উনি আমার বালকদাসী—ভালোমন্দ খেতে ভালোবাসি! রাম রাম রাম—জিভখানা কেটে ফেলো গিয়ে। না-খেলে মানুষ বাঁচে না, খিদে পেলে পৃথিবী অন্ধকার, তাই খাওয়া। তা বলে এটি খাব, ওটি খাব, সেটি খাব—এ কী আবদার! রামচন্দ্র!

ভালোমন্দ খাওয়ার রুচি ওঁদের স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই। বার্ধক্যের সঙ্গে সে রুচি আরও বেড়েছে। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধে। ডাক্তারকে মধ্যে মধ্যে মধ্যস্থতা করতে হয়। সেতাবের কথা শুনে ডাক্তার তাই হাসলেন।

সেতাব ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন—হাসলি যে!

ডাক্তার বললেন—নিদান হাঁকতে বলছিলি না?

মুহূর্তে সেতাবের মুখ শুকিয়ে গেল। ডাক্তার সেটুকু লক্ষ্য করলেন—এবং সমাদরের সঙ্গে অভয় দিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন—না-না তা বলি নি, ভয় পাস নে, এখনও অনেক দেখবি রে তুই। দেরি আছে। রুচি এখনও সমানে আছে। কিন্তু আজ আর হালুয়াটা খাস্ নে। জ্বরটা একেবারে ছেড়ে যাক। বরং এক বেলা আজ ঝোল-ভাত খাস। ওবেলা যদি আর জ্বর না আসে—কই দেখি দে, নাড়ীটা দেখি। গায়ে হাত দিয়ে জ্বর ছাড়ছে বুঝে আর নাড়ী দেখি নি। জ্বর আসবে কিনা দেখি।

নাড়ী ধরে ডাক্তার হাসলেন, বললেন—না। জ্বর আর আসবে না মনে হচ্ছে। হালুয়া কাল তোকে আমি খাওয়াব। আজ না। কিন্তু হঠাৎ হালুয়াতে এমন রুচি হল কেন বল তো?

—চা-মুড়ির নাম শুনে বমি আসছে। বুঝেছিস না? কি রকম অরুচি হয়ে গিয়েছে। তা তুই এক কাজ কর, দোকান থেকে চারখানা বিস্কুট আনিয়ে দিতে বল। তাই বলে যা। চায়ের সঙ্গে ভিজিয়ে সে ভালো লাগবে।

বিস্কুট নিজে পাঠিয়ে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডাক্তার উঠলেন। সেতাব-গৃহিণী এখনি তর্ক তুলবেন, রোগীর এই অবস্থায় মুড়ি বেশী উপযোগী অথবা বিস্কুট বেশী উপযোগী? একেবারে সমকক্ষ চিকিৎসকের মতোই তর্ক তুলবেন। এবং প্রশ্ন করবেন—দেশে যে আগেকার কালে বিস্কুট ছিল না তখন রোগীরা খেত কী? এবং বিস্কুট খেত না বলে তারা কি মনুষ্যপদবাচ্য ছিল না, না তাদের রোগ সারত না? সেতাবগৃহিণী নারী না হয়ে যদি পুরুষ হতেন তবে বড় উকিল হতে পারতেন। রাগ করে চেঁচামেচি করবেন না, নিজের খুঁটে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কূট তর্ক করবেন;

কার সাধ্য তাঁকে এক পা হটায়। এ-যুগে জন্মালেও জন্ম সার্থক হতে পারত। এখন তো মেয়েরাও উকিল জজ ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ডাক্তারের মনের মধ্যেই কথাগুলি খেলে গেল। প্রকাশ্যে সেতাবকে বললেন—গিন্নীকে বলে কাজ নাই। আমি বরং ফিরবার পথে বাজার থেকে দেখে-শুনে কারুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুই যেন বাইরে থাকিস। বুঝলি?

নিজের পথ্য সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়ে সেতাব এবার হাত ধরে বললেন—বোস বোস, একটু চা খেয়ে যা।

ডাক্তার হেসেই বললেন—চা খাব তো তোর বিস্কুট কিনে পাঠাবে কে? তা ছাড়া কর্মফল ভোগ, সেই বা কে করবে? দু-চারজন হাত দেখাতে আসবে তো! বসে থাকবে তারা। আমি উঠি।

বলেই তিনি উঠলেন।

সেতাব সম্পর্কে দুশ্চিন্তা কেটে গেছে তাঁর। পরমানন্দ মাধব, পরমানন্দ মাধব! মৃদুস্বরে নাম জপ করতে করতে ভারী পা ফেলে তিনি অগ্রসর হলেন।

মাথার ছাতাটা একটু নামিয়ে মাথার উপর ধরলেন। সাধারণ লোকে—যাদের ঘরে রোগী আছে—তারা দেখতে পেলে তাঁকে ছাড়বে না।—ডাক্তারবাবু একটু দাঁড়ান। ছেলেদের হাত দেখে যান। কি—একবার আমার বাড়ি চলুন। আজ দশদিন পড়ে আছে আমার বাবা—একবার ধাতটা দেখুন।

তারপর অনর্গল প্রশংসা। যার নাম নিছক তোষামোদ। বিনা পয়সায় একবার ডাক্তার দেখানো। ওতে অবশ্য জীবন মশায়ের খুব একটা আপত্তি বা দুঃখ নেই, কারণ বাপের আমল থেকে তাঁর আমল পর্যন্ত বিনা ফি-তেই গরিবগুনা মধ্যবিত্তদের ঘরে চিকিৎসা করে এসেছেন। কিন্তু এখন এই বয়সে আর না। তা ছাড়া—। এই বাদলা দিনের ঠাণ্ডা সকালবেলাতেও তাঁর কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। লোকে তাঁকে আর চায় না। হাঁ, চায় না। বলে—। বলে—সে আমলের ডাক্তার, তাও পাশ-করা নয়। আসলে হাতুড়ে। এখনকার চিকিৎসায় কত উন্নতি হয়েছে। সে সবের কিছু জানে না।

কেউ কেউ বলে গোবদ্যি।

হনহন করে হাঁটলেন ডাক্তার।

পথের পাশেই হাসপাতাল; পাশেই তৈরী হচ্ছে নতুন হেলথ সেণ্টার। ওদিকে একবার না তাকিয়ে পারলেন না। যাবার সময়ও তাকিয়েছিলেন, তখন সব নিঝুম স্তব্ধ ছিল। এখন জেগেছে সব। হাসপাতালটার বারান্দায় কজন রোগী বাইরে এসে বসেছে। ঝাড়ুদারেরা ঘুরছে স্বামী-স্ত্রীতে। ওই নার্সদের ঘর থেকে দুজন

নার্স বেরিয়ে চলেছে হাসপাতালের দিকে। এদিকে চ্যারিটেবল ডিস্পেনসারির বারান্দায় এর মধ্যেই কজন রোগী এসে গেছে। আরও আসছে। ওই ওদিকে হেলথ সেন্টারের নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে। প্রকাণ্ড বড় বাড়ি। অনেক আয়োজন, অনেক বেড, অনেক বিভাগ, শিশুমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল, সংক্রামক ব্যাধির বিভাগ, সাধারণ বিভাগ। সার্জারি বিভাগটা বড় হবে, তাতে রক্ত থেকে যাবতীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। তা ভালোই হচ্ছে। রোগে যে রকম দেশ ছেয়ে ফেলেছে তাতে এমনি বিরাট ব্যবস্থা না হলে প্রতিবিধান হবে না। ডাক্তারের মনে পড়ল—প্রথমে হয়েছিল ওই চ্যারিটেবল ডিস্পেনসারিটি। সে হল উনিশ শো দুই বা তিন সালে।

তার আগে—।

—প্রণাম ডাক্তারবাবু! কোথায় গিয়েছিলেন ? ডাকে ?

ডাক্তার চকিত হয়ে মুখ ফেরালেন। দেখলেন এখানকার চ্যারিটেবল ডিস্পেনসারির কম্পাউণ্ডার হরিহর পাল তাঁর পিছনেই সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি থেকে ডিস্পেনসারিতে আসছে, তাঁকে চিনেই বোধ হয় বেল না দিয়ে রথ থেকে নেমে পদাতিক হয়ে তাঁকে সম্মান দেখিয়েছে। সস্নেহে ডাক্তার বললেন—ভালো আছ হরিহর ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তারপর খবর ভালো তো ? কী রকম চলছে তোমার ?

—ওই কোনো রকমে চলে যায় আর কি।

ডাক্তার বুঝলেন হরিহরের প্র্যাকটিস ভালোই চলছে আজকাল। ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। বললে—

—পেনিসিলিন চালাচ্ছ খুব! এ তো পেনিসিলিনের যুগ!

—আজ্ঞে তা বটে। সবেই পেনিসিলিন। ওষুটা খাটেও ভালো। বলতে বলতেই সামনের দিকে অর্থাৎ মশায়ের পিছনের দিকে তাকিয়ে হরিহর একটু চঞ্চল হয়ে বললে—ডাক্তারবাবু আসছেন আমাদের। আপনাদের গ্রাম থেকেই আসছেন দেখছি। ওঃ, বোধ হয় মতি কর্মকারের মাকে দেখতে গিয়েছিলেন। কাল রাত্রে মতি এসেছিল, কল দিয়ে গিয়েছিল।

মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে গেল মশায়ের। তাঁকে অবিশ্বাস করেই তা হলে মতি কল দিয়ে গিয়েছে তার মাকে দেখতে ? মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ালেন মশায়। ওদিকে হাসপাতালের নূতন ডাক্তারটির বাইসিক্ল দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। জীবনমশায় নমস্কার করলেন—নমস্কার!

হাসপাতালের ডাক্তার নামলেন বাইসিক্ল থেকে। তরুণ বয়স, পরনে প্যান্ট,

বুশশার্টের উপরে ওয়াটার প্রুফ, মাথায় অয়েলস্কিনের ঢাকনি-মোড়া শোলার হ্যাট। চোখে শেলের চশমা ; কলকাতার অধিবাসী—নাম প্রদ্যোত বোস। প্রতিনমস্কার করে প্রদ্যোত ডাক্তার বললেন—ভালো আছেন ?

—ভালো ? তা রোগ তো নেই। সংসারে তো একেই ভালো থাকা বলে। তারপর—মতির মাকে দেখে এলেন ?

—হ্যাঁ। কাল রাত্রে মতি এসে বলে—রাত্রেই যেতে হবে। তার মা নাকি যন্ত্রণায় অধীর অস্থির হয়ে পড়েছে। সে কিছুতেই ছাড়বে না। কেসটা তো জানা। প্রথম যখন পড়ে যায় তখন কিছুদিন হাসপাতালে ছিল। কমেও গিয়েছিল বেদনা। তারপর বেদনা বেড়েছে আবার, বোধ হয় ওই অবস্থাতেই ঘোরাফেরা কাজকর্ম করেছে। আমার ধারণা আবারও ধাকাটাকা লাগিয়েছিল। আপনি তো দেখেছেন কাল বিকেলে। সবই তো জানেন।

—হ্যাঁ দেখেছি। তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, কেমন দেখলেন ?

—একটু পাকিয়ে গেছে, এক্স-রে না করলে ঠিক ব্যবস্থা তো হবে না। ভিতরে কোথাও হাড়ের আঘাত গুরুতর হয়েছে, ফেটে থাকতে পারে, যদি ফ্র্যাকচার হয়ে হাড়ের কুচিটুচি থাকে তো অপারেশন করতে হবে। ব্যবস্থা হলেই সেরে যাবে। মারাত্মক কিছু নয়। ঠোঁট দুটিতে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী ফুটিয়ে তুললেন তিনি।

মশায় একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, কুচিটুচি নেই। ফ্রাকচার নয়। ব্যথাটা সরে নড়ে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ফুলোটাও। আমার অবিশ্যি সার্জারিতে বিদ্যেবুদ্ধি নাই। ভালো বুঝি না। বুঝি নাড়ী। আমার যা মনে হল—তাতে ওটা উপলক্ষ্য। যাকে বলে হেতু। আসলে—। কথাটা অর্ধসমাপ্ত রেখে একটু হেসে ইঙ্গিতের মধ্যে বক্তব্য শেষ করলেন।

প্রদ্যোত ডাক্তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে একটু কড়া স্বরেই বললেন—হ্যাঁ—আপনি তো জ্ঞানগঙ্গার ব্যবস্থা দিয়ে এসেছেন। হাসলেন প্রদ্যোত ডাক্তার। এবার রসিকতা করেই বললেন—আমি গিয়ে দেখি ভয়ে বুড়ীর এমন প্যালপিটেশন হচ্ছে যে, জ্ঞানগঙ্গাও আর পৌছুতে হবে না। স্টেশনে যাবার জন্য গাড়িতে তুলতে তুলতেই হার্টফেল করবে।

আরও একটু হেসে নিলেন প্রদ্যোত ডাক্তার। তারপর বললেন—নাঃ, বেঁচে যাবে বুড়ী! মতি কিছু খরচ করতে প্রস্তুত আছে, বাকিটা হাসপাতাল থেকে ব্যবস্থা করে ওকে আমি খাড়া করে দেব। ওকে মরতে আমি দেব না।

শেষের কথাটিতে প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্যের ব্যঙ্গ রনরন করে বেজে উঠল। মনে হল ডাক্তার তীর ছুঁড়লে—তীরটা তাঁর মাথার খাটো-করে ছাঁটা চুলগুলি স্পর্শ করে

বেরিয়ে চলে গেল ; তীরটার দাহ—তীরটা তাঁর কপালে কি ব্রহ্মতালুতে বিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা থেকেও শতগুণে মর্মান্তিক।

ঘাড় নেড়ে মশায় বললেন—আমাকে মারতে হবে না ডাক্তারবাবু, বুড়ী নিজেই মরবে। তিন মাস কি ছ মাস—এর মধ্যেই ও যাবে। ওর অনেক ব্যাধি পোষা আছে। এই আঘাতের তাড়সে সেগুলি—

প্রদ্যোতবাবু চকিতে ঘাড় তুললেন—তারপর বাধা দিয়ে বললেন—পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন—এক্স-রে—এসবের যুগে ওভাবে নিদান হাঁকবেন না। এগুলো ঠিক নয়। জড়ি বুটি সঁদি পিত্তি এসবের কাল থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি আমরা। তা ছাড়া এসব হল ইনহিউম্যান—অমানুষিক।

এরপর জীবনমশায়কে আর কথা বলার অবকাশ না দিয়েই প্রদ্যোত ডাক্তার বললেন—আচ্ছা নমস্কার, চলি। দেরি হয়ে যাচ্ছে হাসপাতালের। সঙ্গে সঙ্গে বাইসিক্লে উঠে ভিতরের দিকে চালিয়ে দিলেন দ্বিচক্রযান খানিকে। কটু কথা বলে মানুষের কাছে চক্ষুলজ্জা এড়াবার জন্য মানুষ এমনি নাটকীয় ভাবেই হঠাৎ পিছন ফিরে চলে যায়।

খানিকটা গিয়ে আবার নেমে বললেন—আসবেন একদিন, আমাদের ব্যবস্থা দেখলেই বুঝতে পারবেন সব। নতুন নতুন কেসের সব অদ্ভুত ট্রিটমেণ্টের হিষ্ট্রি পড়ে শোনাব—মেডিক্যাল জার্নাল থেকে। হাতুড়ে চিকিৎসা ছাড়া এককালে যখন চিকিৎসা ছিল না—তখন যা করেছেন—করেছেন। কিন্তু একালে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা যখন হয়েছে, লোকে পাচ্ছে—তখন ওই হাতুড়ে চিকিৎসা ফলানো মারাত্মক অপরাধ। অন্য দেশ হলে শাস্তি হত আপনার।

কঠিন হয়ে উঠেছে তরুণ ডাক্তারটির মুখ।

জীবনমশায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি অপরাধী? অন্য দেশ হলে তাঁর শাস্তি হত?

এত বড় কথা বলে গেল ওই ছোকরা ডাক্তার? জীবন ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন ; কয়েকটি রোগী হাসপাতালে ঢুকবার সময় তাঁকে দেখে থমকে দাঁড়াল, সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। জীবনমশায় লক্ষ্য করলেন না। তিনি আত্মসংবরণ করছিলেন। এ তো তাঁর পক্ষে নতুন নয়। দীর্ঘজীবনে পাশ-করা ডাক্তার এখানে অনেক এল—অনেক গেল। জেলা থেকে বড় ডাক্তারও এসেছেন। কলকাতা থেকেও এসেছিলেন। মতভেদ হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনি অবজ্ঞাও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে জীবনমশায়ই অভ্রান্ত। না, জীবনমশায় নয়—তিনি নয়. নাড়ীজ্ঞান-যোগ অভ্রান্ত।

মনে পড়ছে। সব ঘটনাগুলি মনে পড়ছে।

পিতামহ দীনবন্ধু দত্ত এই জ্ঞানযোগ পেয়েছিলেন এখানকার বৈদ্যকুলতিলক কৃষ্ণদাস সেন কবিরাজ মহাশয়ের কাছে।

আবার তিনি চলতে শুরু করলেন।

তিন

জীর্ণ আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ায় তখন জনদশেক রোগী এসে বসে আছে। এদের অধিকাংশই মুসলমান। আজ তিন পুরুষ ধরে—দীনবন্ধু মশায়ের আমল থেকে—মশায় বংশ পুরুষানুক্রমে চিকিৎসাই করে আসছেন। জীবনমশায় আজ বৃদ্ধ, আসক্তিহীন, উৎসাহহীন—কিন্তু তবু এরা তাঁকে ছাড়ে না। একমাত্র পুত্র মারা গেছে, নতুন কালের চিকিৎসা-বিজ্ঞান এসেছে তার বিপুল সমারোহ নিয়ে, নিজে স্থবির হয়েছেন, সংসারে শান্তি নাই, জীবনমশায় মধ্যে মধ্যে ভাবেন একেবারেই ছেড়ে দেবেন। কিন্তু দেব দেব করেও দিতে পারেন না, দেওয়া হয় না। আজ তিনি ভাবলেন—না। আর না, আজই শেষ করবেন।

আরোগ্য-নিকেতনে আজ আর ওষুধই নাই; ও ব্যবস্থা ডাক্তার উঠিয়ে দিয়েছেন। আজকাল প্রেসক্রিপশন লিখে দেন। নবগ্রাম বি কে মেডিক্যাল স্টোর্স ওষুধ দেয়। দু-তিন মাস অন্তর কিছু অর্থও দেয় কমিশন বাবদ।

এখনও ওই ভাঙা আলমারি তিনটের মাথায় ওষুধের হিসেবের খাতা স্তূপীকৃত হয়ে জমা হয়ে রয়েছে। খেরো-মলাটগুলো আরসোলায় কেটেছে। ভিতরের পাতাগুলি পোকায় কেটে চালুনির মতো শতছিদ্র করে তুলেছে। তবু আছে। ডাক্তারের দুর্ভাগ্য—উই নেই; অথবা কোনোদিন অগ্নিকাণ্ড হয় নি। জঞ্জাল হয়ে জমে আছে। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে জীবন দত্ত হাসেন। ওর মধ্যে অন্তত বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা পাওনার হিসেব আছে। বেশী, আরও বেশী। তিন পুরুষের হিসেব ধরলে লক্ষ টাকা। তাঁর আমলের—তাঁর নিজের পাওনা অন্তত ওই বিশ হাজার টাকা।

পিতামহ দীনবন্ধু দত্ত ওই নবগ্রামে রায়চৌধুরী বংশের আশ্রয়ে এসে পাঠশালা খুলেছিলেন, পাঠশালা করতেন, রায়চৌধুরীদের দেবোত্তরের খাতা লিখতেন, কিছু আদায়ও করতেন। ওই রায়চৌধুরীদের বাড়িতে চিকিৎসা করতে আসতেন কবিরাজ-শিরোমণি কৃষ্ণদাস সেন। দীনবন্ধু দত্তকে তিনিই শিষ্যত্বে গ্রহণ

করেছিলেন। রায়চৌধুরী বংশের বড়তরফের কর্তার একমাত্র পুত্রের সান্নিপাতিক জরবিকার হয়েছিল; জীবনের আশা কেউই করে নি; মা শয্যা পেতেছিলেন, বাপ স্থাণুর মতো বসে থাকতেন, তরুণী পত্নীর চোখের জলে নদীগঙ্গা বয়ে যাচ্ছিল। আশা ছাড়েন নি শুধু ওই কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়। তিনি বলেছিলেন—একজন ধীর অক্লান্তকর্মা লোক চাই, সেবা করবে। তা হলে আমি বলতে পারি, রোগের ভোগ দীর্ঘ হলেও রোগী উঠে বসবে। সেবা করতে এগিয়ে এসেছিলেন দীনবন্ধু দত্ত। দীর্ঘ আটচল্লিশ দিনের দিন জর ত্যাগ হয়েছিল। কবিরাজ দীমবন্ধুকে বলেছিলেন —আজও তোমার ছুটি হল না। অন্তত আরও চব্বিশ দিন তোমাকে সেবা করতে হবে। এই সময়টাতেই সেবা কঠিন। এখন স্নেহান্ধ আত্মীয়-স্বজনেরা স্নেহাতিশয্যে সেবার নামে রোগীর অনিষ্ট করবে। রোগীকে কথা বলাবে বেশী, কুপথ্যও দেবে। এই সময়ে তোমাকে বেশী সাবধান হতে হবে। তাও দীনবন্ধু নিখুঁতভাবে করেছিলেন।

সন্তান আরোগ্য লাভ করতে বড়কর্তা দীনবন্ধু দত্তকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দীনবন্ধু তা গ্রহণ করেন নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছিলেন —আমি তোমাকে পুরস্কার দেব। প্রত্যাখ্যান কোরো না। ধীরতা তোমার আশ্চর্য, বুদ্ধিও তোমার স্থির; লোভেও তুমি নির্লোভ। তুমি চিকিৎসাবিদ্যা শেখো আমার কাছে। তুমি পারবে।

চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে নবগ্রামের পাশে এই ছোট শান্ত গ্রামখানিতে তিনি বাস করেছিলেন। নবগ্রামে বাস করেন নি। গ্রামখানি ব্রাহ্মণ জমিদার বংশ-অধ্যুষিত, সুতরাং সেখানে কলহ অনেক এবং সেখানে বাজার আছে কাছেই তাই কোলাহলও বড় বেশী। এসব থেকে দূরেই তিনি থাকতে চেয়েছিলেন। বলতেন—দেবতারা প্রসন্ন সহজে হন না, কিন্তু রুষ্ট হন একমুহূর্তে; সামান্য অপরাধে আজীবন সেবার কথা ভুলে যান। আর বাজারে থাকে বণিক। সেখানে চিন্তার অবকাশ কোথা?

মশায় উপাধি পেয়েছিলেন এই দীনবন্ধু মশায়ই। পরনে থান-ধুতি, পায়ে চটি, খালি গা, দীনবন্ধু মশায় গ্রামান্তরে রোগী দেখে বেড়াতেন। এ অঞ্চলে প্রতিটি বালক তাঁকে চিনত। তিনি ডেকে তাদের চিকিৎসা করতেন; মধু খাওয়াতেন। টিনবন্দী মধু থাকত। আর আশ্চর্য ছিল তাঁর সাধুপ্রীতি। সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করে, তাঁদের পরিচর্যা করে বহু বিচিত্র মুষ্টিযোগ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। ভণ্ড সন্ন্যাসীর কাছে ঠকেছেনও অনেক। তাতে তাঁর আক্ষেপ বা অনুশোচনা ছিল না; কিন্তু এ নিয়ে কেউ তাঁকে নির্বোধ বলে রহস্য বা তিরস্কার করলে বলতেন—

সেই আমাকে ঠকিয়েছে, আমি তো তাকে ঠকাই নি। আমার আক্ষেপ কি অনুতাপের তো হেতু নাই। শুধু কি সন্ন্যাসী—কত বেদে, ওস্তাদ, গুণীন—এদের কাছেও তাদের বিদ্যা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

পুত্র জগদ্বন্ধু দত্ত ছিলেন উপযুক্ত সন্তান। তিনি পিতার কাছে সমস্ত বিদ্যাই আয়ত্ত করেছিলেন। মৃত্যুকালে দীনবন্ধু মশায় ছেলেকে বলেছিলেন—বিষয় কিছু পারি নি করতে—কিন্তু আশয় দিয়ে গেলাম মহৎ। মহদাশয়ত্বকে রক্ষা কোরো। ওতেই ইহলোক পরলোক—দুইই সার্থক হবে।

জগদ্বন্ধু দত্ত পিতৃবাক্য অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেছিলেন। তাঁকেও লোকে বলত —জগৎমশাই। পিতার অর্জন-করা মহাশয়ত্ব তিনি রক্ষাই করেন নি, তাকে উজ্জ্বলতর করেছিলেন। তিনি রীতিমতো সংস্কৃত শিখে আয়ুর্বেদ পড়েছিলেন। পারুলিয়ার বৈদ্যপাটের ছাত্র তিনি। চিকিৎসক হিসাবে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে যেমন ছিল ব্যুৎপত্তি তেমনি ছিলেন নির্লোভ এবং রোগীর প্রতি স্নেহপরায়ণ। আবার মানুষ হিসাবে যেমন ছিল তাঁর মর্যাদাবোধ তেমনি ছিল প্রকৃতির মধুরতা। সে মধুরতা প্রকাশ পেত তাঁর মিষ্ট ভাষায়, সূক্ষ্ম রসবোধে ও রসিকতায়। তাঁর রসিকতার কয়েকটি স্মৃতি এখানকার মানুষের রসশাস্ত্রের অলিখিত ইতিকথায় কয়েকটি অধ্যায় হয়ে আছে। তাঁর রসিকতার সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তাতে কটু বা অম্লরসের একটুকু প্রক্ষেপ থাকত না। মানুষকে মধুর রসে আপ্লুত করে দিত। প্রসন্ন হয়ে উঠত রসিকতায় আভষিক্ত জনটি।

এই যে লাল কাঁকরের পাকা রাস্তাটি নবগ্রাম থেকে এই গ্রামে এসে পৌঁচেছে এবং এই গ্রাম পার হয়ে উত্তর দিকে বিস্তীর্ণ মাঠখানির বুক চিরে চলে গিয়েছে —ওই রাস্তাটির কথা উঠলেই লোকের মনে পড়ে যায় জগৎমশায়ের কথা, তাঁর রসজ্ঞানের কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে মন সরস ও প্রসন্ন হয়ে ওঠে। আপন মনে একা একাই লোকেরা হেসে সারা হয়।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে। তখন এখনকার এই পরিচ্ছন্ন গ্রাম্য সড়কটির শুধু আকারই ছিল, আয়তনও একটা ছিল, অবয়বও ছিল,—কিন্তু কোনো গঠনই ছিল না। একটা অসমান, খানাখন্দে বন্ধুর এবং দুর্গম গো-পথ ছিল। বর্ষার সময় এক-বুক কাদা হত। সে কাদা একালে কেউ কল্পনাই করতে পারবেন না। মশায়ের রসিকতার কাহিনীটি থেকেই তা বুঝতে পারবেন।

এখনও দেবীপুরে সেকালের খানাখন্দের নাম শুনতে পাওয়া যায়। একটু প্রবীণ দেখে যাকে খুশি জিজ্ঞাসা করবেন—সে নাম বলবে—চোরধরির গাদ অর্থাৎ

কাদা ; মানে যে কাদায় পড়ে চোর ধরা পড়ে রায়। গোরুমারির খাল—ও খালটার চোরাবালির মতো একটা চোরা গর্তে ব্রজ পরামানিকের একটা বুড়ী গাই পড়ে মরেছিল। এই কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ হেসে উঠবে। না হেসে থাকে কী করে? ভাবুন তো ব্যাপারটা! ব্রজর গোরু মরল, কিন্তু সে বিপদের চেয়েও বড় বিপদ হল—ব্রজ যে প্রায়শ্চিত্ত করবে তার মাথা কামাবে কে? সে নিজে নাপিত, ক্ষুর তার আছে, কিন্তু চালাবে কে? এখনকার মতো তখন তো সবাই ক্ষুর চালাতে জানত না। জানলেও, নিজের হাতে মাথা কামানো নিশ্চয় যায় না। শেষে ওই জগদ্বন্ধু মশায়ই দিয়েছিলেন ব্রজর মাথা কামিয়ে। কবিরাজ ছিলেন, বিকারগ্রস্ত রোগীর মাথা অনেক সময় তাঁকে কামিয়ে দিতে হত কি না! এ সব রোগীর মাথায় ক্ষুরের মতো অস্ত্র চালাতে তিনি পরামানিকের হাতে ক্ষুর ছেড়ে দিতেন না। সেদিন ব্রজর মাথা কামাতে বসে তার মাথাটি বাঁ হাতে ধরে নিজেই হেসে ফেলেছিলেন, কামাবার সময় জগদ্বন্ধু মশায় হেসেই বলেছিলেন, ব্রজ, আজ শোধ নি?

—আজ্ঞে? ব্রজ অবাক হয়ে গিয়েছিল—শোধ? কিসের শোধ?

—কামাবার সময় অনেক রক্ত দেখেছ বাবা, আজ আমি দেখি? শোধ নি?

থাক। এই রাস্তাকে ভালো করেছেন তিনি অর্থাৎ জীবনমশায় নিজে। তিনিই ওই কাঠের নামফলকখানা টাঙিয়েছিলেন। জগদ্বন্ধু মশায় ছিলেন কবিরাজ। জীবনমশায়—ডাক্তার কবিরাজ দুই। তখনকার দিনে একটা কথার চলন ছিল ঘরে ঘরে। জগৎ খাবি, না জীবন খাবি? সেকালে অসুখ হলে বাড়ির লোক রোগীকে প্রশ্ন করত—জগৎ খাবি, না জীবন খাবি? অর্থাৎ ডাক্তারি ওষুধ খাবি—জীবন দত্তকে ডাকব? না—কবিরাজী ওষুধ খাবি—জগদ্বন্ধু কবিরাজ মশায়কে ডাকব?

আজ ওই কথাটা চিরদিনের মতো ভুলে যাক লোকে।

—মশায়! বাবা!

জীবনমশায় আহত অন্তর নিয়ে ফিরে এসে ডাক্তারখানায় স্তব্ধ হয়ে বসলেন, স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। আজ থেকে শেষ। শেষ হয়ে যাক মশায় বংশের মশায় উপাধি চিকিৎসকের কাজ। যাক।

এরই মধ্যে শেখপাড়ার বৃদ্ধ মকবুল এসে দরজার মুখে বসে তাঁকে ডাকলে—মশায়! বাবা!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস আপনা-আপনি বেরিয়ে এল জীবনমশায়ের বুক থেকে। —কে? তিনি সচেতন হয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন মকবুলের দিকে।

মকবুল বললে—হাতটা একবার দেখেন বাবা! বড় কষ্ট পাচ্ছি এই বুড়ো বয়সে। অষ্টাঙ্গে দরদ। ঘুষঘুষা জ্বর। মাটি নিতে হবে তা আমার মালুমে এসেছে। কিন্তু এই কষ্ট—এ যে সইতে নারছি বাবা। ইহার একটা বিধান ছান।

মশায় ঘাড় নেড়ে বললেন—আমার কাছে তোমরা আর এস না মকবুল। চিকিৎসা আর আর আমি করব না। একালে অনেক ভালো চিকিৎসা উঠেছে, হাসপাতাল হয়েছে, নতুন ডাক্তার এসেছে। তোমরা সেইখানেই যাও।

মকবুল অবাক হয়ে গেল। জীবনমশায় এই কথা বলছেন? দীনুমশায়ের নাতি, জগৎমশায়ের ছেলে—জীবনমশায় এই কথা বলছেন? যে নাকি নাড়ীতে হাত দিলে, মকবুলের মনে হয়, অর্ধেক রোগ ভাল হয়ে গেল, তাঁর মুখে এই কথা!

ডাক্তার তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসি হেসে, তাকে বুঝিয়েই বললেন—আমার আর ভালো লাগছে না মকবুল। তা ছাড়া বয়স হয়েছে, ভুল-ভ্রান্তি হয়—

—অ—ডাক্তার! বলি, তুমি চিকিৎসা ছাড়লে আমাদের কী হবে হে? আমরা যাব কোথায়? নাও—নাও। লোকের হাত দেখে বিদেয় করো। তোমার ভুল-ভ্রান্তি! কী বলে, তোমার ভুল-ভ্রান্তি হলে সে বুঝতে হবে আমাদের অদৃষ্ট ফের! নতুন চিকিৎসা, নতুন ডাক্তার—অনেক সরঞ্জাম, বৃহৎ ব্যাপার, ওসব করাতে আমাদের সাধ্যিও নাই, ওতে আমাদের বিশ্বাসও নাই। —বললে কামদেবপুরের দাঁতু ঘোষাল। অনেক কষ্টেই বললে।

একসঙ্গে এতগুলি কথা বলে অনর্গল কাশতে শুরু করে দিলে সে। বুকের পাঁজরাগুলি সেই কাশির আক্ষেপে কামারের ফুটো হাপরের মতো শব্দ করে ফুঁপছে। মনে হচ্চে, কখন কোন মুহূর্তে দম বন্ধ হয়ে দাঁতু মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। ডাক্তার চারিদিক তাকিয়ে খুঁজলেন একখানা পাখা অথবা যা হোক একটা কিছু—যা দিয়ে একটু বাতাস দেওয়া যায়। দাঁতুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। কিন্তু কিছুই নাই কোথাও। ওই নন্দ হতভাগার জন্তে কিছু থাকবার জো নাই। শিশি-বোতল থেকে মিনিমগ্লাস, মলম তৈরীর সরঞ্জাম, থারমোমিটারের খোল এমন কি পুরানো বাতিল স্টেথোসকোপের রবারের নলের টুকরো ছুটো পর্যন্ত নিয়ে খিয়েছে হতভাগা! কিছু না পেয়ে ডাক্তার উঠে ভাঙা আলমারির ভিতর থেকে টেনে বের করলেন একখানা পুরানো হিসেবের খাতা; লাখ টাকা পাওনার তামাদি দলিল; তারই একদিকের খেরোর মলাটখানা ছিঁড়ে নিয়ে বাতাস দিতে শুরু করলেন। বাইরে সমাগত রোগীদের দিকে তাকিয়ে একজনকে বললেন—বাড়ি থেকে এক গ্লাস জল আন তো। চট করে।

কামদেবপুরের এই বৃদ্ধ দাঁতু ঘোষালের চিরকাল একভাবে গেল। দাঁতু যত লক্ষ্মীছাড়া তত লোভী; ছুনিয়া জুড়ে খেয়ে খেয়ে লোভের তৃপ্তি খুঁজে বেড়ালে সারাজীবন; কিন্তু তাতে লোভের তুষ্টি হয় নি, হয়েছে যোগ; পুষ্টির বদলে হয়েছে দেহের ক্ষয়। তার উপর গাঁজা খায় দাঁতু। এককালে গাঁজা খেত ক্ষুধার জন্য। গাঁজায় দম দিয়ে খেতে বসলে পাকস্থলীটি না কি বেলুনের মতো ফেঁপে ওঠে। তাতে আহার্য ধরে বেশী পরিমাণে। তাঁর বাড়িতেই দাঁতু ঘোষাল নিমন্ত্রণ খেতে বসে অন্ন-ব্যঞ্জনে বালতিখানেকেরও উপর কিছু উদরস্থ করে—মিষ্টির সময় সাত-চল্লিশটি রসগোল্লা খেয়ে উঠেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে গোটা কাঁঠাল খেয়ে দাঁতু ঘোষাল যে কতবার বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছে তার হিসাব নাই। বার চারেক তো কলেরার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। তবু ঘোষাল লোভ সংবরণ করতে পারলে না। এখন বদহজম থেকে হাঁপানি হয়েছে। তার উপর নেশা। গাঁজায় দম দিয়ে হুঁকো হাতে বসবে, টানবে আর কাশবে। কাশতে কাশতে হাঁপাতে শুরু করবে। এবং সপ্তাহে ছুদিন ডাক্তারের এখানে আসবে—ওষুধ দাও ডাক্তার। ভালো ওষুধ দাও। আর ভুগতে পারছি না।

ভালো ওষুধ চায় ঘোষাল, কিন্তু মূল্য দিয়ে নয়। বিনা মূল্যে চাই। বাল্যকালে ঘোষাল জীবন ডাক্তারের সঙ্গে পাঠশালায় পড়েছিল, অনেক মন্দবুদ্ধি এবং মন্দকর্মে মতি সে যুগিয়েছে, সেই দাবিতে ডাক্তারের চিকিৎসায় ঔষধে তার অবাধ অধিকার। তার উপরে ঘোষাল যজমানসেবী পুরোহিত ব্রাহ্মণ। অশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতা পূজা করে বেড়ায়। সে হিসেবেও তার এ দাবি আছে। বিদেশী ডাক্তারেরা এ দাবি মানে না। তারা না মানতে পারে কিন্তু জীবন মানবে না কেন? এ দাবি তারা দীনবন্ধু মশায়ের আমল থেকে চালিয়ে আসছে, ছাড়বে কে? তবে গুণও আছে ঘোষালের। কোনো যজ্ঞিবাড়ি থেকে কাকের মুখে বার্তা পাঠিয়ে দাও, ঘোষাল এসে হাজির হবে। কোমর বেঁধে দিবারাত্রি খেটে কাজ সেরে খেয়ে-দেয়ে বাড়ি যাবে। দক্ষিণা দাও ভালোই, না দাও তাতেও কিছু বলবে না সে; পুরিয়া ছুয়েক অর্থাৎ ছু আনা কি চার আনার গাঁজা দিলেই ঘোষাল কৃতার্থ। আরও আছে, শ্মশানে যেতে ঘোষালের জুড়ি নাই। সে হিসেবে ঘোষাল এ অঞ্চলের সকলজনের একজন বান্ধব তাতে সন্দেহ নাই। উৎসবে আছে, শ্মশানে আছে—রাজদ্বারেও আছে ঘোষাল; মামলায় সে পেশাদার সাক্ষী।

সুস্থ হতে ঘোষালের বেশ কিছুক্ষণ লাগল। হেউ-হেউ শব্দে ঢেকুরের পর ঢেকুর তুলবার চেষ্টা করে অবশেষে ছু-তিনটে বেশ লম্বা এবং সশব্দ ঢেকুর তুলে

একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে ঘোষাল বললে—আঃ বাঁচলাম! তারপর আবার বললে—তুমি বরং ওদের হাত দেখে শেষ করো ডাক্তার। আমি আর একটু জিরিয়ে নি।

এই সুযোগে মকবুল এগিয়ে এল, হাত এগিয়ে দিল। ডাক্তার তার হাতখানি ধরলেন। বিচিত্র হাস্যে তার মুখখানি প্রসন্ন হয়ে উঠল। উপায় নাই। তিনি ছাড়তে চাইলেও এরা তাঁকে ছাড়বে না; এই মকবুলেরা। নূতনকে এরা ভয় করে—তাকে গ্রহণ করার মতো সামর্থ্য তাদের নাই; মনেও নাই, আর্থিক সঙ্গতিতেও নাই। মকবুলের দেহ পর্যন্ত বিচিত্র। এক গ্রেন কুইনিন খেলে মকবুলের ঘাম হতে শুরু হয়, শেষ পর্যন্ত নাড়ী ছাড়ে। মকবুল বিলিতী ওষুধকে বিষের মতো ভয় করে। একে একে রোগীদের দেখে তাদের ব্যবস্থা দিয়ে সব শেষে দেখলেন দাঁতু ঘোষালকে।

ঘোষাল বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। এবার সে হাতখানি বাড়িয়ে দিলে। জীবন ডাক্তার বললেন—তোর হাত দেখে কী করব ঘোষাল? রোগ তো তোর ভালো হবার নয়। তোর আসল রোগ হল লোভ। লোভ তো ওষুধে সারে না। তার উপর নেশা। সকালে উঠেই এই অবস্থায় তুই গাঁজা টেনে এসেছিস।

দাঁতু লজ্জিত হয় না, সে বেশ সপ্রতিভভাবেই বললে, গাঁজাতে হয় নাই দত্ত। বিড়ি। বিড়ি। বিড়িতে হল। তোমার দাওয়াতে বসেছিলাম, দেখলাম ওই কি বলে তাহের শেখ বিড়ি টানছে। ভারি পিপাসা হল, ওরই কাছে একটা বিড়ি নিয়ে যেই একটান টেনেছি, অমনি বুঝেছ কি না, হাঁপ ধরে গেল। তারপরেতে তোমাকে কতকগুলো কথা একসঙ্গে বলেছি আর ব্যস, হঠাৎ বুঝেছ কি না—।

হাত দুটি নেড়ে দিলে দাঁতু ঘোষাল—এতেই বুঝিয়ে দিলে যে আচমকা রোগটা উঠে পড়ল। এতে আর তার অপরাধটা কোথায়? ঘোষাল নিরপরাধ ব্যক্তির মতোই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—এ সব গ্রহের ফের বুঝলে না! তা দাও ভাই, যা হোক একটা এমন ওষুধ দাও যাতে হাঁপানি-কাশিটা কমে। সকালে বিকেলে চায়ের সঙ্গে দুটো করে চারটে আরসুলা সিদ্ধ করে খাচ্ছি, তাতেও কিছু হচ্ছে না।

ডাক্তার বললেন—গাঁজা-তামাক বন্ধ করতে হবে। লোকের বাড়ি খাওয়া বন্ধ করতে হবে। একেবারে ঝোল আর ভাত। না হলে ওষুধে কিছু হবে না, ওষুধও আমি দেব না ঘোষাল।

তবে আর একবার ভালো করে হাতটা দেখো। ঘোষাল হাতটা বাড়িয়ে দিলে। —দেখো, দেখে বলে দাও কবে মরব। নিদান একটি হেঁকে দাও। ওতে তো তুমি বাকসিদ্ধ। দাও। শুনলাম কামারবুড়ীকে নিদান হেঁকে দিয়েছ। গঙ্গাতীরে যেতে বলেছ। আমাকে দাও।

ডাক্তার চমকে উঠলেন। নতুন করে মনে পড়ে গেল সকালবেলার কথা। তিনি চঞ্চল হয়ে নড়েচড়ে বসে বললেন—তুই থাম ঘোষাল, তুই থাম।

তিনি তাড়াতাড়ি একখানা কাগজ টেনে প্রেসক্রিপশন লিখে ঘোষালের হাতে দিয়ে বললেন—এই নে। গাছ-গাছড়া শুধু, দু-তিনটে জিনিস মুদীখানায় কিনে নিবি। তৈরি করে নিয়ে খাস।

ডাক্তার উঠে পড়লেন। চেয়ারখানা ঠেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল অমরকুঁড়ির পরান খাঁ। সে সেলাম করে দাঁড়াল। সামনে ছইওয়ালা গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। খাঁয়ের তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীর দীর্ঘস্থায়ী অসুখ। আজ ছ মাস বিছানায় পড়ে আছে। মৃত সন্তান প্রসব করে বিছানায় শুয়েছে। সপ্তাহে দুদিন করে পরান ডাক্তারকে নিয়ে যায়। আজ যাবার দিন। যেতে হবে। পরান খাঁ অবস্থাপন্ন চাষী। নিয়মিত ফি দিয়ে থাকে। ডাক্তার হাসলেন; একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছে। এই সব বিনা ফি-এর রোগীদের তিনি যখন বলেছিলেন আর তাদের চিকিৎসা করবেন না তখন তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন, চিকিৎসা ছাড়লে চলবে কী করে? বাঁচতে হবে তো! আজ যে তিনি প্রায় সর্বস্বান্ত। একা তিনি নন—ঘরে স্ত্রী আছে। ক্ষমাহীনা স্ত্রী।

পরান বললে—দেরী হবে না কি আর?

—নাঃ দেরী কিসের। ডাক্তার পা বাড়ালেন।—চলো।

পরান এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে—আপনি তা হলে গাড়িতে চড়েন। আমি পায়দলে তুরন্ত গিয়া ধরব গাড়ি। একটু অপ্রস্তুতভাবেই বললে—কিছুটা তরি নিয়া এসেছিলাম। নন্দ নিয়া গেছে ভিতরে। ডালাটা নিয়াই যাব আমি।

পুরানো কালের লোক পরান; এখনও ভালোবাসার মূল্য দেয়। খেতের ফসল, পুকুরের মাছ ডাক্তারের বাড়ি মধ্যে মধ্যে পাঠায়; কখনও নিজেই নিয়ে আসে। বিবির অসুখে এই ভেট পাঠানোর বহরটা একটু বেড়েছে। ডাক্তারের উপর অগাধ বিশ্বাস পরানের। নতুন কালের চিকিৎসায় বিশ্বাস থাক বা না থাক নতুন কালের অল্পবয়সী ডাক্তারদের উপর বিশ্বাস তার নাই। তৃতীয়পক্ষের বিবি যুবতী, মেয়েটি শ্রীমতীও বটে; এর উপর পরানের আছে সন্দেহ-বাতিক। বিবিকে বাঁচাবার জন্য তার আকুলতার সীমা নাই, অর্থ ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত নয়, কিন্তু জেনানার আবরু জলাঞ্জলি দিয়ে বাঁচার চেয়ে মরাই ভালো। জীবনমশায়ের কথা আলাহিদা। পরান 'আলাদা' শব্দটাকে বলে 'আলাহিদা'। মাথার চুল সাদা হয়েছে, চোখের চাউনির মধ্যে বাপ-চাচার চাউনি ফুটে ওঠে, গোটা মানুষটাই শীতকালে গঙ্গানদীর জলের মতো পরিষ্কার।

গাড়ি মন্থর গমনে চলল।

পরান খাঁয়ের মতো ঘরকয়েক বাঁধা রোগীর জন্যই মশায় সংসারের ভাবনা থেকে নিশ্চিন্ত। বর্ষায় ধানের অভাব হলে ধান ঋণ দেয় তারা। অভাব-অভিযোগের কথা জানতে পারলেই পূরণ করে। অথচ—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন ডাক্তার।

কী না ছিল?

মাঠের উপর এসে পড়েছিল গাড়িটা। চারিপাশের উৎকৃষ্ট ক্ষেতগুলির দিকে আপনি চোখ পড়ল। ওগুলির অধিকাংশই ছিল মশায়দের। ওই বিরাট পাঁজার পুকুর, ওই শ্রীলাইকার, ওই ঘোষের বাগান! শুধু জমি পুকুরই নয়—এই গ্রামের সামান্য জমিদারি অংশও কিনেছিলেন তাঁর বাবা জগদ্বন্ধু মশায়! এক আনা অংশ তিনি চড়া দামে কিনেছিলেন।

গাড়ির মধ্যে বসে যেতে যেতে মনে পড়ে গেল পুরানো কথা।

তখন তাঁর কিশোর বয়স।

পড়তেন নবগ্রাম মাইনর ইস্কুলে। সেইবারই তাঁর মাইনর ইস্কুলে শেষ বৎসর। সে আমলে জমিদারত্বের একটা উত্তাপ ছিল। যে জমিদারি কিনেছে সেকালে তারই মেজাজ পালটেছে। জমিদারি কিনলেই লোকে মনে করত—লক্ষ্মী বাঁধা পড়লেন। সে আমলের প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের অধিকারী কণ্ঠমহাশয়ের গানে আছে—"আগে করবে জমিদারি তবে করবে পাকাবাড়ি।" তাঁরই স্বজাতি জ্ঞাতি ঘোষগ্রামের রাধাকৃষ্ণ মিত্র ওই নবগ্রাম মাইনর ইস্কুলে পড়ত। ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা নবগ্রামের প্রতিপত্তিশালী জমিদারের ভাইয়ের সঙ্গে চলত তার অবিশ্রাম প্রতিযোগিতা। লেখাপড়ার নয়, জমিদার-বংশধরত্বের। প্রায়ই খিটিমিটি বাধত। বাধবার মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকত রাধাকৃষ্ণ। বলত He is a zaminder's son, I am also a zaminder's son; এখন ঝগড়া হচ্ছে, বড় হলে দাঙ্গা হবে!

তাঁর বাবা জগদ্বন্ধু জমিদারি কেনার পর তাঁরও মনে এ উত্তাপ কিছুটা সঞ্চারিত হয়েছিল। লোকে—সহপাঠীরা—বলেছিল, গুলবাঘা এবার ডোরাবাঘা হল! সাবধান!

সহপাঠীরা তাকে বলত—গুলবাঘা।

সেই কিশোর বয়সে তাঁর নিজের রূপের কথা মনে পড়ছিল। রূপ—যে রূপ সুকুমার-কোমল-উজ্জ্বল—সে রূপ তাঁর কোনো কালে ছিল না। কিন্তু রূপ তাঁর ছিল। সবল পরিপুষ্ট দেহ—গোল মুখ, ঝকঝকে চোখ, নির্ভীক দৃষ্টি, শ্যামবর্ণ দুর্দান্ত কিশোর। হাডু-ডু-ডু খেলবার সময় মালকোঁচা মেরে জীবনডাক দিতে

ছুটলে প্রতিপক্ষ দল খানিক পিছিয়ে 'থোল' অর্থাৎ স্থল নিত। বলত—হাঁ গুলবাঘা ছুটেছে।

এধার থেকে ওধার মুহূর্তে ছুটে ঘুরবার ভান করে একেবারে মাঝের দাগের কাছে পর্যন্ত এসে বোঁ করে আবার ঘুরে আক্রমণ করতেন। কাউকে-না-কাউকে মেরে আবার ঘুরতেন।

বাড়ির পিছনে কুস্তির আখড়া ছিল। ল্যাঙট পরে নরম মাটির উপর দেহ ঠুকে আছাড় খেতেন শরীর শক্ত করবার জন্য। এর উপর মুগুর ছিল, সে দুটো আজও আছে।

গুলবাঘ হিংস্রতর নরঘাতী ডোরাবাঘই হয়ে উঠত যদি না জগদ্বন্ধু মশায় মাথার উপরে থাকতেন। জগদ্বন্ধু মশায়ের চিত্ত এতে বিন্দুমাত্র উত্তপ্ত হয় নি। মশায় বংশের মহদাশয়ত্বই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়। দম্ভের মোহে তিনি জমিদারি কেনেন নি। জমিদারির উপর কোনো মোহ তাঁর ছিল না। জমিদারি তিনি কিনেছিলেন জমিদারের দম্ভের উত্তাপ থেকে বাঁচবার জন্য। যেদিন জমিদারি কেনা হয় সেদিনের একটা কথা মনে পড়ছে।

জগদ্বন্ধু মশায়ের বন্ধু, পেশায় গোমস্তা ঠাকুরদাস মিশ্র যে চিকিৎসালয়ের দেওয়ালে লিখেছিল 'লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যম্', সেই তাঁকে শ্লেষ করে বলেছিল—তা হলে এবার জমিদার হলে। আশয়ের চেয়ে বিষয় বড় হল। আগে লোকে সম্ভ্রম করত—মশায় বলে, এবার লোক প্রণাম করবে জমিদার মশায় বলে। বাবুমশায় বলে। ঠাকুরদাস বাতের যন্ত্রণা এবং আরোগ্যের আনন্দ তখন একেবারেই ভুলে গেছে। অনেক দিন হয়ে গেছে তখন।

জগদ্বন্ধু বলেছিলেন—ভাই, ঢাল আর তরোয়াল দুটোই হল অস্ত্র। ওর একটা থাকলেই সে যোদ্ধা। কিন্তু তরোয়াল না নিয়ে তরোয়ালের চোট থেকে মাথা বাঁচাতে শুধু ঢালটা যে রাখে তাতে আর তরোয়ালধারীতে তফাত আছে। আছে কি না আছে—তুমিই বলো। ঠাকুরদাস, ওটা আমার ঢাল, শুধু ঢাল। নবগ্রামের তরোয়ালধারী জমিদারদের উঁচানো তরোয়ালের কোপ থেকে আশয়ের মাথা বাঁচানো দায় হয়ে উঠেছিল। তাই ঢাল অস্ত্র হলেও ধরতে হল। কথাটা তোকে খুলেই বলি ঠাকুরদাস। নবগ্রামের জমিদারদের কাছে মান বজায় রাখা দায় হয়ে উঠেছে ভাই! সদাই ওঁরা শস্ত্রপাণি। নবগ্রামের রায়চৌধুরী বংশের তরোয়াল ভেঙেছে, ওঁরা এখন বাঁট ঘুরিয়ে তারই ঘায়ে লোকের মাথা ভাঙতে চান। আবার নতুন ধনী ব্রজলালবাবু এখন আমাদের গ্রামের আট আনা অংশের জমিদার। তাঁদের হল চকচকে ধারালো তলোয়ার। আজ মাস ছয়েক থেকে দেখছি,

ব্রজবাবুদের বাড়িতে অসুখ-বিসুখ হলে ডাক আসছে চাপরাশী মারফত। সেলাম অবিশ্যি করে। বলে—'সালাম গো ডাক্তারবাবু—বাবুদের বাড়ি একবার যেতে হবে যে।' ওদের দেখাদেখি রায়চৌধুরীরা পথেঘাটে দেখা হলে হেঁকে বলতে শুরু করেছে—'মশায় হে, একবার আমাদের বাড়ি হয়ে যাবে যেন।' তবু তো বড়বাবুরা দর্শনী দেন, এরা আবার তাও দেয় না বুঝেছ না, অনেক ভেবে ঢাল কিনলাম। এ আমার তরোয়াল নয়। এক হাতে ঢাল থাকল—অন্য হাতে খলনুড়ি। ওটা ছাতার বদল।

কথাটা তিনি তাঁর জীবনে সত্য বলেই প্রমাণিত করেছিলেন। তাঁর ওই ঢালের আড়ালে এ গ্রামের অনেক জনকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। এবং ওই ঢাল দেখিয়ে এ গ্রামের কাউকে কখনও অস্ত্রধারীর ঔদ্ধত্যে অপমানিত করেন নি।

কথাগুলি জীবন দত্ত নিজের কানে শুনেছিলেন। পাশের ঘরেই তিনি বসে পড়ছিলেন সেদিন।

তবুও জীবনমশায়ের মনে বিষয়-বৈভবের দম্ভের উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছিল। কী করবেন তিনি? উত্তাপ লাগলে উত্তপ্ত হওয়া যে প্রকৃতি-ধর্ম। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া তো সহজ নয়! নইলে তিনি ডাক্তার হতেন না। বাপের কাছে কবিরাজিই শিখতেন। উত্তপ্ত বস্তু সহজ ধর্মে আয়তনে বাড়তে চায়। জমিদারের এবং বড়লোকের ছেলে তাঁর বৈভব ও অহঙ্কারের উত্তপ্তচিত্তে তখন বাপপিতামহের জীবনপরিধিকে ছাড়িয়ে বাড়তে, বড় হতে চাচ্ছে। তাই জগদ্বন্ধু ছেলের মাইনর পড়া শেষ হওয়ার পর তাকে টোলে ভরতি করতে চাইলেন। ব্যাকরণ শেষ করার পর আয়ুর্বেদ পড়বে। কিন্তু জীবনমশায় বলেছিলেন—আমার ইচ্ছে ডাক্তারি পড়ি।

—ডাক্তারি!

—হ্যাঁ। দেশে তো ডাক্তারিরই চলন হতে চলল। কবিরাজিতে লোকের বিশ্বাস কমে যাচ্ছে। বর্ধমানে ইস্কুল হয়েছে। আমি ওখানেই পড়ব।

দেশে সত্যই তখন ডাক্তারি অর্থাৎ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা রাজকীয় সমারোহে রথে চড়ে আবির্ভূত হয়েছে। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, বর্ধমান মেডিকেল স্কুল, জেলার সদরে সদরে হাসপাতাল, চ্যারিটেব্‌ল্ ডিস্‌পেন্‌সারি, ইংরেজ সাহেব ডাক্তার, দেশী নামজাদা ডাক্তারদের পোশাক গলাবন্ধ কোট, প্যান্টালুন, গোল টুপি, গার্ডচেন, বার্নিশ-করা কাঠের কলবাক্স; ঝকঝকে লেবেল-আঁটা সুন্দর শিশিতে ঝাঁঝালো রঙীন ওষুধ, ওষুধ তৈরীর সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া, সব মিলিয়ে সে যেন একটা অভিযান। এ অঞ্চলে তখনও কবিরাজির রাজ্য চলছে। এ যুগের সাঁড়াশি আক্রমণের মতো দুদিকে বসেছেন দুজন ডাক্তার।

উত্তর এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। উত্তরে বসেছেন ভুবন ডাক্তার। বড় লাল ঘোড়ায় চেপে ব্রিচেস আর গলাবন্ধ কোট পরে ভুবন ডাক্তার মধ্যে মধ্যে এ পথে যাওয়া-আসা করেন। আর উত্তর থেকে আসেন রঙলাল ডাক্তার—তসরের প্যান্টালুন, গলাবন্ধ কোট, গলায় কারে ঝোলানো পকেটঘড়ি। রঙলাল ডাক্তার যাওয়া-আসা করেন পাল্‌কিতে। রঙলাল ডাক্তার থাকেন এখান থেকে মাইল চারেক দূরে। এ অঞ্চলে তিনিই প্রথম অ্যালোপ্যাথি নিয়ে এসেছেন। অদ্ভুত চিকিৎসক। প্রতিভাধর ব্যক্তি। মেডিক্যাল কলেজ বা ইস্কুলে তিনি পড়েন নি; নিজে বাড়িতে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। নদী থেকে, শ্মশান থেকে শব নিয়ে এসে গ্রন্থের নির্দেশ অনুসারে কেটে অ্যানাটমি শিখেছেন। বিস্ময়কর সাধনা। তেমনি সিদ্ধি। কোথায় বাড়ি হুগলী জেলায়, সেখান থেকে এসেছিলেন এ জেলায় রাজ হাই ইংলিশ ইস্কুলে শিক্ষকতার কর্ম নিয়ে। ইংরিজীতে অধিকার ছিল নাকি অসামান্য। আর তেমনি ছিল অগাধ আত্মবিশ্বাস। বিখ্যাত হেড মাস্টার শিববাবুর ইংরিজী খসড়া দেখে দু-এক জায়গায় দাগ দিয়ে বলতেন—এখানটা পালটে এই করে দিন। ইমপ্রুভ করবে। বলতে সঙ্কোচ অনুভব করতেন না। তিনি হঠাৎ কোনো আকর্ষণে ময়ূরাক্ষী তীরে নির্জন একটি গ্রামে এসে এই সাধনা করেছিলেন তপস্বীর মতো। তারপর একদিন বললেন—এইবার চিকিৎসা করব এবং কিছুদিনের মধ্যেই এ অঞ্চলে অসামান্য প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। রঙলাল ডাক্তারের চিকিৎসার খ্যাতি রঙলালকেই প্রতিষ্ঠা দেয় নি—তাঁর সঙ্গে অ্যালোপ্যাথিরও প্রতিষ্ঠা করেছিল। চারিদিকে নতুন চিকিৎসার প্রতি মানুষ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে শুরু করলে।

জীবন ডাক্তার সেদিন কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে কবিরাজির পরিবর্তে ডাক্তারির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। প্রতিষ্ঠা চাই, খ্যাতি চাই, অর্থ চাই, মানুষের কাছ থেকে অগাধ শ্রদ্ধা চাই। তার প্রেরণা দিয়েছিল ওই জমিদারিটুকু। জমিদারি যখন কিনেছেন বাবা তখন অবশ্যই পারবেন ডাক্তারি পড়াতে। তাই মাইনর পাশ করে তিনি গেলেন কাঁদী রাজ হাই ইস্কুলে এণ্টান্স পড়তে। এণ্ট্রান্স পাশ করে এফ. এ. পড়বেন, তারপর ডাক্তারি।

* * * *

গোরুর গাড়িটা থামতেই ডাক্তারের তন্ময়তা ভেঙে গেল। সামনেই পরান খাঁয়ের দলিজা। এসে পড়েছেন। পুরানো কাল থেকে বাস্তব বর্তমানও বটে।

চার

পরানের বিবি একটু ভালোই আছে। আরো ভালো থাকা তার উচিত ছিল। কিন্তু তা থাকছে না। নাড়ীর গতি দেখে ডাক্তারের যা মনে হয় উপসর্গের সঙ্গে ঠিক তার মিল হয় না। রোগের চেয়ে রোগের বাতিকটা বেশী। এখানে ব্যথা, ওখানে ব্যথা, বিছানায় শুয়ে কাতরানো, পাকস্থলীতে যন্ত্রণা—এর আর উপশম নেই। আরও মজার কথা!—'রোগী তো ভালো আছে' বললেই রোগ বেড়ে যায়। কী করবেন ডাক্তার! এর চিকিৎসা তাঁর হাতে নাই। তিনি বুঝতে পেরেছেন, মেয়েটি ভালো হতে চায় না। পরান খাঁয়ের স্ত্রী হিসেবে সুস্থ দেহে উঠে হেঁটে বেড়াতে সে অনিচ্ছুক। তাই ডাক্তার কৌশল অবলম্বন করেছেন, রোগ আদৌ কমে নি বলে যাচ্ছেন। আজো তাই বলবেন—তবে হ্যাঁ, ভয় কিছু নাই খাঁ। ভয় কোরো না। এ ছাড়া খাঁকেই বা বলবেন কী? ও কথা খাঁকে বললে খাঁ যে কী মূর্তি ধরবে—সে ডাক্তারের অজানা নয়। বৃদ্ধের জীবনও অশান্তিময় হয়ে উঠবে। স্বামী-স্ত্রীর অমিলনের মতো অশান্তি আর নাই। তিনি নিজেও চিরজীবন জ্বলছেন। আগুন তাঁর জীবনে কখনও নিভল না। আজও রোগী দেখে বাড়ি ফিরে দেখলেন যে সে আগুন যেন লেলিহান হয়ে উঠেছে। কোন্ আহুতি পেয়েছে বুঝলেন না।

আতর-বউ নিচে নিষ্ঠুর আক্রোশে বকছে। এই মুহূর্তেও বকে চলেছে আপনার মনে। বকছে তাঁকে এবং নবগ্রামের হাতুড়ে শশী মুখুজ্জেকে। শশীই দিয়ে গিয়েছে আহুতি; সে তার অনুপস্থিতিতে এসে হাজির হয়েছিল। জীবন্ ডাক্তারকে না পেয়ে বাড়ির ভিতর আতর-বউয়ের কাছে বসে তাঁকেই জ্বালাতন করে গিয়েছে। তামাক খেয়ে ছাই এবং গুল ঝেড়ে ময়লা করে দিয়ে গিয়েছে গোটা দাওয়াটা। রাজ্যের সংবাদ নিতে গিয়ে ওই হাসপাতালের ডাক্তার তাঁকে যে কটু কথাগুলি বলেছে, সেগুলিও আতর-বউয়ের কানে তুলে দিয়ে গিয়েছে। হতভাগা শশীর উপর আতর-বউয়ের মমতাও যত, ক্রোধও তত।

জীবনমশায়ের শিষ্য শশী। তাঁর আরোগ্য-নিকেতনেই ডিসপেনসিং শিখেছিল সে—এখানেই তার হাতেখড়ি। তারপর বর্ধমান গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাকা কম্পাউণ্ডার হয়ে ফিরে নবগ্রামের চ্যারিটেবল ডিস্পেনসারির প্রথম কম্পাউণ্ডার হয়েছিল সে। কম্পাউণ্ডিং সে ভালোই জানে। তার সঙ্গে চিকিৎসা-বিদ্যাটাও মোটামুটি শিখেছে শশী। তিনিই তাকে নাড়ী দেখতে রোগ চিনতে শিখিয়েছিলেন।

কিন্তু শশী আশ্চর্য অপরিচ্ছন্ন লোক। কামানোর ঝঞ্ঝাটের জন্য দাড়ি-গোঁফ রেখেছে। স্নান কদাচিৎ করে, দাঁতও বোধ করি মাজে না। এক জামা পনেরো দিন গায়ে দেয়; উৎকট দুর্গন্ধ না হলে সেটাকে ছাড়ে না। আর প্রায় অনবরতই তামাক টানে। জামার পকেটেই থাকে তামাক টিকে দেশলাই এবং হাতে থাকে হুঁকো। তার উপর করে মদ্যপান। মধ্যে মধ্যে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে। ওই হুঁকোর জন্যেই তার নবগ্রামে ডিস্‌পেনসারির চাকরি গিয়েছিল। পকেটে হুঁকো, কল্কে, তামাক, টিকের টিন—এ না নিয়ে শশী কোনো কালেই এক পা হাঁটে না। বলে—"ওরে বাবা, লোকে লুকিয়ে বাবার হুঁকো টেনে তামাক খেতে শেখে। আমি আমার কর্তাবাবার—মানে বাবার বাবার কাছে তামাক খেতে শিখেছি। লুকিয়ে নয়, তিনি আমাকে নিজে সেজে তামাক খাওয়াতেন। এ ছাড়া চলতে বারণ। ছেলেদিগে বলেছি, আমি মরলে আমার চিতায় যেন হুঁকো কল্কে তামাক টিকে দেয়। দেশলাই চাই না। ও চিতের আগুনেই হবে।" ডাক্তারখানার ওষুধের আলমারিতে সে তামাক-টিকে রাখত। কোণে গুল ঝেড়ে গাদা করত, ডাক্তার সায়েব এলে কোনো কিছু একখানা কাগজ কি কাপড়, কি প্যাকিং বাক্স দিয়ে চাপা দিয়ে রাখত। তবুও ধরা পড়ত। তিনবার ধরা পড়ে চাকরি বেঁচেছিল, চারবারের বার বাঁচল না। তা না বাঁচলেও শশী ওই বিদ্যেতেই বেশ করে খেয়েছে, আজও খাচ্ছে। মদ্যপানটা কিছু কমেছে এখন। ছেলেরা চাকরি করে। নিজে এখনও একটা টাকা কোনরকমে উপার্জন করে শশী। পরামর্শের দরকার হলে মাঝে মধ্যে জীবনমশায়ের কাছে আসে। জীবন ডাক্তারকে বলে গুরুজী! বলে অনেক শিখেছি জীবনমশায়ের কাছে। যা-কিছু জানি তার বারো আনা। বলে আর প্রচুর হাসে। ইঙ্গিত আছে কথাটার মধ্যে। শশী তাঁর কাছে শুধু ডিসপেনসিং এবং ডাক্তারিই শেখে নি, দাবা খেলাও শিখেছিল সে। আরও শিখেছিল হরিনাম সংকীর্তনে দোয়ারকি। এ দুটোতে শশীর বিদ্যা—শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী যাকে বলে তাই।

শশীকে দাবা খেলতে বসিয়ে দিয়ে বন্ধুরা তার বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এসে খেতে দিত। শশীর বাড়িতে গিয়ে বলত, শশীদাকে আজ রাত্রে রোগীর কাছে থাকতে হবে। কল পেয়েছে। শশীদা আমাদের বললে, ভাই, বাড়িতে গিয়ে আমার খাবার যদি এনে দিস, তবেই তো খাওয়া হয়। শশীদার খাবার দিন।

শশী রাত্রে খেত রুটি এবং শশীর স্ত্রীর রুটি ছিল বিখ্যাত। রাত্রি দুটোর পর শশী যখন দাবা ফেলে উঠত, তখন সঙ্গীরা খাবারের শূন্য পাত্রটা তার হাতে দিত, বলত—নিয়ে যাও শশীদা। তোমাদের বাড়ির থালা। শশীর আর বাড়ি যাওয়া

হত না। গালাগালি দিয়ে খালি পেটেই শুয়ে পড়ত সেই আড্ডাঘরে। না হলে যে শশীর কলের মর্যাদা যায়। পরের দিন কারুর কাছে দুটো টাকা ধার করে নিয়ে তবে বাড়ি ফিরত। বলত, কলের টাকাটা রাখো তো!

তাঁর কাছে শেখা তৃতীয় বিদ্যা সঙ্গীত। তাতে সে অসুর। অসুর বললেও ঠিক ব্যাখ্যা হয় না, বলতে হয় বিকটাসুর। কণ্ঠস্বর তার যেমন কর্কশ, তেমনি সে বেমক্ক বেতালা। তার উপর মদ্যপান না করে আসরে সে নামে না। দৃষ্টান্ত দেয় বড় বড় ওস্তাদদের।

সংকীর্তনের দলে শশী তারস্বরে চীৎকার করে।

জীবনমশায় কপালে হাত দিয়ে হেসে বললেন, আমার কপাল! মধ্যে মধ্যে শশীকে বলেন—শশী, একসঙ্গে বেচারা হরিকে আর তানকে মেরে খুন করিস না বাবা! শিষ্যের পাপ গুরুকে অর্শায়! আমার যে নরক হবে। শশী বলে—ভাববেন না! আপনার রথ আটকায় কোন শা—।

বলেই সে হা-হা করে হাসে।

এই শশী ডাক্তার!

মধ্যে মধ্যে শশী আসে পরামর্শের জন্য, কেসটা যে পেকে গেল ডাক্তারবাবু!

জীবনমশায় বলেন, রোগীটা কাঁচা না পাকা আগে বল। পাকা হলে খসতে দে। তোর চিকিৎসা-দোষের চেয়ে ওর বয়সের দোষ বেশী।

রোগী তরুণ হলে শোনেন, গভীরভাবে চিন্তা করে পরামর্শ দেন।

কখনও কখনও কল দিয়ে নিয়ে যায় শশী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সব কলে ফী নাই, বিনা ফীয়ের কল। শশী কম্পাউণ্ডার যেখানে ডাক্তার হিসেবে চিকিৎসা করে, সেখানে চারিদিকে দৈন্য; চার আনা আট আনা ফীতে শশী সন্তুষ্ট। সেখানে জীবনমশায়কে একটাকা ফী দেবে কোথা থেকে! তাছাড়া জীবনমশায় এখানকার মাটি, মানুষ, গাছপালাকে নিবিড়ভাবে চেনেন। তাদের দুঃখ তিনি জানেন। তাদের জন্য তাঁর বাপ-পিতামহের চিকিৎসালয়ের দুয়ার ছিল অবারিত। তাঁর দুয়ারও তিনি বন্ধ করেন নি। এরা কঠিন রোগে শয্যাশায়ী না হলেও চার আনা বাঁচাতে বুকে হেঁটেও দাতব্যালয়ের দুয়ারে এসে হাজির হয়। তাদের কাছে তিনি কি ফী নিতে পারেন?

ইদানীং কিন্তু শশীর মাথায় যেন একটু গোল দেখা দিয়েছে। যুদ্ধের মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্রে যে কয়টা বিস্ময়কর আবিষ্কার হয়েছে, সেই আবিষ্কারের সঙ্গে শশী কোনোমতেই তাল রাখতে পারছে না। এতদিন পর্যন্ত খুব গোল বাধে নি। তারপর সাল্‌ফাগ্রুপের বিভিন্ন নামে ট্যাবলেট বের হতেই বেচারার মুশকিল হয়েছে।

এর পর পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন। নূতন কালের ডাক্তারেরা ওই ওষুধগুলি প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করে চলেছে। পেনিসিলিন ছাড়া তো কথাই নাই। শশী ওগুলো ব্যবহার করতে খানিকটা ভয় পায়। পাবারই কথা। পাওয়াও উচিত। এর ফলে কিন্তু শশী ক্ষেপে ওঠে মধ্যে মধ্যে এবং যা করে বসে চিকিৎসাশাস্ত্রে তা অভূতপূর্ব। কিছুদিন আগে বাউড়ীদের কুড়োরামের কন্যার হয়েছিল নিউমোনিয়া। শশীকে কুড়োরাম বলেছিল—ডাক্তারবাবু—ওই হাসপাতালের ডাক্তার বললে, ফুঁড়ে ওষুধ দিলে শিগগির সেরে যাবে। তা—

শশী বুঝেছিল—পেনিসিলিনের কথা বলছে কুড়োরাম। চটে গিয়ে বলেছিল—নিয়ে আয় টাকা। দিচ্ছি ফুঁড়ে। প্যাক করে ফুঁড়ে—একটু আঙুলের ঠেল, আমার তো ওই কষ্ট। তারপর তোরা সামলাবি দেহের দাহ। টাকার দাহ আছে। তাও সামলাবি। ও ইনজেকশন দিতে আমাকে টাকা-টাকা করে ফী দিতে হবে—তাও বলে দিচ্ছি।

—তা হলে?

—তা হলে যা খুশি কর। হাসপাতালের ডাক্তার তো বললে—তা হাসপাতাল থেকে দিলে না কেন? ভরতি করে নিলে না কেন?

—সে আজ্ঞে জায়গা নাই। আর হাসপাতালেও উসব ওষুধ দেয় না।

—তা হলে, আমি যা বলি, তাই কর। চিরকাল খাওয়ার ওষুধ আর মালিশে বড় বড় 'নীলমণি' কেস ভালো হয়ে এল—আর আজ কুড়োরামবাবুর কন্যের বুকে খানিকটা সর্দি হয়েছে—পেনিসিলিন ছাড়া আর ভালো হবে না?

—তবে তাই দেন।

শশীর মাথায় বিকৃতি কিছু হয়েছে বার্ধক্য ও নেশার জন্য, সেটা নিষ্ফলতার আক্রোশে আরও বেড়ে যায়। সে গভীর চিন্তা করে স্থির করেছিল মালিশের সঙ্গে সরষের তেল মেশানোর পরিবর্তে কেরোসিন মিশিয়ে মালিশ করলে মালিশের কাজ দ্রুততর হবে। কেরোসিনে আগুন জলে। সুতরাং তার তেজে বুকের ভিতরের সর্দি নিশ্চয় দ্রুত গলবে। যেমন চিন্তা তেমনি কর্ম। ফলে ব্লিস্টার দেওয়ার মতো বুক-পাঁজর জুড়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল টলটলে এক ফোস্কা। তখন ছুটে এসেছিল মশায়ের কাছে।

জীবন ডাক্তারই ব্যাপারটা সামলেও দিয়েছিলেন। বেগ অবশ্য খুব পেতে হয় নি। প্রচুর যত্ন নেওয়ার ফলে ঘা হতে পায় নি। ফোস্কার চামড়া উঠেই নিষ্কৃতি পেয়েছে। এবং বেঁচেও উঠেছে। সেটার জন্য কৃতিত্ব কার—সে কথা জীবন ডাক্তার জানেন না। শশীর উদ্ভাবিত ওষুধের গুণই হোক, আর মেয়েটার ভাগ্যই

হোক, ফোস্কা উঠলেও নিউমোনিয়াটা বাগ মেনে গিয়েছিল। বিনা পেনিসিলিনে, বিনা মালিশে, বিনা অ্যানটিফ্লোজেস্টিনে কয়েকদিনের মধ্যে সেদিক দিয়ে বিপন্মুক্ত হয়েছিল।

এই শশিভূষণ আজ এসেছিল। কেন এসেছিল শশী কে জানে! হতভাগা কিন্তু আতর-বউকে জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আতর-বউয়ের কানে কামার-বুড়ীর কথাটা তুলেছে, তা বোঝা যাচ্ছে। ছি! ছি! ছি!

আতর-বউ এখন তাঁকে এই ছুতো ধরেই বকছে। "চিরটা জীবন মানুষের এক স্বভাব? বার বার ঠেকেও মানুষ শেখে না। নিদান হাঁকার অহঙ্কার কেন? তুই অমুক দিন মরবি বলে লাভ কী? তবু যদি পাশকরা ডাক্তার হতে! ঘরে ডাক্তারি শিখে কেউ সর্ববিদ্যেবিশারদ হয়? ছি—ছি—ছি! নবগ্রামের ডাক্তারেরা কী বলছে তা শুনে আসুক গিয়ে। আর ওই মুখপোড়া নেমকহারাম শশী বলে কিনা বোগাস।"

পাঁচ
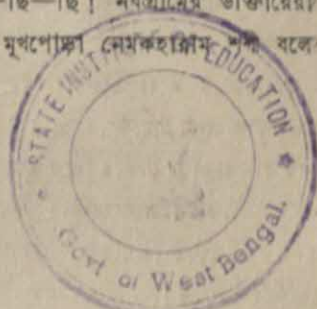
এই 'বোগাস' শব্দটা শশী প্রয়োগ করেই বেশী গোল বাধিয়েছে। শব্দটার অর্থ মশায়গিন্নী জানেন না, তবে ধ্বনিগত ব্যঞ্জনা বা সমস্ত কথাবার্তার পর ওই শব্দটার অর্থ মশায়গিন্নীর কাছে অত্যন্ত অপমানজনক মনে হয়েছে।

শশীরও অবশ্য দোষ নাই। সেও এসেছিল গায়ের জ্বালায়। নবগ্রামে প্রদ্যোত ডাক্তার ব্যাপারটা নিয়ে বেশ একটা সোরগোল তুলেছে। পৃথিবীতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা মানুষের স্বভাব-ধর্ম। তাই একজন প্রতিবাদ করার সঙ্গে আরও পাঁচজন আপনি এসে তার সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে সবল এবং প্রবল করে তোলে।

প্রদ্যোত ডাক্তার নবগ্রামের পাশকরা ডাক্তারদের সকলকেই নাকি কথাটা জানিয়েছেন। এবং ডাক্তারদের আসর থেকে বাজার-হাটে ছড়িয়ে পড়েছে। কথায় আছে, 'মরার বাড়া গাল নেই'। মৃত্যুর চেয়ে কঠিন এবং ভীষণ আর কিছু হয় না। আজও এর ঠিকানা মেলে নি, দিগ্‌নির্ণয় হয় নি। মানুষ মরে; নিত্যই অহরহ মরছে—তবু আজও কেউ তাকে দেখে নি, তার স্বর কেউ শোনে নি, বর্ণে গন্ধে-স্পর্শে-স্বাদে আজও তার এক বিন্দু আভাসও কেউ কখনও পায় নি। এর ব্যাখ্যা করা যায় না, আজও কেউ করে নি। সাধারণ মানুষে 'মরবি' বললে কেউ ভয় পায়

না। কিন্তু চিকিৎসক বললে আতঙ্কিত হয়; বিশেষ করে রোগীকে বললে তার আতঙ্কে আর ফাঁসির আসামীর আতঙ্কে কোনো প্রভেদ থাকে না। প্রদ্যোত ডাক্তার সেই কথাই বলেছে, বলেছে—এত বড় হৃদয়হীন ব্যাপার আর হয় না। এর সঙ্গে ডাকাত বা গুণ্ডার বা খুনের ছুরি তুলে তেড়ে আসায় প্রভেদ কী? প্রদ্যোত নাকি চায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করা হোক। সকল ডাক্তারের সই-করা দরখাস্ত।

নবগ্রামে এখন তিনজন পাশকরা ডাক্তার। প্রদ্যোত নিজে আছে হাসপাতালে, আর দুজনের একজন হরেন ডাক্তার নবগ্রামেরই ছেলে, বয়সে প্রদ্যোত থেকে কয়েক বছরের বড়। মেডিকেল ইস্কুল থেকে পাশ করে এসে গ্রামেই প্র্যাকটিস করছে। নিজের ছোটখাটো একটি ডিসপেনসারি আছে। আর আছেন প্রৌঢ় ডাক্তার চারুবাবু।

ডাক্তারের মধ্যে চারুবাবু সর্বাপেক্ষা প্রবীন; পঞ্চাশের উর্ধ্ব বয়স। চারুবাবুই এখানকার প্রথম এম. বি.। প্রায় পঁচিশ বছর আগে সদ্য ডাক্তারি পাশ করেই এখানকার হাসপাতালে চাকরি নিয়ে এসেছেন। দশ বছর আগে চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস ধরেছিলেন। আজ বছর চারেক থেকে সে প্র্যাকটিস তিনি একরকম ছেড়েই দিয়েছেন। এখন এখানে ইউনিয়ন বোর্ড, ইস্কুল বোর্ড প্রভৃতি নিয়ে মেতেছেন বেশী। লোকে অবশ্য বলে চারু ডাক্তারের প্র্যাকটিস পড়ে এসেছিল, স্বাভাবিক নিয়মে, ডাক্তার তাই ওই দিকে ঝুঁকেছেন। ডাক্তারের ছেলেরাও বড় হয়েছে। বড়টি বেশ উঁচুদরের সরকারী চাকুরে। ছোটটি ডাক্তারি পড়ছে। চারু ডাক্তার লোকটি কিন্তু সাঁচ্চা। দিলখোলা মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত হিসেবী লোক। মেজার গেলাসে মেপে দুটি আউন্স ব্র্যাণ্ডি সন্ধ্যেবেলা নিয়মিত তিনি পান করে থাকেন।

এ অঞ্চলে অনেক ডাক্তারেরই কিছু-না-কিছু ব্যাড ডেট অর্থাৎ অনাদায়ী বাকি থেকে গেছে, কিন্তু চারু ডাক্তারের খাতার হিসেবে যেমন একচুল গলদ থাকে না তেমনি পাওনাও এক পয়সা অনাদায় থাকে না। তাঁর কপাউণ্ডার প্রতি মাসেই দু-চার নম্বর বাকির জন্য তামাদির মুখে ইউনিয়ন কোর্টে গিয়ে নালিশ দায়ের করে আসে। এ বিষয়ে কেউ কেউ অনুযোগ করে—কঠোর বলতেও দ্বিধা করে না, কিন্তু চারুবাবু বলেন—লুক অ্যাট জীবনমশায়। ওই বৃদ্ধকে দেখে কথা বল বাবা। পঞ্চাশ হাজার টাকা বাকি খাতায় লেখা রইল—উইয়ে খেলে। দেখেই শিক্ষা হয়েছে। ঠেকে শিখতে বোলো না বাবা। এখনও চারু ডাক্তার যে অল্পসল্প প্র্যাকটিস করেন তা তাঁর নিজের ব্যক্তিগত খরচটা তুলবার জন্য। তাঁর প্র্যাকটিস

ক্রমে আমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ডিসপেনসারিটিও ছোট হয়ে এসেছে। চারটে আলমারির মধ্যে এখন ওষুধ আছে মাত্র একটাতে, আর এক একটার পাঁচটা থাকের মধ্যে তিনটে খালি।

আরও একজন পাশকরা ডাক্তার আছেন—চক্রধারীবাবু। চারুবাবুর চেয়েও বয়সে বড়। এল.এম.এফ। চারুবাবুর আগে তিনিই ছিলেন এখানকার চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির ডাক্তার। তাঁর চাকরিতেই চারুবাবু বহাল হয়েছিলেন। চক্রধারী এখন প্রায় সন্ন্যাসী। বাড়ীতেই আছেন—তবে গেরুয়া টেরুয়া পরে দিনরাত পুজো-আচ্চা করেন। প্র্যাকটিস তো করেনই না, কেউ এখন হাত দেখাতে এলে—বলেন—বাজে বাজে। হাত দেখে কী হবে? কেউ কিছু জানে নাকি? কিছু জানে না বাবা। সব আন্দাজে ঢিল। লাগল তো লাগল, না লাগল তাতেই বা কী, ফী তো পকেটেই এল। বাবা, রোগ হলে সারে আপনি। রোগীর দেহেই আছে সারাবার শক্তি। ডাক্তার তেতো কষা ঝাঁজালো ওষুধ দেয় আন্দাজে। রোগী মনে করে ওষুধে সারল। তবে হ্যাঁ, দু-চারজন পারে।

চক্রধারী তামাক খেতে খেতে শুরু করেন তাঁর প্রথম যৌবনে দেখা বড় ডাক্তারদের কথা। স্যার নীলরতন, বিধান রায়, নলিনী সেনগুপ্ত প্রভৃতি ডাক্তারদের কথা। সে সব বিচিত্র বিস্ময়কর গল্প। বলেন—হ্যাঁ, সে দেখেছি বটে। এখানে রঙলাল ডাক্তারকে দেখেছি। একটা গোটা ডাক্তার ছিল। আর এখানে আছে একটা মানুষ ওই জীবনমশায়। হ্যাঁ ও পারে। ধরতে পারে। মশায়ের নিজের ছেলে বনবিহারী, সেও ডাক্তার ছিল। আমাদের বন্ধু লোক। একসঙ্গে মদ খেয়েছি। ফুর্তি করেছি। সেই ছেলের—বুঝেছ—রোগ হল। মৃত্যু-রোগ···আমরা বুঝতেও পারি নাই। কিন্তু মশায়—।

রোগীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যায়। সে উঠে চলে যায়। চক্রধারী হেসে বলে—গোবিন্দ গোবিন্দ! তার পরেই বলে—বিনা পয়সায় অনেক হাত দেখেছি। আর না।

প্রদ্যোত ডাক্তার চক্রধারীকে চিকিৎসক বলেই ধরে না। তাই তার গণনায় নবগ্রামে পাশকরা ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র তিনজন। প্রদ্যোতের কথায় প্রতিবাদ কেউ করেন নি, হরেন ডাক্তার বা চারুবাবু কেউ না। এক রকম মৌন থেকে তার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বলতে হবে। মানুষের মুখের উপর 'তুমি আর বাঁচবে না'—এ কথা বলার চেয়ে নিষ্ঠুর আর কী হতে পারে? এবং এতে যে রোগীর মনোবল ভেঙে যায়, রোগের সঙ্গে যুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়ে, এও সত্য। বাঁচবার ইচ্ছা, বাঁচব বিশ্বাসটাই যে বাঁচবার পক্ষে পরম ঔষধ—কে অস্বীকার করবে এ

কথা? হরেন ডাক্তার চুপ করে প্রদ্যোতের অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েও হাত জোড় করেছে। অর্থাৎ মার্জনা করুন আমাকে। প্রদ্যোত ডাক্তার তীব্র তিরস্কার করেছে—ডাক্তারিকে কি আপনি শুধু আপনার জীবিকার পেশা মনে করেন হরেনবাবু? আপনার কোনো সেক্রেড ডিউটি নাই? এই ধরনের নিদান হাঁকা আর গেরুয়াধারী করকোষ্ঠী গণকদের মধ্যে তফাত কী? আর জড়ি-বুটি-তুক-তাক-জলপড়া—এই সব চিকিৎসার সঙ্গে বেদেদের চিকিৎসার অনাচারের মধ্যে ডিফারেন্স কী?

হরেন জোড়হাত করেই দাঁড়িয়ে ছিল সর্বক্ষণ। প্রদ্যোতের কথার শেষে হেসে বলেছে—আমি গ্রামের লোক। এক সময় আমার বাল্যকালে উনিই আমাকে বাঁচিয়েছিলেন।

একটু থেমে আবার বলেছে—এক সময়ে উনি খুব ভালো চিকিৎসা করতেন প্রদ্যোতবাবু। আমি অবশ্য ছোট ডাক্তার, আমার বিদ্যাবুদ্ধি সামান্য। তবে ওঁর নাড়ী দেখে রোগ ডায়গনিসিস্-চিকিৎসা অদ্ভুত ছিল। এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, হয়তো—। মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। তার উপর বয়স হয়েছে। এ ক্ষেত্রে—। এ ছাড়া কিশোরদা নেই, তিনি আসুন, তাঁর অ্যাবসেন্সে এটা করা ঠিক হবে না।

কিশোরবাবু! কিশোরবাবু! প্রদ্যোত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। কিশোরবাবু কে? কোনো কথা না বলে তিনি উঠে এলেন।

চারুবাবু বলেছেন—আপনি ইয়ং ম্যান, রক্তের তেজ আছে। তা ছাড়া আজ আছেন কাল নাই। চলে যাবেন অন্যত্র। কে যেন বলছিল—এ চাকরিও আপনার ট্রপিকাল ডিজিজের এক্সপিরিয়েন্সের জন্যে! এরপর আপনি ফরেনে যাবেন। স্পেশালাইজ করবেন। আপনার কি ওই বৃদ্ধের ওপর রাগ করা উচিত? যেতে দিন। দরখাস্ত করলে ওর সঙ্গে হয়তো অনেকের অন্ন উঠবে। শতমারি ভবেদবৈদ্য সহস্রমারি চিকিৎসক। মানুষ মেরে মেরে হাতুড়েরা নিজেরাও করে খায়, লোকেরও কিছু উপকার করে। আপনার মতো লোকের এ রাগ সাজে না। আমি বরং বৃদ্ধকে বারণ করে দেব। বুঝেছেন। নিদান-টিদান হাঁকবেন না। জানেন—আমাদের সময় একটা গান ছিল—আমরা খুব গাইতাম—"যা কর বাবা আস্তে ধীরে, ঘা কর কেন খুঁচিয়ে।" বলেই হো-হো করে হেসে উঠলেন চারুবাবু।

প্রদ্যোতের বেশ লাগল চারুবাবুকে আজ। এখানে এসেই চারুবাবুর সঙ্গে আলাপ সে করেছে, কিন্তু সে আলাপ একেবারে যাকে বলে ভদ্রতার মুখোস এঁটে বাঁও-কষাকষি ব্যাপার। আজ চারুবাবু মুখোস খুলে কথা বলেছেন। রসিক লোক। বেশ রসিয়ে আবৃত্তি করলেন—'যা কর বাবা আস্তে ধীরে'। প্রদ্যোতের মন

অনেকখানি নরম হয়ে গেল। একটু লজ্জাও পেলে। চারুবাবু ওই যে বললেন—বৃদ্ধের উপর রাগ করা তার উচিত নয়।

প্রদ্যোত বললে—বেশ আপনার কথাই মানলাম। কিন্তু বৃদ্ধকে একটু সাবধান করে দেবেন। এ সব ভালো নয়। একে তো অত্যন্ত নিষ্ঠুর, তার উপর আন-সায়েন্টিফিক। হাত দেখে নাড়ী, পিত্ত, কফ, নিদান—এসব কী?

চারুবাবু বললেন—এক সময় কিন্তু মশায় লোকটার নিদান আশ্চর্যরকম ফলেছে। তা ফলত। এবং এখনও। কণ্ঠস্বর মৃদু করে বললেন—আপনি কিন্তু দেখবেন—মতির মাকে বর্ধমান কি কলকাতা পাঠাব ভেবেছেন—তাই পাঠিয়ে দেবেন। নইলে বুড়োর কথা যদি ফলে যায়।

—যাবে না। দৃঢ়স্বরে কথার মধ্যেই প্রতিবাদ এবং দৃঢ় প্রত্যয় জানিয়ে প্রদ্যোত সাইকেল চেপে চলে এসেছে। হি মাস্ট প্রুভ হিমসেলফ্—প্রমাণ সে করবেই। উইচক্র্যাফটের মতো এই হাতুড়ে বিদ্যের ভেলকি ভেঙে সে দেবেই। জীবনে তার মিশন আছে। শুধু অর্থোপার্জনের জন্য সে ডাক্তার হয় নি।

কথাটা গোপন থাকে নি। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে পল্লবিত হয়ে সারা নবগ্রামেই ছড়িয়ে পড়ল।—প্রদ্যোত ডাক্তার নাকি জীবনমশায়কে জেল দেবে! মতির মায়ের নিদান হেঁকেছে জীবনমশায়, ডাক্তার মতির মাকে বাঁচাবে। এবং তারপর দরকার হলে মামলা করবে। ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার, মিনিস্টারের কাছে দরখাস্ত করবে। দরখাস্ত করবে—হাতুড়ের চিকিৎসা করা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হোক। কথাটা নিয়ে সবচেয়ে গরম এবং তীব্র আলোচনা হল বি কে মেডিক্যাল স্টোর্সে।

বিনয়ের ওষুধের দোকান—বি কে মেডিক্যাল স্টোর্স এ অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বড় ওষুধের দোকান। ডাক্তারেরা, যারা প্র্যাকটিসের সঙ্গে ওষুধেরও ব্যবসা করে তারা সকলেই বিনয়ের দোকান থেকে পাইকিরি হারে ওষুধ কেনে। এ অঞ্চলে বিনয়ের দোকানের নাম-ডাক খুব। ওষুধ নেন না শুধু চারুবাবু। চারুবাবুর দোকানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই বিনয় দোকান খুলেছিল। চারুবাবু যেবার হাসপাতালের চাকরি ছাড়েন—হাসপাতালে আসে নতুন এম. বি. অহীনবাবু, সেইবার বিনয় দোকান খোলে। অহীনবাবুই খুলিয়েছিলেন। তাঁর যত প্রেসক্রিপশন আসত বিনয়ের দোকানে, বিনয়ের দোকানে তিনি সন্ধ্যের সময় নিয়মিত ঘণ্টা দুয়েক করে বসতেন। বিনা ফী-য়ে রোগী দেখতেন। অহীনবাবুর পর তিনজন ডাক্তার এসেছেন হাসপাতালে—তাঁরাও অহীনবাবুর মতোই বিনয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রদ্যোত কিন্তু তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নি। তার সঙ্গে কী-কী নিয়ে বিনয়ের একটু-আধটু-দর কষাকষি চলছে।

বি কে ফার্মাসির বিনয় চিকিৎসা জানে না, কিন্তু চিকিৎসকদের ডাক্তার-কবিরাজদের ইতিহাসে ইতিকথায় সে প্রায় শুকদেব বললেও অত্যুক্তি হয় না। দিন-রাত্রিই বিনয় এখানকার ডাক্তারদের নিয়ে আলোচনা করে। শশী পথ দিয়ে যাচ্ছিল হরিজন পল্লীতে রোগীর সন্ধানে। বিনয় তাকে ডেকে বললে—ডাক্তার, তামাক খেয়ে যাও। তারপর রসিকতা করে বলেছে—মলে, শশী ডাক্তার, তোমরা এবার মলে। প্রদ্যোৎ ডাক্তার বলেছে--সব হাতুড়ের রুটি মারব। জেলে দেব ব্যাটাদের। তারপর বিস্তৃত উত্তপ্ত আলোচনা।

শশী সেই কথা এসে বলেছে ডাক্তার-গিন্নিকে।

—কী দরকার? বিনা পয়সায় মতির মায়ের হাত দেখে নিদান হাঁকার কী দরকার। এ কাল হল বিজ্ঞানের কাল। পাশকরা ডাক্তারদের কাল। সর্দি পিত্তি কফ নিদান—সেকালে চলত। একালে ওসব কেন? যত সব—! হুঁ!

এই কথাটা ডাক্তারের অন্তরে বড় লাগে। জীবনের সকল দুঃখ-ব্যর্থতার উদ্ভব ওইখান থেকেই। মানুষের দেহে যেমন একটি স্থানে অকস্মাৎ একটি আঘাত লাগে বিষমুখ তীক্ষ্ণধার কোনো বস্তুতে, তারপর সেই ক্ষতবিন্দুকে কেন্দ্র করে বিষ ছড়ায় সর্বদেহে, এও ঠিক তেমনি। তাঁর অদৃষ্ট! অদৃষ্ট ছাড়া কী আর বলা যায়। সঙ্গতি থাকতেও তাঁর ডাক্তারী পড়া হয় নাই। তিনি কলেজে পড়ে পাশ করে ডাক্তার হলে, আতর-বউ—তুমিও আসতে না এ বাড়িতে।

বিচিত্র ঘটনা সে। স্মরণ হতেই ডাক্তার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

এক সর্বনাশী ছলনাময়ী তাঁর জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিয়ে গিয়েছে। কাঁদী ইস্কুলে পাঠ্য জীবনে এই সর্বনাশীকে নিয়ে ওখানকার এক অভিজাত বংশের ছেলের সঙ্গে বিবাদ হল। ছেলেটিও তাঁর স্বজাতি, কায়স্থ। পড়ন্ত জমিদারবাড়ির ছেলে।

হায়রে অবুঝ কৈশোর! শক্তি যোগ্যতা বিচার করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে না। কিশোর ছেলে তালপত্রের খাঁড়া হাতে রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করে। রাখাল ছেলে রাজার ছেলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সঙ্কোচ অনুভব করে না, ভয় পায় না।

ছয়

জীবনমশায়ের মনে পড়ল। এক কিশোর শাল আর এক কিশোর তমাল চারায় প্রতিযোগিতা হয়েছিল—তাতে কিশোর তমাল লজ্জা পায় নি।

নবগ্রামে মাইনর পাশ করে জীবন ডাক্তার কাঁদী গেলেন এণ্ট্রান্স পড়তে। কাঁদী রাজ হাই ইস্কুলে ভর্তি হলেন। এণ্ট্রান্স পাশ করে বর্ধমান মেডিক্যাল ইস্কুলে ভর্তি হবেন। জীবনে সে কত কল্পনা, কত আশা! নিজের ডাক্তারী জীবনের ছবি আঁকতেন মনে মনে। রঙলাল ডাক্তারের মতো গরদের পাতলুন আর গলাবন্ধ কোট পরে, সাদা একটা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াবেন এ অঞ্চল। বুকে সোনার চেনে বাঁধা সোনার পকেট-ঘড়ি। থারমোমিটার, স্টেথোসকোপ, কলবাক্স। ঘরে লক্ষ্মী ছিলেন, বাপও ছিলেন স্নেহময়, অর্থের অভাব ছিল না, জীবনের দেহেও ছিল শক্তি, মনেও ছিল সাহস; সুতরাং কাঁদীর পাঠ্যজীবনে উৎসাহের স্ফূর্তির অভাব হয় নি। একদিকে করতেন হৈ-হৈ রৈ-রৈ, অন্যদিকে বোর্ডিংয়ের তক্তাপোশে শুয়ে স্বপ্ন দেখতেন ভাবীকালে জীবন দত্ত এল. এম. এস. সাদা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন জীবনের মোড় ফিরে গেল। সদ্য যুবক জীবন দত্ত প্রেমে পড়ে গেলেন। প্রেমে পড়েছিলেন এক দরিদ্র কায়স্থ শিক্ষক-কন্যার। তাঁর বয়স তখন আঠারো, নায়িকার বয়স বারো। সেকালে চোদ্দ বছরেই মেয়েরা যৌবনে প্রবেশ করত। দেহে মনে দুইয়েই তারা একালের বেণীদোলানো সতেরো বছরের মেয়েদের থেকে স্বাস্থ্য এবং মনে অনেক বেশী পরিপুষ্ট হয়ে উঠত। এ মেয়েটি আবার একটু বেশী পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। আজকালকার মতে অকালপক্ক বললে একটু আপত্তি করেন জীবন ডাক্তার। বলেন —অকাল পাকা আর সকালে পাকার তফাত আছে। অকালে যা পাকে তাতে গঠনে খুঁত থাকে; উপাদানে খামতি থাকে। কিন্তু সকালে যা পরিপুষ্টিতে পূর্ণতা লাভ করে পাকে তাতে খুঁত থাকে না; যে-যে উপাদানের রস-পরিপূর্ণতায় স্বাভাবিকভাবে ফলই বল বা দেহমনই বল, রাঙিয়ে-ওঠা রঙ ধরে মিষ্ট গন্ধে মনকে আকর্ষণ করে, তার সবই থাকে তার মধ্যে। বরং একটু বেশী পরিমাণেই থাকে, নইলে সকালে পাকে কী করে? মঞ্জরী একটু সকালে ফুটেছিল।

মেয়েটির নাম মঞ্জরী।

মঞ্জরীর স্বাস্থ্য ছিল সুন্দর। বারো বছরের মঞ্জরী একালের কলেজে পড়া ষোড়শী বা পূর্ণিমার চেয়ে স্বাস্থ্যে শক্তিতে পূর্ণাঙ্গী ছিল। শুধু চুল দেখে সন্দেহ হত

যে মেয়েটি ষোড়শী নয়—কারণ চুলগুলি পিঠ ছাড়িয়ে নিচে নামে নি। কালো চুলের রাশিটি কোমর ছাড়িয়ে নিচে নামলে তবে ষোড়শী রূপটি পরিপূর্ণ হবার কথা। ঠিক কেমন জান? যেন, কোজাগরী লক্ষ্মী-প্রতিমার পিছনে চালপট লাগানো হয়েছে অথচ তাতে ডাকসাজের বেড়টি এখনো লাগানো হয় নি। সেইগুলি আঁটা হলেই নিখুঁত হয়ে লক্ষ্মীপ্রতিমা হয়ে উঠবে। এইটুকু খুঁত ছিল। তার বেশী নয়।

একটু বাড়িয়ে বলা হয়েছে। জীবন ডাক্তার মনে মনেই সংশোধন করে নেন সেটুকু। লক্ষ্মীপ্রতিমা বটে—তবে শ্যামা। এবং তাতেই যেন অধিকতর মনোরম মনে হত মেয়েটিকে। মঞ্জরীর রূপটি তখন ছিল ভুঁইচাঁপার সবুজ নিটোল ডাঁটাটির মতো, মাথায় এক থোকা ফুলের কুঁড়ি তখনও ফোটে নি; ফোটবার সব আয়োজন সম্পূর্ণ।

অন্তরের দিক থেকেও বারো বছরের মঞ্জরী ষোড়শীর চেয়ে কম ছিল না। দেহের পরিপুষ্টিতায়, স্বাস্থ্যসমৃদ্ধির কল্যাণে সে তখন কিশোরীর মন পেয়েছিল। একেবারে ষোলো আনার অধিকারীর চেয়েও বেশী, আঠারো আনা বলা চলে; বলা চলে কেন জীবন দত্তের হিসাবে তাই হয়। ষোলো বছরে কৈশোর পূর্ণ হলে বয়স মেপে হিসেবের আইনে বারো আনা তো পাওয়ারই কথা, ষোলো আনার বাকি চার আনার দু আনা পূরণ করেছিল তার সমৃদ্ধ স্বাস্থ্য, বাকি দু আনা সেকালের ঘরের শিক্ষায় এবং মায়ের প্রদত্ত শ্বশুর-বাড়ি যাওয়ার মন্ত্রপাঠের ফলে সে পেয়েছিল। এর উপরও বাড়তি দু আনা মূলধন তার ছিল। সে পড়ে-পাওয়া নয়, সেটা সে পড়াশুনা করে পেয়েছিল। গরিব হলেও বাপ ছিলেন শিক্ষক, বাঙলা লেখাপড়া কিছু শিখিয়েছিলেন। বাপ শিশুবোধক থেকে বোধোদয় পর্যন্ত পড়িয়ে আর পড়ান নি, বলেছিলেন কৃত্তিবাসী-কাশীদাসী রামায়ণ-মহাভারত পড়ো। কিন্তু রামায়ণ মহাভারত পড়েও সে ক্ষান্ত হল না। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত নিজেই পড়লে। ওগুলি বাড়িতেই তাদের ছিল। খাতায় লেখা পূর্বপুরুষের সম্পদ। এর পর বঙ্কিমচন্দ্র পেলে হাতে। প্রতাপ-শৈবলিনী, জগৎসিংহ-আয়েষার সঙ্গে পরিচয় হতেই ষোলো আনা আঠারো আনায় ফেঁপে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্র তার হাতে এনে দিয়েছিল তারই বড় ভাই।

জীবন ওখানে সহপাঠী পেলে মঞ্জরীর বড় ভাই বঙ্কিমকে। বোর্ডিংয়ে জীবন নাম-ডাক ছুটিয়েছিল; খরচ করত দরাজ হাতে। ওই যে বাপ জমিদারি কিনেছিলেন—তারই হাঁকটা জীবন ওখানে নানাপ্রকারে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তার মধ্যে ভালো তামাকের গন্ধটা ছিল একটি বিশেষ প্রকার। ঐ গন্ধে গন্ধে এলেন

চতুরানন। বঙ্কিমের ডাক-নাম ছিল চতুরানন। ছেলেরা বলত বঙ্কিম চার মুখে হুঁকো খায়, চার মুখে কথা কয়। ভালো তামাকের গন্ধে এসে বঙ্কিমই আলাপ জমিয়ে তুললে। এবং আলাপের সূত্রে আবিষ্কার করলে যে, জীবন তাদের আত্মীয়। বঙ্কিমের মামা জীবনের নিজের মামীর দেওরের আপন ভায়রার নাতজামাই। এবং একদা টেনে নিয়ে গেল নিজেদের বাসায়। বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল—জীবন আমাদের আপনার লোক বাবা। বঙ্কিমের বাবা নবকৃষ্ণ সিং সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দেন নি, তবুও তিনি পরিচয় পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেই সমাদর করলেন।

—দীনবন্ধু দত্ত মহাশয়ের পৌত্র তুমি? জগদ্বন্ধু দত্ত মহাশয়ের ছেলে? তোমরা তো মহাশয়ের বংশ গো। আয়ুর্বেদ তোমাদের কুলবিদ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুনেছি তোমার বাবা জমিদারি কিনেছেন।

পুলকিত হয়েছিল জীবন। সলজ্জ মুখে মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভালোই লেগেছিল এ প্রশংসাবাদ।

নবকৃষ্ণবাবু বলেছিলেন—আমার বাড়িও তো তোমাদের ওই দিকে গো। চাকরি করি—যাওয়া আসা পূজোর সময়—গরমের ছুটিতে বড় যাই না। দেশে তো সম্পত্তি তেমন কিছু নাই। বিঘে পাঁচ-সাত জমি, শরিকে শরিকে বিবাদ। কী করব গিয়ে? নইলে পাঁচ কোশ দূরে বাড়ি, আত্মীয়তাও যা-হোক একটা আছে, আলাপ থাকত। তা ভালো হল আলাপ হল। কিন্তু—।

একটু ভুরু কুঁচকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—কিন্তু তুমি যে ইংরেজী পড়তে এলে?

প্রশ্নের মর্মার্থ বুঝতে পারে নি জীবন; উত্তরে প্রশ্নের স্বরেই বলেছিল—আজ্ঞে?

—তোমাদের তো আয়ুর্বেদই এক রকম কুলগত বিদ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুলধর্মও বলতে পারি। এর জন্যে তোমার সংস্কৃত পড়া উচিত ছিল গো। ইংরেজী পড়তে এলে কেন? বিদ্যাই শুধু নয়, বাঁধা টাট, বাঁধা ঘর,—সে এক রকম যজমানের মতো। ওই থেকেই তো তোমাদের প্রতিষ্ঠা, মহাশয় উপাধি; জমি পুকুর জমিদারি সব তো ওই থেকে।

জীবন বলেছিল—আমার ইচ্ছে ডাক্তারি পড়ব।

—ডাক্তারি! বাঃ বাঃ। খুব ভালো হবে। সে খুব ভালো হবে। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন নবকৃষ্ণ সিংহ। তারপর তিনি বলেছিলেন—যাও, বাড়ির ভিতরে যাও। বঙ্কিম, নিয়ে যা তোর মায়ের কাছে। তিনি তো হলেন আসল আত্মীয়। আমরা তো তাঁর টানে-টানে আত্মীয়! যাও।

মঞ্জরী তখন উঠানে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আনি-মানি ঘুরছিল। গাছ-কোমর

বেঁধে হাত দুটোকে দুদিকে প্রসারিত করে দিয়ে বনবন করে খাচ্ছিল ঘুরপাক। মুখে সে ছড়া আওড়াচ্ছিল—

"আনি মানি জানি না
পরের ছেলে মানি না
লাগলে পরে নাইক দোষ
মানব না-কো রাগ কি রোষ
সরে যাও—সরে যাও
নইলে এবার ধাক্কা খাও।"

বলেই পাশে ঘুরন্ত ভাইদের কোনো একজনের সঙ্গে খাচ্ছিল ধাক্কা। একজন সে ভাই-ই হোক বা বোনই হোক পড়ছিল। পড়ে গিয়ে কেউ অবশ্য এ সব ক্ষেত্রে রাগ-রোষ সত্যই করে না, পড়ে শুয়েই থাকে চোখ বুজে, মনে হয় মাটি দুলছে—আকাশ দুলছে—ঘরগুলোও দুলছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে—অতলের কি পাতালের দিকে সে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। সর্বাঙ্গ কেমন শিরশির করতে থাকে।

বঙ্কিম জীবনকে নিয়ে ঘরে যখন ঢুকল তখন মঞ্জরী পাক খেতে খেতে কাউকে ধাক্কা মারবার উদ্যোগ করছে এবং ঘুরপাকের বেগের মধ্যে ঠিক ঠাওর করতে না পেরে দাদা ভ্রমে জীবনের হৃদ্‌পিণ্ডের উপর মারলে ধাক্কা ; এবং নিজেই পড়ে গিয়ে খিলখিল করে হাসতে লাগল। জীবন দত্ত থ ·মেরে দাঁড়িয়ে গেলেন। এদিকে মঞ্জরীর হাসিও স্তব্ধ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। তার ভুল ভেঙেছে। দাদা ভ্রমে অপরিচিত একজনকে ধাক্কা মেরেছে বুঝে বিস্ময়ে ও লজ্জায় চোখ দুটো বড়ো করে ভূমিশয্যা থেকে উঠেই 'ও-মাগো' বলে ছুটে পালিয়ে গেল গৃহাভ্যন্তরে। এবং আবার শুরু করলে খিলখিল হাসি। জীবন বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

সে আমলে ওই যথেষ্ট।

ঘটনার ওইখানেই শেষ নয়, আরও আছে।

বঙ্কিম পলায়নপরা মঞ্জরীকে উদ্দেশ্য করে হেসে বলেছিল—মর হতচ্ছাড়ী! তারপর মায়ের সঙ্গে জীবনের পরিচয় করিয়ে দিলে। জীবন তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—না না। তুমি তো সম্পর্কে আমার বড় গো। আমার দাদা তোমার মাসীমার দেওরের ভায়রার নাতজামাই। সে হিসেবে তুমি আমার দাদার কোনো শ্বশুর-টশুর হবে। আমারও তাই তো হলে। বোসো, বোসো। প্রণাম আমিও তোমাকে করব না, তুমিও আমাকে কোরো না।

বঙ্কিম এ সম্পর্ক নির্ণয়ে খুব খুশী হয়েছিল—তা হলে তো তার সঙ্গে সম্পর্ক আর

এক পর্ব তফাত অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষ। নাতি-দাদামশায় সম্পর্ক—রসিকতার অবাধ অধিকার।

মা খাবার আনতে উঠে যেতেই বঙ্কিম ভিতরে গিয়ে মঞ্জরীকে ডেকে বলেছিল—আয় না হতচ্ছাড়ী, দাদামশায় দেখবি।

—কে? মঞ্জরীর কণ্ঠস্বর ঈষৎ চাপা হলেও শুনতে পাচ্ছিল জীবন।

—দাদামশায় রে।

—দূর! ওই আবার দাদামশায় হয়! ও একটা বুনো শুয়োর, মা গো—কী হোঁতকা চেহারা, কালো রঙ!

—ছি! তুই ভারি ধিঙ্গী হচ্ছিস দিন দিন। আমাদের বড় মামা হল ওর মাসীমার দেওরের নিজের নাতজামাই।

—মরণ! সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের বোনপো-বউয়ের বোনঝি-জামাই!

—না। না। উঠে আয়, আমার বন্ধু। খুব ভালো ঘরের ছেলে।

—ভালো ঘরের ছেলে তো এমন হোঁতকা বুনো শুয়োরের মতো চেহারা কেন?

—কী যা-তা বলছিস? বীরের মতো চেহারা। মুগুর ভাঁজে কি না!

—তাহলে পড়তে না এসে যাত্রার দলে ভীম সাজতে গেল না কেন? আমরা সত্যিকারের ভালো গদাযুদ্ধ দেখতে পেতাম। তুই যা—আমি যাব না।

বঙ্কিম একটু ক্রুদ্ধ হয়েই ফিরে এল।

জীবনও বন্য বরাহের মতো মাথা হেঁট করেই বসে ছিল; খুব প্রীতিপ্রদ নয়, তরুণ বয়সে ও কথায় কারুরই পুলক-সঞ্চার হয় না। সে চলে আসবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললে—আজ যাব ভাই, কাজ আছে।

মা ঠিক এই সময়েই জলখাবারের থালা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। থালাখানি নামিয়ে দিয়ে ডাকলেন—মঞ্জী কই? মঞ্জী—জল নিয়ে আয় এক গেলাস। মঞ্জী!

মা-টি বড় রাশভারী লোক। অমান্য সহজে করা যায় না। জীবন ওই কণ্ঠস্বর শুনেই 'না' বলতে গিয়েও বলতে পারলে না। মঞ্জরীও মিনিট-খানেকের মধ্যেই জলের গেলাস হাতে বেরিয়ে এল।

মা বললেন—প্রণাম কর। দাদার বন্ধুই শুধু নয়, আমাদের আপনার লোক। তোদের দাদামশায় হয়।

মঞ্জরী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

—হাসছিস যে? প্রণাম কর!

—ওইটুকু আবার দাদামশাই হয়?

—হয়। মামা-কাকা বয়সে ছোট হয় না? তুলসীপাতার ছোট বড় আছে?

মঞ্জরী এবার প্রণাম করলে। সে আমলে গড় করে প্রণাম করত। এ আমলের মতো হেঁট হয়ে পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকানো প্রণাম নয়। উঠেই আবার হাসতে লাগল।

মা বিরক্ত হয়েই বললেন—হাসছিস কেন?

—দাদামশাই মিলছে না বলে হাসছি।

—কী? কী মিলছে না?

—দাদামশায়ের গালে কাদা কই? ছড়ায় আছে, ঠাকুরদাদা গালে কাদা—। বলেই মঞ্জরী হাসতে হাসতেই চলে গেল।

এর পর কিশোর জীবন দত্তের অবস্থার কথা বোধ করি না বললেও চলে।

সে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠল। মঞ্জরী! মঞ্জরী! মঞ্জরীকে সে জয় করবেই। কিন্তু অকস্মাৎ পথ রোধ করে দাঁড়াল একজন।

এই হল সেই ছেলে যার সঙ্গে বিবাদ করে জীবনের সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়ে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। অভিজাত বংশের উগ্র দাম্ভিক ছেলে ভূপতিকুমার বসু। লোকে ডাকত ভূপী বসু বলে। ভূপী বসু—ওখানকার নামজাদা দুর্দান্ত। মাঝখানে শহরে-বাজারে বেশ গা দুলিয়ে হেলে-দুলে যে মাতঙ্গ-গমন ধরনের চলনটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেটা ওখানে অর্থাৎ কাঁদী অঞ্চলে আমদানী করেছিল ভূপী বোস। সে যখন যে পা-খানা ফেলত—তখন তার সর্বাঙ্গটা সেই দিকে লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যেন হেলে যেত। সামনে বা পিছনে যারা থাকত তারা বাধ্য হয়ে দেখত; পাশে যারা চলত—যাদের পাশে তাকাবার অবকাশ থাকত না, তারা এই দোলার ধাক্কা খেয়ে তাকিয়ে সভয়ে সরে যেত; ওরে বাবা ভূপী বসু যাচ্ছে!

ভূপী বসু ছিল গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি। মাথায় রেখেছিল বাবরি চুল; জমিদারের বাড়ির ছেলে। এই ভূপীও ছিল বঙ্কিমের বন্ধু। অনেক আগে থেকেই সে মঞ্জরীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল।

সুতরাং ভূপী বোসের সঙ্গে আরম্ভ হল প্রতিযোগিতা। ব্যাঘ্র-বরাহ-সংবাদ রচনা শুরু করলেন কৌতুকপ্রিয় বিধাতা। ভূপী বোস ব্যাঘ্র, জীবন দত্ত বরাহ। এ নাম মঞ্জরী দিয়েছিল।

সাত

তাঁর সহপাঠি, বোর্ডিংয়ে পাশের সিটে ছাত্র, এরা তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিল কিন্তু একটু দেরী হয়ে গিয়েছে তখন। দোষ তাদেরও ছিল না, কিশোর জীবনেরও ছিল না।

সহপাঠিরা জানত না যে জীবন বুকে মঞ্জরীর ধাক্কা খেয়েছে এবং ধাক্কা খেয়েও সেইদিকেই ছুটেছে। এবং জীবনও জানত না যে, ভূপী বোস-রূপী ব্যাঘ্রটি মঞ্জরীর প্রত্যাশায় ওত পেতে বসে আছে। সে সময়ে সামান্য একটা কারণে অভিজাত-কুলপ্রবীণ ভূপী বোস মঞ্জরী ও মঞ্জরীর মায়ের উপর রাগ করে ওদিক দিয়ে যাওয়া-আসা বন্ধের ভান করে বসে ছিল। এরই মধ্যে বরাহ প্রবেশ করল।

ভূপী জীবন থেকে বয়সে বেশ ক-বছরের বড়। কিন্তু ফেল করেও জীবনের এক ক্লাশ উপরে পড়ে। কাঁদী ইস্কুলের সর্বজনপরিচিত ভূপী। কাঁদী ইস্কুলে সেকালে যারাই পড়েছে তারা ইস্কুলে ভরতি হওয়ার পাঁচদিন বা সাতদিনের মধ্যেই তাকে চিনেছে। প্রথমেই চোখে পড়ত তার হেলে-দুলে চলন। তারপর শুনত তার বিচিত্র বাগ্‌বিন্যাস।

—কোথায় বাড়ি রে ব্যাটাচ্ছেলে? দরিদ্র অবস্থার পাড়াগেঁয়ে ছেলেদের প্রতি এইটিই ছিল তার প্রথম প্রশ্ন।

তার চেহারা বেশভূষা এবং বাগ্‌ভঙ্গিতে আগন্তুক দরিদ্র সন্তানেরা শঙ্কিত হত, একালের মতো বিদ্রোহ করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কাল ছিল বিরূপ। তারা সসম্ভ্রমেই বলত গ্রামের নাম। তারপরই ভূপী প্রশ্ন করত—অ! কোন থানা র‍্যা? কোন পরগনা! কত নম্বর লাট?

তারপর বলত—ওইখানেই আমাদের একটা লাট আছে। ৫০৭ কি ৭০৫ একটা নম্বর তাতে সে লাগিয়ে দিত।

জীবন দত্তের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে কিন্তু এই ভঙ্গীতে প্রশ্ন করে নাই ভূপী; একটু খাতির করে বলেছিল—কোথায় বাড়ি হে ছোকরা? জীবনের বলিষ্ঠ দেহ এবং বেশ ফিটফাট পোশাক দেখেই তাকে র‍্যা এবং ব্যাটা না বলে বলেছিল হে এবং ছোকরা।

প্রথম দিন জীবন ভড়কে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তও হয়েছিল। কিন্তু সে বিরক্তি গোপন করেই বলেছিল—নবগ্রাম।

বলেই সে চলে গিয়েছিল। দন্তী, নখী, শৃঙ্গীদের সান্নিধ্য পরিত্যাগই শ্রেয়,

—এই বাক্যটি স্মরণ করেছিল এবং ভুপীকে ওই দলেই ফেলেছিল। কিন্তু ভুপী ছাড়ে নাই। সে নিজেই এসেছিল এগিয়ে, দু-চার দিন পরেই একদিন বোর্ডিংয়ে জীবনের ঘরে এসে বলেছিল—শুনলাম না কি ছোকরা, তুমি তামাক খাও ভালো। কই খাওয়াও দেখি! দেখি—কী তামাক তুমি খাও! ভুপীর কণ্ঠস্বর রীতিমতো পৃষ্ঠপোষকের কণ্ঠস্বর।

জীবন দুর্দান্ত ছিল, কিন্তু অভদ্র ছিল না। এবং জমিদারী যত কালের পুরনো হলে জমিদার-বংশে পচ ধরে—তাদের একখানা জমিদারি ততকালেরও পুরনো হয় নি। এবং সত্য বলতে কি, সেদিন একটু গোপন খাতিরও মনে মনে অনুভব করেছিল সে ভুপী বোসের প্রতি। বড় বংশের ছেলে, ভালো চেহারা, এমন বোলচাল, তার উপর জীবন বিদেশী, ভুপী এখানকারই লোক, সুতরাং ওটা স্বাভাবিক ছিল। জীবন সেদিন তামাকও খাইয়েছিল। সেদিন যাবার সময় ভুপীর হঠাৎ নজর পড়েছিল জীবনের মুগুর দুটোর উপর। একটু নেড়েচেড়ে দেখেও গিয়েছিল। হেসে নামও দিয়ে গিয়েছিল—মুদ্গর সিংহ।

ঝগড়াটা লাগল হঠাৎ।

ভুপী বোস নবকৃষ্ণ সিংহের বাড়ি থেকে বের হচ্ছে, জীবন ঢুকছে। ভুপী পান চিবুচ্ছিল, সঙ্গে বঙ্কিম, পিছনে বঙ্কিমের মা। জীবনের অনুপস্থিতিতে গরমের ছুটির মধ্যে ভুপীর সঙ্গে ওদের ঝগড়া মিটে গেছে।

জীবনের সঙ্গে একজন মুটে। তার দেশের লোক; গরমের ছুটির পর দেশ থেকে ফিরেছে ইস্কুলে, আসবার সময় মস্ত ঝাঁকায় বাগানের আম, খেতের ফুটি, কিছু তরকারি এবং খড় দিয়ে মুড়ে একটা মাছও এনেছে।

ভুপী থমকে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হেসে বললে, কী রকম? মুদ্গর সিংহ এখানে? এ বাড়িতে?

পিছন থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের কথা ভেসে এল—উনি আমাদের সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের বোন-পো বউয়ের বোনঝি-জামাই, আপনার লোক, সম্পর্কে আমার দাদামশাই! কী এনেছ গা দাদামশাই?

সকলের পিছন থেকে মঞ্জরী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে সামনে এসে দাঁড়াল।

ভুপীও সঙ্গে সঙ্গে ফিরল। বললে—চল—চল—দেখে যাই দাদামশাই মুদ্গর সিংহ কী এনেছেন। নামা ঝুড়িটা।

জিনিসপত্রগুলি দেখে মুখ বেঁকিয়ে একটা আম তুলে নিয়ে দাঁতে কেটে একটু রসাস্বাদ করেই থু-থু করে ফেলে দিয়ে বলল—আমড়া! আমি ভেবেছিলাম আম! কাল আমি আম পাঠিয়ে দেব। গোলাপখাস, আর কি বলে, কিষণ-ভোগ।

আমের গায়ে কাগজের টিকিটে লেখা থাকবে—কবে কখন খেতে হবে। ঠিক সেই সময়ে খাবেন কিন্তু। না হলে ঠিক স্বাদ বুঝবেন না।

ভূপী চলে গেল। মঞ্জরীর মা বললেন—এসো বাবা। ভাল তো সব?

—হ্যাঁ ভালো। আমি কিন্তু চলি এখন। এই তো আসছি। বোর্ডিংয়ের বারান্দায় জিনিস পত্র পড়ে আছে। গাড়োয়ানকে রেখে এগুলি দিতে এসেছিলাম আমি। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, ভূপীর কথাগুলিতে সে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

—একটু জল খেয়ে যাবে না?

—না। গাড়োয়ানটা অজ পাড়াগেঁয়ে। ভয় পাবে আমি যাই।

কিশোর জীবন দত্ত সেদিন ভূপীর আঁচটা অনুভব করেছিল। এবং সেই হেতুই সেদিন তার সহপাঠী বোর্ডিংয়ের পাশের সিটের বন্ধুটিকে সব কথা বলেছিল বাধ্য হয়ে। না বলে উপায়ও ছিল না। এত বড় মাছটা এবং এতগুলি আম ও ফুটির উপর ছেলেদের লোভ হয়েছিল দুর্দান্ত। কোথায় কোন বাড়িতে এগুলি গেল জানতে তাদেরও কৌতূহলের অন্ত ছিল না। কাজেই প্রশ্নেরও বিরাম ছিল না। অবশেষে বলতে হল নাম।

বন্ধুরা শুনে শিউরে উঠল।—ওরে বাবা, গেছলি কোথায় তুই? বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা বাঁধতে গেছিস? ও যে ভূপী বোসের মঞ্জরী!

—ভূপী বোসের মঞ্জরী?

—হ্যাঁ বাবা। ওদিকে হাত বাড়িয়ো না মানিক। হাত কেটে নেবে।

জীবন দত্ত কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে প্রশ্ন করেছিল—কথা পাকা হয়েছে কিনা জান?

—না। তবে—

—ব্যস। তবে দেখা যাক মঞ্জরী কার। মঞ্জরী তো এখনও বাপরূপী গাছে ফুটে আছে রে। যার মুরদ থাকবে সেই পেড়ে মালা গেঁথে গলায় পরবে। আমিও জীবন দত্ত।

গাড়োয়ানের হাতেই সে মাকে একখানি গোপন পত্র পাঠালে—'অবিলম্বে পঞ্চাশটি টাকা চাই।' সেদিনের পঞ্চাশ টাকা আজ উনিশ শো পঞ্চাশ সালে অন্তত দু-হাজার টাকা।

লাগল সংঘর্ষ।

প্রথমটা ভূপী বোস গ্রাহ্যই করে নাই। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ওই বরাহটা! বঙ্কিম অথবা মঞ্জরী দুজনের মধ্যে একজনের কাছে নিশ্চয় সেই প্রথম দিনের বরাহ সম্বোধন-

বৃত্তান্তটা শুনেছিল এবং মনে মনে নিশ্চয়ই প্রচণ্ড কৌতুক ও পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করেছিল। মঞ্জরী জীবন দত্তকে দেখে বুনো শুয়োর বলেছিল বলে ভূপীও তার নামকরণ করেছিল বরাহ। আরও বলত মুদ্গর সিংহ। ওই সব নামে সে তাকে অভিহিত করত। অবশ্য আড়ালে। আর আমড়ার-স্বাদবিশিষ্ট আমের টুকরি বা কতকগুলো ফুটি কি একটা মাছকে সে মূল্যই দিত না। ওর বদলে কলমের গাছের অল্প গোটাকয়েক ল্যাংড়া কি বোম্বাই কি কিষণভোগ নামবিশিষ্ট আম এবং গণ্ডাকয়েক লিচু কি গোলাপজাম বা জামরুলের মূল্য যে বেশী এটা সে জানত। তার ওপর তার রূপ-গৌরব সম্পর্কে সে ছিল পূর্ণমাত্রায় সচেতন। কাজেই সে গ্রাহ্য করে নাই।

এদিকে জীবন নিজের পেলবরূপের অভাব পূরণ করতে হয়ে উঠল বিলাসী। বাড়িতে তার টাকার চাহিদার অঙ্ক বাড়তে লাগল। জগদ্বন্ধু মশায় বেশ একটু চিন্তিত হলেন। তবুও একমাত্র ছেলের দাবি সহজে অগ্রাহ্য করলেন না। বাপের কাছ ছাড়াও মায়ের কাছ থেকে টাকা আনাত জীবন। পুরো দাবিটা বাবাকে জানাতে সাহস করত না।

তার জন্য জীবন কখনও আক্ষেপ করেন নি। আজও করেন না।

কী আক্ষেপ? যৌবনের স্বপ্ন, নারীপ্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এর চেয়ে মাদকতাময়, এর চেয়ে জীবনের কাম্য কৈশোরে আর কী আছে? শুধু কি কৈশোরে যৌবনে? সমস্ত জীবনে কোনো নারীকে সম্পূর্ণভাবে জয় করে জীবনভরে পেয়েছে তার চেয়ে ভাগ্যবান কে আছে? মঞ্জরীর প্রেমের প্রতিযোগিতায় যদি জমিদারির এক আনা ছ-গণ্ডা দু-কড়া দু-ক্রান্তি বিক্রি হয়েই যেত—তাতেই বা কী হত! তাতেও আক্ষেপ হত না তাঁর।

তাই হয়তো যেত। বাবার কাছে টাকা না পেলে সে ধার করত। তখন তার হালচালে সেখানে রটে গিয়েছিল—জীবন দত্ত ধনী বলে ধনী নয়—নামজাদা ধনীর ছেলে। সুতরাং টাকা ধার পেতে সেই আমলে তাকে কষ্ট পেতে হত না। বঙ্কিমদের বাড়িতে নিত্যনূতন মনোহারী উপঢৌকন পাঠাতে লাগল সে।

কাঁদীর বাজারে তখন তার নাম ছুটে গেল 'বাবুজী' বলে। জীবন বাজারের রাস্তায় বের হলে দোকানীরা বলত—কি বাবুজী? কোনদিকে যাবেন?

খাস লালবাগের ছোঁয়াচ-লাগা কাঁদীতে আমীরি আমলের 'জী' শব্দটা তখনও বেঁচে ছিল। কোম্পানির আমলের বাবু শব্দের সঙ্গে ওটিকে লাগিয়ে বাবুজীই ছিল ওখানকার সম্মানের আহ্বান।

জীবন বাবুজী হাসত।

ওসমান শেখ ওখানকার সব থেকে বড় মনোহারী দোকানের মালিক, তার সঙ্গে ব্যাপারটা আরও অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। জীবন ওসমানকে বলত—চাচাজান। ওসমান বলত—বাপজান। ওসমান শেখের মস্ত দোকান, দু-তিনটে শাখা। মনোহারী, জুতো, তামাক। বাকি খাতার পাতায় সসম্ভ্রমে জীবন বাপজানের নামপত্তন করে নিয়েছিল ওসমান চাচা। চাচা মানুষ চিনত। জীবনের প্রয়োজন না থাকলেও চাচা তাকে ডেকে বলত—বাপজান! আরে, শুনো শুনো!

—কী চাচাজান?

—আরে বাপজান—আজ চার-পাঁচ রোজ তুমাকে ঢুঁড়ছি। নতুন 'খোশবয়' এনেছি। শহরে (অর্থাৎ মুরশিদাবাদ) গেলাম, মহাজন দেখালে—দেখো ওসমান, 'খোশবয়' দেখো। আতর ছোট হয়ে গেল। নিয়ে যাও—রাজবাড়িতে দিবা। রাজবাড়ির জন্তে নিলাম, আর তিন জমিদারবাড়ির জন্তে নিলাম, হাকিমদের জন্তে নিলাম। তা পরেতে বললাম—আর দু-শিশি! তুমার তো দু-শিশি চাই আমি জানি। নিজের জন্য এক শিশি; আর—।

হেসে চাচা বলত—আর ই বাড়ির জন্য এক শিশি! নিয়ে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে কাগজে মুড়ে তার হাতে তুলে দিত।

—দাম?

—সে হবে। নিয়া যাও তুমি। আর আমি রাখতে পারব নাই। ইয়ার মধ্যে ভূপী চাচা এসেছে দু-দিন। ওই উকিল সাহেবের বাড়িতে দেখেছেন ই খোশবয়। বলে আমার চাই দু-শিশি। দাও। আমি বলি—নাই। সে বলে—জরুর আছে। আমি দোকান তল্লাস করব। তুমি লুকিয়ে রেখেছ, জীবনটারে দিবে। অনেক কষ্টে রেখেছি। নিয়া যাও তুমি। দাম সে খাতায় লিখে রাখব। তার তরে তোমার ভাবনা কী?

ওই গন্ধ রুমালে মেখে জীবন ভূপী বোসের সান্নিধ্যে এসে রুমালখানা পকেট থেকে বের করে মুখ মুছতে শুরু করত। ভূপী চকিত হয়ে উঠত। তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাত। জীবন বুঝত এবং হাসত। প্রশ্নটা ভূপীর এই—মঞ্জরীর কাপড়ে এবং এই বরাহটার রুমালে একই মিষ্টি গন্ধ কী করে এল?

ভূপী অবশ্য হটবার ছেলে নয়, ঠিক পরদিনই সেই গন্ধ সে রুমালে মেখে আসত। জীবন ভাবত—ভূপী বোস তো যে সে নয়, ওসমান চাচার দোকানে না পেয়ে নিশ্চয় মুরশিদাবাদ থেকে আনিয়েছে।

হায়—তখন কি জানতেন যে, মঞ্জরীকে পাঠানো উপঢৌকনটি ভূপীর কাছে এসেছে বিচিত্রভাবে!

থাক সে কথা। ও নিয়ে আপেক্ষ কেন? কোনো কিছু নিয়েই আক্ষেপ জীবন দত্ত আর আজ করেন না। পরিহাস করেন। প্রেম এক প্রকারের সাময়িক উন্মাদ রোগ! সেই রোগে সত্যযুবক জীবন দত্ত সেদিন আক্রান্ত হয়েছিল।

ভূপী বোসের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হার মানবার চরম মুহূর্তটির আগেকার মুহূর্ত পর্যন্ত ভেবেছিল সে জিতেছে। জয় তার অনিবার্য। মনে করেছিল, পরাজয় আশঙ্কায় ভূপীর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

ভূপী বোস তখন জীবন দত্তের অর্থব্যয়ের প্রাচুর্য দেখে বেশ খানিকটা শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে ছুতো-নাতায় কথা-কাটাকাটি করত। জীবন আমোদ অনুভব করত। সঙ্গে সঙ্গে দু-চার বার ডাম্বল ভাঁজার ভঙ্গিতে হাত ভাঁজত ভূপীর সামনেই। নিত্য মুগুর ভাঁজাটা সে বজায় রেখেছিল। এবং বোর্ডিংয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে রুটি খেত পঁচিশ থেকে তিরিশখানা। ভূপী তার দেহ দেখেও ভয় পেত। জীবন হাসত। জয় তার অনিবার্য। সম্পদের প্রতিযোগিতায় তার জয় হয়েছে, বীর্যের প্রতিযোগিতায় সে শ্রেষ্ঠ; স্বয়ংবরে আর চাই কী?

হায় রে হায়। হায়রে মানুষের দম্ভ! আর বিচিত্র মানুষের মন! বিশেষ করে নারীর মন! ও যে কিসে পাওয়া যায়, এ কেউ বলতে পারে না।

হঠাৎ একদিন জীবন দত্তের ভুল ভেঙে গেল। ভূপী বোসের সঙ্গে হয়ে গেল চরম সংঘর্ষ। এবং সম্পদ ও শক্তিতে শ্রেষ্ঠতা সত্ত্বেও সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

সেদিন দোলের দিন।

বেশ একটি মূল্যবান উপঢৌকনের ডালা সাজিয়ে জীবন দত্ত মঞ্জরীদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তখনও মঞ্জরীর সারা অঙ্গের কোথাও এক ফোঁটা আবীরের চিহ্ন ছিল না। জীবনের অভিপ্রায় ছিল সে-ই তার শ্যামল সুন্দর মুখখানিকে প্রথম আবীর দিয়ে রাঙিয়ে দেবে। প্রথমেই দেখা হল মঞ্জরীর মায়ের সঙ্গে। সে উপঢৌকনের ডালাটি তাঁর সামনেই নামিয়ে দিয়ে বললে—মা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার কাছে আপনাদের কথা শুনেছেন কিনা।

মঞ্জরীর মা গম্ভীর মানুষ, জীবন তাঁকে ঠিক বুঝতে পারত না। একটু কেমন ভয় করত। আবার যেন ভালোও লাগত না লোকটিকে।

তিনি মুখে বললেন—না না, এসব ঠিক নয় জীবন। বলে ডালাটি হাতে করে উঠে গেলেন উপরতলায়। নীচে রইল মঞ্জরী। মঞ্জরীর মুখে চোখে নিষ্ঠুর কৌতুক। এ নিষ্ঠুর কৌতুক জীবনের যেন ভালোই লাগত। এবং এই নিষ্ঠুরতার জন্যই তার কৌতুক যেন বেশী মধুর মনে হত, বেশী করে টানত তাঁকে।

একলা পেয়ে জীবন পকেট থেকে আবীর বের করে বললেন—নাতনীকে আজ মাখাব কিন্তু।

মঞ্জরী হেসে বললে—আমিও মাখাব। রঙ গুলে রেখেছি। দাঁড়াও দাঁড়াও! সে ছুটে গেল ঘরের মধ্যে। বেরিয়ে এল হাত দুটি পিছনে রেখে। জীবনের তখন হুঁশ ছিল না। সে সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জরীর মুখে মাথায় মাখিয়ে দিলে আবীর। এদিকে মঞ্জরীর দুখানি হাত মুখের সামনে উদ্যত হল, দুই হাতে মাখানো আলকাতরা।

জীবন সভয়ে পিছু হটল। সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে বাহির দরজার দিকে ছুটল, বন্য বরাহের মতো।

বাহির দরজার মুখেই তখন ব্যাঘ্র। ব্যাঘ্রের পশ্চাতে প্রজাপতি চতুরানন বঙ্কিম।

বন্য বরাহে এবং ব্যাঘ্রে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়ে গেল। দ্রুত ধাবমান সবল দেহে জীবন দত্তের সঙ্গে ধাক্কা লাগল ভূপী বোসের; বঙ্কিম তখন রাস্তার উপর থেকে লাফ দিয়ে উঠেছে মঞ্জরীর দাওয়ায়। জীবন দত্তের ধাক্কা সহ্য করতে পারলে না ভূপী। একেবারে চিত হয়ে উল্টে যাকে বলে সশব্দে-ধরাশায়ী-হওয়া তাই হল ভূপী বোস। জীবন ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আঘাত তাকেও কম লাগে নি, কিন্তু সে সহ্য করবার শক্তি তার ছিল। এবং একটু সামলে নিয়েই সে সত্যসত্য সহানুভূতির সঙ্গে হাত ধরে তুলতে গেল ভূপী বোসকে। ইচ্ছাকৃত না-হোক অনিচ্ছাকৃত হলেও ত্রুটিটা তারই বলে মনে হল তার। শুধু সে তাকে হাত ধরে তুলেই নিরস্ত হল না, ভূপীর শরীরে কোথাও আঘাত লেগেছে কিনা দেখতে চেষ্টা করলে, ধুলো ঝেড়ে দিলে অপরাধীর মতো।

এই অবসরে ভূপী ছিটকে-যাওয়া পায়ের জুতোপাটিটা কুড়িয়ে নিয়ে তার মাথায় মুখে পিঠে আথালি-পাথালি মারতে শুরু করলে। গাল দিলে—শুয়ার কি বাচ্চা! হারামজাদা! উল্লুক!

ব্যস। উন্মত্তের মতো জীবন হুঙ্কার দিয়ে পড়ল ভূপী বোসের উপর। সেদিন নেশাও করেছিল জীবন। সিদ্ধি খেয়েছিল। ভূপীর সঙ্গে সে যুদ্ধ কেমন করে হয়েছিল, সে তার মনে নাই; কিন্তু বুকে বসে ভূপীর নাকে তার প্রকাণ্ড হাতের প্রচণ্ড মুঠির একটা কিল সে মেরেছিল। মারতেই মনে হল নাকটা যেন বসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এসে ভাসিয়ে দিলে ভূপী বোসের মুখ, রক্তাক্ত হয়ে গেল জীবনের হাত—জামায় কাপড়েও রক্ত লাগল। বঙ্কিম চিৎকার করে উঠল—করলি কী!—আরও একটা আর্ত কণ্ঠ তার কানে এল—মঞ্জরীর কণ্ঠস্বর—ও মা গো! খুনে ডাকাত, খুন করলে মা গো!

চকিতে উন্মত্ত জীবন আত্মস্থ হয়ে গেল।

তাই তো! এ কী করলে সে? ভূপী বোসের জ্ঞান নাই, বুকে চেপে বসে তার স্পর্শ থেকে সে তা বুঝতে পেরেছে। বিপদের কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে হল। ভূপীর দেশ দেউলিয়া জমিদার ঘরের ছেলে। ওরা ভয়ঙ্কর। দাঁত-নখ-ভাঙা বাঘই হয় নরখাদক। আর মঞ্জরীর কান্না শুনেও আজ তার স্বপ্ন ভেঙেছে। মুহূর্তে সে লাফ দিয়ে উঠে ছুটল। ছুটল একেবারে নিজের গ্রামের অভিমুখে। পথ দশ ক্রোশ। কিন্তু সে পথ ধরে ফিরল না, ফিরল অপথে-অপথে, ময়ূরাক্ষী নদীর তীর ধরে। বোধ হয় তেরো-চোদ্দ ক্রোশ পথ হেঁটে বাড়ি এসে পৌছেছিল। জামা-কাপড় নদীতে কেচে, কাদা মাখিয়ে, রক্তচিহ্নের আভাস গোপন করে বাড়ি এল।

মেডিক্যাল কলেজে পড়ার স্বপ্ন তার শেষ হল।

মঞ্জরীর মোহে পড়ে ঘুচে গেল। মঞ্জরীই দিলে ঘুচিয়ে।

সেদিন জগদ্বন্ধু মশায় ও তাঁর স্ত্রী ছেলের অবস্থা দেখে শিউরে উঠে প্রশ্ন করলেন —কী হয়েছে? এমন করে কেন তুমি ফিরলে? কী হয়েছে?

জীবন মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। কোনো উত্তর দিলে না।

জগদ্বন্ধু মশায়ের মতো দৃঢ়চিত্ত প্রকৃতির মানুষের সামনেও সে অটল রইল। মঞ্জরীর নাম সে কিছুতেই প্রকাশ করবে না। শেষ পর্যন্ত বললে একজন বড়লোকের ছেলে তাকে জুতো মেরেছিল, সে তার শোধ নিয়েছে। আঘাত অবশ্য বেশী হয়েছে, রক্তপাত হয়েছে খানিকটা, সেই জন্যই ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে। ওখানে থাকলে সে হয়তো খুন করবার চেষ্টা করবে। ওখানে সে আর ফিরবে না। সে অন্য জায়গায় পড়বে। সিউড়ি বা বর্ধমান সরকারী হাই ইস্কুলে পড়বে সে।

—না! আর না!

জগদ্বন্ধু মশায় বললেন—আর না। বাইরে পড়তে আর আমি তোমাকে পাঠাব না। আমাদের কৌলিক বিদ্যা শেখো তুমি।

জগদ্বন্ধু মশায়ের কণ্ঠস্বর কঠিন, কিন্তু মৃদু। কণ্ঠস্বর শুনে জীবনের সর্বদেহ যেন হিম হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়েছিল, এ সে-ই কণ্ঠস্বর, এ কণ্ঠস্বরে যে কথা বলেন জগবন্ধু মশায় তার আর লঙ্ঘন হয় না। জীবনের মনে পড়ল, একদিন নবগ্রামের বাবুদের বাড়ির এক অনাচারী, ব্যভিচারী, প্রৌঢ়ের অসুখে চিকিৎসা হাতে নিয়ে হঠাৎ একদিন ঠিক এই কণ্ঠস্বরে চিকিৎসায় জবাব দিয়েছিলেন। বাবুটি ছিলেন মদ্যপায়ী; জগবন্ধু মশায় তাঁকে মদ্য পান করতে নিষেধ করেছিলেন; কিন্তু তিনি নিষেধ লঙ্ঘন করেছিলেন। জগদ্বন্ধু মশায় ঘরে ঢুকে সেই কথা জানতে পেরেই ফিরে এসেছিলেন। রোগীর আত্মীয়েরা অনুনয় করে তাঁকে ফেরাতে

এসেছিল—মশায় এমনি কঠিন মৃদুস্বরে বলেছিলেন—না। ঐ ছোট একটি 'না' শব্দ শুনে জমিদার পক্ষ থমকে গিয়েছিল। এবং সে 'না'-এর আর পরিবর্তন কোনো দিন হয় নাই। আজকের 'না'ও সেই 'না'। এবং এর সঙ্গে জগদ্বন্ধু যে কথাগুলি বললেন তার মধ্যেও কণ্ঠস্বরের সেই মৃদুতা এবং সেই কাঠিন্যই রনরন করছিল।

জীবন দত্ত সচকিত হয়ে মুহূর্তের জন্য বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে পর মুহূর্তেই মাথা নামিয়েছিল। বুঝতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে নি—এ 'না'-এর আর পরিবর্তন নাই।

জগদ্বন্ধু মশায় পঞ্জিকা খুলে বসলেন, বিদ্যা আরম্ভের দিন করবেন।

আট

শুভকর্মে বিলম্ব করতে নাই এবং কর্মহীন মানুষের মনের মধ্যে মন্দের হাতছানি অহরহ ইশারা জানিয়ে ডাকে। জগদ্বন্ধু মশায় অবিলম্বে ফাল্গুনের শেষেই জীবনের হাতে ব্যাকরণ তুলে দিয়ে পাঠ দিয়েছিলেন। আয়ুর্বেদ—পঞ্চম বেদ। চতুর্বেদের মতোই স্বয়ং প্রজাপতির সৃষ্টি। দেবভাষায় কথিত, দেবভাষায় লিখিত। সুতরাং দেবভাষায় অধিকার লাভ করতে হবে প্রথম। ব্যাকরণ কিন্তু জীবনের খুব ভালো লাগে নাই, নরঃ নরৌ নরাঃ থেকে আগাগোড়া ব্যাকরণ মুখস্থ কি সোজা কথা। তবে ভালো লাগল অন্য দিকটা। সকালবেলা জগদ্বন্ধু মশায় যখন রোগী দেখতে বসতেন তখন ছেলেকে কাছে বসাতেন। তাঁর আয়ুর্বেদ-ভবনের ওষুধ তৈরীর কাজে জীবনকে কিছু কিছু কাজ দিতেন। গাছ-গাছড়া মূল ফুল চেনাতেন। সবচেয়ে বেশী ভালো লেগেছিল তাঁর নাড়ী-পরীক্ষা বিদ্যা। অদ্ভুত বিস্ময়কর এ বিদ্যা! কবিরাজের ঘরের ছেলে, কিশোর বয়সেই অল্পসল্প নাড়ী পরীক্ষা করতে জানতেন। জ্বর হয়েছে কিনা জ্বর ছেড়েছে কিনা, এগুলি তিনি নাড়ী দেখে বলতে পারতেন। জগদ্বন্ধু মশায় যখন তাঁকে নাড়ী পরীক্ষার প্রথম পাঠ দিলেন সেদিন ওই পাঠ শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। আজও মনে পড়ছে।

দেবতাকে প্রণাম করে জগদ্বন্ধু মশায় বলেছিলেন—রোগ নির্ণয়ে সর্বাগ্রে সংগ্রহ করবে বিবরণ, তারপর রোগীর ঘরে ঢুকে গন্ধ অনুভব করবে, তারপর রোগীকে আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করবে। তারপর প্রশ্ন করবে রোগীকে—তার কষ্টের কথা। তাই থেকে পাবে উপসর্গ। এরপর প্রত্যক্ষ পরীক্ষার প্রথম এবং প্রধান পরীক্ষা

নাড়ী-পরীক্ষা। তারপর জিহ্বাগ্র, মূত্র ইত্যাদি। পাকস্থলী মলস্থলী অনুভব করবে। সর্বাগ্রে নাড়ী।

আদৌ সর্বেষু রোগেষু নাড়ী জিহ্বাগ্রে সম্ভবাম।
পরীক্ষাং কারয়েদ্বৈদ্যঃ পশ্চাদ্রোগং চিকিৎসয়েৎ ॥

অতি সুকঠিন এ পরীক্ষা। বিশেষ করে নাড়ী-পরীক্ষা। রোগ হয়েছে—রোগদুষ্ট নাড়ী—সুস্থ নাড়ী এ অবশ্য বোঝা বিশেষ কঠিন নয়। তুমিও দেখ দেখেছি।

হাসলেন জগদ্বন্ধু মশায়। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললেন, কিন্তু যে বোধে রোগনির্ণয়, তার ভোগকাল নির্ণয়, মৃত্যুরোগাক্রান্ত হলে মৃত্যুকাল-নির্ণয় পর্যন্ত করা যায়, সে অতি-সূক্ষ্ম-জ্ঞানসাপেক্ষ; জ্ঞান নয়, বোধ। তার জন্য সর্বাগ্রে চাই ধ্যানযোগ। আমরা যে চোখ বন্ধ করে নাড়ী দেখি—তার কারণ নাড়ীর গতি অনুভবে ধ্যানযোগে মগ্ন হয়ে গতি নির্ণয় করি। পারিপার্শ্বিকের কোনো কিছুতে আকৃষ্ট হয়ে আমার মন যেন যোগ থেকে ভ্রষ্ট না হয়। ইন্দ্রিয়ের অগোচর শক্তি এবং রহস্য,—যা নাকি জগতের নিগূঢ় অন্তরে প্রবহমান প্রকাশমান—সেই শক্তি, সেই রহস্য যেমন ধ্যানযোগে যোগীর অনুভূতির গোচরীভূত হয়, ঠিক তেমনিভাবেই আয়ুর্বেদজ্ঞ যখন রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করেন, তখন দেহের অভ্যন্তরে চক্ষু-অগোচর রোগশক্তির ক্রিয়া, তার রূপ আয়ুর্বেদজ্ঞের ধ্যানযোগে যথাযথভাবে গোচরীভূত হয়। বায়ু, পিত্ত, কফ—এই তিনের যেটি বা যেগুলি কুপিত হয়ে দুষ্ট হয়ে রোগীর রক্তধারায় ক্রিয়া করছে, নাড়ীতে তার গতি, তার বেগ কতখানি—সব একেবারে নির্ভুল অঙ্কফলের মতো নির্ণীত হয়। আর—।

জগদ্বন্ধু মশায়ের কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে উঠল। তিনি বললেন—জ্ঞানযোগে নাড়ীবোধে আর মনঃসংযোগে ধ্যানযোগে যদি অনুভূতিতে সিদ্ধ হতে পার, তবে বুঝতে পারবে রোগের অন্তরালে কেউ আছে বা নেই।

জগদ্বন্ধু মশায় ছেলের মুখের দিকে দৃষ্টি তুলে বলেছিলেন—আমার বাবা বলতেন—এক সন্ন্যাসী তাঁকে বলেছিলেন, তিনি তাঁকে সাপের বিষের ওষুধ দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—সর্পদংশনে বিষক্রিয়ার ওষুধ আছে; কিন্তু যে সাপ কালের আজ্ঞা বহন করে আসে, তার দংশনে মৃত্যুই ধ্রুব; তার ওষুধ হয় না। ঠিক তেমনি রোগের ওষুধও আছে, চিকিৎসা আছে, কিন্তু কালকে আশ্রয় করে যে রোগ আসে, তার ওষুধও নাই, চিকিৎসাও নাই। আমরা বৈদ্য, আমরা চিকিৎসাজীবী—আমাদের চিকিৎসা করতেই হয়, কিন্তু ফল হয় না। এই নাড়ীবোধের দ্বারা বুঝতে পারা যায়—রোগ তার দেহে নির্দিষ্টকাল ভোগ করেই ক্ষান্ত হবে—অথবা রোগের অন্তে কাল তাকে গ্রহণ করবে।

জীবন মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। শুনতে শুনতে সব যেন তাঁর ওলোটপালট হয়ে গিয়েছিল। সত্যই ওলোটপালোট।

সেকালে জীবন দত্তের চোখের সামনে ছিল রঙলাল ডাক্তারের প্রতিষ্ঠা—তাঁর গরদের কোট পেণ্টালুন, সোনার চেন—সাদা ঘোড়া—আরও অনেক কিছু,—অর্থ, সম্পদ, প্রতিষ্ঠা। যার জন্য ডাক্তারি পড়াই ছিল স্বপ্ন। কিন্তু এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, সেদিন শাস্ত্রতত্ত্ব শুনতে শুনতে এ সব তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। এক অপরূপ জ্ঞানলোকের সিংহদ্বারে তাঁকে তাঁর পিতা—তাঁর গুরু এনে দাঁড় করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ওই দরজা খুলে প্রবেশ করতে পারলে অমৃতের সন্ধান পাবে। তিনি যেন তার আভাসও পেয়েছিলেন।

তাঁর বাবা বলতেন, তিনিও মানেন—কোনো শাস্ত্র জানা আর সে শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ, দুটো আলাদা জিনিস। বলতেন—বাবা, আমাদের শাস্ত্রে বলে, গুরুর কৃপা না হলে জ্ঞান হয় না। শিক্ষা হয়তো হয়। মুখস্থ অবশ্য করতে পার। কিন্তু সে শিক্ষা যখন জ্ঞানে পরিণত হয়, তখন পৃথিবীর রূপ পালটে যায়। চক্ষুর অগোচর প্রত্যক্ষ হয়, স্পর্শের অগোচর অনুভূতিতে ধরা দেয়। নাড়ী-পরীক্ষা-বিদ্যা জ্ঞানে পরিণত হলে তুমি জীবনের মধ্যে মৃত্যুকে অনুভব করতে পারবে।

সে কথা সত্য। জীবন দত্ত উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে বলতে পারেন—সত্য, এ সত্য, এ সত্য।

এই সুদীর্ঘকালে কত দেখলেন—পৃথিবীর আয়তন জম্বুদ্বীপ থেকে প্রসারিত হয়ে পশ্চিম গোলার্ধ, পূর্ব গোলার্ধ, উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত হল, প্রাচীনকালে যাকে সত্য বলে মেনেছে মানুষ, তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল, নতুন সত্যকে গ্রহণ করতে হল, কিন্তু এই সত্য মিথ্যা হয় নি। এ চিরসত্য।

একালে পড়েছেন ডুবুরীর কথা। সমুদ্রে নামে—আধুনিক যন্ত্রপাতি-সংযুক্ত পোশাক পরে মুক্তা আহরণ করে, তারা সেখানে গিয়ে সমুদ্রের তল-দেশের বিচিত্র সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়, কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলেও যায় মুক্তা আহরণের কথা। ঠিক তেমনিভাবেই সেদিন জীবন দত্ত সব ভুলে গিয়েছিলেন; প্রতিষ্ঠার কথা, সম্পদের কথা, সম্মানের কথা—সব ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। সেদিন এই প্রসঙ্গে জগদ্বন্ধু মশায় তাকে এক বিচিত্র পুরাণ-কাহিনী শুনিয়েছিলেন। মৃত্যু কে? ব্যাধি কী? মৃত্যুর সঙ্গে ব্যাধির কী সম্পর্ক? সেই সব নিয়ে—সে কাহিনী বিচিত্র।

জগদ্বন্ধু মশায় ভাগবত-কথকের মতো দক্ষ কথক ছিলেন। তাঁর নিপুণ গভীর বাগ্‌বিন্যাসে জীবন দত্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

বলেছিলেন—অবশ্য রোগমাত্রেই মৃত্যু-স্পর্শ বহন করে। মহাভারতে আছে,

ভগবান প্রজাপতি মনের আনন্দে সৃষ্টি করে চলেছেন, সৃষ্টির পর সৃষ্টি। বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর। তখন পৃথিবীতে শুধু সৃষ্টিই আছে, লয়, বা মৃত্যু নাই। এমন সময় তাঁর কানে এল যেন কার ক্ষীণ কাতর কণ্ঠস্বর। তিনি উৎকর্ণ হলেন। এবার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করল যেন অস্বাচ্ছন্দ্যকর কোনো গন্ধ। এবার সৃষ্টির দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করলেন। দেখে চকিত হয়ে উঠলেন। এ কী? তাঁর সৃষ্টির একটি বৃহৎ অংশ জীর্ণ, মলিন, স্থবির, কর্কশ হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর বুক বহু জীবে পরিব্যাপ্ত। স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খল অথচ উচ্ছ্বাসবিহীন—স্তিমিত। বিপুলভারে ক্লিষ্ট পৃথিবী করছেন কাতর আর্তনাদ। আর ওই যে অস্বাচ্ছন্দ্যকর গন্ধ? ও গন্ধের সৃষ্টি হয়েছে ওই জীর্ণ সৃষ্টির জরাগ্রস্ত দেহ থেকে।

উপায় চিন্তায় নিমগ্ন হলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। ললাটে চিন্তার কুঞ্চনরেখা দেখা দিল। অকস্মাৎ এই চিন্তামগ্নতার মধ্যে তাঁর মুখমণ্ডল অকারণে কুটিল হয়ে উঠল। ভ্রূকুটি জেগে উঠল প্রসন্ন ললাটে। হাস্যস্মিত মুখে অপ্রসন্নতা ফুটে উঠল। প্রসন্ন নীল আকাশে যেন মেঘ উঠে এল দিগন্ত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অঙ্গ থেকে ছায়ার মতো কী যেন বেরিয়ে এল; ক্রমে সে ছায়া কায়া গ্রহণ করল—একটি নারীমূর্তি তাঁর সামনে দাঁড়াল কৃতাঞ্জলি হয়ে। পিঙ্গলকেশা, পিঙ্গলনেত্রা, পিঙ্গলবর্ণা; গলদেশে ও মণিবন্ধে পদ্মবীজের ভূষণ, অঙ্গে গৈরিক কাষায়; সেই নারীমূর্তি প্রণাম করে ভগবানকে প্রশ্ন করলেন—পিতা, আমি কে? কী আমার কর্ম? কী হেতু আমাকে আপনি সৃষ্টি করলেন?

ভগবান প্রজাপতি বললেন—তুমি আমার কন্যা। তুমি মৃত্যু। সৃষ্টিতে সংহারকর্মের জন্য তোমার সৃষ্টি হয়েছে। সেই তোমার কর্ম।

চমকে উঠলেন মৃত্যু—অর্থাৎ সেই নারীমূর্তি; আর্তস্বরে বললেন—পিতা হয়ে তুমি এ কী কুটিল কঠিন কর্মে আমাকে নিযুক্ত করছ? এ কি নারীর কর্ম? আমার নারী-হৃদয়—নারী-ধর্ম এ সহ্য করবে কী করে?

ভগবান হেসে বললেন—কী করব? উপায় নাই। সৃষ্টি যখন করেছি, তখন ওই কর্মই করতে হবে।

মৃত্যু বললেন—পারব না।

—পারতে হবে।

মৃত্যু তপস্যা শুরু করলেন। কঠোর তপস্যা করলেন। ভগবান এলেন—বললেন—বর চাও।

মৃত্যু বর চাইলেন—এই কঠিন নিষ্ঠুর কর্ম থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন।

ফিরে গেলেন ভগবান—না।

আবার তপস্যা করলেন মৃত্যু, এবারের তপস্যা পূর্বের তপস্যার চেয়েও কঠোর।

আবার এলেন প্রজাপতি। আবার ওই বর চাইলেন মৃত্যু—এই নিষ্ঠুরতম কর্ম থেকে কন্যাকে অব্যাহতি দিন পিতা।

প্রজাপতি নীরবে ধীরভাবে ঘাড় নাড়লেন, জানালেন—না। সে হয় না।

এবং মুহূর্তে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কন্যারূপিণী মৃত্যু দীর্ঘক্ষণ আকাশমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আবার আসন গ্রহণ করলেন।

তৃতীয়বার তপস্যামগ্ন হলেন মৃত্যু। এবার যে তপস্যা করলেন, তার চেয়ে কঠোরতর তপস্যা কেউ কখনও করে নি। আবার ভগবান ব্রহ্মাকে আসতে হল। আবার মৃত্যু ওই বর চাইলেন। বর প্রার্থনা করতে গিয়ে এবার তাঁর ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল। চোখ দিয়ে অনর্গল ধারার জল গড়িয়ে এল। ব্রহ্মা ব্যস্ত হয়ে নিজে অঞ্জলি বদ্ধ করে সেই প্রসারিত অঞ্জলিতে অশ্রুবিন্দুগুলি ধরলেন। বললেন—মা, তোমার চোখের জল এ সৃষ্টিতে পড়বামাত্র এর উত্তাপে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে।

দেখতে দেখতে সেই অশ্রুবিন্দুগুলি হতে এক-একটি কুটিল মূর্তির আবির্ভাব হল। ভগবান বললেন—এরা হল রোগ; এরা তোমারই সৃষ্টি; এরাই তোমার সহচর।

মৃত্যু বললেন—কিন্তু আমি নারী হয়ে পত্নীর পার্শ্ব থেকে পতিকে গ্রহণ করব কী করে? মায়ের বুক থেকে তার বত্রিশনাড়ী-ছেঁড়া সন্তানকে গ্রহণ করব, এই নিষ্ঠুর কর্মের পাপ—

বাধা দিয়ে ভগবান বললেন—সর্ব পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে তুমি। পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না। তাছাড়া তাদের কর্মফল তোমাকে আহ্বান করবে এই রোগেদের মাধ্যমে। অনাচার, অমিতাচার ব্যভিচারের ফলে রোগাক্রান্ত হবে মানুষ। তুমি তাদের দেবে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, জ্বালা থেকে শান্তি, পুরাতন জন্ম থেকে নব জন্মান্তর।

—কিন্তু—। মৃত্যু আকুল হয়ে বললেন—শোকাতুরা স্ত্রী পুত্র মাতাপিতা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, বুক চাপড়াবে, মাথা কুটবে, সে দৃশ্য আমি দেখব কী করে?

ভগবান বললেন—তুমি অন্ধ হলে, দৃষ্টি তোমার বিলুপ্ত হল। দেখতে তোমাকে হবে না।

মৃত্যু বললেন—তার ক্রন্দন? নারী-কণ্ঠের আর্তবিলাপ কি—

বাধা দিয়ে ভগবান বললেন—তুমি বধির হলে। কোনো ধ্বনি তোমার কানে যাবে না।

জগবন্ধু মশায় বলেছিলেন—মৃত্যু অন্ধ, মৃত্যু বধির। রোগই তার সন্তানের মতো

নিয়ত তার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে নিয়ম-কাল। যার কাল পূর্ণ হয়, তাকে যেতে হয়। অকালমৃত্যুও আছে। নিজের পাপে মানুষ নিজের আয়ুক্ষয় করে কালকে অকালে আহ্বান করে। আমাদের যে পঞ্চম বেদ আয়ুর্বেদ—তার শক্তি হল, কাল যেখানে সহায়ক নয় রোগের, সেখানে রোগকে প্রতিহত করা। রোগ এমন ক্ষেত্রে ফিরে যায়, তার সঙ্গে অন্ধ-বধির মৃত্যুও ফিরে যায়। কিন্তু কাল যেখানে পূর্ণ হয়েছে, সেখানে আক্রমণের বেগে নাড়ীতে যে স্পন্দন-বৈলক্ষণ্য দেখা দেয় তা থেকে বুঝতে পারা যায়, মৃত্যু এখানে কালের পোষকতায় অগ্রসর হচ্ছে। এমন কি কতক্ষণ, কয়প্রহর, কয় দিন, কয় সপ্তাহ, পক্ষ বা মাসে সে গ্রহণ-কর্ম শেষ করবে, তাও বলা যায়—এই নাড়ী পরীক্ষা করে।

এই মুহূর্তটিতে সেদিন ঘরের কোণে একটা টিকটিকি টক টক শব্দে ডেকে উঠেছিল। মাটিতে আঙুলের টোকা দিয়ে জগদ্বন্ধু মশায় টিকটিকিটার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলেন—ওই দেখো।

জীবন প্রথমটা ভেবেছিল—বাবা বলেছেন—টিকটিকি তাঁর কথাকে সত্য বলে সমর্থন করছে। কিন্তু না। সেদিকে তাকিয়ে জীবন দেখেছিলেন, ডাক দিয়েই টিকটিকিটা লাফিয়ে ধরেছে একটা ফড়িংকে। ফড়িংটা ঝটপট করছে।

মশায় বলেছিলেন—অনুরূপ অবস্থায়—মানে ধরো যদি কোনো মানুষকে কুমির ধরেছে কি কোনো দুটো কঠিন জিনিসের মধ্যে চাপা পড়ছে—পিষ্ট হচ্ছে, এমন অবস্থায় তার নাড়ী যদি পরীক্ষা করা যায় তবে নাড়ীর মধ্যে জীবনের আর্তনাদ অনুভব করতে পারবে। একেবারে প্রত্যক্ষ করতে পারবে, মনে হবে চোখে দেখছ।

নাড়ীবিজ্ঞানে নিদান হাঁকার প্রথম অভিজ্ঞতার গল্প বলেছিলেন জগদ্বন্ধু মশায়। বলেছিলেন—গিরিশবাবুর মা,—এই নবগ্রামের গিরিশবাবু, তাঁর মা—বর্ষার সময় বাঁধানো ঘাটের চাতালে পা পিছলে পড়ে গেলেন। পড়েই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। বাবা তখন দেহ রেখেছেন—আমার বয়স তখন কম। গেলাম। নাড়ী দেখে শঙ্কিত হলাম। কিন্তু সঠিক কিছু বুঝতে পারলাম না। দেখলাম, আঘাতের ফলে যেমন নাড়ী স্পন্দনহীন হয়, তাই হয়েছে। সে ক্ষেত্রে নাড়ী অসাধ্য নয়। তবু কেমন যেন সন্দেহ হল। বললাম প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে মৃত্যু হতেও পারে—না হতেও পারে। আপনারা আরও বিচক্ষণ কবিরাজ এনে দেখান। পারুলিয়ার বৃদ্ধ

কবিরাজ মশায় এলেন সন্ধ্যায়। তিনি দেখলেন। বললেন—এ অবস্থায় তিনদিন উত্তীর্ণ হলে এ যাত্রা রক্ষা পেলেন। তবে—

আবার নাড়ী দেখলেন, বাহুমূলে কণ্ঠে, নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন—রক্ষা পেলেও এক বৎসর মধ্যেই ওঁর দেহান্ত ঘটবে এবং দেহান্তের পূর্বে যেখানে আঘাত পেয়েছেন আজ, সেইখানে তীব্র বেদনা অনুভব করবেন। যেন নূতন করে সেদিন আঘাতটা পেলেন—এমনি মনে হবে।

গিরিশবাবু দ্বিতীয় দিনেই মাকে পালকি করে গঙ্গাতীরে নিয়ে গেলেন। সকলেই সন্দেহ করলেন—তিনদিনের মধ্যেই দেহান্ত ঘটবে। গঙ্গাতীরে দেহ-রক্ষায় মায়ের একান্ত বাসনা ছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে চতুর্থদিনের প্রভাতে বৃদ্ধার জ্ঞান হল। ধীরে ধীরে সেরেও উঠলেন। দেহরক্ষার সঙ্কল্প নিয়ে গঙ্গাতীরে গিয়ে ফেরার নিয়ম নয়। গঙ্গাতীরেই থাকলেন তিনি। ঠিক বৎসরের শেষে—এক সপ্তাহ আগে, হঠাৎ একদিন তিনি যন্ত্রণা অনুভব করলেন আঘাতের স্থানে। যন্ত্রণা ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। চব্বিশ ঘণ্টা সেই যন্ত্রণা ভোগ করে তিনি অচেতন হয়ে গেলেন। তারপর আর বারো ঘণ্টা পরে ঘটল তাঁর দেহান্ত।

এ আমার প্রত্যক্ষ প্রথম অভিজ্ঞতা। তারপর নিজেই অনেক দেখলাম। তুমিও দেখবে। এ ঠিক বুঝিয়ে দেবার নয়, ব্যাখ্যা করে ফল নাই। উপলব্ধি করবার শক্তি ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বাবা। তোমার যদি সে ভাগ্য থাকে, সে শক্তি যদি অর্জন করতে পার, তবে তুমিও বুঝতে পারবে।

নয়

হঠাৎ আজ নিজের নাড়ী ধরলেন জীবন মশায়, কত দেরি? কত দূরে সে? দীর্ঘক্ষণ নাড়ী ধরে বসে রইলেন। কই, কিছুই তো অনুভব করতে পারছেন না। কোথায় গেল তাঁর অনুভবশক্তি? ওই তরুণ ডাক্তারটির আঘাতে তিনি কি অন্তরে অন্তরে অসাড় হয়ে গেলেন?

—কী, হচ্ছে কী? নিজের নাড়ী দেখছ? প্রশ্ন করলেন আতর-বউ।

জীবন ডাক্তার ছেড়ে দিলেন নিজের নাড়ী। আতর-বউ এসেছে। আসবারই কথা। সারাটা জীবন ভাত খাওয়া শেষ করে, লোকজনকে খাইয়ে আতর-বউ পাখা হাতে এসে তাঁর বিছানার পাশে বসে। পান-দোক্তা খায়, বাতাস করে।

কর্পূর-দেওয়া জলের গ্লাসটি শিয়রে রেখে দেয়। হাতে সেবা করে, মুখে অনর্গল মর্মচ্ছেদী অথচ মিষ্ট কথা বলে যায়। তাঁকে উদ্দেশ করে বড় বলে না, নিজের কপালকে উদ্দেশ করে। আইনের প্যাঁচে তাকে ধরা যায় না। প্রতিবাদ করলেই আতর-বউ বলে—তোমাকে তো কোনো কথা আমি বলি নি। আমি বলছি আমার কপালকে। তুমি ফোঁস করে উঠছ কেন?

অনেককাল আগে জীবন ডাক্তার একবার ধৈর্য হারিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তোমার কপালে যে ভগবান আমাকে বেঁধে অধিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। আঘাত করলে আমাকেই লাগে যে!

আতর-বউ ঘাড় বেঁকিয়ে তির্যক দৃষ্টিপাত করে নিস্পৃহ কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন—তোমাকে লাগে?

—হ্যাঁ। বুঝতে পার না?

আতর-বউ একটা পাথরের ফল নিয়ে কপালে ঘা মেরে কপালটা রক্তাক্ত করে তুলে বলেছিলেন—কই? কই? কই?

এরপর থেকে জীবন ডাক্তার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলেই চোখ বুঁজে পড়ে থাকেন ঘুমের ভান করে। আজ অতীত কথা স্মরণ করতে গিয়ে এমনই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে পায়ের শব্দ শুনতে পান নাই।

আতর-বউ আবার প্রশ্ন করলেন—শরীর খারাপ?

জীবন দত্ত চেষ্টা করলেন মিথ্যা বলতে। বলতে চাইলেন—'শরীরটা যেন ভালো বোধ হচ্ছে না।' কিন্তু বললেই এই আতর-বউ আর-এক আতর-বউ হয়ে যাবে। শিশুর মতো অসহায় করে তুলে সেবা যত্নে জীবন ডাক্তারকে অভিষিক্ত করে দেবে।

কতবার জীবন দত্তের মনে হয়েছে এই আতর-বউই তাঁর জীবনের ছদ্মবেশিনী মৃত্যু। তাঁর বাবা বলতেন, তিনিও তাঁর সুদীর্ঘ চিকিৎসক জীবনে বুঝেছেন, উপলব্ধি করেছেন, মৃত্যু অবগুণ্ঠনময়ী। দূর থেকে তাকে চেনা যায় না। তাকে দেখে ভয় হয়, কারণ সে আসে জ্বালাযন্ত্রণাময়ী ব্যাধির পশ্চাদনুসরণ করে—কালবৈশাখীর ঝড়ের অনুসারিণী বর্ষণ-ধারার মতো। প্রচণ্ড বিক্ষোভে ব্যাধির জ্বালায়, যন্ত্রণায় জীবনের উপর তোলে বিক্ষোভ, মৃত্যু আসে বর্ষাধারার মতো, সকল জ্বালা-যন্ত্রণার বিক্ষোভ জুড়িয়ে দিয়ে, প্রশান্ত স্নিগ্ধ করে দেয়। আতর-বউ ঠিক তাই। দূরে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ভয়ঙ্করী, তার অশ্রুরুদ্ধ তপ্ত কথাগুলি ব্যাধির জ্বালার মতোই যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু—।

না। আতর-বউ তাঁর জীবনে ব্যাধি, শুধুই ব্যাধি। মৃত্যু হল সেই মঞ্জরী।

জীবনে তো আয়ু থাকতে কেউ মৃত্যুকে পায় না। তাই জীবন দত্ত মঞ্জরীকে পাননি নি। মধ্যে মধ্যে মৃত্যু ছলনা করে যায় মানুষকে, আসতে-আসতে ফিরে যায়, ধরা দিতে-দিতে দেয় না। রেখে যায় আঘাতের চিহ্ন; অনেক ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী ব্যাধি রেখে যায়। মঞ্জরীও তাই করেছে। ছলনা করে চলে গেছে, রেখে গেছে ব্যাধিরূপিণী আতর-বউকে।

নীরবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জীবন ডাক্তার। আতর-বউয়ের প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না। আতর-বউ কিন্তু এ নীরবতায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সরস মনে থাকলে জীবন ডাক্তার বলেন—আতর-বউ রাগলে টেম্পারেচার ওঠে ম্যালেরিয়ার জ্বরের মতো। দেখতে দেখতে একশো পাঁচ।

আতর-বউ তাঁর জীবনে ম্যালেরিয়াই বটে; পোষাই আছে; এতটুকু অনিয়ম ব্যতিক্রম হলেই প্রকট হয়ে উঠবে। অনিয়ম না হলেও অমাবস্যা পূর্ণিমাতে দেখা দেওয়ার মতো মধ্যে মধ্যে জর্জর জ্বরোত্তাপ ফুটবেই।

আজ কিন্তু শশী হতচ্ছাড়া এসে আতর-বউকে স্বরূপে প্রকট করে দিয়ে গিয়েছে। আতর-বউ শশীকে স্নেহও করেন। অনেকদিন শশী যে এ বাড়িতে কাটিয়েছে; আতর-বউয়ের ফাইফরমাস শুনত, তাঁদের ছেলে-মেয়েদের কোলে-পিঠে করত; এ বাড়ি ছেড়েও শশী সম্পর্ক ছাড়ে নাই, মধ্যে মধ্যে আসে। শশীকে ডাক্তার বলেন—ওটা হল ম্যালেরিয়ার পিলে। ওটা কামড়ে উঠলেই ম্যালেরিয়া জাগবেন।

আতর-বউ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, বললেন—বলি হাঁগা, কথা বললেও কি তোমার নিদান বুঝবার পক্ষে ব্যাঘাত হবে?

জীবন ডাক্তার এবার সোজাসুজি বললেন—শশী তোমাকে কী বলে গিয়েছে বলো তো?

—শশী? শশী কী বলে যাবে? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো! সব তাতেই শশী। কার না শুনতে বাকি আছে যে, তুমি কামারবুড়ীর নিদান হেঁকেছ? কে না এ চাকলায় শুনেছে যে, সরকারী ডাক্তার তোমাকে হাতুড়ে বলে প্রকাশ্যে অপমান করেছে! নিদান হাঁকতে বারণ করেছে। বলেছে দরখাস্ত করবে। মকদ্দমা করবে। শশী বলবার মধ্যে বলেছে—পায়ের হাড় ভেঙেছে—এতে উনি নিদানটা না হাঁকলেই পারতেন। নিদানের রুগী আছে বই কি। সেখানে পাশ-করা ডাক্তাররা থৈ পাবে না। এই তো তারই হাতে রুগী রয়েছে—ডাক্তাররা কেউ কিছু করতে পারলে না। তোমাকে ডাকতে এসেছিল শশী। শশীর ওপর দোষ কেন?

বৃদ্ধ জীবন ডাক্তার চুপ করে রইলেন। কী বলবেন? আমল পালটেছে, চিকিৎসা শাস্ত্র এগিয়ে গিয়েছে। তিনি পিছিয়ে পড়েছেন। নইলে —আগের কালের

চিকিৎসা অনুযায়ী তাঁর নিদান ভুল নয়, বুড়ীর যাওয়ার কথা, নিশ্চয় যাওয়ার কথা এই আঘাতের ফলে। তবে এ কালের সার্জারির উন্নতি এক্সরে আবিষ্কার এ সব তাঁর অজানা নয়; কিন্তু সে চিকিৎসা ব্যয়সাধ্য।

তাই সে হিসেব তিনি করেন নি। আরও একটা কথা,—বুড়ীর এই সময় যাওয়াটা ছিল অসুখের যাওয়া, সমারোহের যাওয়া। স্বেচ্ছায় যাওয়াই উচিত। তাঁর বাবা বলতেন—।

তাঁর বাবার কথাগুলি স্মরণ করবার অবকাশ পেলেন না তিনি। বাইরে থেকে কেউ তাঁকে ডাকলে—ডাক্তারবাবু!

চমকে উঠলেন ডাক্তার। আতর-বউও চকিত হয়ে উঠলেন। এ যে নবগ্রামের কিশোরের গলা। দুজনের মুখই মুহূর্তে প্রসন্ন হয়ে উঠল। কিশোর! কিশোর আসে যেন বর্ষার দুর্যোগরাত্রির অবসান করে প্রসন্ন শরৎপ্রভাতের মতো। বয়সে প্রৌঢ় হয়েও কিশোর চিরদিন কিশোরই থেকে গেল! আজন্মকুমার কিশোর উনিশশো সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত ছিল রাজনৈতিক এবং সমাজসেবক কর্মী। এখন সে সব ছেড়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে বেড়ায়, তবে অভ্যাস বশে দু-চারটে পরের উপকার না করে পারে না, না করলে লোকেও ছাড়ে না। কিশোর ছেলেটি ডাক্তারের জীবনের একটা অধ্যায়। তাঁর জীবনে প্রকাণ্ড বড় একটি স্থান অধিকার করে আছে।

—ডাক্তারবাবু! আবার ডাকলে কিশোর।

—সাড়া দাও, আসতে বলো! প্রসন্ন স্বরেই তিরস্কার করলেন আতর-বউ। এবং স্বামীর অপেক্ষা না করেই তিনি নিচে নেমে গেলেন,—ডাকলেন—এসো বাবা এসো।

মোটা খদ্দরের কাপড় এবং হাত-কাটা খাটো পাঞ্জাবির উপর একখানা চাদর—এই হল কিশোরের চিরকালের পোশাক। প্রসন্ন প্রশান্ত সুশ্রী মানুষ। যে পোশাকই হোক কিশোরকে মানায় বড় সুন্দর। কর্মঠ সরল দেহ, সবল প্রদীপ্ত মন; মানুষটি ঘরে ঢুকলেই ঘরখানি যেন প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

কিশোর এসে মাটির উপরেই বসে পড়ল এবং বিনা ভূমিকাতেই বললে—একবার বেরুতে হবে ডাক্তারবাবু।

আতর-বউ একখানা আসন পেতে দিলেন, বললেন—উঠে বোসো কিশোর। মাটিতে কি বসে!

ডাক্তার হেসে বললেন—মহারাজ অশোক মাটিতে বসে রাজা হয়েছিলেন। কিশোর মাটিতে বসে একদিন রাজা না হোক মিনিস্টার হবে। কেমন কিশোর?

কিশোর হাত জোড় করে বললে—তার চেয়ে এই বয়সে বিয়ে করতে রাজী আছি ডাক্তারবাবু। এমন কি শনির দশায় পড়তেও রাজী আছি। কিন্তু আপনাকে একবার তাড়াতাড়ি উঠতে হবে।—শেষের কটি কথায় কিশোরের কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল—জানিয়ে দিলে সরস পরিহাসের মানসিকতা তার এখন নাই।

—কি ব্যাপার? কোথায় যেতে হবে?

—যেতে হবে আমাদের গ্রামেই। রতনবাবু হেডমাস্টার মশায়ের ছেলে বিপিনের অসুখ—একবার যেতে হবে।

ডাক্তার বিস্মিত হলেন। বৃদ্ধ রতনবাবু এককালের নামকরা হেডমাস্টার, দুর্লভ দৃঢ় চরিত্রের মানুষ; তাঁর ছেলে বিপিনও বাপের উপযুক্ত সন্তান, সৎপ্রকৃতির মানুষ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। বিপিন কয়েক বৎসর রক্তের চাপের আধিক্যে অসুস্থ রয়েছে। সম্প্রতি অসুখ বৃদ্ধি পাওয়ায় কলকাতায় গিয়েছিল চিকিৎসার জন্য। সেখান থেকে ওষুধপত্র নিয়ে দেশে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে। বিশ্রামই এ রোগের চিকিৎসা। নবগ্রামের ডাক্তার হরেন চাটুজ্জে কলকাতায় গিয়েছিলেন এই উপলক্ষ্যে। সেখানকার বড় ডাক্তারের কাছে চিকিৎসাবিধি বুঝে এসেছে এবং সেইমত চিকিৎসা সেই করছে। এখন হঠাৎ কী হল যে, কিশোর তাঁকে ডাকতে এসেছে?

কিশোর বললে—চলুন, পথে চলতে চলতে বলব।

কিশোর বলে যাচ্ছিল রোগের কথা। পথ চলতে চলতে কথা হচ্ছিল।

কলকাতায় বড় ডাক্তার রক্তের চাপ কমাবার জন্য রক্ত মোক্ষণ করেছিল। মূত্রাশয়ে দোষ পাওয়া গেছে। এখন গ্লুকোস ইন্‌জেকশনই হল প্রধান চিকিৎসা। এর সঙ্গে অবশ্যই আরও অনেক ওষুধ আছে। এ ব্যবস্থায় কলকাতায় ভালোই ছিলেন বিপিনবাবু। ভালো থাকতেই দেশে এসেছেন, হরেন ডাক্তার ভরসা দিয়েছিল; বড় ডাক্তারও সম্মতি দিয়েছিলেন। এখন দেশে ফিরে হঠাৎ রোগটি যেন বেঁকে দাঁড়িয়েছে। বিচিত্র এক উপসর্গ দেখা দিয়েছে—হিক্কা। আজ পাঁচ দিন হয়ে গেল হিক্কা চলছে সমানভাবে। হাসপাতালের ডাক্তার প্রদ্যোত বোসকেও ডাকা হয়েছিল, কিন্তু তাদের ওষুধে কোনো ফল হয় নাই। তবে একমাত্র ভরসার কথা এই যে, নাড়ীর গতি বা হৃদ্‌যন্ত্রের গতির উপর এখন কোনো প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয় নাই। কিন্তু দিতে কতক্ষণ? কাল কিশোর হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়েছিল। তাতেও কোনো ফল হয় নাই। তাই আজ কিশোর জীবন-মশায়কে ডাকতে এসেছে।

প্রদ্যোত ডাক্তারের নাম শুনে জীবন ডাক্তার সচেতন হয়ে উঠলেন, বললেন, হাসপাতালের ডাক্তারটি কি এখনও দেখছে? সেও কি থাকবে না কি? তা ছাড়া হরেন? হরেনের মতামত নেওয়া হয়েছে তো?

কিশোর তাঁর দিকে ফিরে তাকালে, বললে—প্রদ্যোত ডাক্তারের কথা আমি শুনেছি ডাক্তারবাবু। প্রদ্যোত ডাক্তার এমনিতে তো লোক খারাপ নয়, বরং ভালো লোক বলেই আমার ধারণা। হঠাৎ এমন অভদ্র—

—ভদ্রতা-অভদ্রতার কথা নয় কিশোর! এ হল সত্য-মিথ্যার কথা। প্রদ্যোত ডাক্তারের যদি এই বিশ্বাসই হয় যে নাড়ী পরীক্ষা করে আমি যে ধরনের চিকিৎসা করি সে ভুল, সে মিথ্যা, তা হলে তিনি অবশ্যই আমাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতে পারেন। সে কথা এখন থাক। এখন আমি যে কথাটা জানতে চাচ্ছি তার উত্তর দাও। জীবন ডাক্তার পথের মধ্যেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

কিশোর একটু বিস্মিত হয়েই ডাক্তারের দিকে ফিরে তাকালে। জীবন ডাক্তার বললেন—তুমি আমাকে খুলে বলো কিশোর। তুমি কি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে সম্মতি নিয়ে আমার কাছে এসেছ? না, নিজেই এসেছ? তোমার তো এ ব্যাধি আছে। টাকাওয়ালা লোকের টাকব্যাধি যেমন শোভন, তোমার পক্ষে এ কর্মটি তেমনি শোভনই বটে। পরের উপকার যারা করে, পরের ঘরের বিধি-ব্যবস্থা উলটে দিতে তাদের অধিকারও থাকে।

কিশোর এবার একটু হেসেই বললে—এই শেষ বয়সে আপনি অভিমান করলেন ডাক্তারবাবু! এবং এতখানি অভিমান?

—তা হয়েছে কিশোর। এবং সে অভিমান ছাড়তে পারব না। তুমি যখন যেখানে ডেকেছ—আমি গিয়েছি। আজ কিন্তু যেতে পারব না তোমার ডাকে।

—একা আমি ডাকি নি ডাক্তারবাবু। রোগীর বাপ আপনাকে আহ্বান জানিয়েছেন, রতনবাবু আপনাকে ডেকেছেন। বলেছেন জীবন ডাক্তার নাড়ীটা দেখলে আমি নিশ্চিন্ত হই। অন্তত অনিশ্চিত মনের সংঘাত থেকে নিষ্কৃতি পাই। সে ঠিক বলে দেবে।

অর্থাৎ মৃত্যুর কথা!

জীবন ডাক্তার একটু বিচলিত হলেন। বৃদ্ধ রতন তাঁরই সমবয়সী। মাত্র দু-বছরের ছোট। তাঁর থেকে এক ক্লাস নিচে পড়ত। যে বছর জীবন ডাক্তার কাঁদীর ইস্কুল থেকে ভূপী বোসের নাক ভেঙে দিয়ে পালিয়ে এলেন সেই বছরই রতন এম. ই. পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে ওখানে গিয়ে ভরতি হল। রতন এনট্রান্সেও বৃত্তি পেয়েছিল। চিরকালই ধীর প্রকৃতির মানুষ রতন। রতন এই কথা বলেছে?

বলেছে—জীবন নাড়ী দেখলে আমি চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই! যা হবে সে ঠিক বলে দেবে।

বলবে বই কি! জীবন ডাক্তার যে নিজের একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর কথা তিনমাস পূর্বে থেকে নাড়ী দেখে জেনেছিলেন—শুধু জেনেই ক্ষান্ত হন নি, ঘোষণা করে জানিয়েছিলেন সে কথা। সুতরাং বলবে বই কি রতন।

*　　　*　　　*

রতনবাবু মৃদুস্বরেই প্রশ্ন করলেন বটে কিন্তু মৃদু হলেও কণ্ঠস্বর কাঁপল না, প্রশ্ন করলেন—কেমন দেখলে বলো? কী দেখলে?

হাত ধুয়ে জীবন ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—হিক্কার জন্যে ভেবো না, ও দু-তিন দিনেই বন্ধ হয়ে যাবে।

অশীতিপর বৃদ্ধ হলেও রতনবাবু খাড়া সোজা মানুষ। এতটুকু ন্যুব্জ হন নি। অবশ্য মাথায় তিনি খাটো এবং দেহেও তিনি ভারী নন। তবুও খানিকটা ঝুঁকে পড়ার কথা, কিন্তু তা তিনি পড়েন নি। চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ হলেও স্থির এবং শুষ্ক, সহজে জল তাঁর চোখে আসে না। সেই যৌবনে তিরিশ বৎসর বয়সে পত্নী-বিয়োগের পর থেকে স্বপাকে নিরামিষ খেয়ে ছেলেকে মানুষ করেছেন। আদর্শবাদী নীতিপরায়ণ মানুষ রতনবাবু। রতনবাবু ঈষৎ হেসে বললেন—আমার প্রশ্ন তো তা নয়। আমি যা জিজ্ঞাসা করেছি সে তো তুমি বুঝেছ জীবন!

—বুঝেছি। কিন্তু—

—তোমার কাছে তো 'কিন্তু' প্রত্যাশা করি না। তুমি স্পষ্ট বল বলেই তোমার জন্য আমার এত আগ্রহ।

ডাক্তার মাটির দিকে চেয়ে রইলেন।

—জীবন? মৃদুস্বরে ডাকলেন রতনবাবু।

—ভাবছি!

—আমার জন্যে? রতনবাবু বললেন—আমার জন্য ভেবো না। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যু—তিনিই তো পরমানন্দ।

চমকে উঠলেন ডাক্তার! তাঁর সমস্ত অতীত কালের স্মৃতি যেন মুহূর্তে আলোড়িত হয়ে উঠল। তাঁর নাড়ী-পরীক্ষা বিদ্যা শিক্ষার গুরু এই কথাটি বলতেন। জীবন আর মৃত্যু? যস্য ছায়ামৃত্যুং যস্য মৃত্যু—তিনিই আনন্দস্বরূপ!

বাবা জগৎমশায় নস্য নিয়েছিলেন এই সময়,—সে-কথা জীবন ডাক্তারের আজও মনে আছে। তার ফলেই হোক আর হৃদয়াবেগের জন্যই হোক তাঁর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠেছিল। ভারী গলার কথাগুলির প্রতিধ্বনিতে জীবন ডাক্তারের বুকের

ভিতরটা যেন বর্ষার মেঘের ডাকে পৃথিবীর মতো এক পুলকিত অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন—বাবা, এতে আমাদের দুই তত্ত্বই হয়, ইহলোক পরলোক দুই। পরমানন্দ স্বরূপ যিনি তিনিই আমার মাধব। আমাদের ইষ্টদেবতা।

ধ্যানযোগে সিদ্ধ চিকিৎসক যখন গভীর একাগ্রতায় তন্ময় হয়ে নাড়ী পরীক্ষা করেন—তখন জীবন এবং মৃত্যুর যুদ্ধ আর বিয়োগান্ত বলে মনে হয় না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চিরন্তন লীলা বলে মনে হয়, তখনই অনায়াসেই বলা যায়, যে সূর্যাস্তের কাল সমাগত। সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আনন্দ এক, পৃথক নয়।

রতনবাবু অপেক্ষা করে তাঁরই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—এবার তিনি তাঁকে ডাকলেন—জীবন!

জীবন ডাক্তার সচেতন হয়ে উঠলেন, রতনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে একবার যেন কেঁপে উঠলেন, বললেন—তেমন কোনো লক্ষণ আমি আজ পাই নি রতন। তবে—

—কী তবে? বলো! দ্বিধা কোরো না। হাসলেন রতনবাবু; বিষণ্ণ এবং করুণ সে হাসি। এ হাসির সামনে দাঁড়ানো বড় কঠিন। অন্তত মুখ তুলে চোখে চোখ রেখে মিথ্যা সান্ত্বনা দেওয়া যায় না। মাথা হেঁট করে বলতে হয়।

জীবন ডাক্তার তাঁকে মিথ্যা বলতে চান নি। তিনি যা-সত্য তাই বলতে যাচ্ছিলেন, তাই বোধ করি মাথা হেঁট করলেন না তিনি। বললেন—এ রোগটি হঠাৎ মারাত্মক হয়ে ওঠে; রোগের বৃদ্ধি ধীরে ধীরে হয় না, এবং বৃদ্ধির হেতুও হিসাবের বাইরে। যে-কোনো একটা আঘাতের ছুতো, দৈহিক হোক মানসিক হোক—হলেই চরম সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

—সে আমি জানি।

—তা হলে আমার বলবার তো কিছু নাই রতন। রোগ এখন ষোলোআনা দাঁড়িয়েছে। তবুও এমন কোনো লক্ষণ আমি পাই নি যাতে বলতে পারি সাধ্যাতীত। দুঃসাধ্য—কিন্তু অসাধ্য আমি বলব না। তবে এ রোগের যা প্রকৃতি তাতে যে-কোনো মুহূর্তে অসাধ্য হয়ে উঠতে পারে। ভগবানের দয়া, সে দয়া তোমরা পিতাপুত্রে পাবার হকদার।

—হকদার! এ দয়ার উপর কি কারও হক আছে জীবন?

জীবন ডাক্তার এবার চুপ করে রইলেন। এ কথার সত্যই উত্তর নাই।

রতনবাবু বললেন—তুমি তা হলে হিক্কাটা থামিয়ে দাও।

—আমার ওষুধে ডাক্তারদের আপত্তি হবে না তো? অ্যালোপ্যাথি মতে যা

ওষুধ—সে বিষয়ে ওঁদের চেয়ে আমি তো অনভিজ্ঞ নই। আমি দেব—আমাদের কৌলিক চিকিৎসাপদ্ধতি অনুযায়ী ওষুধ।

হরেন ডাক্তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে—আমাদের ওষুধে আপনার আপত্তি হবে না তো? প্রয়োজন হলে আমরা একটা-দুটো ইনজেকশন দেব, গ্লুকোজ দেব, বিশেষ করে ঘুমের জন্য ইনজেকশন না দিলে ওঁর ঘুম হয় না। তা ছাড়া—প্রেসার বাড়লে—তার জন্যে ওষুধ দিতে হবে। আর একটা কথা—।

থমকে গেল হরেন ডাক্তার। হাজার হলেও হরেন এই গ্রামের ছেলে, জীবন ডাক্তারকে সে শ্রদ্ধা করে, ছেলেবেলায় জীবন ডাক্তারের অনেক ওষুধ সে খেয়েছে। এখনও দু-চারটে রোগীকে বলে—এর জন্যে জীবন মশায়ের কাছে যাও বাপু। আমাদের ওষুধের চেয়ে ওঁর ওষুধে কাজ বেশী হবে।

সেদিন প্রদ্যোত ডাক্তারকে নিদান সম্পর্কে যাই বলে থাক হরেন, জীবন ডাক্তার নাড়ী দেখে রোগ নির্ণয় করলে রক্ত মল মূত্র পরীক্ষা না করেও তাঁর নির্ণয়মত রোগেরই চিকিৎসা করে যেতে পারে। এই কারণেই কথাটা বলতে হরেন ডাক্তার সঙ্কুচিত হল।

—বলো, কী বলছ?

—আপনাকে বলার দরকার নেই, তবুও—। হরেন ক্ষমা প্রার্থনা করে হাসলে। বাকিটা আর বললে না।

জীবন ডাক্তার কিন্তু একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। প্রদ্যোত ডাক্তারের মুখ মনে পড়ে গেল। দুজনেই একালের ছেলে—প্রায় এক সময়ের পাশকরা ডাক্তার। দীর্ঘকালের পরিচয়ের জন্য প্রদ্যোতের মতো কঠিন তিরস্কার করতে না-পারলেও উপদেশের ছলে তিরস্কার করতে পারে। অসহিষ্ণুভাবেই জীবন ডাক্তার বললেন—বলার দরকার আছে হরেন, তুমি যা বলছ প্রকাশ করে বলো।

হরেন একটু ভেবে নিয়ে বেশ হিসেব করেই বললে—আমরা লক্ষ্য রেখেছি হার্ট আর কিডনির ওপর। তার জন্যে ওষুধ দিচ্ছি; আফিং-ঘটিত ওষুধে হিক্কা থামতে পারে। কিন্তু হার্টের কথা ভেবে সে সব ওষুধ ব্যবহার করি নি। প্রেসক্রিপশন তো আপনি দেখেছেন।

—আমার ওষুধে হার্টের কোনো অনিষ্ট হবে না, আফিং-ঘটিত ওষুধ আমি দেব না হরেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

দশ

ডাক্তার হাঁটছিলেন বেশ একটু জোরে জোরে। মনের মধ্যে উত্তাপ যেন ঘুরপাক খাচ্ছে। ওষুধ ঠিক হয়ে গিয়েছে, সে ওষুধ তিনি নিজে তৈরি করে দেবেন। এ দেশেরই সুলভ কয়েকটা জিনিস দিয়ে তৈরী মুষ্টিযোগ। সে কিন্তু ওদের বলবেন না। সংসারে যা সুলভ তার উপর মানুষের আস্থা হয় না। তা ছাড়া এ বলেও দেবেন না। কখনই বলবেন না। এবং একদিনে এই হিক্কা থামিয়ে দিয়ে ওদের দেখিয়ে দেবেন, কি বিচিত্র চিকিৎসা এবং ওষুধ তাঁর আছে। পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। সেতাবকে একবার দেখে গেলে হত। তা হলে কিন্তু ফিরতে হয়, অন্যমনস্কভাবে পথ হাঁটতে হাঁটতে সেতাবের বাড়ির গলিটা ফেলে এসেছেন। থাক—বুড়োর জ্বর আজ নিশ্চয় ছেড়ে গিয়েছে। একলাই বোধ হয় ছকের উপর দাবার ঘুটি সাজিয়ে বসে আছে। কাল সকালে বরং দেখে যাবেন। এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে এই ওষুধটা তৈরী করে দিতে হবে।

—জীবনমশায়, না কে গো? ওগো জীবনমশায়! পাশের গলি থেকে মেয়েলি গলায় কে ডাকলে।—শোনো গো! দাঁড়াও!

দাঁড়ালেন জীবনমশায়। গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক প্রৌঢ়া বিধবা। নবগ্রামের নিশি ঠাকরুণ। বিখ্যাত নিশি ঠাকরুণ। গ্রামের এ কালের ছেলেরা আড়ালে-আবডালে নিশি ঠাকরুনকে বলে—মিসেস শেরিফ অব নবগ্রাম। গ্রামের মধ্যে অসীম প্রতাপ নিশি ঠাকরুনের।

নিশি ঠাকরুন এসেই প্রশ্ন করল—বলি হ্যাঁগো, একে, মানে রতনবাবুর ছেলেকে দেখে এলে? কেমন দেখলে বলো তো?

জীবমশায় প্রমাদ গণলেন। কণ্ঠস্বর শুনে তিনি নিশি ঠাকরুনকে অনুমান করতে পারেন নি। কিন্তু অনুমান করা উচিত ছিল, কারণ এই গলিতে এমনভাবে আধিপত্য-খাটানো কণ্ঠস্বরে আর কে ডাকবে? নিশি ঠাকরুন এই গলিতে নিজের দাওয়ার উপর বসে থাকে এবং যাকে দরকার তাকেই ডেকে তার প্রয়োজনীয় সংবাদটি সংগ্রহ করে।

জীবন ডাক্তার সংক্ষেপে বললেন—অসুখ কঠিন বটে, তবে হাল ছাড়ার মতো নয়। আমি যাই নিশি, ওষুধ দিতে হবে।

—আঃ, তবু যদি মশায়, তোমার ঘোড়া থাকত! দাঁড়াও না।

—ওষুধ দিতে হবে নিশি।

—তা তো বুঝছি। সঙ্গে লোকও দেখেছি। ওরে লোকটা—তুই এগিয়ে চল ডাক্তার যাচ্ছে! আমার মামাতো ভাইয়ের মেয়েটা বড় ভুগছে। পেটের ব্যামো কিছুতেই সারছে না। একবার দেখে যাও মশাই। এই সব হালের ডাক্তারদের পাল্লায় পড়ে এককাঁড়ি টাকা খরচ করলাম—কিছুতেই কিছু হল না। তা তুমি তো আর এ গাঁ মাড়াও না। একেবারে আমাদিকে ছেড়েছ। বলি—অ —নীহার, শুনছিস?

—ডাকতে হবে না, চলো দেখেই আসি। ওরে দাঁড়া তুই পাঁচ মিনিট।

বাড়ির মধ্যে ঢুকেই নিশি প্রায় পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বললে—ঠিক করে বল দেখি মশায়, রতন মাস্টারের ছেলে বাঁচবে না মরবে?

অবাক হলেন না জীবনমশাই। নিশি ঠাকুরুনের স্বভাবই এই। পৃথিবীর গোপন কথাগুলি ওর জানা চাই। জেনে ক্ষান্ত হবে না, প্রচার করে তবে তৃপ্ত হবে।

গম্ভীর কণ্ঠে জীবনমশায় বললেন, আমি তোমাকে লুকিয়ে কথা বলি নি নিশি। নাড়ীতে কিছু বুঝতে পারি নি।

—না পার নি! তুমি জীবন মশায়, তুমি বুঝতে পার নি, তাই হয়? লোকে বলে জীবনমশায় রোগীর নাড়ী ধরলে মৃত্যু-রোগে মরণ পায়ের চুটকি বাজিয়ে সাড়া দেয়! লুকোচ্ছ তুমি।

এবার ডাক্তার ভ্রুকুটি করে উঠলেন। নিশি এতে নিরস্ত হল কিন্তু ভয় পেলে না, বললে—আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। ওই হয়েছে। এখন—ওলো ও নীহার। বলি যাস কোথায় লা?

—কী পিসি-? নীহার এতক্ষণে উত্তর দিলে ঘরের ভিতর থেকে। একটুখানি দরজা খুলে উঁকি মারলে মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে আচারের গন্ধ পেলেন জীবনমশায়। মেয়েটি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আচার খাচ্ছিল। আমাশয় পেটের অসুখের ওটা একটা উপসর্গ। রোগটা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। নইলে অনিষ্টকারক বস্তুতে রুচি কেন?

মেয়েটি বেরিয়ে এল।

শীর্ণ কঙ্কালসার বাসি অতসী ফুলের মতো দেহবর্ণ একটি কিশোরী। মাথায় সিন্দুর। বয়সে কিশোর হ'লেও সন্তানের জননী হয়েছে।

জীবনমশায় চমকে উঠলেন। সর্বাঙ্গে যেন কার ছায়া পড়েছে।

নিশি ঠাকুরুণ বললে, গর্ভস্থতিকা হয়েছে। দুটি সন্তান। সব ভেসে যাবে মশায়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেঁদে ফেললে নিশি।

দুটি সন্তান। কত বয়স? চোদ্দ? দুটি সন্তান? ডাক্তার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে।

চোখ মুছে মুহূর্তে সহজ হয়ে নিশি বললে—পূর্ণ বারোতে প্রথম সন্তান হয়েছে। নেকটানেকটি বিয়েন—চোদ্দ বছরে কোলেরটি। চাঁদের মতো ছেলে মশায়, কী বলব তোমাকে, চোখ জুড়িয়ে যায়।

চাঁদ নয় যম। মাকে খেতে এসেছে। বাপের মূর্তিমান অসংযম। সমস্ত অন্তরটা তিক্ত হয়ে উঠেছিল জীবন ডাক্তারের। এই সব অনাচারীর সাজা হয় না? পরক্ষণেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। বাবা বলতেন—রোগী যখন দেখবে বাব, তখন কোনো কারণে তার উপর ক্রোধ বা ঘৃণা কোরো না, করতে নাই। তিনি বলতেন, মানুষের হাত কি বাবা? মানুষ তো ক্রীড়নক।

তাঁর অ্যালোপ্যাথিক শাস্ত্রের গুরু রঙলাল ডাক্তার বলতেন—মানুষ বড় অসহায়। তার অন্তরে পশুর কাম, ক্রোধ, লোভ; অথচ পশুর দেহের সহনশক্তি তার নাই! ওদের ওপর রাগ কোরো না! করতে পার, অধিকার অবশ্যই তোমার আছে। কিন্তু তা হলে চিকিৎসকবৃত্তি নিতে পার না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তার বললেন—এতদিন কী করছিলে নিশি?

—এই এটা-সেটা। তা ছাড়া সূতিকা তো হয় মশায়, এমন হবে কী করে জানবো বলো? তারপর এই দিন কতক হালের ডাক্তারদের দেখালাম, ওরা আবার নানান কথা বলে। এই লম্বা খরচের ফর্দ। সে আমি কোথায় পাব?

—হুঁ। বলেই থেমে গেলেন ডাক্তার।

নিশির কথা তখনও ফুরোয় নি—বাঙ্গয়ের কবচ, দেবতার ওষুধ, অনেক করেছি।

তা বুঝতে পেরেছেন ডাক্তার। গলায় বুঝি এক বোঝা মাদুলি। হাতে ন্যাকড়ায় বাঁধা জড়ি-পুষ্প। কিন্তু কী করবেন? ডাক্তারই বা কী করবেন? আছে একমাত্র ওষুধ। কবিরাজী—সূচিকাভরণ।

—পারবে। জল বারণ। খাওয়াতে পারবে নিশি?

জল বারণ? নিশিও চমকে উঠল। কী বলছ মশায়?

হ্যাঁ। জল বারণ। দেখি আর-একবার হাতখানি খুকী।

মরণ-রোগাক্লিষ্টা খুকী—মুখে কাপড় দিয়ে হাসে। দুই সন্তানের জননী সে—সে নাকি খুকী? ডাক্তারও হাসেন! সঙ্গে সঙ্গে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। একমাত্র উপায় বিষ। বিষম রোগের বিষজ ঔষধ! নাড়ীতে পদধ্বনি শুনছেন তিনি।

নিশি মিথ্যা বলে নি। মরণের পারে এদেশের মেয়েদের মতো চুটকি থাকলে

তার ঝুমঝুম বাজনাও শুনতে পেতেন ডাক্তার। লোকে বলত, কেমন বাপ, কেমন শিক্ষা দেখতে হবে! বাপ ছিলেন গুরু, তিনি ছিলেন এই নাড়ী পরীক্ষার বিদ্যায় প্রায় সিদ্ধপুরুষ। দীক্ষার দিন ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভের পর যেদিন হাতে-কলমে নাড়ী-পরীক্ষা বিদ্যায় শিক্ষা দিয়েছিলেন—সে দিনটিও ছিল অতি শুভ দিন। বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়া।

এই বৃদ্ধ বয়সেও সেদিনের কথাগুলিকে মনে হচ্ছে যেন কালকের কথা। স্পষ্ট মনে পড়ছে সব। পথ চলতে চলতে মশায় ভাবছিলেন কথাগুলি।

* * *

হিক্কার ওষুধ তৈরী করে ওষুধ খাওয়ার প্রণালী পালনের নিয়ম কাগজে লিখে রতনবাবুর লোকের হাতে দিয়ে জীবনমশায় আয়ুর্বেদ-ভবনের দাওয়ার উপর বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। নিশি ঠাকরুনের কথা কয়টিই আবার মনে পড়ল।

চাকর ইন্দির এসে হুঁকোটি বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াল।

ডাক্তার তার মুখের দিকে তাকালেন। ভাবছিলেন রতনবাবুর ছেলে বিপিনের হিক্কার কথা! বোধ করি কাল ভোর নাগাদ হিক্কার উপশম হবে। কমে আসবেই। কী বলবে প্রদ্যোত ডাক্তার?

—তামাক খান। আর মা বললেন চায়ের জল ফুটছে।

অর্থাৎ বাড়ির ভিতর যাবার জন্যে আতর-বউ বলে পাঠিয়েছেন। হুঁকোটি হাতে নিয়ে ডাক্তার বললেন—চা বরং তুই নিয়ে আয়। এখন আর উঠতে পারছি না।

—এই খোলাতে বসে থাকবেন? আকাশে মেঘ ঘুরছে! বৃষ্টি নামবে কখন।

আকাশের দিকে চাইলেন ডাক্তার। শ্রাবণের আকাশে এক স্তর ফিকে মেঘের নিচে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ঘুরছে, এক যাচ্ছে এক আসছে। গতি দেখে ডাক্তারের মনে হল—বৃষ্টি আসবে না। বললেন, বেশ আছি। বৃষ্টি আসবে না।

তবু দাঁড়িয়ে রইল ইন্দির। ডাক্তারের মনে পড়ল, বাজারের খরচ চাইছে ইন্দির।

নিয়ম হল ডাক্তার কল থেকে ফিরে টাকাগুলি আতর-বউয়ের হাতে দিয়ে থাকেন। আজকাল ডাক্তার ব্যবসা প্রায় ছেড়েছেন। এককালে কুড়ি পঁচিশ ত্রিশ টাকা দৈনিক পকেটে নিয়ে ফিরতেন। এখন কোনোদিন চার টাকা, কোনোদিন ছয় কোনোদিন বা দু টাকা। এক-একদিন কল আসে না। আবার বেশী দূরের কল যাতে টাকা বেশী তাতে ডাক্তার নিজেই যান না। আজ ডাক্তার আতর-বউকে টাকা দেন নি। পরান শেখের বাড়ি থেকে ফিরে খাওয়াদাওয়ার পরই আতর-বউয়ের সঙ্গে কলহ বেধেছিল। তারপর কিশোর এসে ডেকে নিয়ে

গেল রতনবাবুর বাড়ি। ডাক্তার ইতিমধ্যেই জামা খুলে খালি গা করে বসেছিলেন। জামাটা ইন্দিরের হাতে তুলে দিলেন। বললেন—পকেটে টাকা আছে দেখ।

—চার টাকা।

—দিগে আতর বউকে। আমাকে আর বিরক্ত করিস নে।

—আর দুটো কল্কে সেজে রেখে যাই।

—যা, তাই যা। তুই বড় বেশী বকিস।

আকাশের দিকে চেয়ে কথা বলছিলেন ডাক্তার। দেখছিলেন আকাশের মেঘ—ইন্দিরের কথার দিকে ছিল কান, মুখে তার জবাবও দিচ্ছিলেন কিন্তু মনের মধ্যে ঘুরছিল বিপিনের হিক্কার কথা, প্রদ্যোতের কথা, নিশির কথা। লোকে বলে জীবনমশাই নাড়ী ধরলে মরণ পায়ের চুটকি বাজিয়ে সাড়া দেয়। কেমন বাপ, কেমন শিক্ষা!

* * *

সেদিন ছিল বৈশাখের অক্ষয়-তৃতীয়া। পুত্রের দীক্ষার জন্য এই প্রথম শুভ-দিনটিই নির্বাচন করেছিলেন জগৎমশায়। একান্তে নির্জন ঘরে পুত্রকে কাছে বসিয়ে তিনি যেন তার চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন সেদিন। বাড়িতে বলে রেখেছিলেন যেন কেউ তাঁদের না ডাকে, কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না করে।

জীবন অল্পসল্প নাড়ী দেখতে জানতেন। চিকিৎসকের বাড়ির ছেলে বাল্যকালে খেলাচ্ছলে খেলাঘরে বৈদ্য সেজে বসে সঙ্গী-সাথীদের হাত দেখতেন, কাদামাটি, ধুলো কাগজে মুড়ে ওষুধ দিতেন। জীবনের মা পর্যন্ত নাড়ী দেখতে জানতেন। সেদিন বাপ তাকে প্রথম পাঠ দিয়ে নাড়ীতত্ত্ব বুঝিয়ে মৃত্যুর কাহিনী বলে আয়ুর্বেদ-ভবনে যে সব রোগীরা এসেছিল তাদের কয়েকজনের নাড়ী নিজে পরীক্ষা করে ছেলেকে বলেছিলেন, দেখো—এর নাড়ী দেখো।

রোগীকে ওষুধের ব্যবস্থা-পত্র দিয়ে অন্যদিকে যেদিকে ওষুধ পাওয়ার ব্যবস্থা সেই দিকে পাঠিয়ে দিয়ে জীবনকে রোগীর নাড়ীর বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এই ছিল জগৎমশায়ের শিক্ষার ধারা।

আয়ুর্বেদ-ভবনের কাজ শেষ করে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি রোগীকে রোগীর বাড়িতে গিয়ে দেখে বাড়ি ফেরার পথে বলেছিলেন—বাবা, যে চিকিৎসক নাড়ীবিজ্ঞানে সিদ্ধিলাভ করতে পারে তার সঙ্গে মৃত্যুকে সন্ধি করতে হয়। মৃত্যুর যেখানে অধিকার সেখানে মৃত্যু বলে—আমার পথ ছেড়ে দাও। এ আমার অধিকার। আর যেখানে তার অধিকার নাই সেখানে ভুলক্রমে উঁকি মারলে চিকিৎসক বলেন—দেবি, এখনও সময় হয় নাই, এক্ষেত্রে তোমাকে স্ব-স্থানে ফিরতে হবে।

কারণ এমন চিকিৎসকের রোগনির্ণয়েও ভ্রান্তি ঘটে না, ঔষধ নির্বাচনেও ভুল হয় না। মৃত্যু যেমন অমোঘ, পঞ্চম বেদ আয়ুর্বেদের স্রষ্টা ব্রহ্মার সৃষ্টি ভেষজ এবং ওষধির শক্তিও তেমনি অব্যর্থ। যে ব্রহ্মার ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি থেকে সৃষ্টি হল মৃত্যুর, সেই ব্রহ্মারই প্রসন্ন দৃষ্টি থেকে সৃষ্টি হয়েছে ভেষজের। ব্রহ্মা এই শাস্ত্র দিয়েছিলেন দক্ষপ্রজাপতিকে, দক্ষের কাছে থেকে এই শাস্ত্র পেয়েছিলেন অশ্বিনীকুমারেরা, তাঁদের কাছ থেকে পেলেন ইন্দ্র, ইন্দ্র দিলেন ভরদ্বাজ আর দিবদাস ধন্বন্তরিকে। এইখানে আয়ুর্বেদ দুভাগে ভাগ হয়েছে। ধন্বন্তরি শল্য-চিকিৎসার ভাগ পেয়েছিলেন। তারপর পূনর্বসু এবং আত্রেয়। তারপর অগ্নিবেশ। আচার্য অগ্নিবেশ রচনা করেছিলেন অগ্নিবেশ সংহিতা। এই সংহিতা থেকেই চরক সংহিতার সৃষ্টি। পঞ্চনদ প্রদেশের মনীষী চরক এই সংহিতাকে নতুন করে সংস্কার করেছিলেন। চরক হলেন চিরজীবী। কথা বলতে বলতেই পথ চলছিলেন পিতা-পুত্রে। চলেছিলেন গ্রামান্তরে। জগৎমশায় সচরাচর গাড়ি-পালকি ব্যবহার করতেন না। বেশী দূর হলে তবে গোরুর গাড়ি এবং তাড়াতাড়ি যাওয়ার প্রয়োজন হলে তবে ডুলিতে চাপতেন। সেদিন ছেলেকে দেখিয়েছিলেন ঠিক আজকের ওই নিশির ভাইঝির মতো একটি রোগিণী। ঠিক এমনি। কিশোরী মেয়ে, বড় জোর ষোল বছর বয়স—সে আবার দুই সন্তানের পর তৃতীয়বার সন্তানসম্ভবা ছিল।

সেদিন ফিরবার পথে জগৎ মশায় বলেছিলেন—নির্দিষ্ট আয়ুর কথা শাস্ত্রে আছে। কিন্তু কর্মফলে সে আয়ুরও হ্রাসবৃদ্ধি আছে। ব্যাভিচার করে মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করে আনে মানুষ। এ সব ক্ষেত্রে তাই—অথচ—।

চুপ করে গিয়েছিলেন জগৎ মশায়, বোধ হয় সংশয় উপস্থিত হয়েছিল নিজের মনে। একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, এক-এক সময় শাস্ত্রবাক্যে সংশয় জাগে, জীবন। আমাদের শাস্ত্রে বলে—স্বামীর পাপের ভাগ স্ত্রী গ্রহণ করে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কী বলব? এ ক্ষেত্রে স্বামীর অমিতাচারের ফল ভোগ করছে মেয়েটা, সেই হেতুতেই ওকে যেতে হবে অকালে।

আবার খানিকটা চুপ করে থেকে বলেছিলেন—হয়তো বা প্রাক্তন জন্মান্তরের কর্মফল ওই মেয়েটার—তার ফলেই স্বল্পায়ু হয়েই জন্মেছিল। তাই বা কে বলবে?

সেদিন জীবনমশায়ও ওই কথাতেই বিশ্বাস করেছিলেন। মনে মনে নিজের ভাগ্যবিধাতাকে প্রণাম জানিয়েছিলেন। তাকে পরিত্রাণ করেছেন তিনি। মঞ্জরী স্বাস্থ্যবতী বটে, কিন্তু বয়স তো বারো বৎসর। কে বলবে—মঞ্জরীর ঠিক এই পরিণতি হত না?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আজ বৃদ্ধ জীবনমশায় আকাশের দিকে চাইলেন আবার। এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে! দাড়িতে হাত বুলোলেন। আকাশে রক্তসন্ধ্যা দেখা দিয়েছে। গাঢ় লাল হয়ে উঠেছে দিগন্তবিস্তৃত মেঘস্তর। তার নিচে বকের সারি উড়ে চলেছে। হঠাৎ এতক্ষণে চোখে পড়ল সামনে ঢাকা রয়েছে চায়ের বাটি। ইন্দির কখন রেখে গিয়েছে। অতীত কথা স্মরণ করতে গিয়ে চায়ের কথা মনেই হয় নি। ইন্দির নিশ্চয় কথা বলেছিল, খেয়াল করে দেবার চেষ্টাও সে নিশ্চয় করেছিল কিন্তু সে তিনি স্মরণ করতেই পারছেন না।

থাক। আজ চা থাক।

অতীত কালের কথার একটা নেশা আছে। বড় মনোরম বর্ণবিন্যাস। চোখে পড়লে আর ফেরানো যায় না। বিশেষ করে যেখানটার কথা মনে পড়ছে এখন, সেখানটা যেন ঐ আকাশের রক্তসন্ধ্যার বর্ণচ্ছটার মতোই গাঢ়।

পথে তিনি ভাগ্যবিধাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এলেন—মঞ্জরীর বন্ধন থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য। আর বাড়ি ফিরেই দেখলেন—।

আবার হাসলেন এবং বার কয়েক দাড়িতে হাত বুলোলেন। হ্যাঁ কর্ম-পাক নিয়ে যিনি চক্র রচনা করেন তিনি যেমন চক্রী তেমনি রসিক।

* * *

সেদিন তৃতীয় প্রহরের শেষে তাঁরা বাড়ি ফিরেছিলেন। মা বসেছিলেন, তাঁরা ফিরে এলে ভাত চাপিয়ে দেবেন। অবশ্য সে দিক দিয়ে বিশেষ অনিয়ম হয় নি। চিকিৎসকের খাওয়া তৃতীয় প্রহরেই বটে।

মুখ-হাত ধুয়ে ভিজে গামছা পিঠে বুলিয়ে জগৎমশায় বললেন—জীবনকে কুলকর্মে দীক্ষা দিয়ে আজ আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু জীবনের মা তোমার মুখ এমন কেন?

—কেমন?

—যেন খুব চিন্তান্বিত মনে হচ্ছে। কিছু ভাবছ?

—কী ভাবব? জীবনের মা কথাটা উড়িয়ে দিলেন যেন।

—তা বটে! কী ভাববে! মেয়েদের ভাবনা অলঙ্কারের, মেয়ের বিয়ের, ছেলের বিয়ের। সুতরাং দুটোর একটা ভাবতে পার।

হাসলেন জীবনের মা। উঠে গিয়ে উনানে চড়ানো বগনোর ঢাকা খুলে হাতায় ভাত তুলে টিপে দেখতে বসলেন।

জগৎ মশায়ের মনটা সেদিন প্রসন্ন ছিল—নির্মেঘ শরৎকালের আকাশের মতো। তিনি প্রসন্ন হেসে বললেন—কী, উত্তর দিলে না যে?

পিছন ফিরেই মা উত্তর দিলেন—কী বলব? তুমি অন্তর্যামী। ভাবছি না বললেও বলছ—ভাবছ। তা হলে তুমিই বলে দাও কী ভাবছি।

জীবনের অভিভূত ভাবটা তখনও কাটে নি। তার মাথার মধ্যে তখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল বাপের গম্ভীর মৃদুস্বরের কথাগুলি।

অভিভূত ভাবটা আকস্মিক একটা আঘাতে কেটে গেল। জীবন চমকে উঠল।

খাওয়া-দাওয়ার পর ছোট রেকাবিতে হরিতকীর টুকরো নামিয়ে দিয়ে জীবনের মা বললেন—তুমি অন্তর্যামীই বটে। তামাসা তোমাকে আমি করি নি। কাঁদী থেকে চিঠি নিয়ে দুপুরে লোক এসেছে। জানি না কী লেখা আছে, তবে কে চিঠি পাঠিয়েছে, তার নাম জেনে আমার ভাবনা হয়েছে। না ভেবে থাকতে পারি নি আমি। নবকৃষ্ণ সিং চিঠি লিখেছে—এই দেখো।

চিঠিখানি পড়লেন জগবন্ধু মশায়। চমকিত হয়ে জীবন উদ্বিগ্নচিত্তে বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু মুখ দেখে কিছু অনুমান করতে পারলে না। জগবন্ধু মশায় চিঠি শেষ করে স্থির দৃষ্টিতে বৈশাখের উত্তপ্ত আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন।

মনে পড়ছে জীবন ডাক্তারের।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছিল। তৃতীয় প্রহরের শেষ পাদ। পূর্বদুয়ারী ঘরের বারান্দায় বসে ছিলেন: সামনে পশ্চিম-দুয়ারী একতলা রান্নাঘরের চালার উপর দিয়ে, আচার্য ব্রাহ্মণদের বাড়ির উঠানের বকুল গাছের মাথার উপর দিয়ে রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখী আকাশ যেন তপোমগ্ন রুদ্রের অর্ধনিমীলিত তৃতীয় নেত্রের বহ্নির ছটায় ক্লিষ্ট নিথর। দিকে-দিগন্তরে কোথাও ধ্বনি শোনা যায় না। বাতাসও ছিল না সেদিন। মনে হয়েছিল, বোধ হয় সন্ধ্যার দিকে কালবৈশাখীর ঝড় উঠবে। পশ্চিম দিগন্তে আয়োজন হতে আরম্ভ হয়েছে। জীবন ওই আকাশের দিকেই তাকিয়ে ছিল। তারও বুকে বোধহয় ঝড় উঠবে মনে হয়েছিল। কী লিখেছে নবকৃষ্ণ সিংহ? মঞ্জরী, হয়তো মঞ্জরীর মা—এরা যে ওই দেউলিয়া অভিজাত ঘরের বর্বর ছেলেটার মোহে মুগ্ধ তাতে তার সন্দেহ নাই। বঙ্কিম মঞ্জরী সম্পর্কে তো নাই-ই, কোনো সন্দেহই নাই। তাকে নিয়ে তারা খেলা করছে। তাই বা কেন? সে নিজেই মূর্খ বানর তাই তাদের বাড়ি গিয়ে বানর-নৃত্য করেছে—তারা উপভোগ করেছে। বানর-নৃত্য নয়—ভল্লুক-নৃত্য। মঞ্জরী মধ্যে মধ্যে তাকে ভালুকও বলত। ভালুক নাচই সে নেচেছে। ভালুঁক আর বানরে প্রভেদই বা কী? দুটোই জানোয়ার—দুটোই নির্বোধ! কিন্তু কী লিখেছে নবকৃষ্ণ সিংহ। মিথ্যা কদর্য অভিযোগ! কী করবে জীবন? ভগবান সাক্ষী, কিন্তু ভগবান তো

সাক্ষী দিতে আসেন না! তিনি তো বলবেন না—প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা যদি অপরাধ হয় তবে জীবন অপরাধী। নইলে সে কোনো অপরাধ করে নাই! সে মৃত্যুদণ্ডে প্রতীক্ষারত আসামীর মতোই অপেক্ষা করে রইল।

মশায় দৃষ্টি নামিয়ে বললেন—জীবনের মা! তাঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

চিন্তিত মুখেই জীবনের মা প্রতীক্ষা করছিলেন। সাগ্রহে তিনি বললেন——বলো! শোনবার জন্য তো দাঁড়িয়েই আছি।

—জীবনের বিবাহের আয়োজন করো।

—কার সঙ্গে? ওই মেয়ের সঙ্গে? নবকৃষ্ণ সিংহের মেয়ের সঙ্গে?

—হ্যাঁ দিতেই হবে বিবাহ। নবকৃষ্ণ সিংহ লিখেছেন—এই ঘটনায় এখানে তাঁর কন্যার দুর্নাম রটেছে চারিদিকে। ওই যে কুৎসিত প্রকৃতির ছেলেটি—সে তাঁর কন্যা মঞ্জরীকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নানারকম মন্তব্য করেছে। বলেছে—ঘটনার দিন সে নাকি জীবনকে আবীর দেবার ছলে মঞ্জরীর অঙ্গে হাত দিতে দেখেছে।

মা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—জীবন!

মাকে এমন মূর্তিতে কখনও জীবন দেখে নাই।

মা আবার বললেন—বলো, আমার পায়ে হাত দিয়ে বলো—

জীবন সেদিন যেন নবজন্ম লাভ করেছে—বাপের সাহচর্যের ফলে, তাঁর অন্তরের স্পর্শে। সে উঠে এসে পায়ে হাত দিয়ে বলল—আমি তার কপালে আবীর দিয়েছি। আর কোনো দোষে দোষী নই।

মশায় বললেন—কর কী জীবনের মা? ছি! বিবাহের আয়োজন যখন করতে বলছি, তখন ও-সব কেন? জীবন মনে মনে মেয়েটিকে কামনা করে! এক্ষেত্রে কি শপথ করায়? বিবাহের আয়োজন করো।

—সে কি? কোষ্ঠী দেখাও। নিজে মেয়ে দেখো। তারপর কথাবার্তা দেনা-পাওনা—

—কিচ্ছু না, এক্ষেত্রে ওসব কিচ্ছু না। ছক এই চিঠির সঙ্গে আছে। ওটা আমি ছিঁড়েই দিচ্ছি, কী জানি যদি বাধার সৃষ্টি করে; আর দেনা পাওনাই বা কী? কী লিখেছেন তিনি জান? লিখেছেন, "আপনাদের বংশের উপাধিই হইয়াছে মহাশয়। মহাশয়ের বংশ আপনার। আপনি নিজে ও অঞ্চলে বিখ্যাত চিকিৎসক। আপনার পুত্র ডাক্তারি পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এ অবশ্যই আমার বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার বাসনা। কিন্তু যেরূপ ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আপনি প্রত্যাখ্যান করিলে আমার কন্যাকে গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিতে হইবে।"

—আর কোনো কথা নয়। আয়োজন করো। বৈশাখে আর এক-দিনে বিবাহ হয় না? জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দেশাচারে নিষিদ্ধ। প্রথম আষাঢ়েই বিবাহ হবে।

এগারো

অতীত কালের কথা মনে করে যতই মনের মধ্যে বিচিত্র রসের সঞ্চার হয়—বৃদ্ধ জীবনমশায় ততই ঘন ঘন দাড়িতে হাত বোলান। সাদা দাড়ি, তামাকের ধোঁয়ায় খানিকটা অংশে তামাটে রঙ ধরেছে। যত্ন অভাবে করকরে হয়ে উঠেছে। তবুও হাত না বুলিয়ে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে হাসেন, সেকালের তরুণবয়সী নিজেকে পরিহাস করেন এই হাসির মধ্যে। একা নিজেকেই বা কেন—সমস্ত মানুষকেই করেন।

যৌবনে কী একটা আছে ; জলের যেমন ঢালের মুখে গতির বেগ তেমনি একটা বেগ ; যৌবনের মন যখন কোনো একজনের দিকে ছোটে তখন ওই বেগে ছোটে, তখন শাস্ত্রের কথা ভালোমন্দ বিবেচনার কথা, সমাজের বাধার কথা, হাজার কথাতেও কিছু হয় না, মন বাগ মানে না। এই সব শাস্ত্রকথাগুলিকে যদি বালির বাঁধের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে মন যেখানে ঢালের টানে ছুটন্ত জলস্রোত। হয় বাঁধ ভাঙে নয় জল শুকায়।

তাই তো আজ হাসছেন জীবনমশায়। সেই দিনই ওই রোগিণী দেখে ফিরবার পথে মঞ্জরীর সঙ্গে বিবাহ-সম্ভাবনা বন্ধ হওয়ায় তরুণ জীবন ভাগ্যবিধাতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। মঞ্জরীর আসল চেহারা দেখতে পেয়ে তার উপর বিতৃষ্ণার সীমাও ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে জগৎ মশায় স্ত্রীকে বললেন—প্রথম আষাঢ়ে বিবাহ হবে, সেই মুহূর্তেই তরুণ জীবন সব ভূলে গিয়েছিল। শুধু ভুলে যাওয়াই নয়, মনে হয়েছিল হাত বাড়িয়ে সে আকাশের চাঁদের প্রায় নাগাল পেয়েছে! যেটুকু ব্যবধান রয়েছে আষাঢ় মাস পর্যন্ত নিশ্চয় সে ততখানি বেড়ে উঠবে।

জীবন দত্তের প্রত্যাশার আনন্দে টলমল মনের পাত্র হতে আনন্দ যেন উথলে উঠে তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর যতটুকু অংশ তাঁর চোখে পড়েছিল সমস্তটুকু আন্দময় হয়ে উঠেছিল। সব মধু। মধু বাতা ঋতায়তে!

ওদিকে পত্রবিনিময় চলছিল। জগৎ মশায় পত্র দিয়েছিলেন নবকৃষ্ণ সিংহকে। কয়েকদিন পরই সে পত্রের উত্তর এল।

নবকৃষ্ণ সিংহ দ্বিতীয় পত্র লিখেছিলেন—"মঞ্জরী আমার লজ্জায়-দুঃখে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল ; আপনার পত্র আসিবার পর তাহার মুখে হাসি ফুটিয়াছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মাকে বলিয়াছে—আমার শিবপূজা মিথ্যা হয় নাই।"

জীবন দত্ত আনন্দে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। মঞ্জরী লজ্জায় দুঃখে শয্যাগ্রহণ করেছিল, জীবনের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধের কথা শুনে সে উঠে বসেছে ? মুখে হাসি ফুটেছে ? দুঃখের শয্যা ছেড়ে মঞ্জরীর হাসিমুখে উঠে বসার কথা মনে হতে তাঁর চোখের সামনে ফুলে-ফুলে সর্বাঙ্গ-ভরা গুলঞ্চফুলের গাছটার ছবি ভেসে উঠেছিল !

ছুটে গিয়ে সেতাবকে, সুরেন্দ্রকে এবং নেপালকে দেখিয়েছিলেন চিঠিখানা। চিঠিখানা তিনি চুরি করেছিলেন।

নিজের গ্রামের সুরেন্দ্র এবং নবগ্রামের সেতাব ও নেপাল ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ! সুরেন আর নেপাল তখন মদ ধরেছে। সেকালে এ অঞ্চল সম্পর্কে লোকে বলত—মাটিতে মদ খায়। তা খেত। তেরো-চৌদ্দ বছর হতেই মদ খেতে শিখত। তান্ত্রিকের দেশ, সবাই তান্ত্রিক—বিশেষ তো ব্রাহ্মণেরা। তারপর দীক্ষা হলে ওটা দাঁড়াত ধর্মসাধনের অঙ্গ। অর্থাৎ প্রকাশ্যেই খাওয়ার অধিকার পেত। খেত না শুধু সেতাব। সেতাব ব্রাহ্মণ, শাক্ত ঘরের সন্তানও বটে কিন্তু ভড়কে যেত। সেতাব সমস্ত জীবনটাই পিতলের পাত্রে নারকেলের জল ঢেলে তাই দিয়ে তান্ত্রিক তর্পণ চালিয়ে এল।

সুরেন গ্রামের ছেলে। ঠাকুরদাস মিশ্রের ছেলে। জমিদারী সেরেস্তার পাটোয়ারী কাজ শিখেছে। চতুর ছেলে। সে বলল—আজ তোকে খাওয়াতে হবে। মদ-মাংস খাব। দে, টাকা ফেল।

নেপাল বাপের আদুরে ছেলে। সব-রেজিষ্ট্রি অপিসের কেরানী, তার বাবার অনেক রোজগার। নবগ্রামের ছড়ায় ছিল—বিনোদ বুড়ো লম্বা জামায়, পকেট ভরে রেজকি কামায়। বিনোদ মুখুজ্জে সত্যিই রেজকিবোঝাই পকেট দুটো দুই হাতে ধরে বাড়ি আসত। নেপাল লোক ভালো ! হাউ-হাউ করে বকত, হা-হা করে হাসত, দুম-দুম করে চলত, সাদা দিলখোলা মানুষ। একবার রাঘবপুরে ব্রাহ্মণ ভোজনে নেমতন্ন খেতে যাবার পথে হঠাৎ নেপালের খেয়াল হল পৈতে নেই গলায়, কোথায় পড়েছে। নেপাল পথে কালী বাউড়ীকে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল—কী করি বল তো কেলে ? আমাকে একটা পৈতা দিতে পারিস ? জীবনের বাড়ি এসে মশায়ের কবিরাজখানায় ঢুকে কামেশ্বর মোদকের বদলে খানিকটা হরিতকী-খণ্ডই খেয়ে ফেলত অম্লান বদনে। স্বাদেও বুঝতে পারত না এবং তাতেই তার নেশাও হত।

নেপাল সেদিন বলেছিল—হাম, হাম খাওয়ায়েঙ্গা। আমি খাওয়াব।

নেপালই সেদিন খাইয়েছিল। তিন টাকা খরচ হয়েছিল। লুচি মাংস মিষ্টি মদ। গান-বাজনা হয়েছিল রাত্রি দুটো পর্যন্ত। সুরেন তবলা সঙ্গত করেছিল—জীবন আর নেপাল গান গেয়েছিল। সেতাব ছিল শ্রোতা।

চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী। পূর্বরাগের পালাটাই শেষ করে ফেলেছিল তিনজনে। সেতাব ঘাড় নেড়েছিল, বাহবা দিয়েছিল।

ভুল হচ্ছে। বৃদ্ধ জীবন দত্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন এতক্ষণে। এতকাল পরে ভুল হয়ে যাচ্ছে। জীবন নিজেই সেদিন গুলঞ্চ চাঁপার ফুলের মালা গেঁথেছিল। একগাছি নয় চার গাছি। চার বন্ধু গলায় পরেছিল।

নেপাল এবং সুরেন সেদিন তাকে পায়ে ধ'রে সেধেছিল—একটু খা ভাই। আজ এমন সুখের সংবাদ পেয়েছিস, আজ একটু খেয়ে দেখ! একটু!

জীবন কিন্তু ধর্মভ্রষ্ট হন নি।

বৈষ্ণব-মন্ত্র-উপাসকের বংশ। মহাশয়ের বংশ। তিনি খান নি। তিনি বলেছিলেন—না ভাই। বাবার কথা তো জানিস। মঞ্জরীদের বাড়িও ঠিক আমাদের মতো। তারাও বৈষ্ণব।

ওদিকে বাড়িতে চলছিল মহাসমারোহের আয়োজন। জগদ্বন্ধু মশায়ের একমাত্র সন্তানের বিবাহ। ব্রাহ্মণভোজন, জ্ঞাতিভোজন, নবশাখভোজন, গ্রামের অন্ত লোকদের খাওয়াদাওয়া—এমনকি আশেপাশের মুসলমান পল্লীর মিঞা সাহেবদের লুচি মিষ্টি খাওয়ানো, ব্যবস্থার ত্রুটি রাখেন নি জগদ্বন্ধুমশায়। বাজনা, বাজি পোড়ানো, রায়বেঁশে—তার উপর দু রাত্রি যাত্রাগান হবে কিনা এ নিয়েও কথা চলেছিল। সুরেন-সেতাব-নেপাল থেকে গ্রামের ঠাকুরদাস মিশ্রের মতো মাতব্বর পর্যন্ত ধরেছিলেন—সে কি হয়! যাত্রাগান করাতে হবে বৈ কি। না হলে অঙ্গহীন হবে।

মশায় বলছিলেন—আষাঢ় মাসের কথা। বৃষ্টি নামলে সব পণ্ড হবে। শামিয়ানাতে জল আটকাবে না। তাঁর ইচ্ছা ওই খরচে বরং গ্রামের সরকারী কালী-ঘরের মেঝে দাওয়া বাঁধানো হোক, ঘরখানারও সংস্কার হোক।

এই প্রতীক্ষার কাল যত সুখের তত উদ্বেগের। উদ্বেগে দিনকে মনে হয় মাস, মাসকে মনে হয় বৎসর। তবুও কাটল দিন। আষাঢ়ের এগারোই বিবাহ, আষাঢ়স্য প্রথম দিবস এল। আকাশে মেঘ এল। সে মেঘ ভুবন-বিদিত বংশের পুষ্কর মেঘ নয়। অশনিগর্ভ কুটিলমনা কোনো অজ্ঞাতনামা মেঘ। বর্ষণের ফলে বজ্রপাত হয়ে গেল সে মেঘ থেকে।

মঞ্জরী নাই।

বেলা দু'পহরের সময় লোক এল পত্র নিয়ে। পত্রে লেখা ছিল—'গত পরশ্ব রাত্রে আমার কন্যা বিসূচিকা রোগে মারা গিয়াছে।'

এক মুহূর্তে সুখস্বপ্ন একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সেকালের তরুণ জীবন দত্ত। সেকালের মানুষের বিবাহিত পত্নীর মৃত্যুতে বুকখানা ফেটে চৌচির হয়ে গেলেও আর্তনাদ বের হত না মুখ থেকে। এ তো ভাবী পত্নী। জীবন কাঁদে নি। নির্জনে কবিরাজখানার উপরের ঘরে চুপ করে বসে ছিল। হঠাৎ ঠাকুরদাস মিশ্রের উচ্চ চীৎকারে চমকে উঠেছিল।

চীৎকার করছিল ঠাকুরদাস মিশ্র।—আমি ঠাকুরদাস মিশ্রি—আমার চোখে ধুলো দেবে? লোকে ডালে ডালে যায়—আমার আনাগোনা পাতায় পাতায়। মুখ দেখে আমি মতলব বুঝতে পারি, পাটোয়ারিগিরি করে খাই আমি। এদিকের চার দিকে গোলমাল চলছে, ওদিকে বেটা সুট করে উঠে রাস্তায় নামল! আমার সন্দেহ হল। কী ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবে হে? বললে—একবার মাঠে যাব। প্রথমটা বুকটা ধড়াস করে উঠল। সেখানে ওলাউঠো হয়েছে—লোকটা সেখান থেকে আসছে, ওর আবার কিছু হয় নি তো? লোকটা হনহন করে চলে গেল। গেল তো, একেবারে যে পথে এসেছে, সেই পথে। কাছের পুকুর জঙ্গল ফেলে চলল। হঠাৎ নজরে পড়ল ছাতাটিও বগলে পুরেছে। তখনই আমার সন্দেহ হল বেটা পালাচ্ছে, আমিও গলি-পথে মাঠের ধারে এসে দাঁড়ালাম। দেখি, মাঠে এসেই ছুটতে শুরু করছে। তখনই আমি বুঝে নিয়েছি। কিন্তু পালাবে কোথা? মাঠে চাষীরা হাল ছেড়ে ঘুরছে, হাঁকলাম—ধর বেটাকে—ধর-ধর। ধর।

সোলেমান, করিম, সাতন—তিনজন বেটাকে ধরলে, বললাম—নিয়ে আয় বেটাকে পাঁজাকোলা করে। আনতেই সোলেমানের হাতের পাঁচনটা নিয়ে বেটার পিঠে কষে এক বাড়ি। বল বেটা, বল—সত্যি কথা বল। ঠিক বলবি, নইলে কাস্তে দিয়ে জিভ কেটে ফেলব। গলগল করে বলে ফেললে সব।

জগদ্বন্ধু মশায়ের গম্ভীর শান্ত কণ্ঠস্বর বেজে উঠেছিল—ওকে ছেড়ে দাও ঠাকুরদাস, ও গরিবের কী দোষ? ও কী করবে! ওকে পাঠিয়েছে—ও এসেছে। দূত অবধ্য। ও দূত। নবকৃষ্ণ সিংয়ের অপকর্মের জবাবদিহি বা প্রায়শ্চিত্ত ও কী করে করবে বলো?

ঠাকুরদাস বললেন—দোষ তোমার। একখানা চিঠিতে তুমি বিয়ে পাকা করলে। নিজে গেলে না, তাকে আসতে লিখলে না।

মশায় তাঁর বাপের কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করলেন;—প্রবঞ্চনা আমি করিনি ঠাকুরদাস, প্রবঞ্চনা করেছে নবকৃষ্ণ। এতে আমার দোষ কোথায় বলো ?

জীবন নেমে এসেছিল উপর থেকে।

মঞ্জরীর বিসূচিকায় মৃত্যু মিথ্যা কথা। গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ তার সঙ্গে ভূপী বোসের বিবাহ হয়ে গিয়েছে।

জীবনের মনে হয়েছিল—দোলের দিন মঞ্জরী হাতে আলকাতরা নিয়ে তার মুখে লেপে দিতে এসেছিল ; সেদিন পারে নি, কিন্তু আজ মঞ্জরী সেই আলকাতরা তার মুখে মাখিয়ে দিয়েছে। যেন মঞ্জরী সেই খিল-খিল হাসি নতুন করে হাসছে দূরান্তরে দাঁড়িয়ে।

ভূপী হেসে বলছে—বুনো শুয়োরটা !

মশায় ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে তাকে বলেছিলেন—ভগবান তোমার উপর সদয় বাবা, জীবন। তোমাকে তিনি আজীবন প্রবঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। ওই মেয়ে ঘরে এলে তুমি সুখী হতে না। শুধু প্রবঞ্চনা নয়—আজীবন সে তোমাকে অশান্তির আগুনে দগ্ধ করত। তা ছাড়া যার যে পতি-পত্নী। এ তো তোমার আমার ইচ্ছায় হবে না। লজ্জা পেয়ো না, দুঃখ কোরো না। মনকে শক্ত করো।

শেষের কথা কটা ভালো লাগে নি জীবনের। সে মাথা হেঁট করে সেখান থেকে চলে এসেছিল।

মশায় বলেছিলেন—তোমার সঙ্গে কথা আছে। যেয়ো না কোথাও। সুরেন তুমি যাও, তোমাকেও চাই। পাশের ঘরে অপেক্ষা করো।

পাশের ঘরে বসেই জীবন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনতে পেয়েছিলেন। ঠাকুরদাস মিশ্র আস্তে কথা বলতে জানতেন না, অন্যের কাছে আস্তে উত্তর শুনতেও পছন্দ করতেন না। জগৎ মহাশয়ের অনুরোধে দূতকে তিনি নির্যাতন করেন নাই বটে তবে ধমক দিয়েছিলেন অনেক। প্রশ্নোত্তরের মধ্যে যে কথাগুলি প্রকাশ পেয়েছিল, তা হল এই।

প্রতারণা নবকৃষ্ণ সিংহ ঠিক করেন নি।

করেছে মঞ্জরী, বঙ্কিম, আর ওদের মা।

জীবনের হাতে মুষ্ট্যাঘাত খেয়ে ভূপী বোস অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল ; খুন করবে, সে খুন করবে বর্বর উল্লুককে, রোমশ কালো শুয়োরকে। তারপরই তার চোখ পড়েছিল মঞ্জরীদের উপর। সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ গিয়ে পড়ল তাদের উপর। বঙ্কিমকে

ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মঞ্জরীর সামনে হাত নেড়ে কুৎসিত মুখভঙ্গি করে বলেছিল—এ তোদের ষড়যন্ত্র। তোদের! তোদের! ভাই বোন মা সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেছিলি আমাকে তাড়াতে। টাকার জন্যে ওই শুয়োরটার সঙ্গে, ছোট-লোকের ছেলের সঙ্গে প্রেম করতে বাধে না! ছি! ছি! ছি! তারপর সাড়ম্বরে পথে চীৎকার করে অপবাদ রটনা করে ফিরেছিল। কিছু দিন থেকেই তার সন্দেহ হয়েছিল মঞ্জরীরা জীবনকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। জীবনের খরচের বাহুল্য দেখে অনুমান করেছিল যে, প্রশ্রয় পেয়েই জীবন এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। সে এর প্রমাণ দিতে পারে। নইলে নাতনী-দাদামশায় সম্পর্ক ধরে যে হাসিখুশি বক্র রসিকতার বাগ্‌যুদ্ধ চলছিল সে এমন সীমা ছাড়াত না। সম্পর্কটা প্রকাশ্য হলে মঞ্জরী তার কাছ থেকে দামী আতর গোপনে উপহার নিত না। আর আলকাতরা মাখাতে যেত না। তাই সেদিন নাক ভেঙে রক্তমাখা মুখেই ওই কথা রটাতে রটাতে বাড়ি ফিরেছিল। এবং তার দলবল জড়ো করে বোর্ডিং থেকে আরম্ভ করে চারপাশ জীবনের খোঁজে প্রায় সমুদ্র মন্থন করে ফেলেছিল। খুন করবে। তাকে না পেয়ে তার মুণ্ডরটা কুড়ুল দিয়ে কেটে চেলা বানিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছিল।

নবকৃষ্ণ সিংহ অথৈ সমুদ্রে পড়েছিলেন। কুল-কিনারা ছিল না। গোটা বাজারে ঐ ছাড়া কথা ছিল না। মা মঞ্জরীকে বলেছিলেন—মর, মর—তুই মর!

মঞ্জরী মরতে পারে নি, কিন্তু শয্যা সত্যই পেতেছিল।

বঙ্কিম আস্ফালন করেছিল—আমিও বঙ্কিম সিংহী, আমি দেখে নোব।

বাপ তার গালে ঠাস করে চড় মেরেছিলেন—হারামজাদা, তুই সব অনর্থের মূল। দুজনকেই তুই ঘরে এনেছিলি।

বঙ্কিম তাতেও দমে নি, সে আরও প্রবল আস্ফালন করে বলেছিল—খুন করবো ওকে আমি।

নবকৃষ্ণ ফাঁকা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—কাকে? কাকে খুন করবি?

বঙ্কিম এর উত্তর দিতে পারে নি।

ওদিকে নিত্য নতুন রটনা রটাচ্ছিল ভূপী বোস। কঠিন আক্রোশ তার তখন। শেষ পর্যন্ত নবকৃষ্ণ এই পত্র লিখলেন জগদ্বন্ধু মশায়কে এবং পত্রোত্তর পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। মঞ্জরীও উঠে বসেছিল। ভূপী বোসের নির্মম নিষ্ঠুর অপবাদ রটনায় লজ্জা তার হয়েছিল বই কি! দুঃখও হয়েছিল, বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদেও ছিল! আঘাত যে নির্মম। কাঁদী শহরের চারিদিকে যে রটে গিয়েছিল এই কাহিনী। জগৎ মশায়ের পত্রে সে সব মুছে গেল। নবকৃষ্ণ মাথা তুললেন

পত্র দেখিয়ে বেড়ালেন সকলকে। জগৎ মশায় লিখেছেন—'মা লক্ষ্মীকে সসম্মানে ঘরে আনিব ইহাতে আর কথা কী আছে।' মঞ্জরীও উঠে বসেছিল। ওদিকে ভূপী বোস গর্জাতে লাগল খাঁচার বাঘের মতো। আর সে কী করতে পারে? তবুও নবকৃষ্ণ সিং সাবধানতা অবলম্বন করে কাঁদী থেকে দেশে চলে এলেন। কাঁদীতে বিবাহ দিতে সাহস করলেন না। গ্রীষ্মের ছুটির কয়েকদিন পরই বিবাহের দিন। স্কুলে ছুটির জন্য দরখাস্ত পাঠালেন। দরখাস্ত নিয়ে গেল বঙ্কিম। সেখানে সে কী করে কী হল কেউ বলতে পারে না, তবে ভূপীর সঙ্গে বঙ্কিমের ছিন্ন প্রীতির সম্পর্ক গাঢ়তর হয়ে উঠল। বঙ্কিমই ফিরে এসে সব পণ্ড করে দিয়েছে।

লোকটি বললে—ওনারা জানতেন—পাত্র ডাক্তার হবে। কিন্তু জগৎ মশায় চিঠিতে লিখেছিলেন, ছেলে তার ডাক্তারী পড়বে না; কবিরাজি করবে; আমার কাছেই কবিরাজি শিখেছে। এই শুনেই মায়ের মুখ বেঁকে গেল, কন্যের মুখে বোঝা নামল।

কিন্তু নবকৃষ্ণ সিংহ সেটা চাপা দিলেন, বললেন—তাতে কী হয়েছে?

মঞ্জরীর মা বলেছিলেন—কোবরেজ? ছি ছি! একালে কোবরেজের কি মান-সম্মান আছে? পয়সাই বা কোথায়? তুমি বরং লিখে দাও ছেলেকে ডাক্তারী পড়াতে হবে।

ধমক দিয়েছিলেন নবকৃষ্ণ সিং। বলেছিলেন—তাঁর ছেলেকে তিনি যদি ডাক্তারী না পড়ান? দায়টা আমাদের না ওঁদের?

মঞ্জরী না কি কেঁদেছিল গোপনে কিন্তু সে কথা মায়ের অগোচর ছিল না। তিনি আবারও বলেছিলেন—না বাপু, একে তো ছেলের ওই দত্যির মতো চেহারা, তার উপর কোবরেজ হলে খালিগায়ে—বড় জোর পিরান চাদর গায়ে—না বাপু—।

নবকৃষ্ণ বলেছিলেন—খবরদার? সাবধান করে দিচ্ছি আমি—এ বিয়ে ভেঙে গেলে তোমার মেয়েকে আইবুড়ো থাকতে হবে। ভূপী বোস কাল সাপের বাচ্চা—তার বিষে তোমার মেয়ের জীবন নীল হয়ে গিয়েছে। ও দেখে তোমার মেয়েকে নিতে পারে শুধু জগৎ মশায়। কবিরাজ বলে তাকে উপেক্ষা করতে চেয়ো না।

চুপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন মঞ্জরীর মা। কিন্তু গজগজ তিনি করেছিলেন।

এই অবস্থায় ভূপীর সঙ্গে আপোস করে বঙ্কিম এল। ফলে আরও দুদিন প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেল। তৃতীয় দিন রাত্রে নবকৃষ্ণ ঘুমিয়েই থাকলেন বাড়িতে, বঙ্কিমকে সঙ্গে নিয়ে মা এবং মঞ্জরী গোরুর গাড়ি ভাড়া করে এসে উঠল কাঁদীতে। পরের দিন ২৭শে বিবাহের দিন ছিল পাঁজিতে।

নবকৃষ্ণ সিংহ ছুটে গিয়েছিলন বিবাহ বন্ধ করতে, কিন্তু কিছু করতে পারেন নি। তখন মঞ্জরী ভূপতির চাদরে নিজের অঞ্চল আবদ্ধ করে নবকৃষ্ণের বাসা বাড়ি পিছনে রেখে ভূপীদের জীর্ণ পুরানো চকমিলানো দালানে গিয়ে উঠেছে।

মঞ্জরীর মা ভূপতির বামপার্শ্বে মঞ্জরীকে দেখে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করে বলেছেন—দেখো তো, কী মানিয়েছে—এ যেন মদন-মঞ্জরী!

ভূপতিদের বাড়ীতে ওখানকার অভিজাতবংশীয়াদের সঙ্গে কুটুম্বিনীর দাবিতে রহস্যালাপ করে এসেছেন। একসঙ্গে দোতলার ঘরে বসে খেয়ে এসেছেন।

ঠাকুরদাস বলেছিলেন—চিটিং কেস করো তুমি, করতেই হবে।

জগবন্ধু বলেছিলেন—তার আগে ভালো পাত্রীর সন্ধান করো। ওই এগারোই তারিখেই বিয়ে। সদ্বংশের সুন্দরী পাত্রী বের করো। বিয়ে হয়ে যাক—কেস-টেস তার পরে। আমোদ-আহ্লাদ খাওয়াদাওয়া সেরে হৃষ্টচিত্তে, সবল সুস্থ দেহে আদালতে হাজির হয়ে বলা যাবে—আমাদের ঠকাতে চেয়েছিল, কিন্তু আমরা ঠকি নি। ধারা-টারাগুলো বরং দেখেশুনে রেখো অবসরমতো।

হা-হা করে হেসে উঠেছিলেন মশায়।

সকলে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল জগৎ মশায়ের মুখের দিকে। এই অপমানেও জগৎ মশায় হা- হা করে হাসছেন।

জগৎ মশায়ের সেই এক কথা—বিয়ে এগারোই। একদিন পিছুবে না। সুরেন্দ্র, তুমি আর সেতাব আমার সঙ্গে পাত্রী দেখতে যাবে। তোমরা পছন্দ করে ঘাড় নাড়লে আমি তাব হ্যাঁ বলব। খোঁজ করো কোথায় আছে গরীবের ঘরের সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। তবে বংশ সদ্বংশ হওয়া চাই।

সেতাব, সুরেন্দ্র, নেপাল এদের উৎসাহের আর সীমা ছিল না। উঠে পড়ে লেগেছিল—পাত্রী খুঁজে বের করবেই। ভালো মানুষ সেতাব হেসে বলেছিল—এ সেই রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র সদাগরপুত্র কোটালপুত্রের গল্প হল, হারা উদ্দেশে রাজকন্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু ভাই জীবন, তুই এই একটু হাস দেখি।

সেতাব চিঠি লিখেছিল তার মামার বাড়িতে। "সুন্দরী গুণবতী সদ্বংশের বয়স্থা পাত্রী থাকিলে অবিলম্বে জানাইবেন। কোনো পণ লাগিবে না। পাত্রের পিতা এখানকার নামকরা কবিরাজ জগৎ মশায়। খুব রোজগার। জমি পুকুর বাগান জমিদারি আছে। ছেলেও কবিরাজি শিখিতেছে।"

সুরেন্দ্র সত্যসত্যই চালচিঁড়ে বেঁধে বেরিয়ে পড়ার মতো বেরিয়ে পড়েছিল। জগৎ মশায়ের কাছে কয়েকটা টাকা চেয়ে নিয়ে বলেছিল—আমি একবার সদর

শহরটা ঘুরে আসি। পসার নাই এমন গরিব উকিল-মোক্তারের তো অভাব নাই। এদের মধ্যে কায়স্থও অনেক। বয়সওয়ালা আইবুড়ো মেয়ে এই সব জায়গাতে মিলবে।

জগৎ মশায় তাই পাঠিয়েছিলেন সুরেন্দ্রকে।

নেপালটা ছেলেবেলা থেকেই আধপাগলা। সন্ধানের ধারা ছিল বিচিত্র। তার বাবা ছিলেন সবরেজেষ্ট্রি আপিসের মোহরার। নেপাল তখন বাপের সঙ্গে সবরেজেষ্ট্রি আপিসে গিয়ে টাউটের কাজ করত। দলিল যাতে আগে রেজেষ্ট্রি হয় তার ব্যবস্থা করে দাখিল দিত, কাটাকুটি থাকলে কৈফিয়ত লিখে দিত, সনাক্তদার না-থাকলে সনাক্ত দিয়ে দিত। অর্থাৎ বলে দিত—"এই ব্যক্তির নাম ধাম পিতার নাম যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য—আমি শ্রীনেপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—পিতা শ্রীবিনোদলাল মুখোপাধ্যায় নিবাস নবগ্রাম—আমি ইহাকে জানি এবং চিনি।" তার তলায় সই মেরে দিত। ফি নিত দু আনা। নেপাল সবরেজেষ্ট্রী আপিসের সামনে বটতলায় বসে জনে জনে জিজ্ঞাসা করত—বলি চাটুজ্জেমশায়, আপনার খোঁজে ভালো কায়স্থ পাত্রী আছে?

—ওহে—কী নাম তোমার? গোবিন্দ পাল? কায়স্থ পাত্রীর খোঁজ দিতে পার?

—কোথায় বাড়ি শেখজীর? আপনাদের গাঁয়ের কাছাকাছি কায়স্থ আছে? বেশ সুন্দরী ভালো বংশের কন্যে আছে? বলতে পারেন?

শুধু এই নয়, পথেঘাটে পথিক পেলেই সে প্রশ্ন করত। ভালো কন্যে আছে হে কায়স্থ বংশের? শেষ পর্যন্ত লাগল একদিন। ওদের জমির ভাগজোতদার নবীন বাগ্দীকে বলেছিল—খোঁজ করিস তো নবীন! ভালো কায়স্থঘরের বড়সড় মেয়ে।

নবীন যাচ্ছিল কাটোয়া—ভার বয়ে গঙ্গাজল আনবে। নেপাল বলেছিল—যাবি তো এতটা পথ। আসিস তো নবীন খোঁজ করে!

* * *

আজকের জীবন মশায় তখন শুধু জীবন; বড় জোর জীবন দত্ত। সেদিন জীবনের পক্ষে এ আঘাত হয়েছিল মর্মান্তিক। কিন্তু ভেঙে পড়েন নাই। বরং ক্রোধে আক্রোশে বিবাহের জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। সে উৎসাহ অনেকের চোখে বেশী-বেশী মনে হয়েছিল। জীবন কিন্তু গ্রাহ্য করেন নাই। তরুণ জীবন সেদিন মনের ক্ষোভে উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠতে চেষ্টা করেছিল।

আজ বৃদ্ধ জীবন মশায় হাসলেন। আজ তিনি দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজের তরুণ জীবনের দিকে চেয়ে আছেন রসজ্ঞ দ্রষ্টার মতো।

সাপের বিষে জর্জর মানুষের জিভে নিমের মত তেতোকেও নাকি মিষ্টি লাগে। মিষ্টি রসকে মনে হয় তেতো।

নাঃ।

ভুল হল। বৃদ্ধ জীবন মশায় বার দুই ঘাড় নাড়লেন। না-না।

মঞ্জরী যে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তার সঙ্গে মঞ্জরীর প্রতি তাঁর ভালোবাসার সম্পর্ক কী? ভালোবাসার সঙ্গে কি কখনও সাপের বিষের তুলনা হয়? তিনি ক্ষোভে নিজে হাতে বিষের নল মুখে তুলে শেষ বিন্দু পর্যন্ত পান করেছিলেন।

ক্ষোভে আক্রোশে তরুণ জীবন দত্ত সেদিন দুটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

খুব সুন্দরী পত্নী ঘরে এনে সর্বোত্তম সুখে সুখী হবেন। ভালোবাসবেন তাকে রামায়ণের কাহিনীর ইন্দুমতীকে অজরাজার ভালোবাসার মতো।

আর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—ডাক্তার তিনি হবেনই।

নাই বা পড়তে গেলেন মেডিক্যাল স্কুল বা কলেজে। ঘরে বসে তিনি পড়ে ডাক্তার হবেন। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল তাঁর চোখের সম্মুখে।

এ অঞ্চলের প্রথম বিখ্যাত ডাক্তার—রঙলাল মুখুজ্জে। নতুন দিনের সূর্যের মতো তিনি তখন উঠছেন।

বিস্ময়কর মানুষ, বিস্ময়কর প্রতিভা, রোমাঞ্চকর সাধনা রঙলাল ডাক্তারের ; তেমনি চিকিৎসা!

গৌরবর্ণ মানুষ ; সবল স্বাস্থ্য, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, রঙলাল ডাক্তারকে একশো জনের মধ্যে দেখবামাত্র চেনা যেত। চেহারাতেই যাঁরা প্রতিভার স্বাক্ষর নিয়ে আসেন, তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। এ সব মানুষ দুঃসাহসী হবেই। স্বল্পভাষী কিন্তু সেই অল্প কথাগুলিও ছিল, রূঢ় ঠিক নয়, অতি দৃঢ়তায় কঠিন, সাধারণের কাছে রূঢ় বলে মনে হত। হুগলী জেলার এক গ্রামে সেকালে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। হুগলী ইস্কুলে এবং কলেজে এফ. এ. পর্যন্ত পড়ে বাপের সঙ্গে মনান্তরের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কলেজে পড়বার সময় তিনি হুগলীর মিশনারিদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন ; তাদের ওখানে যেতেন, তাদের সঙ্গে খেতেন। বাপের সঙ্গে মনান্তরের হেতু তাই।

বাপের মুখের উপরেই বলেছিলেন—জাত আমি মানি না। ধর্মকেও না। তাই ওদের ওখানে ওদের সঙ্গে খাওয়া আমি অপরাধ বলে মনে করি না। আর ধর্মই যখন মানি না তখন ধর্মান্তর গ্রহণের কথাই ওঠে না।

সেই দিনই গৃহত্যাগ করে বেরিয়েছিলেন পদব্রজে, কপর্দকশূন্য অবস্থায়। এই

জেলায় প্রথম এসে এক গ্রামে হয়েছিলেন পাঠশালার পণ্ডিত। পাঠশালার পণ্ডিত থেকে হয়েছিলেন ইস্কুল মাস্টার। এ জেলার এক রাজ-ইস্কুলে শিক্ষকের পদ খালি আছে শুনে দরখাস্ত করে চাকরি পেয়েছিলেন। এই চাকরি করতে করতেই হঠাৎ আকৃষ্ট হলেন চিকিৎসা-বিদ্যার দিকে। রাজাদের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে হয়েছিল বন্ধুত্ব। প্রায় যেতেন তাঁর কাছে। হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে রোগী দেখতেন। ডাক্তারের কাছে ডাক্তারী বই নিয়ে পড়তেন। ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করতেন—রাত্রির পর রাত্রি। এক-একদিন সমস্তরাত্রিব্যাপী আলোচনা চলত। আলোচনা থেকে তর্ক, তর্ক থেকে কলহ।

একদিন কলহ কী হয়েছিল কে জানে—সে কথা রঙলাল ডাক্তার কারও কাছে জীবনে প্রকাশ করেন নাই, ডাক্তারও করে নাই—তবে তার ফল হয়েছিল বন্ধুবিচ্ছেদ। কয়েকদিন পরেই হঠাৎ রঙলাল ডাক্তার মাস্টারি ছেড়ে তাঁর বইয়ের গাড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন এই অঞ্চলে। এখান থেকে ছ'মাইল দূরে ময়ূরাক্ষীর তীরে একটা বাঁকের উপর মুসলমানপ্রধান লাল-মাটি গাঁয়ে প্রথম রইলেন ঘর ভাড়া করে। তারপর গ্রামপ্রান্তে নদীর প্রায় কিনারার উপর একখানি বাংলো বাড়ি তৈরি করে বাস করলেন। সামনে বিস্তীর্ণ ময়ূরাক্ষীকে রেখে বারান্দার উপর বসে দিনরাত্রি সাধনা শুরু করলেন। মধ্যে মধ্যে রাত্রে বের হতেন পিশাচসাধকের মতো। কাঁধে কোদাল নিয়ে বেরিয়ে যেতেন আর নিয়ে যেতেন একটা চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ি। কবরস্তানের টাটকা কবরটি খুঁড়ে শবদেহ বের করে নিয়ে—আবার কবরটি পরিপাটি করে বন্ধ করে—শবদেহটা ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে টেনে আনতেন। তারপর দু-একদিন রঙলাল ডাক্তারকে আর বাইরে দেখা যেত না। বাংলোটার পিছনে পাঁচিল-ঘেরা বিস্তীর্ণ হাতার মধ্যে তিনি একটা কাচের-ছাদ-ওয়ালা ঘর করেছিলেন। সে ঘরে কারুর ঢুকবার অধিকার ছিল না। সেইখানে তিনি মড়া কেটে বই মিলিয়ে দেহতত্ত্ব শিখেছিলেন। কিছুদিন পরই জুটেছিল এক যোগ্য উত্তরসাধক। ময়ূরাক্ষীর ওপারের মনা হাড়ি। মনা হাড়ি ছিল ময়ূরাক্ষী ঘাটের খেয়া-মাঝি। আর একটা কাজ করত—সে ছিল শ্মশানের শ্মশানবন্ধু—দুর্দান্ত মাতাল, সব পরিচয়ের চেয়েও তার আর-একটা বড় পরিচয় ছিল—লোকে বলত মনা রাক্ষস। মনার ক্ষুধার কখনও নিবৃত্তি হত না। একবার এক হাঁড়ি ভাত নিঃশেষ করে মনা শ্মশানে এসে শ্মশানের অনতিদূরে একটা পাঁঠাকে দেখে আবার ক্ষুধার্ত হয়ে পাঁঠাটাকে ধরে ঘাড় মুচড়ে মেরে ওই চিতার আগুনেই সেটাকে পুড়িয়ে শেষ করেছিল। এই মনাই হল রঙলাল ডাক্তারের প্রথম ভক্ত। বছর দুয়েক পর থেকে মনাই হয়েছিল তাঁর পাচক। তার হাতেই তিনি খেতেন।

এই মনাই তাঁকে শব সংগ্রহে সাহায্য করত। ময়ূরাক্ষীর জলে ভেসে-যাওয়া শব তুলে এনে দিত। অনেক সময় শ্মশানের পরিত্যক্ত শব এনে দিত। এইভাবে বৎসর পাঁচেক সাধনার পর রঙলাল ডাক্তার একদিন ঘোষণা করলেন—আমি ডাক্তার। যে রোগ এখানে কেউ সারাতে পারবে না, সেই রোগী আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি সারিয়ে দেব।

কিছুদিনের মধ্যেই এই ঘোষণাকে তিনি সত্য বলে প্রমাণিত করলেন। লোকে বিস্মিত হয়ে গেল তাঁর প্রতিভায়। বললে, ধন্বন্তরি। ডাক্তার পালকি কিনলেন কলে যাওয়ার জন্য।

মনা বললে—উঁহু! একটা ঘোড়া কিনে ফেলো বাবা। মানুষের পায়ে আর ঘোড়ার পায়ে!

রঙলাল বললেন—দূর বেটা! মানুষের কাঁধে আর ঘোড়ার পিঠে? মানুষের কাঁধে আরাম কত?

—আজ্ঞে?

—সে তুই বুঝবি না রে বেটা! ঘোড়ায় চড়ে পড়ে হাড়গোড় ভাঙব?

জীবন দত্ত সেদিন আকাশকুসুম কল্পনা করে নাই। তাঁর আদর্শ ছিল বাস্তব এবং সজীব। ডাক্তার হয়ে প্রচুর প্রতিষ্ঠা অর্জন করে সোনার গহনায় সুন্দরী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে একদিন তার কাঁদী যাবার ইচ্ছা ছিল। সে যাবে বড় সাদা ঘোড়ায় চেপে, স্ত্রী যাবে কিংখাবে মোড়া পালকিতে।

মুরশিদাবাদ যাবার অছিলায় পথে কাঁদীতে ভূপী বোসের ফাটল-ধরা বাড়ির দরজায় ঘোড়াটার রাশ টেনে দাঁড় করিয়ে বলবে—আজকে রাত্রির মতো একটু বিশ্রামের স্থান হবে কি? ইচ্ছে করেই প্রহরখানেক রাত্রে গিয়ে উপস্থিত হবে ওদের বাড়িতে।

স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবে অন্দরে মঞ্জরীর কাছে।

সে গিয়ে বলবে—আজ রাত্রির মতো থাকতে আমাদের একটু জায়গা দেবেন? আপনি তো আমাদের আপনার লোক। সম্বন্ধটা সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের বোনপো বউয়ের বোনঝি জামাইয়ের মতো হলেও সম্বন্ধ তো বটে!

তারপর যা হবার আপনি হবে।

বিবাহের পর কিন্তু সব যেন বিপরীত হয়ে গেল। জীবন দত্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সেদিন, কেন এমন হল?

বারো

সেদিন আশ্চর্য মনে হয়েছিল—আজ কিন্তু আশ্চর্য মনে হয় না।

বিবাহের পূর্বে জীবনের যে উচ্ছ্বাস শুক্লপক্ষের চতুর্দশীর সমুদ্রের মতো ফুলে ফেঁপে উঠেছিল, বিবাহের দিনেই সেই উচ্ছ্বাস স্তিমিত নিরুৎসব বিষণ্ণ হয়ে গেল প্রতিপদ-দ্বিতীয়ার ভাটার সমুদ্রের মতো। জীবনে পূর্ণিমা তিথিটা যেন এলই না কোনোদিন। অমাবস্যাই কি এসেছে? না, তাও আসে নাই আজও। একমাত্র সন্তান বনবিহারীর মৃত্যুতেও না।

এগারোই আষাঢ়েই বিবাহ হয়েছিল। কন্যার এদেশে অভাব হয় না।

কন্যা এ দেশে দায়ের সামিল। যা দায় তাই দুর্বহ বোঝা। সবল মানুষ বোঝা বইতে পারে, দুর্বল মানুষ বোঝা নামাতে গিয়ে ফেলে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। সংসারে দুর্বলের সংখ্যাই তো বেশী!

দশটি কন্যার খোঁজ এসেছিল। ছটি কন্যাকে পরিচয় শুনেই নাকচ করেছিলেন জগৎ মশায়। চারটি কন্যা চাক্ষুষ করে সদর শহরের এক বৃদ্ধ মোক্তারের পিতৃমাতৃ-হীনা ভাগ্নীকে পছন্দ করলেন। পণ হরিতকী। মেয়েটির নাম কৃষ্ণভামিনী। মেয়েটি তখনকার দিনে অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছিল। চোদ্দ বছর উত্তীর্ণ হয়ে মাস দুয়েক পরেই পনেরোয় পড়বে। এ মেয়ের সন্ধান এনেছিল সুরেন্দ্র।

বাইরে ঘরে উৎসব সমারোহের কোনো ত্রুটি ছিল না। জগৎ মশায়ের তখন কবিরাজ হিসেবে খ্যাতিতে, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হিসেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠায় যাকে বলে একই আকাশে চন্দ্রসূর্যের একসঙ্গে উদয়। জীবন তাঁর একমাত্র সন্তান, তার উপর এই বিচিত্র অবস্থায় বিবাহ। কাঁদীতে মঞ্জরী এবং ভূপী বোসের বিবাহ হয়েছিল যত চুপিচুপি এখানে জীবনের সঙ্গে কৃষ্ণভামিনীর বিবাহ তত উচ্চ সমারোহে নহবত থেকে ঢোল বাঁশি এমন কি ব্যাণ্ড বাজনা বাজিয়ে হয়ে গেল। ওই ব্যাণ্ড বাজনা আনা হয়েছিল কাঁদী থেকে। রাঢ় অঞ্চলে প্রথম ব্যাণ্ড বাজনার দল হয়েছিল মুরশিদাবাদে, তারপর কাঁদীতে। নবগ্রাম থেকে কাঁদী দশ ক্রোশ পথ; এখানকার বাজনার শব্দ দশ ক্রোশ অর্থাৎ বিশ মাইল অতিক্রম করে সেখানে নবদম্পতির নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটালেও বাজনাদারদের মারফত খবরটা পৌছুবার কথা। এই এত সমারোহের মধ্যেও পাত্র জীবন যখন কন্যার বাড়িতে পৌছুল তখন সে ম্লান স্তিমিত হয়ে গেছে। বাসরে গিয়ে জীবন অবসন্ন ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল, হাত জোড় করে বলল—আমাকে মাফ করবেন, আমার শরীরটা বড় খারাপ করছে।

তবুও অবশ্য ছাড়ে নি মেয়েরা। গানও গাইতে হয়েছিল, সেকালের নিয়ম অনুযায়ী কৃষ্ণভামিনীকে কোলে বসাতেও হয়েছিল।

কৃষ্ণভামিনীর রঙ ছিল পাকা সোনার মতো। মুখশ্রী কোমল এবং স্নিগ্ধ হলে তাকে ডাকসাইটে সুন্দরী বলা যেত।

তেরো বছরের কৃষ্ণভামিনী যেদিন বধূবেশে মশায়দের ঘরে পদার্পণ করে, সেই দিনই তার নামকরণ হয়েছিল আতর-বউ। কৃষ্ণভামিনীর রঙ দেখে মানুষের চোখ ঝলসে গিয়েছিল। নামকরণ করে জীবনের পিসীমা বলেছিলেন—তোমার স্বভাবের সৌরভে ঘর ভরে উঠুক।

ফুলশয্যার রাত্রিও কেটেছিল একটি প্রচ্ছন্ন উদাসীনতার মধ্যে। জীবন হেসেছিল, ঠাকুমা বউদিদির পরিহাস-রসিকতায় যোগও দিয়েছিল, কিন্তু সে যেন প্রাণহীন পুতুলনাচের পুতুলের মতো। আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও মনে পড়ছে শোধ নেওয়ার আনন্দ কেমন যেন নিভানো প্রদীপের মতো কালো হয়ে গিয়েছিল। নিগূঢ় একটা বেদনা তাকে যেন অভিভূত করতে চেয়েছিল।

বিবাহ করেছিলেন তিনি অপমানের প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু বিবাহ করে বুঝলেন, অপমানের শোধ নেওয়া হয় নি; শুধু বিয়ে করাই হয়েছে।

এ সংসারে অপমান মাত্রেরই গ্লানি মর্মদাহী, সে মর্মদাহ একমাত্র প্রতিশোধের উল্লাসেই মুছে যায়; তার অন্তরে জলে ওঠে যে আগুন, সেই আগুনে প্রতিপক্ষকে পুড়িয়ে ছাই করে শান্ত হয়। না পারলে সেই আগুনে নিজেই তিলে তিলে পুড়ে ছাই হয়। বড় মানুষ যাঁরা, মহৎ যাঁরা তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা অপমানের আগুনকে ক্ষমার শান্তিবারি বর্ষণে নিভিয়ে ফেলেন।

জীবন মশায় মহৎ নন—নিজে তাই বলেন। তাঁর মনের আগুন তাই বোধ করি আজও জ্বলছে। বাইরে দেখে কেউ বুঝতে পারেনা। বুঝতে তিনি দেন না। বুঝতে পারে একজন। সে আতর-বউ। সে প্রথম দিন থেকেই বোঝে।

জীবনের প্রচ্ছন্ন বেদনা সংসারে সকলের কাছে প্রচ্ছন্ন থাকলেও নতুন বধূটির অগোচর ছিলনা। শুধু তাই নয়, বধূটিকেও আক্রমণ করলে সংক্রামক ব্যাধির মতো। ফুলশয্যার রাত্রেই জীবন দত্তের মনের বেদনা নতুন বউয়ের মনে আঘাত করে প্রতিহত হয়ে ফিরে এল।

ফুলশয্যার শেষ রাত্রে জীবন বধূকে আকর্ষণ করেছিল—নিজের বুকের কাছে। বধূটি তিক্ত কঠিন স্বরে বলে উঠেছিল—আঃ, ছাড়ো!

—কেন? কী হল?

—কী হবে? ভালো লাগে না।

—ভালো লাগে না?

—না। ছেড়ে দাও, পায়ে পড়ি তোমার। ছেড়ে দাও।

—কী হল?

—কী হবে? আমাকে দয়া করে বিয়ে করেছ, উদ্ধার করেছ। দাসী হয়ে এসেছি—দাসীর মতো খাটব। দু মুঠো খাব। আদর তো আমার পাওনা নয়। ছেড়ে দাও আমাকে।

আজও চলছে ওই ধারায়।

আতর-বউ আজ আগ্নেয়গিরি; অগ্ন্যুদ্গার আরম্ভ হলে থামে না।

আতর-বউয়ের দোষ কী? আতর-বউয়ের বুকে আগুন লেগেছে তাঁরই বুকের আগুনের সংস্পর্শে।

* * *

তবু এরই মধ্যে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ একটি সংসার।

ওই যে আতর-বউ বলে—কত নাম ডাক ছিল—দুহাতে রোজগার করেছ, চার হাতে খরচ করেছ—এর অর্থই তো হল যশ-প্রতিষ্ঠা অর্থ-সম্পদ! সাধারণ মানুষের এ ছাড়া আর কী চাই?

সাজানো সংসার—তিন কন্যা এক পুত্র। সুরমা-সুষমা-সরমা। ছেলে বনবিহারী। তারা পেয়েছিল মায়ের বর্ণচ্ছটা, বাপের স্বাস্থ্য।

খ্যাতি প্রতিষ্ঠাও অনেক হয়েছিল; সে খ্যাতি কিশোর-জীবনের আকাঙ্ক্ষার পরিমাপে সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদতুল্য না হলেও দিগন্তজোড়া বিলের তুলনায় মাঝারি আকারের পরিচ্ছন্ন একটি শখের পুষ্করিণী একথা নিঃসন্দেহ বলা যায়। যার বাঁধানো ঘাট আছে, জলে মাছ আছে, নামেও যে পুষ্করিণীটি কর্তার অভিপ্রায় অনুযায়ী শ্যামসায়র বা শ্যামসরোবর। জলও তার নির্মল ছিল, তপ্ত গ্রামবাসীরা তাতে অবগাহন করে তৃপ্তও হয়েছে। তৃষ্ণার্তেরা তার জল পান করে শ্যামসায়রের অধিকারীকে মুক্তপ্রাণে আশীর্বাদও করেছে। কিন্তু দিগন্তবিস্তৃত বিলের তুলনায় সে কতটুকু কত অকিঞ্চিৎকর—তা সেই অধিকারীই জানে যে এই বিলের মতোই একটি বিল কাটাতে চেয়েছিল। যার কল্পনা ছিল ওই বিলের ঘাটে ভিড়বে কত দেশদেশান্তরের বড় বড় বজরা নৌকা ছিপ!

আজ এই পরিণত বয়সে জীবনের সকল মোহই কেটে গেছে। লাল নীল সবুজ বেগুনে—সাত রঙের ইন্দ্রধনু তিনি আর দেখতে পান না। আজ চোখের সামনে মাত্র দুটি রঙ আছে। একটি সাদা আর অন্যটি কালো। আলো আর অন্ধকার। তাই

আশ্চর্য হয়ে ভাবেন—সেদিন কী করে জেগেছিল ইন্দ্রধনুর মতো এমন বর্ণ-বৈচিত্র্যময় আকাঙ্ক্ষা।

এ প্রশ্ন মনে উঠতেই জীবন দত্ত হাসেন। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেন—কেন? বারবার এ প্রশ্ন মনে ওঠে কেন তোমার? এ প্রশ্ন ওঠবার তো কথা নয়।

তুটি রঙ—দিন ও রাত্রির সাদা ও কালো রঙ তুটি ছাড়া বাকি রঙগুলি তুমি নিজেই তো ধুয়ে মুছে দিয়েছ হাতে। অক্ষম লোকের রঙগুলি ধুয়ে যায় ব্যর্থতায়, বেদনার চোখের জলে। তুমি ধুয়ে মুছে দিয়েছ মিথ্যা বলে; তোমার মহাগুরু জগৎ মশায়ের শিক্ষার কথা ভুলে যাও কেন? তাঁর শিক্ষার মধ্যে তো নিজেকে সেদিন ডুবিয়ে দিয়েছিলে তুমি।

নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করে নিয়ে ঘাড় নাড়লেন জীবন মশায়। বারবার দাড়িতে হাত বুলালেন। ঠিক! ঠিক!

হঠাৎ একটা আলোর ছটা এসে চোখে বাজল। আলো? উঃ—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। রাত্রি নেমেছে। খেয়াল ছিল না। পুরনো কথা মনে করতে গিয়ে বর্তমানের কথা ভুলেই গিয়েছেন তিনি।

আলোটা আসছে ভিতর বাড়ি থেকে, হয় ইন্দির, নয় নন্দ আলো নিয়ে আসছে। না-তো। পায়ের দিকে কাপড়ের ঘের দেখে মনে হচ্ছে—মেয়েছেলে। আতর বউ আসছেন। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন জীবন মশাই। অসময়ে আতর-বউয়ের আসাটা তাঁর কাছে শঙ্কার কারণ।

আতর-বউই বটে। আলোটা সামনে নামিয়ে দিয়ে আতর-বউ কাছে দাঁড়ালেন। দীর্ঘাঙ্গী গৌরবর্ণা আতর-বউ, কপালে সিঁন্দুর টিপটি আজও পরেন, সিঁথিতে সিন্দুর ডগ-মগ করে। কাঠোরভাষিণী আতর-বউ সুযোগ পেলে বোধ করি একটা রাজ্যশাসন করতে পারতেন। জীবন মশায় এ-কথা অনেকবার বলেছেন রসিকতা করে। আতর-বউ উত্তর দিয়েছেন—একটা মানুষকেই আনতে পারলাম না হাতের মুঠোয়, তো একটা রাজ্য! আতর-বউ উত্তর দিয়ে চিরকাল এক বিচিত্র হাসি হাসেন। আতর বউ আলোটি নামালেন দাওয়ার উপর।

—কী খবর? মুখ তুলে বললেন জীবন মশায়। আতর-বউয়ের মুখখানি বড় মধুর লাগছে আজ। মমতায় যেন বর্ষার অভিষিক্ত ধরিত্রীর মতো কোমল।

আতর-বউ ঈষৎ উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—তুমি আজ চা খাও নি?

—ভুলে গিয়েছি।

ভুলে গিয়েছ? হাসলেন আতর-বউ।—চা খেতে ভুলে যায় মানুষ! নন্দ

ছোঁড়া গিয়ে বললে—তামাক পর্যন্ত খাও নি। এসে ডেকেছে, সাড়া দাও নি! শরীর ভালো আছে তো? না—মন ভালো নাই? কী হল তোমার?

অপ্রতিভের মতো হেসে জীবন মশায় বললেন—হয় নি কিছু। এমনি ভাবছিলাম। নবগ্রামে রতন মাস্টারের ছেলেকে দেখে এলাম; পথে নিশিঠাকরুন ডেকে দেখালে তার ভাইঝিকে। রতন মাস্টারের ছেলের রোগ খুবই কঠিন, তবে জোর করে কিছু বলা যায় না। কিন্তু এই মেয়েটি—এর আর—।

ঘাড় নাড়লেন ডাক্তার। আবার বললেন—এই কচি মেয়ে—বড় জোর পনের বছর বয়স—এরই মধ্যে দুটি সন্তান হয়েছে। নিশি দেখিয়ে বললে—চাঁদের মতো ছেলে। আমি দেখলাম চাঁদ নয়, যম। মাকে খেতে এসেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

—নিশিকে বলে এলে নাকি? শিউরে উঠলেন আতর-বউ।

—না। তবে নিশি বুঝতে পারবে। বলেছি জলবারণ খেতে হবে। এছাড়া ওষুধ নই। কে?

আতর-বউয়ের পিছনে কেউ এসে দাঁড়াল। ও—ইন্দির!

—হাঁ। ওকে চা করতে বলে আমি চলে এসেছিলাম। নাও চা খাও! ভালো মনুষ তুমি। যে চা নেশার জিনিস—তা না খেলেও তোমার কষ্ট হয় না! তামাক খেতে ভুলে যাও?

ইন্দির চায়ের পাথরের গেলাসটি এগিয়ে দিল। আতর-বউ বললেন—তুমি খাও, আমি দাঁড়িয়ে আছি। গেলাস আমি হাতে করে নিয়ে যাব। ইন্দিরের হাতে শনি আছে;ছ মাসে তিনটে পাথরের গেলাস ভাঙলো। ইন্দির, তাকের ওপর বড় এলাচ গুঁড়ে করা আছে, নিয়ে আয়।

ইন্দির চলে যেতেই আতর-বউ বললেন—তুমি আমাকে লুকোলে। ওই হাসপাতালের ডাক্তারের কথায় তুমি খুব দুঃখ পেয়েছ। নতুন কালের ছেলেমানুষ ডাক্তার, অহঙ্কার অনেক। কাকে কী বলেছে জানে না। আমি তো জানি তোমার নিদান মিথ্যে হয় না। মতির মা যখন মরবে তখন বুঝতে পারবে ছোকরা ডাক্তার। আমিও তোমাকে ওবেলা কতকগুলো খারাপ কথা বললাম। মুখপোড়া শশী, যে এইখানে হাত-দেখা শিখলে, কম্পাউণ্ডারি শিখলে সে এসে বলে কিনা, হাত-পা ভাঙাতে নিদান হাঁকা তো শুনি নি, বুঝিও না। ও যে কেন মশায় বলতে গেলেন কে জানে? শশীর মুখে এই কথা শুনে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমি তক বলেছি, এ কথা তুই কোন মুখে বললি শশী? বলতে লজ্জা লাগল না? কল্কিকাল, নইলে তোর জিভ খসে যেত।

জীবনমশায় হাসলেন। কিন্তু কথার কোন উত্তর দিলেন না। শশীর উপর আজ অত্যন্ত চটেছে আতর-বউ।

আতর-বউ প্রতীক্ষা করলেন স্বামীর উত্তরের। উত্তর না পেয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু ভালো দেখতে পেলেন না স্বামীর মুখ। শ্রাবণ মাসের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি—তাঁর পাশে অনেকখানি খোলা জায়গার মধ্যে বারান্দাটির উপর একটি পুরানো লণ্ঠন যেটুকু আলোকচ্ছটা বিস্তার করেছিল সে নিতান্তই অপর্যাপ্ত। তার উপর আতর-বউয়ের দৃষ্টি বার্ধক্য-ম্লান। হাত বাড়িয়ে আলোটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। তারপর ঝুঁকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রুষ্ট স্বরেই বলে উঠলেন—হাসছ তুমি? তোমার কি গণ্ডারের চামড়া? হাসি দেখে অকস্মাৎ চটে উঠলেন আতর-বউ।

ডাক্তার কিন্তু আরও একটু হেসে বললেন—তা ছাড়া করব কী বলো? কাঁদব?

কাঁদবে? হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল। আতর-বউ বললেন—কাঁদবে? তুমি? চোখে জল তো বিধাতা তোমাকে দেয় নাই। কি করে কাঁদবে তুমি? যে মানুষ নিজের ছেলের নিদান হাঁকে; মরণের সময় বাইরে বসে থাকে, বলে, কী দেখব? এ আমি ছ মাস আগে দেখে রেখেছি—

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন—থামো, আতর-বউ থামো। তোমাকে মিনতি করছি। থামো তুমি। আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও। রতনবাবুর ছেলেকে দেখে এসেছি, আমাকে একটু ভাবতে দাও। বুঝতে দাও!

আতর-বউ যেন ছিটকে উঠে পড়লেন ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো বললেন—অন্যায় হয়েছে। আমার অন্যায় হয়েছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসাই আমার অন্যায় হয়েছে। আমার অধিকার কী? আমাকে এনেছিলে তোমরা দয়া করে, মামার বাড়ীর মা-বাপ মরা ভাগ্নী, বিনা পণে দয়া করে ঘরে এনেছিলে দাসী- বাঁদীর মতো খাটাতে—আমার সেই অধিকার ছাড়া আর কোনো অধিকার তো নাই। একশোবার অন্যায় করেছি, হাজারবার। মাফ করো আমাকে।

উঠে চলে গেলেন তিনি অন্ধকারের মধ্যে।

এই তো আতর-বউ! চিরকালের সেই আতর-বউ! হাসলেন ডাক্তার। কিন্তু সে হাসি অর্ধপথেই একটা বিচিত্র শব্দে বাধা পেয়ে থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল স্থানটা। ডাক্তার এবার সশব্দে হেসে উঠলেন। আতর-বউ লণ্ঠনটার শিখা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন—বোধ হয় মাত্রা অনেক পরিমাণে

ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কথাবার্তার উত্তেজনার মধ্যে কেউই লক্ষ্য করেন নি। সশব্দে লণ্ঠনের কাচটা ফাটিয়ে দপ করে নিভে গেল আলোটা।

* * *

সশব্দে হাসিও হঠাৎ থেমে গেল তাঁর। মনের ছিন্ন চিন্তা আবার জোড়া লাগল। আতর-বউ বলে গেলেন—বিধাতা তাঁকে চোখের জল দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান নি। কথাটা মনে হতেই, হাসি থেমে গেল তাঁর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তার মনে মনেই বললেন—দিয়েছিলেন, অনেক অজস্র—তুমি অনুমান করতে পার না আতর-বউ, সমুদ্রের মতো অথৈ লবণাক্ত চোখের জল ভগবান তাঁর দুটি চোখের অন্তরালে অন্তরের মধ্যে দিয়েছিলেন। তার সংবাদ তুমি জান না। কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রের জ্ঞানযোগ অগস্ত্য ঋষির মতো গণ্ডূষে সে সমুদ্র পান করে নিঃশেষ করে দিয়েছে। অন্তর এখন শুষ্ক সমুদ্রগর্ভের মতো বালুময় প্রান্তর। অনেক প্রবাল অনেক মণিমাণিক্য হয় তো আছে; কিন্তু তার সর্বাঙ্গে আছে চোখের জলের লবণাক্ত স্বাদ। তুমি তো কোনোদিন সে বুঝলে না, বুঝতে চাইলে না! তুমি, মঞ্জরী—তোমরা দুজনেই যে মৃত্যু; অমৃত তো তোমরা চাও নি কোনো দিন। চাইলে—তাঁর কাছে আসতে, বুঝতে পারতে। আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জীবন ডাক্তার।

মঞ্জরী আতর-বউকে বা শুধু দোষ দিচ্ছেন কেন তিনি? তাঁর নিজের কথা? তিনি নিজে? নিজেই কি তিনি জীবনে অমৃত পেয়েছেন বলে অনুভব করেছেন কেনোদিন? এ কথা অন্য কেউ জানে না, জানতেন দুজন, তাঁরা আজ নেই। একজন তাঁর বাবা, প্রথম শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু।

জগৎ মশায় জানতেন তাঁর এ অতৃপ্তির কথা। অমৃত-অপ্রাপ্তিই হল অশান্তি অতৃপ্তি। মৃত্যুকালে জগৎ মশায় একথা তাঁকে ডেকে বলেছিলেন। জীবনকে চিকিৎসা-শাস্ত্রে দীক্ষা দিয়ে আরও দশবৎসর তিনি বেঁচে ছিলেন! মৃত্যুকালে জ্ঞানগঙ্গা গিয়ে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেছিলেন। মা তখন গত হয়েছেন। তিনিও খানিকটা জানতেন। কিন্তু তিনি এ অতৃপ্তির হেতু জানতেন না; তিনি হেতু সন্ধান করেছিলেন একেবারে বাস্তব সংসারে। বাবার মতো গভীরভাবে বুঝে তার অন্তর খুঁজে সন্ধান করেন নাই।

বিবাহের পর জীবন আয়ুর্বেদ শিক্ষায় মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিল! যে পড়াশুনা তার ইস্কুল-জীবনে ভালো লাগে নাই সেই পড়াশুনায় যেন ডুবে গিয়েছিল। জগৎ মশায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। জগৎ মশায় বলেছিলেন—ইস্কুলে পড়াশুনার রকমসকম দেখে ভাবতাম জীবনের বুদ্ধি বোধ হয় মোটা। কিন্তু আয়ুর্বেদে দেখছি

ওর বুদ্ধি ক্ষুরধার। তবে—। থেমে গিয়েছিলেন তিনি—ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বলেছিলেন—তবে এর সঙ্গে গানবাজনা শেখো। আনন্দ করো। গান করো। ভগবানের নাম না করলে চিকিৎসকের বৃত্তি নিয়ে বাঁচবে কী করে ?

ঠাকুরদাস মিশ্র সে সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেছিলেন, ওহে ওটা যে ওর রক্তে রয়েছে। বংশগত বিদ্যেতে তাই হয়। আমার ওই হারামজাদা বেটাটার বিবরণ জান ?

অর্থাৎ সুরেন্দ্রের। উচ্ছ্বাসভরে বলেই গেলেন ঠাকুরদাস মিশ্র।

—হারামজাদা বেটা মদ ধরেছে তা তো জান। লেখাপড়াও ছেড়েছে অনেক দিন। ভেবেছিলাম ও বেটাকে আর জমিদারী সেরেস্তার কাজে লাগাব না। পূজো-আর্চার মন্তরগুলো মুখস্থ করিয়ে বেটাকে লাট দেবগ্রামের বিশ্বেশ্বরী মায়ের পূজারী করে দেব। ওখানকার পূজারী বেটার বংশ নাই। পূজারীই সেবায়েত, পনেরো বিঘে জমি আছে চাকরান, তা ছাড়া বিশ্বেশ্বরী হল রেশমের পলু পোকা চাষের 'রাখে হরি মারে কে'র মতো দেবতা! বিশ্বেশ্বরীর পূজো না দিয়ে পুষ্প না নিয়ে ও চাষই হয় না। পাওনা অঢেল। তা কিছুতেই না। ও বলে—ও মন্তর আমার মুখস্থ হবে না। তারপর ব্যাপার শোনো—বেটা সেদিন দশবছর আগের এক জমাওয়াশীল বাকি নিয়ে এসে আমাকে দেখিয়ে বলে—এটাতে যে ভুল রয়েছে। শোনো কথা! ভুল অবিশ্যি আমি জানি—ও ভুল আমারই কলমের ডগায় পুকুর লোপাট। কিন্তু দশ বছরের মধ্যে কেউ ধরতে পারে নি। জমিদারের ঘরে আর ধরাও পড়বে না। কিন্তু বেটার বিদ্যে দেখো। গোপনে গোপনে পুরানো কাগজ দেখে হিসেব বুঝেছে, বাপের ভুল ধরেছে। আমি তো বেটার মাথায় চড় মেরে বললাম, চুপ রে বেটা চুপ!

ঠাকুরদাস মিশ্র পুত্রগৌরবে যেভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন জগৎ মশায় তা হন নি। ঠাকুরদাস আঘাত পেতে পারে বলে শুধু একটু হেসেছিলেন, বাধাও দেন নি। শুধু একটু হেসেছিলেন। জগদ্বন্ধু ছিলেন জ্ঞানযোগী। সেই বাপের ছেলে এবং তাঁরই শিষ্য হয়েও আসল বস্তুটি তিনি আয়ত্ত করতে পারলেন না।

বাবা বলেছিলেন—আয়ুর্বেদে ওর বুদ্ধি ক্ষুরধার।

বুদ্ধি তাঁর ক্ষুরধার ছিল, রোগ উপসর্গ এমন কি রোগ ও উপসর্গের পশ্চাতে অন্ধ বধির পিঙ্গলকেশী মৃত্যু তার হিমশীতল হাত দুখানি জীবনকে গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছে, কি হয় নি, তাও তিনি অনুমান করতে পারতেন। আজ তুমি তরুণ ডাক্তার জীবন ডাক্তারকে উপহাস করেছ, তিরস্কার করেছ, নতুন কালের চিকিৎসা-

বিজ্ঞানের অহঙ্কারে তাকে অবহেলা করেছ। করো, কিন্তু সেকালে কেউ সাহস করত না।

স্মৃতিচারণ করতে করতে জীবনমশায় যেন প্রাচীন, স্থবির অজগরের মত ফুলে উঠলেন; একটা তরুণ বিষধর তার তারুণ্যের ক্ষিপ্রগামিতা আর বিষদন্তের তীক্ষ্ণতার অহঙ্কারে ছোবলের পর ছোবল মেরে গেল; বার্ধক্যের জীর্ণতায় তাঁর বিষদাঁত ভেঙে গিয়েছে, স্থবিরতায় তাঁর বিপুল দেহে গতিবেগ মন্থর হয়েছে; অগত্যা তাঁকে সহ্য করতে হল।

নারায়ণ! নারায়ণ! পরমানন্দ মাধব হে!

বেশ স্ফুট স্বরেই উচ্চারণ করলেন জীবন ডাক্তার।

মৃত্যুকালে গঙ্গাতীরে জগদ্বন্ধু মশায় তাঁকে বলেছিলেন—জীবন, বলো আমাকে যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে?

জীবন মশায় নিজেকে আর বেঁধে রাখতে পারেন নি, রুদ্ধ আবেগ চোখের জলের ধারায় পথ করে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। মুখে বলতে কিছু পারেন নি।

জগৎ মশায় বলেছিলেন—তুমি কাঁদছ? তোমার দীক্ষা আয়ুর্বেদে। জীবন এবং মৃত্যুর তথ্য তো তুমি জান; তবু কাঁদছ? ছি! আমাকে দুঃখ দিয়ো না; তুমি কাঁদলে এই শেষ সময়ে আমাকে বুঝে যেতে হবে যে আমার শিক্ষা সার্থক হয় নি। তা ছাড়া, মৃত্যুতে আমার তো কোনো দুঃখ নাই, আক্ষেপ নাই। পরম শান্তি অনুভব করছি আমি, সুতরাং তুমি কাঁদবে কেন?

জীবন ডাক্তারের চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল।

জগৎ মশায় বলেছিলেন—আমি জানি তোমার মনে কোথায় আছে গভীর অতৃপ্তি। থাকা উচিত নয়। তোমার জীবনের কোনো দিক তো অপূর্ণ নয়!

কয়েক মুহূর্ত পরে বলেছিলেন—তবু আছে, রয়েছে! অবশ্য এর উপর মানুষের হাত নাই আমি জানি। কিন্তু এ অতৃপ্তি থাকতে তো অমৃত পাবে না বাবা।

পরমানন্দ মাধবকে অনুভব করতে পারবে না। অতৃপ্তি অবশ্য কামনার বস্তু না পেলে মেটে না। কিন্তু কামনা যে কী তাই কি কেউ জানে? শোনো, আশীর্বাদ করে যাই কামনার বস্তু পেয়েই যেন তোমার সকল অতৃপ্তি মিটে যায়, অমৃত আস্বাদন করতে পার। দুঃখে স্থির থাকতে পার, পৃথিবীতে মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে অনুভব করতে পার; পরে আনন্দে সুখে কাঁদতে পার। নাই পাও তৃপ্তি। তবে বাবা জ্ঞানযোগে ডুব দিয়ো। ওই আয়ুর্বেদে। বড় কঠিন ও শুষ্ক পথ। হোক। জ্ঞান হল অগস্ত্য ঋষি; গণ্ড যে দুঃখের সমুদ্র পান করে নেন। স্বেচ্ছায় সৃষ্টির কল্যাণে চলে যান দক্ষিণে।

জ্ঞানযোগ-রূপী অগস্ত্যের গণ্ডুষপানে শুকিয়ে-যাওয়া সমুদ্রের বালির মতো তাঁর জীবন বালুময়। কিন্তু তার প্রতি বালুকণায় সমুদ্রের জলের লবনাক্ত স্বাদ। আতর-বউ কোনো দিন একবার আস্বাদন করেও দেখলেন না, কেবল মরুভূমি বলেই তাঁকে উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসে উত্তপ্ত করে তুললেন।

* * *

বাপের মৃত্যুর পর জ্ঞানযোগেই নিজেকে ডুবিয়ে দেবার জন্য জীবন দত্ত ডাক্তারি পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তখন বিলাতী চিকিৎসার অভিনবত্বে দেশ চকিত হয়ে উঠেছে। রঙলাল ডাক্তারের পালকির বেহারাদের হাঁকে হাঁকে দেশের পথঘাট মুখরিত; নবীন মুখুজ্জে, ডাক্তারের ঘোড়ার খুরের ধুলোয় পথের দুই ধার ধূসর। শুধু পথঘাটেই নয়, কবিরাজদের মনের মধ্যেও এর সাড়া উঠেছে। এই বিদ্যা আগে থেকেই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, বাপের মৃত্যুর পর তিনি সুযোগ পেলেন।

বৃদ্ধ জীবন মশায় অন্ধকারের মধ্যে আবার একবার হাসলেন, দাড়িতে হাত বোলালেন।

হায়রে হায়! মানুষ সংসারে নিজেকে নিজে যত ছলনা করে, প্রতারণা করে, মিথ্যা বলে তার শতাংশের একাংশও বোধ হয় পরকে করে না।

বৃদ্ধ বারবার মাথা নাড়লেন। ছোট ছেলের অপটু মিথ্যা বলার চাতুরীকে ধরে ফেলে কতকটা হতাশায়, কতকটা স্নেহবশে, কতকটা ধরে-ফেলার আনন্দে যেমন প্রবীণেরা মাথা নাড়ে, তেমনিভাবেই মাথা নাড়লেন বারবার। সেদিনের আত্ম-প্রতারণার কথাই আজ ধরে ফেলেছেন তিনি।

শুধু জ্ঞানলাভের জন্য, জ্ঞানযোগের মধ্যে নিজেকে সমাহিত করবার জন্য ডাক্তারি শিখতে চেয়েছিলেন নিজে ঘোড়ায় চড়ে, আতর-বউকে পালকিতে চাপিয়ে কাঁদীতে ভূপী বোসের বাড়ি যাওয়ার কামনার তাড়নার কথাটা মিথ্যা?

শুধু কি এই? জগৎ মশায়ের মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই কতকগুলি বাঁধা ঘর কি হাতছাড়া হয় নাই তাঁর? লোকে বলে নাই—এইবার মশায়দের বাড়ির পশার গেল?

নবগ্রামে কি প্রথম অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার এসে বসে নি? তার প্রায় মাস দুয়েক পর ওই কিশোরের বাপ কৃষ্ণদাসবাবুর আশ্রয়ে কি হরিশ ডাক্তার আসে নি? তিনি কি নিজেই শঙ্কিত হন নি?

গুরু রঙলাল ডাক্তার এর অন্য অর্থ করেছিলেন। বলতেন—জীবন, তোমাকে আমি ভালোবাসি কেন জান? তোমাকে ভালোবাসি তুমি জীবনে হার মান নি এইজন্যে। এ দেশের কবিরাজরা হার মেনে এই অ্যালোপ্যাথিকে শুধু ঘরে বসে

শাপ-শাপান্তই করলে। না পারলে নিজেদের শাস্ত্রের উন্নতি করে এর সঙ্গে পাল্লা দিতে, না চাইলে এর মধ্যে কী আছে সেই তত্ত্বকে জানতে। আধমরারা এমনি করেই মরে হে। তুমি জ্যান্ত মানুষ। তাই তোমাকে ভালোবাসি। হার মানার চেয়ে আমার কাছে অপমানের বিষয় আর কিছু নাই। হার মানা মানেই মরা। ডেড ম্যান, ডেড ম্যান! বুঝেছ?

লম্বা একটা চুরুট ধরিয়ে খালি গায়ে একখানা খাটো কাপড় পরে রঙলাল ডাক্তার ময়ূরাক্ষীর দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন আর পা দোলাতেন।

রোগী আসত। একথা যেদিন বলেছিলেন সে দিনের কথা মনে পড়ছে। একজন জোয়ান মুসলমানকে ডুলি করে নিয়ে এসেছিল। পেটের যন্ত্রণায় ধড়ফড় করছিল জোয়ানটা। রঙলাল ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে দেখে নির্বিকার ভাবেই বলেছিলেন, শুয়ে পড়্ চিত হয়ে—এই আমার পায়ের তলায় শুয়ে পড়।

জীবন ডাক্তারকে বলেছিলেন—দেখবে নাকি নাড়ী? দেখো, তোমার নাড়ীজ্ঞান কী বলে দেখো। অম্বল না অম্বলশূল না পিলের কামড় দেখো।

রোগী চীৎকার করে উঠেছিল, ওগো ডাক্তারবাবু তুমি দেখো গো, তুমি দেখো! মরে গেলাম, আমি মরে গেলাম। নইলে একটুকুন বিষ দেন মশায়—খেয়ে আমি মরে বাঁচি। আঃ কোথাও কিছু হল না গো, কবরেজ হাকিম পীর কালীস্থান কিছু বাকি নাই মশায়।

বাধা দিয়ে রঙলাল বলেছিলেন, ঠাকুর-দেবতা কী করবে রে ব্যাটা? গোগ্রাসে গোস্ত খাবি তো তারা কী করবে? কতখানি গোস্ত খাস একবারে—দেড় সের না দু সের? কৃমি হয়েছে তোর পেটে, তিন-চার হাত লম্বা কৃমি।

—হেই বাবা, ওষুধ দেন বাবা। যাতনায় আর বাঁচি না বাবা।

—তা দেব কিন্তু টাকা কই? দুটো টাকা দে ফীজ আর ওষুধের দাম। দে আগে। টাকা না হলে হবে না।

—এক টাকা এনেছি বাবা—

জীবন বলেছিলেন, কাল তা হলে দিয়ে যেয়ো।

রঙলাল বলেছিলেন ইউ আর এ ফুল। বিনা ফীজে চিকিৎসা কোরো না। ধারে ওষুধ দিয়ো না, মরবে তুমি। তা ছাড়া ওরা ভাববে এ লোকটার পশার নেই ভালো! মানুষের বেঁচে থাকতে টাকা চাই। মানুষ খাটে ওই বাঁচার মূল্য উপার্জন করতে, তাতেও যে দাক্ষিণ্য দেখাতে যায় সে শুধু ফুলই নয়, সে অপরাধী অপরাধী। তাকে জীবনের যুদ্ধে হারতেই হবে। জাস্ট লাইক দি হিন্দুজ, ইতিহাসে পাবে হিন্দুরা প্রবল যুদ্ধ করে জিতে এল প্রায়, মুসলমানেরা যুদ্ধ-বিরতি প্রার্থনা

করলে ; ব্যস, হিন্দুরা বিব্রত হল। আচ্ছা, বিশ্রাম করে নাও, কাল আবার যুদ্ধ হবে কিন্তু রাত্রে মুসলমান আক্রমণ করলে বিনা নোটিশে অপ্রস্তুত হিন্দুরা হারল, মরল কিন্তু স্বর্গে গেল। আমি স্বর্গকামী নই। বুঝেছ? বলেই রোগীর সঙ্গের লোকদের বলেছিলেন, যাও, আর একটা টাকা নিয়ে এসো। যাও। রোগী থাকুক এখানে। ভয় নেই। মরবে না। যাও।

তারা চলে গেলে বলেছিলেন, জীবনে টাকা চাই জীবন। টাকা চাওয়াটা অপরাধ নয়। কারও কাছে ভিক্ষা কোরো না, কাউকে ঠকিও না, কারও চুরি কোরো না, কাউকে সর্বস্বান্ত করে নিও না, কিন্তু তুমি যার জন্যে খাটবে তার মজুরি—ফীজ, এ নিতে সঙ্কোচ কোরো না। করলে তুমি মরবে—স্বর্গে যাবে কিনা জানি না।

তের

অদ্ভুত মানুষ ছিলেন রঙলাল ডাক্তার।

সাধারণ মানুষের সমাজ তাঁকে মহাদাম্ভিক অর্থপিপাসু হৃদয়হীন বলেই মনে করত। ঠিক তাঁর বাবার প্রকৃতির বিপরীত।

ভাষা ছিল রূঢ়, আপ্যায়নহীন অসামাজিক মানুষ!

জীবন ডাক্তারের সঙ্গেও প্রথম পরিচয়ে এমনই ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন তিনি।

জগৎ মশায়ের মৃত্যুর পর। মনে তখন গম্ভীর অশান্তি। সুপ্ত অতৃপ্তি যেন প্রচণ্ড তৃষ্ণায় জেগে উঠেছে জগৎ মশায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে, তাঁর গুরুগম্ভীর অস্তিত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে। তাঁর স্নেহ যেমন প্রসন্ন এবং গাঢ় ছিল, তাঁর নির্দেশ এবং পরোক্ষ শাসনও ছিল তেমনি গুরুগম্ভীর, অলঙ্ঘনীয় জীবনের যে অসন্তোষ ছিল চাপা সে যেন চূড়া-ভেঙে পড়া পাহাড়ের বুকের আগুনের মতো বেরিয়ে পড়ল।

ওঃ—প্রথম দিনের অগ্ন্যুদ্গারের কথা মনে পড়ছে।

আতর-বউ সেদিন প্রথম মাথা কুটেছিলেন। আতর-বউও চিরকালের অসন্তোষের আগুন বুকে বয়ে নিয়ে চলেছেন। বিবাহের পর সেই ফুলশয্যার রাত্রি থেকেই জীবন ডাক্তার সে আগুনের উত্তাপ সহ্য করে আসছেন।

বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীনা মেয়েটি মামার বাড়িতে মানুষ। চিরদিনের মুখরা।

চিরদিনের—। কী বলবেন? প্রচণ্ডা ছাড়া বোধ করি বিশেষণ নাই। চিরদিনের প্রচণ্ডা। অদ্ভুত জীবনী-শক্তি। সেই বাল্যকাল থেকেই মাথা কুটে বিদ্রোহ করতেন। শাসন যত কঠিন হয়েছে তত মাথা কুটেছেন। তত চীৎকার করে কেঁদেছেন। তারপর কৈশোরে দিনের পর দিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছেন মামা-মামীর ঘরে, দিনেকের জন্য বিশ্রাম নেন নি। তার সঙ্গে উপবাস। মাসের মধ্যে সাতটা আটটা দিন উপবাস করতেন; অন্যপক্ষ শাসনের নামে নির্যাতন করে ক্লান্ত হয়ে হার মানলে তবে অন্ন গ্রহণ করতেন।

বিবাহের ফুলশয্যাতেই এমন মেয়ের বুক থেকে অগ্নিজালা না হোক অগ্নিতাপ বিকীর্ণ হবে তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে। কিন্তু নতুন বউ হিসেবে সংসারে সে সুনাম কিনেছিল। দিনের বেলা দূর থেকে জীবনমশায় আতর-বউকে দেখতেন প্রসন্ন, প্রশান্ত, হাস্যময়ী; অবশ্য শাশুড়ীর সমাদর তার একটা বড় কারণ। মা বউকে বড় সমাদর করতেন! মায়ের ধারণা ছিল আতর-বউয়ের মতো পয়মন্ত মেয়ে আর হয় না। বিয়ের পর বাপের কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষায় জীবনের মন-প্রাণ সমর্পণ করা দেখে এই ধারণা হয়েছিল তাঁর। তিনি বলতেন—আমার বউয়ের পয়েই এমনটা হল। নইলে সেই জীবন, যে মাথাটা নিচু করে ঢুঁ মেরে বড় বড় জোয়ানকে ঘায়েল করেছে, বোশেখ মাসের দিনে সকালে বেরিয়ে বেলা দুপুর পার করে তাল খেয়ে ফিরেছে, মোলকিনী পুকুর বিশবার এপার-ওপার করে পাঁক তুলে কাদা করে তবে উঠেছে, তার এই মতিগতি হয়! ইস্কুলে গিয়ে মারামারি করেছে! বই ছুঁতো না। এ যেন সে মানুষই নয়। বউমার পয় ছাড়া আর কী বলব? বউমা বাড়িতে পা দেওয়ার পর এই হল!

এ কথা শুনে সেকালে আতর-বউয়ের মুখ স্মিতহাস্যে ভরে উঠত।

এই সময়টাই জগৎ মশায়ের জীবনের প্রবীণতম কাল, প্রবীণতার সঙ্গে সঙ্গে বিচক্ষণতা এবং বহুদর্শিতার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল; তখন জগৎ মশায় নিজে আর সাধারণ রোগী দেখতে বের হতেন না, জীবন ছিলেন সেজন্য। রোগ কঠিন হলে তবে নিজে যেতেন। নইলে বলতেন, আমার যাবার দরকার নাই বাবা, আমার জীবন যাচ্ছে। ও আমারই যাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসতেন।

কথাটার ভিতরের অর্থ যে না বুঝত, তাকে তিনি ওর অর্থ বোঝাতে চেষ্টা করতেন না, রসিকতা যে বোঝে না তার সঙ্গে রসিকতা তিনি করতেন না, সাদা কথায় বলতেন, জীবন দেখে এসে আমাকে বলবে, তাতেই হবে। জীবনকেই আমি বলে দেব যা করতে হবে, যে ওষুধ দিতে হবে, তার জন্যে ভেবো না।

যেতেন, জীবন যখন বলত তখন। আর যেতেন অন্য চিকিৎসকের হাতের

রোগী দেখবার জন্য ডাক এলে তখন। আর যেতেন যে ক্ষেত্রে নিদান হাঁকতে হবে সেই ক্ষেত্রে।

একটা ঘটনা মনে পড়ছে। এই ঘটনায় জগৎ মশায়ের খ্যাতি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। নবগ্রামের বরদাপ্রসাদবাবুর কঠিন অসুখ। বরদাবাবুরা নবগ্রামের প্রাচীনতম জমিদার বংশ; এক পুরুষকাল আগে এই বংশেরই বড়তরফের কর্তার বাড়িতে জগৎ মশায়ের বাবা দীনবন্ধু মশায় খাতা লিখতেন এবং ছেলেদের পড়াতেন। এই বাড়ির ছেলের রোগের সেবা করে, দীনবন্ধু মশায় প্রথম চিকিৎসাবিদ্যার আস্বাদ পেয়েছিলেন এবং কর্তার ছেলের আরোগ্যের পর বিখ্যাত কবিরাজ কৃষ্ণদাস সেনগুপ্ত নিজে ডেকে তাঁকে আয়ুর্বেদে দীক্ষা দিয়েছিলেন। এই কৃতজ্ঞতায় দীর্ঘকাল, জগৎ মশায়ের চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত, এই বংশের যে-কোন বাড়িতে ডাকলে সসম্ভ্রমে বিনা দক্ষিণায় চিকিৎসা করেছেন। কিন্তু এরা তাঁর সম্ভ্রমকে বজায় রাখত না উপরন্তু পদে পদে অসম্ভ্রম করত, এমন কি ওষুধের দামও দিত না, বলত খাজনায় কাটছিট করে দেব; এই কারণেই জগৎ মশায় স্বগ্রামের কয়েক পয়সা জমিদারি কিনে অসম্ভ্রমের হাত থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছিলেন। এবং রক্ষাও পেয়েছিলেন। নবগ্রামের রায়চৌধুরী বংশ তাঁকে আর ডাকত না। তাঁরা হরিহরপুরের কবিরাজ হীরালাল পাঠককে গৃহ-চিকিৎসক করেছিলেন। রোগ কঠিন হলে ডাকতেন রাঘবপুরের গুপ্ত কবিরাজদের। বরদাবাবুর অসুখে বাধ্য হয়ে তাঁর ছেলে জগৎ মশায়কে ডেকেছিলেন। বরদাবাবুর ছেলে কলকাতায় ব্যবসায় করতেন। বাপের অসুখের সংবাদ শুনে গ্রামে এসেই ডাকলেন রাঘবপুরের গুপ্তকে। গুপ্ত এসে বললেন —তিনদিন, এক সপ্তাহ বা নবম দিনে মৃত্যু অনিবার্য।

ছেলে বললেন—আমি কলকাতায় নিয়ে যাব।

গুপ্ত বললেন—তাতে পথে মৃত্যু হবে। তিনদিন পরমায়ুও তাতে ক্ষয়িত হবে।

ছেলে এরপর রঙলাল ডাক্তারকে ডাকলেন, কবিরাজ হাত দেখে বললেন—। রূঢ়ভাষী রঙলাল ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন—ও বিদ্যেটা আমি বুঝি না, বিশ্বাসও করি না।

ছেলে বললেন—মানে উনি বলছেন তিনদিন, এক সপ্তাহ বা নবম দিনে মৃত্যু অনিবার্য।

রঙলাল বললেন—সেও আমি বলতে পারব না। তবে ওর কাছে লিখে নিতে পারেন। মৃত্যু না হলে নালিশ করতে পারবেন। আমাকে লিখে দিলে আমি নালিশ করব।

ছেলে বললেন—এখন আমি চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাই।

—তবে আমাকে কেন ডেকেছেন? নিয়েই যান।

—কবিরাজ বলেছেন—তাতে তিন দিনও বাঁচবেন না, পথেই ত্রিশূন্যে অর্থাৎ গাড়িতেই মারা যাবেন।

—তা পারেন। আবার নাও পারেন। আমি ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি। রোগ কঠিন। মরবেন কি বাঁচবেন সে আমি জানি না।

রঙলাল ডাক্তার চলে গেলে অগত্যা তাঁরা জগৎ মশায়কে ডাকলেন।

জগৎ মশায় নাড়ী দেখে বলেছিলেন—সুচিকিৎসার জন্য কলকাতা নিয়ে যাবেন, বাধা দেব না; নিয়ে যান। চিন্তার কোনো কারণ নাই। আমি দায়ী রইলাম।

ছেলে বলেছিলেন—দেখুন, ভালো করে বুঝুন।

—না বুঝে কি এতবড় কথা বলতে পারি রায়চৌধুরীমশায়? নিয়ে যান। আমার কথার অন্যথা হলে আমি দশের সম্মুখে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, চিকিৎসা আমি ছেড়ে দেব। আর—।

হেসে বলেছিলেন—আর এ যাত্রায় কর্তার রোগভোগ আছে, দেহরক্ষা নাই। অচিকিৎসা কুচিকিৎসা হলে তার কথা আলাদা। চিকিৎসা হলে বাঁচবেন। আপনি কলকাতায়ই নিয়ে যান।

তাঁর কথাই সত্য হয়েছিল। বরদাবাবুকে কলকাতা নিয়ে পৌছুতে কোনো বিঘ্ন ঘটে নাই এবং তিনি সেবার রোগমুক্ত হয়ে দেওঘরে শরীর সেরে বাড়ি ফিরেছিলেন।

বরদাবাবুর বাড়িতে তিনি কোনো দক্ষিণা গ্রহণ করেন নাই। বরদাবাবু বাড়ি ফিরে তাঁকে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। দেওঘরের পেঁড়া, একটি ভালো গড়গড়া ও নল, কিছু ভালো তামাক আর একখানি বালাপোশ।

এই ঘটনার পরই জীবন তাঁকে বলেছিল—এবার ফীজ বাড়াতে হবে আপনাকে। চার টাকা ফীজ করুন।

জগৎমশায় তাতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু জীবন ছাড়ে নাই। বলেছিল—গরিব যারা তাদের বাড়ি আপনি বিনা ফীজে যাবেন। কিন্তু যে যা দেবে—এ করলে আপনার মর্যাদা থাকবে না।

এই সময়টিই দত্তমশায়দের বাড়ির সর্বোত্তম সুসময়।

জীবনের মা বলতেন, এসব আমার বউয়ের পয়।

আতর-বউ নিজেও তাই ভাবতেন।

সেকালে জীবন ডাক্তার রোগী দেখতে বের হবার সময় নিয়মিতভাবে আতর-বউ সামনে এসে দাঁড়াতেন। তাঁর মুখ দেখে যাত্রায় শুভ ফল অবশ্যম্ভাবী।

* * *

জগৎ মশায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দত্তমশায়ের খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠার ভাঁটা পড়ল স্বাভাবিকভাবে।

অনেক বাঁধা ঘর—চার পাঁচখানা গ্রাম তাঁকে ছেড়ে কামদেবপুরের মুখুজ্জে কবিরাজের এবং হরিহরপুরের পাঠক কবিরাজের কাছে গিয়ে পড়ল। ওদিকে নবগ্রামের বাবুরা নিয়ে এলেন একজন ডাক্তার। দুর্গাদাস কুণ্ডু। জীবন মশায় তখন শুধু জীবন দত্ত। মহাশয় তো সহজে লোকে বলে না। ওদিকে ডাক্তারির একটা স্থবিধে আছে। বয়স যেমনই হোক, অভিজ্ঞতা থাক আর না থাক ডিগ্রি আছে; ডিগ্রির জোরেই ডাক্তার খেতাব তাদের প্রতিষ্ঠিত।

জীবন দত্তের সুপ্ত কামনা এই দুঃসময়ের ঝড়ে ছাই-উড়ে-যাওয়া আগুনের মতো গনগনে হয়ে উঠল। তিনি ডাক্তার হবেন। সম্মুখে রঙলাল ডাক্তারের দৃষ্টান্ত। ওদিকে নবগ্রামে আরও একজন নতুন ডাক্তার এল। তাঁরই বন্ধু কৃষ্ণদাসবাবু, ওই কিশোর ছেলেটার বাপ, নতুন ডাক্তারকে আশ্রয় দিলেন। আরও শোনা গেল, নবগ্রামের নবীন ধনী ব্রজলালবাবু এখানে চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি—অ্যালোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়—প্রতিষ্ঠা করছেন। তিনি গোপনে গোপনে আরম্ভ করে দিলেন। অনেক সন্ধান করে দুখানি বই আনালেন—ডাক্তারি শিক্ষা ও বাঙলা মেটিরিয়া মেডিকা। ইচ্ছা সত্ত্বেও রূঢ়ভাষী রঙলাল ডাক্তারের কাছে যেতে সাহস হল না।

মাস তিনেক পর হঠাৎ রঙলাল ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর দেখা হল, তাঁর সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র রচিত হবার প্রথম গ্রন্থি পড়ল।

ওই কিশোর ছেলেটিকে তিনি এইজন্যই এত ভালোবাসেন। এই গ্রন্থিটি পড়েছিল তাকে উপলক্ষ্য করেই।

হঠাৎ একদিন শুনলেন, নবগ্রামের কৃষ্ণদাসবাবুর ছেলে কিশোরের বড় অসুখ। আজ দশ দিন একজ্বরী। দেখছিল ওই নবাগত হরিশ ডাক্তার, আজ মাসখানেক যে নবগ্রামে এসেছে। কৃষ্ণদাসবাবুই তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। পাশ করা ডাক্তার —পাটনা ইস্কুল থেকে পাশ করে এসেছে। পসার না হওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণদাসবাবুই তার সকল ভার বহন করবেন বলেছেন। সেই দেখছিল—আজ রঙলাল ডাক্তার দেখতে আসবেন।

জীবন দত্ত বিস্মিত হলেন, শঙ্কিত হলেন। নিজেকে একটা ধিক্কারও দিলেন। খবর রাখা উচিত ছিল। কৃষ্ণদাসবাবু তাঁর চেয়ে বয়সে বড় হলেও বন্ধু। এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেপালের পরমাত্মীয়—সম্বন্ধী। তা ছাড়া এই কিশোর ছেলেটিকে তিনি বড় ভালোবাসেন। এই নতুন ডাক্তারটি কৃষ্ণদাসবাবুর বাড়িতে আসবার

আগে পর্যন্ত অর্থাৎ চার মাস আগে পর্যন্তও তাঁরাই পুরুষানুক্রমে ওঁদের বাড়িতে চিকিৎসা করে আসছিলেন। তাঁর তো একবার যাওয়া উচিত ছিল। চিকিৎসক হিসেবে না-ডাকতে যাওয়ায় মর্যাদায় বাধে, কিন্তু তার উপরেও যে একটা অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক আছে। কৃষ্ণদাসবাবুর সঙ্গে আছে, ওই কিশোর ছেলেটির সঙ্গেও আছে। ও পাড়ায় গেলেই তিনি কিশোরের খোঁজ করে দু-চারটি কথা বলে আসেন। ছ-সাত বছরের এই শ্যামবর্ণ ছেলেটি আশ্চর্য রকমের দীপ্তিমান। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং রসবোধে সরস বুদ্ধি।

এই তো সেদিন।

নেপালের বাড়ি থেকে তিনি নেপালকে সঙ্গে নিয়েই বের হচ্ছিলেন। পথে যাচ্ছিল কিশোর। দুপুরবেলা শ্যালক-পুত্রকে একা দেখে পাগলা নেপালের কর্তব্য বোধ জেগে উঠল। কিশোরের গতিপথ দেখে যে-কেউ বুঝতে পারত যে, সে নিজেদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছে; পাগল নেপাল সেই হিসেবে অকারণেই প্রশ্ন করলে—কোথায় যাবি? আমাদের বাড়ি?

—না।

—তবে? দুপুরবেলা যাবি কোথায়?

কিশোর উত্তর দিয়েছিল—যাব তোমার শ্বশুরবাড়ি!

নেপাল বুঝতে পারে নাই রসিকতাটুকু। জীবন হা-হা করে হেসেছিলেন।

জীবন ডাক্তার নিজেও অপ্রতিভ হয়েছেন তার কাছে। এই তো মাস কয়েক আগে। তখনও চিকিৎসা করতেন ওদের বাড়িতে। কিশোরেরই জ্বর হয়েছিল। নাড়ীতে দেখলেন অম্লদোষ। কৃষ্ণদাসবাবুর ভগ্নী বললেন—এই জ্বর অবস্থাতেও কাল খোয়া-ক্ষীর চুরি করে খেয়েছে। অম্লদোষের আর দোষ কী?

জীবন ডাক্তার বলেছিলেন—অ্যাঁ? তুমি চুরি করে খেয়েছ?

কিশোর অপ্রস্তুত হয় নি। বলেছিল—হ্যাঁ।

—জান, চুরি করে খেলে পাপ হয়?

কিশোর ঘাড় নেড়ে বলেছিল—হয়। কিন্তু খোয়া-ক্ষীর খেলে হয় না।

জীবন ডাক্তার অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন—কে বলেছে তোমাকে?

কিশোর বলেছিল—ভাগবতে শুনেছি। কৃষ্ণ নিজে খোয়া-ক্ষীর, ননী মাখন চুরি করে খেতেন। তবে কেন পাপ হবে?

জীবন ডাক্তারকে হার মানতে হয়েছিল। অতঃপর চিকিৎসা-শাস্ত্রতত্ত্ব

বোঝাতে হয়েছিল। ছেলেটি মন দিয়ে শুনেছিল এবং শেষে বলেছিল—আচ্ছা আর বেশী খাব না। কম করে খাব।

এর পর জীবন ডাক্তার কিশোরকে দেখলেই পুরাণ-সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। কিশোর প্রায়ই উত্তর দিয়েছে এবং বিচিত্র ভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছে। রাবণের কটা মাথা কটা হাত জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল—দশটা মাথা কুড়িটা হাত। জানেন, রাবণ কখনও ঘুমোত না।

—কেন?

—শুয়ে পাশ ফিরবে কী করে?

এইভাবেই ছেলেটির সঙ্গে একটি নিবিড় অন্তরঙ্গতা জমে উঠেছিল। তার অসুখ—বেশী অসুখ, রঙলালবাবুর মতো ডাক্তার আসছেন—জীবন ডাক্তার আর থাকতে পারলেন না। তিনি নিজেই এলেন কৃষ্ণদাসবাবুর বাড়ি। কৃষ্ণদাস অপ্রস্তুত হলেন কিন্তু জীবন স্মিতহাস্যে বললেন—কিছু না কৃষ্ণদাস দাদা, আপনারা ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ হলেও তো আমি আপনার ভাই। খুড়ো হিসেবে দেখতে এসেছি। চলুন, কিশোরকে একবার দেখব।

কিশোর প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিল। গলায় মৃদু সর্দির শব্দ উঠছে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। দু-চারটি ভুলও বকছে। ভাদ্র মাসে গরম কাপড় দিয়ে তাকে প্রায় মুড়ে রাখা হয়েছে। নতুন ডাক্তার বললেন—বুকে সর্দির দোষ রয়েছে; জ্বর উঠেছে এক শো তিন। নিউমোনিয়া এতদিন পূর্ণমাত্রায় দেখা দিত, কিন্তু আমি গোড়া থেকেই বেঁধেছি। তবু যে কেন জ্বর কমছে না, বুঝছি না।

জীবন ডাক্তার দুটি হাতের নাড়ী দীর্ঘক্ষণ ধরে মনঃসংযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করলেন। জিভ, চোখ দেখলেন, পেট টিপে পরীক্ষা করলেন। তারপর উঠে হাত ধুয়ে কৃষ্ণদাসবাবুর কাছে বসে বললেন—একুশ দিন বা চব্বিশ দিনে জ্বর ত্যাগ হবে কৃষ্ণদাস দাদা। ভয়ের কোন কারণ নাই, তবে জ্বরটা একটু বাঁকা। আগন্তুজ্ জ্বর, সান্নিপাতিক-দোষযুক্ত; তবে প্রবল নয়; মারাত্মকও নয়। শ্লেষ্মা দোষ—ডাক্তারবাবু যেটা বলছেন—।

হরিশ ডাক্তারের দিকে চেয়ে বলেলেন—ওটা আনুষঙ্গিক, আসল ব্যাধি ওটা নয়।

হরিশ ডাক্তার প্রায় তাঁর সমবয়সী; জীবন দত্তের থেকে বছর চার-পাঁচের ছোট। কর্মজীবনে এটা খুব পার্থক্যের বয়স নয়। প্রীতির সঙ্গে বলেছিলেন। কিন্তু পাশ-করা হরিশ ডাক্তার বলেছিল—নাঃ। আমি স্টেথোসকোপ দিয়ে দেখেছি। সর্দির দোষটাই মূল দোষ। আর সান্নিপাতিক মানে টাইফয়েডের কথা যা বলছেন—ওটা আমার মতে ঠিক নয়।

জীবন দত্ত ধ্যানস্থের মতো নাড়ী ধরে অনুভব করেছেন, যা বুঝেছেন তা ভুল হতে পারে না। তিনি মৃদু হাসির সঙ্গে ঘাড় নেড়েছিলেন। ঠিক এই সময়েই বাইরে পালকির বেহারাদের হাঁক শোনা গিয়েছিল।

হরিশ ডাক্তার ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল—ওই, উনি এসে গিয়েছেন।

জীবন দত্ত বাইরে যাবার জন্য উদ্যত হলেন, হঠাৎ নজরে পড়ল কিশোরের শিয়রে বসে অবগুণ্ঠনবতী তার মা। জীবন দত্ত গভীর বিশ্বাসে আশ্বাস দিয়ে আবার বলেছিলেন—কোনো ভয় নাই। যে যা বলবে বলুক মা, একুশ দিন বা চব্বিশ দিনে জ্বর ছেড়ে যাবে, ছেলে সেরে উঠবে।

রঙলাল ডাক্তারের সঙ্গেও সংঘর্ষ বাধল—এই একুশ দিন, চব্বিশ দিন নিয়ে।

রঙলাল ডাক্তার রোগী দেখলেন।

প্রথমেই বললেন—বাজে লোক—বেশী লোক ঘরে থাকা আমি পছন্দ করি না। যে ডাক্তার দেখছে আর রোগীর যে সেবা করছে, আর এক-আধজন।

জীবন দত্তও বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণদাসবাবু বললেন—তুমি থাকো জীবন।

তিনি তাঁর হাত ধরলেন। জীবনমশায়ের মনে আছে—ভীত কৃষ্ণদাসবাবুর হাত ঘামছিল; জীবন দত্ত মৃদু স্বরে সাহস দিয়ে বলেছিলেন—ভয় কী?

রোগী দেখে রঙলাল ডাক্তার কিছু বললেন না। প্রেসক্রিপশন চাইলেন। পড়ে দেখলেন। সেগুলি ফিরিয়ে দিয়ে নিজে প্রেসক্রিপশন লিখে হরিশ ডাক্তারের হাতে দিলেন, বললেন—ও সব পালটে এই দিলাম। পথ্য—বার্লি, ছানার জল, বেদানার রস চলতে পারে। কোনো শক্ত জিনিস নয়। ছেলের টাইফয়েড হয়েছে।

হরিশ ডাক্তারের মুখ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে জীবন দত্তের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়েছিল—এ জীবনমশায়ের মনে আছে। জীবন দত্ত কিন্তু হরিশ ডাক্তারের মুখের দিকে তাকান নি। ছি। অপ্রস্তুত হবেন উনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রঙলাল ডাক্তার হরিশকে ভালো করে সব বুঝিয়ে দিলেন।

জীবন দত্তের কবিরাজী পদ্ধতির সঙ্গে তাতে কয়েকটিতে গরমিল ছিল। কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। তাঁর অধিকার কী? তারপর রঙলাল ডাক্তার ওষুধ তৈরি করতে বসলেন। ওইটি ছিল তাঁর একটি বিশেষত্ব। নিজের কলবাক্স থেকে ওষুধ তৈরি করে দিতেন। অন্য কোনো ডাক্তারের কি ডাক্তারখানায় তৈরি ওষুধ তিনি রোগীকে খেতে দিতেন না। এমন কি হঠাৎ যে বিপদ বা পরিবর্তন আসতে পারে, তারও ওষুধ তৈরি করে দিয়ে বলতেন—এই রকম হলে এই দেবে। এই রকম হলে এটা। এক-একদিন পর অবস্থা লিখে লোক পাঠাবে আমার কাছে। তবে

যে ডাক্তার দেখছে, তার কাছে গোপন রাখতেন না কিছু। বিশ্বাসের পাত্র হলে তারপর তাকে দিতেন প্রেসক্রিপশন—সে ওষুধ তৈরি করে দিত। বলতেন—বিষ মিশিয়ে রোগীকে অনিষ্ট করবে না, সে আমি জানি ; বিষের দাম আছে। আমার সই-করা প্রেসক্রিপশন আছে—আমাকে দায়ী করতে পারবে না। কিন্তু জোলো দেশে জলের দাম লাগে না, ওষুধের বদলে জল দিলে কী করব ? ছটা ওষুধের তিনটে না দিলে কী করব ? পচা পুরনো দিলে কী করব ? আমার বদনাম হবে।

ঠিক এই সময়। ওষুধের শিশি দুটি ঝাঁকি দিয়ে একবার নিজে ভালো করে তার রঙ এবং চেহারাটা দেখে হরিশ ডাক্তারের হাতে দিলেন—দু রকম ওষুধ থাকল। এইটাই এখন চলবে। যদি ভুল বকে বা জ্বর বাড়ে—জ্বর বাড়লেই ভুল বকবে, ভুল বকলেই জানবে জ্বর বেড়েছে, তখন এইটে দেবে। বুঝেছ ? আর ওই লেপকাঁথাগুলো খুলে দাও। ও চাপা দিয়েই তো বাচ্চাটাকে খতম করবে। এমন করে জানালা-দরজা বন্ধ কোরো না। আলো-বাতাস আসতে দাও। বুঝেছ ?

উঠলেন তিনি।

কৃষ্ণদাসবাবু এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন—রোগ কি টাইফয়েড ?

—হ্যাঁ, কঠিন রোগ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই জিজ্ঞাসা করছি।

—বাঁচা-মরা ঈশ্বরের হাত, সে আমি বলতে পারি না।

কৃষ্ণদাসও সাহসী লোক ছিলেন—তিনি মুখে মুখে জবাব দিতে পটু ছিলেন। বলেছিলেন, সে কথা আপনি কেন, আমরাও বলতে পারতাম। আপনার দেখে কেমন মনে হল ? টাইফয়েড সান্নিপাতিক হলেই তো অসাধ্য হয় না। রোগেরও প্রকার-ভেদ আছে। মৃদু, মধ্যম—কঠিন।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে রঙলাল বলেছিলেন—আপনিই তো কৃষ্ণদাসবাবু ? ছেলের বাবা ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—রোগ মধ্যম রকমের বলশালী। তবে কঠিন হতে কতক্ষণ! উপযুক্ত সেবা, নিয়মিত ওষুধ—এ না হলে রোগ বাড়তে পারে। এই রোগে সেবাটাই বড়।

—তার জন্যে দায়ী আমরা। এ রোগ সারতে কতদিন লাগবে ?

—সে কী করে বলব আমি ? সে আমি জানি না।

জীবন কবিরাজের এতটা অসহ্য মনে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, কৃষ্ণদাস দাদা; বাইশ থেকে চব্বিশ দিনের মধ্যে আপনার ছেলের জ্বর ত্যাগ হবে, আপনি উতলা হবেন না।

হেঁট হয়ে কল-বাক্‌সে ওষুধ গুছিয়ে রাখছিলেন রঙলাল ডাক্তার—তিনি খোঁচা-খাওয়া প্রবীণ গোক্ষুর সাপের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে ডাকলেন।

—আপনি কে? গণক?

—না। উনি আমাদের এখানকার কবিরাজ। জগবন্ধু মশায়ের নাম বোধ হয় জানেন।

—নিশ্চয় জানি। বিচক্ষণ কবিরাজ ছিলেন তিনি। রোগনির্ণয়ে আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। এখানকার বরদাবাবুর কথা মনে আছে আমার।

—উনি তাঁরই ছেলে। জীবন দত্ত।

রঙলাল আবার একবার তাকালেন জীবন দত্তের দিকে, বললেন, বাইশ থেকে চব্বিশ দিন কী থেকে বুঝলে? নাড়ী দেখে?

—হ্যাঁ, নাড়ী দেখে তাই আমার অনুমান হয়। জর চব্বিশ দিনে ছাড়বার কথা। তিন অষ্টাহ। তবে প্রায়ই আমাদের দেশে এ রোগে প্রথম একটা-দুটো দিন গা ছ্যাঁক-ছ্যাঁকের শামিল হয়ে ছুট হয়ে যায়। সেই কারণেই বলেছি—বাইশ থেকে চব্বিশ দিন।

—তোমার সাহস আছে। স্বল্প বয়স—তাজা রক্ত। হেসেছিলেন রঙলাল ডাক্তার। তোমাদের বংশের নাড়ীজ্ঞানের প্রশংসা শুনেছি, বরদাবাবুর বেলা দেখেছিও। কিন্তু ওটা তো আমাদের শাস্ত্রের বাইরে।

ঠিক চব্বিশ দিনেই কিশোরের জর ছেড়েছিল।

কৃষ্ণদাসবাবু জীবন দত্তকে ডেকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। রঙলাল ডাক্তারের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে লিখেছিলেন—আজ চব্বিশ দিনেই জর ত্যাগ হইয়াছে। ইহার পর ঔষধ এবং নির্দেশ দিলে সুখী হইব। আসিবার প্রয়োজন বোধ করিলে কখন আসিবেন জানাইবেন।

রঙলাল ডাক্তার আর আসেন নি। শুধু নির্দেশ এবং ওষুধ পাঠিয়েছিলেন। তার সঙ্গে লিখেছিলেন, জগদ্বন্ধু মশায়ের ছেলেটিকে আমার আশীর্বাদ দিবেন।

জীবন দত্ত উৎসাহিত হয়ে চার মাইল পথ হেঁটে তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন।

বহ্নিগর্ভ দুটি শমীবৃক্ষ পরস্পরের সান্নিধ্যে আসবামাত্র দুজনের ভিতরের বহ্নিই উৎসুক হয়ে উঠল।

* * *

সেই রঙলাল ডাক্তার তাঁর পিঠে সেদিন হাত বুলিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। সে হাতের স্পর্শের মধ্যে জীবন দত্ত স্নেহ অনুভব করেছিলেন।

সে এক বিস্ময়। তান্ত্রিক শবসাধকের মতো মানুষ রঙলাল ডাক্তার। বামাচারীর মতো কোনো আচার-নিয়ম মানেন না, কঠিন রূঢ় প্রকৃতি, নিষ্ঠুর ভাষা; ময়ূরাক্ষীর জলে ভেসে-যাওয়া মড়া টেনে নিয়ে ফালি ফালি করে চিরে দেখেন, কবর থেকে মড়া টেনে তোলেন, মায়ের কোলে সন্তানকে মরতে দেখেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, পৃথিবীর কারও কাছে মাথা হেঁট করেন না। এই মানুষটিকে এই তন্ত্রপ্রধান অঞ্চলের লোকে বলত, আসলে রঙলাল ডাক্তার হলেন প্রচ্ছন্ন তান্ত্রিক। বামাচারী।

কেউ কেউ বলত নাস্তিক্যবাদী পাথর।

রঙলাল ডাক্তার তাঁকে প্রথম কথাই বলেছিলেন—তুমি যদি ডাক্তারি পড়তে হে! বড় ভালো করতে। তোমার মধ্যে একজন জাত চিকিৎসক রয়েছে। কবিরাজি শাস্ত্রে কিছু নেই এ কথা আমি বলছি না। কিন্তু আমাদের জাতের মতো শাস্ত্রটিও কালের সঙ্গে আর এগোয় নি। যে কালে এ শাস্ত্রের সৃষ্টি—চরম উন্নতি—সে কালে কেমেষ্ট্রির এত উন্নতি ছিল না। তা ছাড়া আরও অনেক কিছু আবিষ্কার হয় নি। তারপর ধরো, কত দেশ থেকে কত মানুষ আমাদের দেশে এসেছে। তাদের সঙ্গে তাদের দেশের রোগ এ দেশে এসেছে—জল বাতাস মাটির পার্থক্যে বিচিত্র চেহারা নিয়েছে। তা ছাড়া আয়ুর্বেদ আগন্তুজ ব্যাধি বলে যেখানে থেমেছে, ইউরোপের চিকিৎসা-বিদ্যা মাইক্রোসকোপের কল্যাণে জীবাণু আবিষ্কার করে অনুমান এবং উপসর্গের সীমানা ছাড়িয়ে চলে এসেছে বহুদূরে এগিয়ে।

আধুনিক কালের রোগ-চিকিৎসা নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। জীবন দত্ত তন্ময় হয়ে শুনেছিলেন। বার বার মনে পড়েছিল নিজের বাপ এবং মহাগুরু জগৎ মশায়কে। পার্থক্যের মধ্যে জগৎ মশায় শিক্ষার মধ্যে বার বার উল্লেখ করতেন অদৃষ্টের, নিয়তির, ভগবানের; এবং সমস্ত বক্তব্যই যেন রোগবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা ছাড়াও অন্য একটি ভাব-ব্যাখ্যা-জড়িত বলে মনে হত, যেন, কথার অর্থ ছাড়াও একটি ভাব থাকত; রঙলাল ডাক্তারের বক্তব্যের মধ্যে ঈশ্বর ছিল না, অদৃষ্ট ছিল না এবং সমস্ত বক্তব্য ছিল শুষ্ক, কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য, কথার মানে ছাড়া কোনো ভাববাষ্পের অস্তিত্ব ছিল না। রঙলাল ডাক্তার বলতেন—মানুষ মরে গেলে আমরা আর কোনো দিকে তাকাই না। বুঝেছ, ওই দেহপিঞ্জর করি ভঙ্গ প্রাণ-বিহঙ্গ কেমন করে ফুড়ুত করে উড়লেন সে দেখতে আমরা চেষ্টা করি না। মধ্যে মধ্যে হেসে বলতেন—আরে, প্রাণ যদি বিহঙ্গ হয় তবে নিশ্চয় বন্দুকধারী শিকারীও আছে, তারা নিশ্চয় পক্ষিমাংস ভক্ষণ করে। তা হলেই তো পুনর্জন্ম খতম।

সেই দিনই জীবন সুযোগ বুঝে বলেছিলেন, আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমাকে যদি দয়া করে ডাক্তারি শেখান!

—তুমি ডাক্তারি শিখবে? তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন রঙলালবাবু। অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কপালে সারি সারি কুঞ্চনরেখা। বিস্ময়, প্রশ্ন অনেক কিছু তার মধ্যে ছিল। তারপর প্রশ্ন করেছিলেন কবিরাজি ভালো চলছে না?

হেসে জীবন দত্ত বলেছিলেন, লেখাপড়াজানা বাবুদের সমাজে কবিরাজির চলন কম হয়েছে বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে ভালো চলে।

—তবে?

—আমার ছেলেবেলা থেকেই ডাক্তারি পড়বার ইচ্ছা ছিল কিন্তু—। জীবন দত্ত একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন।

—তবে পড় নি কেন? তোমার বাবার তো অবস্থা ভালো ছিল।

জীবন দত্ত ম্লান হেসে বলেছিলেন—আমরা ভাগ্য মানি, তাই বলছি আমার ভাগ্য। আর কী বলব? নইলে বাল্যকাল থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল আমি ডাক্তারি পড়ব। কিন্তু—

—তোমার বাবা দেন নি পড়তে?

—আজ্ঞে না। অপরাধ আমার।

মঞ্জরীর কথাটা বাদ রেখে ভূপী বোসের সঙ্গে মারামারির কথা বলে বললেন—গ্রামে ফিরলাম—বাবা বললেন, আর না। আর তোমাকে বিদেশে পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না। কৌলিক বিদ্যায় তুমি দীক্ষা গ্রহণ করো।

কথাটা শুনে ন্যাড়া পাহাড়ের মতো মানুষ রঙলাল ডাক্তার অকস্মাৎ হা-হা-হা শব্দে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন কৌতুকে; যেন তৃণপাদহীন কালো পাথরে গড়া পাহাড়টা এই কাহিনী শুনে কৌতুকে ফেটে গেল এবং ভিতর থেকে ঝরঝর শব্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বের হল ঝরনার ফোয়ারা। এমনভাবে রঙলাল ডাক্তারকে হাসতে বড় কেউ একটা দেখে নি।

বেশ খানিকক্ষণ হেসে বললেন—সেই ভূপী বোস ছেলেটার সুডৌল নাকটা এমন করে তুমিই ভেঙে দিয়েছ? আরে, তাকে যে আমি দেখেছি। চিকিৎসা করেছি। তার শ্বশুর নিজের বাড়িতে এনেছিল চিকিৎসা করাতে, সংশোধন করতে। অপরিমিত মদ্যপান করে লিভারের অসুখ। আমাকে ডেকেছিল। ছোকরার মাকাল ফলের মতো টুকটুকে চেহারায় পোকাধরার কালো দাগের মতো নাকে ওই খুঁত।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন রঙলালবাবু, বললেন—আমি কিন্তু সন্দেহ করেছিলাম, ওটা হয়েছে সিফিলিস থেকে। বড়লোকের ছেলে—দুর্দান্ত মাতাল! সন্দেহ হওয়ারই কথা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম। কিছুতেই স্বীকার করে না। তারপর স্বীকার করলে। যা এদেশের লোকের স্বভাব! উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রঙলাল ডাক্তার—হাতের চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে বললেন—অদ্ভুত, এ দেশটাই অদ্ভুত! লজ্জায় রোগ লুকিয়ে রাখবে। বংশাবলীকে রোগগ্রস্ত করে যাবে! নিজে ভুগবে। কিছুতেই বুঝবে না তুই দেবতা নোস। তুই রক্তমাংসের মানুষ। ক্ষুধার দাস, লোভের দাস, কামের দাস!

উঠে দাঁড়ালেন রঙলাল ডাক্তার, বললেন—সেই শুয়ারটা কী বলেছিল জান? বলেছিল, কী করে হল তা জানি না। আমার স্ত্রী ছাড়া আর কারও সংশ্রবে তো আমি কখনও আসি নি। আমি আর থাকতে পারি নি। প্রচণ্ড এক চড় তুলে বলেছিলাম—মারব এক চড় উল্লুক!

কিছুক্ষণ পায়চারি করে শান্ত হয়ে রঙলাল ডাক্তার এসে বসেছিলেন তাঁর আসনে। চুরুট ধরিয়ে দুটো টান দিয়ে মৃদু হেসে বললেন, ওটা তাহলে তোমার ওই মুদ্গরসদৃশ হস্তের মুষ্ট্যাঘাতের চিহ্ন? তুমি তো ভয়ানক লোক। তবে ভূপী বোসের বন্ধুর কাজ করেছ। ওই চিহ্ন থেকে ওর ওই পাপ রোগটাকে ধরার সুযোগ করে দিয়েছ।

তারপর রঙলাল ডাক্তার বলেছিলেন—হ্যাঁ, তোমাকে আমি শেখাব, যতটা পার নিয়ে নাও তুমি আমার কাছ থেকে। কী? কী ভাবছ তুমি?

সেদিন তখন জীবন দত্ত ভাবছিলেন—ভূপী বোসের কথা, মঞ্জরীর কথা। যতক্ষণ রঙলাল ভূপী বোসের কথা বলছিলেন জীবন দত্ত অবশ্য চিন্তাশক্তিহীন মানুষের মতো তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। রঙলালবাবু তাঁকে ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে কথা শেষ করলেন, জীবন দত্ত তার উত্তরে কিন্তু প্রশ্ন করলেন—ভূপীর লিভারের দোষ হয়েছে? সেরেছে?

রঙলাল ডাক্তার তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভূপীর জন্যে যেন তোমার মমতা রয়েছে জীবন?

জীবন এবার সচেতন হয়ে উঠলেন; লজ্জিত হলেন।

রঙলাল বললেন—তোমরা তো বৈষ্ণব?

—হ্যাঁ।

—তাই। তারপর বললেন—ভূপীর অসুখ আপাতত সেরেছে। আবার হবে। ওটা বাঁচবে না বেশীদিন। ওতেই মরবে। যোগাযোগ যে ভারি বিচিত্র। ছোকরার,

স্ত্রী, এক ধরনের মা আছে দেখেছ, রোগা ছেলেকে খেতে দেয় লুকিয়ে, ঠিক সেই রকম! ডাক্তার বারণ করেছে, ভূপী মদের জন্য ছটফট করছে, স্ত্রী গোপনে লোককে বকশিশ দিয়ে মদ আনিয়ে স্বামীকে দিচ্ছে, বলে—বেশী খেয়ো না, একটু খাও। আশ্চর্যের কথা হে, নিজের গহনা বিক্রি করে করেছে। অদ্ভুত! পুরাণে আছে সতী স্ত্রী মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বামীকে বাঁচায়। আর এ মেয়েটা ভালোবাসায় তো তাদের চেয়ে খাটো নয়, কিন্তু এ মৃত্যুকে ডেকে এনে স্বামীকে তার হাতে তুলে দেয়। অদ্ভুত!

এর পর স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন জীবন ডাক্তার। স্থান, কাল, পাত্র সব তিনি ভুলে গেলেন, মুছে গেল চোখের সম্মুখ থেকে। অর্থহীন একাকার হয়ে গেল। রঙলাল ডাক্তার সচেতন করে তুললেন জীবন দত্তকে। বললেন—ছেড়ে দাও ওই পচা ধনীর ছেলেটার কথা। ওসব হল মানুষের নিজের পাপে সৃষ্টির অপব্যয়। এখন শোনো যা বলছি। শিখবে তুমি ডাক্তারি? আমার মতো কঠিন নয় তোমার পক্ষে। তুমি চিকিৎসা জান—রোগ চেন। তোমার পক্ষে অনেক সহজ হবে। আমি এদেশের জন্যে অনুবাদ করেছি ওদের চিকিৎসাশাস্ত্র। পড়ে ফেললেই তুমি পারবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব। শেখাব। পড়াব।

এবার জীবন দত্তের কান এড়াল না। মুহূর্তে তাঁর সব উদাস অবসন্নতা দূর হয়ে গেল। আগুন জ্বলে উঠল-জীবনে।

মঞ্জরী আর ভূপী বোস একদিন মেঘ আর বাতাসের মতো মিলে তার জীবনের সদ্য-প্রজ্বলিত বহ্নির উপর দুর্যোগের বর্ষণ ঢেলে নিভিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বনস্পতির কাণ্ড থেকে শাখাগ্র পর্যন্ত প্রসুপ্ত বহ্নির ধারা নেভে নি। সে জ্বলল! ভুলে গেলেন মঞ্জরীকে—ভূপীকে। আতর-বউকেও মনে রইল না সে মুহূর্তে। সেদিন সামনে ছিলেন রঙলাল ডাক্তার। হাতে ছিল—মোটা বাঁধানো খাতা—চোখের সামনে ছিল ভবিষ্যৎ। উজ্জ্বল দীপ্ত।

চৌদ্দ

এরপর চার বৎসর—জীবন দত্তের জীবনের বোধ করি উদয়লগ্ন।

নতুন জন্মান্তর। অথবা নতুন জন্মলাভের তপস্যা।

রঙলাল ডাক্তার মধ্যে মধ্যে রহস্য করতেন। একবার বলেছিলেন—তাই তো হে জীবন; মনে বড় আক্ষেপ হচ্ছে। মনে হচ্ছে বিবাহ একটা করলাম না কেন?

এ ধরনের কথা হত রাত্রে। বারান্দায় বসে নিয়মিত পরিমাণ ব্রাণ্ডি খেতেন

আর চুরুট টানতেন। জীবন দত্ত থাকলে তাঁর সঙ্গে গল্প করতেন, নইলে বই পড়তেন, কোনো কোনো দিন মনা হাড়িকে ডেকে তার সঙ্গেই গল্প বলতেন। তিনি গল্প বলতেন না, গল্প বলত মনা, তিনি শুনতেন। ভূতের গল্প, তিনি শুনতেন আর মধ্যে মধ্যে অট্টহাস্যে ফেটে পড়তেন।

জীবন দত্তকে তাঁর খাতাপত্র দিয়েছিলেন—দত্ত সে-সবগুলি পড়তেন নিজের বাড়িতে, যথারীতি কবিরাজী পদ্ধতিতে চিকিৎসাও করে বেড়াতেন; দু-চারদিন অন্তর সকালের কাজ সেরে খাওয়া-দাওয়া করে চলে যেতেন রঙলাল ডাক্তারের ওখানে। যা বুঝতে পারতেন না বুঝিয়ে নিতেন। যে অংশটুকু পড়ছেন তাই বলে যেতেন, ডাক্তার শুনতেন। এই অবস্থাতেই কোনো কোনো দিন আসন্নমৃত্যু রোগীর বাড়ির অবিলম্ব আহ্বান জানিয়ে ডাক আসত; ডাক্তার বিবরণ শুনে কোনোটাতে যেতেন না; যেটাতে যেতেন—জীবন দত্ত সঙ্গে যেতেন। গুরু যেতেন পালকিতে, জীবন দত্ত যেতেন হেঁটে। সবল সুস্থ দেহ—আটত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, ওজন দু' মনের উপর, বিরাট মুগুরভাজা শক্ত শরীর—জীবন দত্ত জোয়ান হাতির মতোই ভারী পা ফেলে সমানে বেহারাদের সঙ্গে চলে যেতেন।

কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই জীবন দেখলেন এ বিদ্যা আয়ত্ত করা তাঁর বুঝি সাধ্যাতীত। তিনি পিছিয়ে গেলেন। গুরুশিষ্যের মধ্যে গুরুর মনে বিরক্তির সুর বেজে উঠল। কদিন থেকেই রঙলাল ডাক্তার জীবন দত্তকে তাঁর সেই কাচের ঘরে মড়া কাটার জন্য বলছিলেন। জীবন দত্ত প্রথম দিন মড়া কেটেছিলেন কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় রাত্রে খাওয়ার পর বমি করে ফেলেছিলেন। তারপর দিন পাঁচেক আর গুরুগৃহের দিকে পা বাড়ান নাই। ছ'দিনের দিন ভেবেছিলেন—সেই পচা মড়াটা নিশ্চয় ডাক্তার ফেলে দিয়েছেন। সেদিন যাওয়া মাত্র তিরস্কার করেছিলেন গুরু। এবং মনাকে হুকুম করেছিলেন—আর একটা নিয়ে আয় মনা।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মনা একটা বছর পাঁচেকের মেয়ের শব এনে হাজির করেছিল। এ অঞ্চলে হিন্দুরাও পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শব দাহ করে না, মাটিতে পুঁতে দেয়। সেদিন জীবন দত্ত হাতজোড় করে বলেছিলেন—ও আমি পারব না। ওই শিশুর দেহের উপর—। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন —বিশ্বাস করুন, আমার মেয়েটা ঠিক এমনি দেখতে। ঠিক এমনি। এমনি চুল, এমনি গড়ন!

রঙলাল ডাক্তার তাঁর দিকে যে চোখ তুলেছিলেন সে চোখ উগ্রতায় বিস্ফারিত। কিন্তু দেখতে দেখতে কোমল হয়ে এসেছিল। বলেছিলেন—আচ্ছা থাক। তুমি

বাংলোয় গিয়ে বোসো—এটাকে আমি ডিসেকশন করে যাই। মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে—অত্যন্ত হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে। রোগের কোনো চিহ্ন নেই।

সত্যই মেয়েটি দেখতে অনেকটা জীবন ডাক্তারের প্রথম সন্তান সুষমার মতো। আতর-বউয়ের তখন দুটি সন্তান হয়েছে, বড়টি মেয়ে সুষমা, তারপর ছেলে বনবিহারী।

জীবন দত্ত কাচের ঘর থেকে বেরিয়ে আর অপেক্ষা করেন নাই, বাড়ি চলে এসেছিলেন। গুরুর মনে বিরক্তির সুর বেজে উঠেছিল এই কারণে।

কয়েক দিন পর জীবন দত্ত যেতেই গুরু সেই কথাই বলেছিলেন, বোসো। কয়েকটা কথা বলব তোমাকে। জীবন শঙ্কিত হয়ে বসেছিলেন। ডাক্তার চুরুট টেনে চলেছিলেন। কিছুক্ষণ পর চুরুটটা নামিয়ে রেখে বলেছিলেন—জীবন, তোমাকে যেমনটি গড়ে তুলব ভেবেছিলাম—তা হল না। তোমার মধ্যে সে শক্তি নাই। তা ছাড়া ইংরেজী ভালো না জানলে এ শাস্ত্রে গভীর বুৎপত্তি লাভও অসম্ভব। ভেবেছিলাম—আমি তোমার সে অভাব পূরণ করে দেব। কিন্তু সেও দেখছি সহজ না। আমার বিরক্তি লাগে এবং তোমার পক্ষেও এ বিদ্যার শিক্ষা-পদ্ধতির একটা বড় অংশ অত্যন্ত অরুচিকর। সে অরুচি কাটানো তোমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

ডাক্তার চুপ করে গেলেন।

আবার বলেছিলেন—তোমার বাবা তোমার ধাতুকে পুড়িয়ে পিটিয়ে শক্ত করে গড়ে গিয়েছেন—তাকে নতুন করে না গালিয়ে আর নতুন কিছু করা যাবে না। তলোয়ার আর খড়্গ দুটোই অস্ত্র, কিন্তু প্রভেদ আছে। তলোয়ার দিয়ে মহিষ বলি হয় না, আর খাড়া দিয়ে এ যুগের যুদ্ধ হয় না। বুঝেচ?

ঠিক সেই মুহূর্তেই এল একটি ডাক। এ অঞ্চলের একটি নামকরা বাড়ি থেকে ডাক। বাড়িটির সঙ্গে রঙলাল ডাক্তারের প্রথম চিকিৎসার কাল থেকেই কারবার চলে আসছে। তারও চেয়ে যেন কিছু বেশী। একটি প্রীতির সম্পর্কও বোধ করি আছে। এ দেশের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে রঙলাল ডাক্তারের একটা অবজ্ঞা আছে। কিন্তু এ বাড়ি সম্পর্কে ঠিক অবজ্ঞা নাই। বাড়ির গৃহিণীর কঠিন অসুখ। মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে রোগ মারাত্মক হয়ে উঠেছে। মহিলাটি আগে থেকেই অম্বলের ব্যাধির রোগিণী। তিনি আজই ঘণ্টা দুয়েক আগে পায়ে হোঁচট লেগে বাড়ির উঠানে পড়ে গিয়েছিলেন। তারপর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই এই অবস্থা। ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছেন। নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। কথাও প্রায় বলতে পারছেন না। চোয়াল পড়ে গিয়েছে।

রঙলাল ডাক্তার বিস্মিত হলেন, কতক্ষণ আগে পড়ে গেছেন বলছ ?

—এই ঘণ্টা দুয়েক।

—মাত্র দু ঘণ্টা ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাই তো। এত শিগগির ? মনা, বেহারাদের ডাক।

জীবন ডাক্তারও নীরবে গুরুর অনুসরণ করছিলেন।

রঙলাল ডাক্তার প্রথমটা লক্ষ্য করেন নাই ; মধ্যপথে জীবনকে দেখেছিলেন, বলেছিলেন, তুমিও আসছ ? এটা বোধ হয় ইচ্ছা ছিল না তাঁর। সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়ার জন্যই কথা শুরু করেছিলেন। কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই এই ভাবটি এসে পড়েছিল।

আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে সে ছবি।

বর্ধিষ্ণু ঘর, রাঢ় অঞ্চলের মনোরম মাটির কোঠা অর্থাৎ দোতলা, প্রশস্ত, পাকা মেঝে, চুনকাম করা দেয়াল। উজ্জ্বল আলো জলছিল—সে আমলের শৌখীন শেড-দেওয়া চল্লিশ-বাতি টেবিল ল্যাম্প !

অনেকগুলি লোক আত্মীয়-স্বজন—দূরে বসে রয়েছে।

একটি বিছানায় রোগিণী ছিলায়-টান-দেওয়া ধনুকের মত বাঁকা অবস্থায় পড়ে আছেন। এর উপরেও কেউ যেন টান দিচ্ছে ; অদৃশ্য কেউ যেন মেরুদণ্ডে হাঁটু লাগিয়ে সবল বাহুর আকর্ষণে টঙ্কার দিয়ে টানছে। রোগিণীর ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ। চোয়াল পড়ে গিয়েছিল এ কথা সত্য, কিন্তু তবু জীবন দত্ত বুঝতে পারলেন—অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে ওই ক্ষীণকায়া মেয়েটি এই মর্মান্তিক যন্ত্রণা সহ্য করে চলেছেন। শুধু ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে যন্ত্রণার পরিচয় বেরিয়ে আসছে। তার সঙ্গে একটু শব্দ। সেটুকুকে আর চাপতে পারছেন না ভদ্রমহিলা।

রঙলাল ডাক্তারও স্থির দৃষ্টিতে রোগিণীকে দেখছিলেন। বোধ হয় পাঁচ মিনিট পর বললেন—আজই হোঁচোট লেগে দু ঘণ্টার মধ্যে এমন হয়েছে ?

—হ্যাঁ, দু ঘণ্টাও ঠিক হবে না।

ভ্রূ কুঁচকে উঠল রঙলাল ডাক্তারের—কই কোথায় হোঁচোট লেগেছে ? রক্ত পড়েছে ?

—ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে। রক্তপাত হয় নি।

রঙলাল ডাক্তার পায়ের বুড়ো আঙুলে হাত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরখানাই যেন শিউরে উঠল; নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণায় রোগিণী ভাষাহীন একটা অবরুদ্ধ আর্তনাদ করে উঠলেন। জীবন তখনও অবাক বিস্ময়ে রোগিণীকে দেখছিলেন—কী

অপরিসীম ধৈর্য! চোখের-দৃষ্টিতে সে যন্ত্রণার পরিচয় ফুটে উঠেছে। চোয়াল পড়ে গেছে, কণ্ঠ দিয়ে আর্তস্বর বের হচ্ছে, তাকে প্রাণপণে সংযত করবার চেষ্টা করছেন তিনি। এত যন্ত্রণাতেও জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে।

ক্ষত কোথাও হয় নি, রক্তপাতের চিহ্ন নাই; বেঁকে যাচ্ছেন অসহ্য যন্ত্রণায়; শুধু তাই নয়—শরীরের কোনো স্থানে পাখির পালকের স্পর্শেও অসহ্য যন্ত্রণায় রোগিণী থরথর করে কেঁপে উঠছেন। কণ্ঠ দিয়ে অবাধ্য আর্তস্বর বের হচ্ছে।

নাড়ী দেখলেন রঙলাল। রোগিণী আবার যন্ত্রণাকাতর অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন। স্নায়ু-শিরাগুলি এমনই কঠিন টানে টান হয়ে উঠেছে যে, সামান্য স্পর্শেই ছিঁড়ে যাবার মতো যন্ত্রণায় অধীর করে তুলছে।

রঙলাল ডাক্তার ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন। গম্ভীর মুখে বললেন—দেখো তো জীবন; তোমার নাড়ীজ্ঞানে তুমি কি পাচ্ছ?

সরে দাঁড়ালেন তিনি।

সন্তর্পণে এসে বসলেন জীবন দত্ত। আশঙ্কায় একবার বুকটা কেঁপে উঠল। শুক্রাচার্যের তুল্য রঙলাল ডাক্তার, তাঁর কাছে আজ পরীক্ষা দিতে হবে। নাড়ী অনুভবের অবকাশ তিনি পান নাই। যেটুকু পেয়েছেন তার মধ্যে নাড়ীর স্পন্দন আছে কি নাই তাও বুঝতে পারেন নাই। রঙলাল ডাক্তার রোগীর মণিবন্ধ মোটা আঙুলে টিপে ধরে নাড়ী পরীক্ষা করেন। স্পন্দনের সংখ্যা গুণে দেখেন। মধ্যে মধ্যে তাতে ছেদ পড়ছে কি না দেখেন। এর বেশী কিছু না। বেশী বুঝতেও চেষ্টা করেন না।

রোগিণীর হাতখানি বিছানার উপরে যেমন ভাবে ছিল—তেমনি ভাবেই রইল; জীবন দত্ত শুধু মণিবন্ধের উপর আঙুলের স্পর্শ স্থাপন করলেন। চোখ বন্ধ করে পারিপার্শ্বিকের উপর যবনিকা টেনে দিলেন। প্রায় রিক্ত-পত্র অশ্বত্থ গাছের একটি সরু ডালে একটিমাত্র পাতা, অতি ক্ষীণ বাতাসের প্রবাহে দৃষ্টির অগোচর কম্পনে কাঁপছে; সেই কম্পন অনুভব করতে হবে; অথচ অসতর্ক রূঢ় স্পর্শ হলেই পাতাটি ভেঙে ঝরে যাবে। অতিসূক্ষ্ম স্পর্শানুভূতিকে প্রবুদ্ধ করে তিনি বসলেন। ধ্যানস্থ হওয়ার মতো।

তাঁর বাবা বলতেন—শক্তির ধর্মই হল ব্যবহারে সে সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণ হয়। অনুভূতি হল পরম সূক্ষ্ম শক্তি। আবার স্থূল করলে সে গদা হয়ে ওঠে।

ক্ষীণ ও অতি ক্ষীণ স্পন্দন তিনি অনুভব করলেন। কখনও কখনও যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

কানে এল রঙলাল ডাক্তারের কণ্ঠস্বর—পাচ্ছ?

অতি সন্তর্পণে ঘাড় নেড়ে জীবন দত্ত জানালেন—পাচ্ছি। যেন ঘাড় নাড়ার সঙ্গে হাত না নড়ে ওঠে। দেহ-চাঞ্চল্যে মনের সূক্ষ্ম কোনো কম্পন-তরঙ্গের আঘাত না লাগে।

—কিছু বুঝতে পারছ? দেখো, ভালো করে দেখো!

জীবন এবার কোনো ইঙ্গিত জানালেন না। তিনি ধ্যানযোগকে গভীর এবং গাঢ় করে তুলতে চেষ্টা করলেন। জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রদীপের শিখাকে উজ্জ্বলতর করে তুলে ধরে রোগের অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে।

কতক্ষণ অনুভব করেছিলেন নাড়ী তাঁর নিজের ঠিক হিসাব ছিল না।

অনুভব করলেন নাড়ি, যত ক্ষীণই হয়ে থাক এ নাড়ী অসাধ্য নয়। উচ্চ স্থান থেকে পড়ে গেলে বা ভগ্ন অস্থি সংযোজন-কালে, অতিসারে, অজীর্ণ রোগে, বাতরোগে এমন হয়। কিন্তু অসাধ্য নয়। এখানে দুটি কারণ একসঙ্গে জুটেছে। অকস্মাৎ একটা নদীর বন্যার সঙ্গে আর-একটা নদীর জল মিশে দেহখানাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। অজীর্ণ রোগে জীর্ণ-দেহে পড়ে যাওয়ার আঘাতের ফলে এমন হয়েছে। আঘাতটা শুধু হেতু হয়েছে, এখন প্রয়োজন কুপিত বায়ুর প্রভাবে শরীরের স্নায়ু-শিরাগুলির সংকোচন দূর করা।

—কী দেখলে? রঙলাল ডাক্তার প্রশ্ন করলেন এবং ব্যগ্রতার সঙ্গেই করলেন।

—আজ্ঞে? সবিনয়েই জীবন বলেছিলেন—নাড়ী দেখে তো একেবারে অসাধ্য মনে হচ্ছে না। তিনি নিজে নির্ণয়ের কথা বলে বলেছিলেন ধনুষ্টঙ্কার নয়।

রঙলাল ডাক্তার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলেছিলেন—হাঁ, টিটেনাস তো নয়ই এবং তুমি যা বলছ তাই খুব সম্ভব ঠিক। তুমি বলছ অসাধ্য নয়। জীবনের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—কিন্তু সাধ্য হবে কী করে? চোয়াল পড়ে গেছে—ওষুধ যাবে না। শরীরের কোথাও হাত দেবার উপায় নাই, মালিশ করা যাবে না। সাধ্য হবে কিসে?

ঘাড় নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে এলেন রঙলাল ডাক্তার।

বাইরে একান্তে জীবন বলেছিল—আপনি ওষুধ দিন, চামচ বা ঝিনুকে করে ফোঁটা ফোঁটা করে মুখে দেওয়া হোক। আর—আপনি অনুমতি করলে আমি একটা মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করি। তাতে ওই বায়ুপ্রকোপের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসবে। স্নায়ুশিরায় টানভাবটা কমে আসবে। চোয়ালও খুলবে বোধ হয়।

—মুষ্টিযোগ?

—আমাদের বংশের সংগ্রহ করা মুষ্টিযোগ। আমার পিতামহ পেয়েছিলেন

এক সন্ন্যাসী চিকিৎসকের আছে। তালগাছের কচি মাজপাতা, যা এখনও বাইরের আলোবাতাস পায়নি, তাই গরম জলে সিদ্ধ করে সেই জলের ভাপ—

—দিতে পার, দেখতে পার। আমার কাছে ও মরার সামিল। রোগীর আত্মীয়দের বলেছিলেন—ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি। জীবন রইল। আশা আমি করছি না। জীবন আশা ছাড়ে নি ; ও দেখুক। এ অবস্থা যদি কাটে, চোয়ালটা ছাড়ে—আমাকে খবর দিয়ো। জীবন একটা মুষ্টিযোগ দেবে। ঠিকমতো সব হয় যেন। বুঝলে ?

সমস্ত রাত্রি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন জীবন ডাক্তার।

গরম জলের ভাপ দেওয়ার তত্ত্বাবধান করলেন। রাত্রি বারোটার পর অসহনীয় যন্ত্রণা কমল। জীবন নাড়ী দেখলেন! মুখ প্রফুল্ল হল। প্রশ্ন করলেন—এবার একটু দেখুন তো গায়ে সেঁক নিতে পারেন কিনা ?

নিজেই জল-নিঙড়ানো গরম কাপড়ের টুকরোটা সন্তর্পণে রোগিণীর হাতের উপর রাখলেন। লক্ষ্য করলেন—দেহে কম্পন ওঠে কি না। উঠল না। প্রশ্ন করলেন—পারবেন সহ্য করতে ? কষ্ট হবে জানি, কিন্তু সহ্য করতে হবে।

অসাধারণ রোগিণী। মূর্তিমতী ধরিত্রীর মতো সহনশক্তি। সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়লেন তিনি। উৎসাহিত হলেন জীবন। নিজেই বসলেন সেঁক দিতে। ওষুধ চলছিল ফোঁটা ফোঁটা। ঘন্টাখানেক পরে রোগিণীর অবস্থা লক্ষ্য করে বললেন—একটু বেশি বেশি দিয়ে দেখুন তো! মুখে ফোঁটা ফোঁটা ওষুধ দিচ্ছিলেন আর-একটি মহিলা। নীরবে চলছিল জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধ।

ক্রমে রাত্রি তৃতীয় প্রহর শেষ হল। জীবন ডাক্তার এবার লক্ষ্য করলেন—প্রচণ্ড শক্তিতে গুণ দিয়ে বাঁকানো ধনুকের দণ্ডের মতো দেহখানি, ধীরে ধীরে সোজা হচ্ছে, সন্তর্পণে সভয়ে রোগিণী সোজা হতে চাচ্ছেন, যেন ধীরে ধীরে গুণ শিথিল করে দিচ্ছে কেউ।

জীবন মৃদুস্বরে বলল—দেখুন তো মা, হাঁ করতে পারেন কি না ?

পারলেন, স্বল্প হলেও তার মধ্যে জিহ্বা সঞ্চালিত করবার স্থান পেলেন, চাপা উচ্চারণে বললেন—পারছি।

এবার পূর্ণ এক দাগ ওষুধ খাইয়ে সেঁকের ভার রোগিণীর ছেলের উপর দিয়ে বললেন—বাইরের বারান্দায় আমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিন। একটু বিশ্রাম করব। আমার বিশ্বাস সূর্য উদয় হলেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন উনি—আর ভয় নাই।

প্রায় নিশ্চিন্ত হয়েই বললেন জীবন দত্ত। বায়ুর কাল চলে গিয়েছে ; এবার কাল হয়েছে অনুকূল। ঝড় থেমেছে ; অনুকূল মৃদু বাতাসে নৌকার মতোই জীবনতরী এবার পৃথিবীর কূলে এসে ভিড়বে।

তাই হয়েছিল। সেদিনের আনন্দ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ!

গুরু রঙলাল ডাক্তারকে বিস্মিত করতে পেরেছিলেন তিনি।

বেলা তখন আটটা। রঙলাল ডাক্তার রোগী দেখছিলেন। এ সময় তিনি ফীজ নিতেন না। রোগী দেখতে দেখতেই তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে জীবনের দিকে তাকালেন।

কান থেকে স্টোথোসকোপটা খুলে প্রশ্ন করলেন, বাঁচাতে পেরেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিপদটা আপাতত কেটে গিয়েছে।

—বাঃ। আজ এইখানে থাকো। বিশ্রাম করো।

দুপুরবেলা নিজে রোগিণীকে দেখে এসে খুশী হয়ে বলেছিলেন, ক্রেডিট বারো আনা তোমার জীবন। আমার ওষুধে কিছু ছিল না। যা ছিল তার পাওনা সিকির বেশি নয়। মেয়েটির এখন কলিকের চিকিৎসার প্রয়োজন। আমি বলেছি কবরেজি মতে চিকিৎসা করাতে। তুমি ব্যবস্থা করো।

সেইদিন রঙলাল ডাক্তার রাত্রে বাতির রঙীন আমেজের মধ্যে মৃদু হেসে ওই কথাটা বলেছিলেন। বলেছিলেন, আক্ষেপ হচ্ছে হে জীবন—একটা বিয়ে করি নি কেন? তারপর হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন।

হাসি থামিয়ে আবার বলেছিলেন—কেন বললাম জান?

স্নেহে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন জীবন। অভিভূত ভাবেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আজ্ঞে?

—তুমি আমাকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের সঙ্গে তুলনা কর সেটা আমি শুনেছি। আমি তাতে রাগ করি না। শুক্রাচার্য বিরাট পুরুষ। হোক এক চোখ কানা। হাসতে লাগলেন আবার। তারপর বললেন—আজ আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে কচের সঙ্গে তুলনা করতে।

হা-হা করে হাসতে লাগলেন—বিয়ে করলে একটা দেবযানী পেতাম হে।

পনেরো

আরও একবৎসর পর রঙলাল ডাক্তার তাঁকে বিদায় দিলেন।

হঠাৎ চিকিৎসা ছেড়ে দিলেন। বললেন—আর না। এইবার শুধু পড়ব আর ভাবব। জীবন এবং মৃত্যু। লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ, তার পিছনের সেই প্রচণ্ড শক্তি—তাকে ধারণা করবার চেষ্টা করব। আর দেশী গাছ-গাছড়া নিয়ে একখানা বই লিখব।

জীবনকে বলেছিলেন—তোমার ডাক্তারি শেখাটা বোধ হয় ঠিক হল না জীবন। ওই সব বিচিত্র অবিশ্বাস্য মুষ্টিযোগ নিয়ে যদি গবেষণা করতে পারতে! কিন্তু তাও ঠিক পারতে না তুমি। তোমার সে বৈজ্ঞানিক মন নয়। কার্য হলেই তোমার মন খুশী। কেন হল—সে অনুসন্ধিৎসা তোমার মনে নাই। যাক। তুমি বরং ডাক্তারি, কবিরাজি, মুষ্টিযোগ তিনটে নিয়েই তোমার ট্রাইসাইকেল তৈরি করো। ওতে চড়েই যাত্রা শুরু করো। নিজেরই একটা স্টেথোসকোপ তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন ; থারমোমিটার দেন নি, কিনতেও বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন—ওর দরকার নেই তোমার।

এরপরও জীবন দত্ত মধ্যে মধ্যে যেতেন। রঙলাল ডাক্তার দেখা করতেন, কিন্তু চিকিৎসা সম্পর্কে কোনো আলোচনা করতেন না। প্রশ্ন করলে বলতেন—ভুলে গিয়েছি। এখন বাগান করছি, গাছ-গাছড়ার সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে করো।

আসল উদ্দেশ্য ফুলের বাগান নয়, রঙলাল ডাক্তার নিজের সমাধিক্ষেত্র তৈরি করছিলেন। ওইখানেই তাঁকে মৃত্যুর পর সমাধিস্থ করা হয়েছে। তাঁর ইচ্ছানুসারেই হয়েছে! তিনি উইল করে গিয়েছিলেন। সেই উইলে তিনি লিখেছিলেন—তাঁকে যেন সমাধি দেওয়া হয় এই বাগানের মধ্যে।

একা ঘরের মধ্যে মরেছিলেন। মৃত্যুকালে ঘরের মধ্যে কাছে কেউ ছিল না। সেও তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে। মনা হাড়ি ছিল দরজায় পাহারা। মনা অঝোর-ঝরে কেঁদেছিল কিন্তু ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয় নি। বলেছিল—সে পারব না। বাবার হুকুম নাই।

ওই রঙলাল ডাক্তারের দেওয়া স্টেথোসকোপ নিয়ে তিনি অ্যালোপাথিক চিকিৎসা শুরু করলেন। কবিরাজি ত্যাগ করলেন না। মুষ্টিযোগও রইল। সেইবারই দত্ত মশায়দের চিকিৎসালয়ের নামকরণ করলেন—'আরোগ্যনিকেতন'।

নবগ্রামে তখন হরিশ ডাক্তার খুলেছে—হরিশ ফার্মেসি।

ধনী ব্রজলালবাবু দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করে নাম দিয়েছে—পিয়ারসন চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি।

হোমিওপ্যাথ এসেছে একজন। পাগল ছিল লোকটা, নাম বলত—কে, এম, ব্রারোরী অর্থাৎ ক্ষেত্রমোহন বাড়ুরী। তার ডিসপেন্সারির নাম ছিল—'ব্রারোরী হোমিও হল'।

জীবন দত্ত কলকাতার অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ কিনতে গিয়ে ওই সাইনবোর্ডটা লিখিয়ে এনেছিলেন।—'আরোগ্য-নিকেতন'।

ওঃ—উদ্যোগপর্বে আতর-বউয়ের সে কী রাগ!

অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ, আলমারি এবং সরঞ্জামপাতি কিনবার জন্য পাঁচশো টাকায় পাঁচবিঘে জমি বিক্রি করেছিলেন তিনি। রাগ ক্ষোভ তাঁর সেই উপলক্ষ্য করে, নইলে ওটা ভিতরে ভিতরে জমাই ছিল।

ক্ষোভের দোষ ছিল না। জগৎ মশায়ের আমল থেকে তাঁর আমল পর্যন্ত তখন লোকের কাছে ওষুধের দাম পাওনা তিন-চার হাজার টাকারও বেশি। সচ্ছল অবস্থার লোকের কাছেই পাওনা বেশি। কিন্তু তার মধ্যে এই প্রয়োজনে শতখানেক টাকার বেশি আদায় হল না।

এর জন্য ক্ষোভ তাঁর নিজেরও হয়েছিল। কিন্তু আতর-বউয়ের ক্ষোভ স্বতন্ত্র বস্তু। সে ক্ষোভ তাঁর উপর এবং সে ক্ষোভ ক্ষমাহীন; আতর-বউয়ের বাহ্যিক ক্ষোভের আপাত উপলক্ষ্য যাই হোক; ক্ষোভ প্রকাশ হলেই মুহূর্তে মূল কারণ বেরিয়ে পড়ে; সেটা হল তাঁর বিরুদ্ধে একটা অনির্বাণ চিতার মতো অসন্তোষের বহ্নিদাহ!

তখন ওই জমি বিক্রির উপলক্ষ্য নিয়ে তাঁর মনের আগুন জ্বলেছিল! মনে পড়ছে, পাওনা টাকা আদায় করতে গিয়ে—টাকা পাওনা দূরে থাক কটুকথা শুনে তখন তাঁর নিজের মনেও ক্ষোভ জমেছিল। ওষুধের বাকির প্রসঙ্গে লোকে বলেছিল—পঞ্চাশ টাকা? ওষুধের দাম? কী ওষুধ হে? সোনাভস্ম না মুক্তাভস্ম না মানিকভস্ম—কী দিয়েছিলে? পঞ্চাশ টাকা? গাছ-গাছড়া আর গিয়ে এটা-ওটা টুকি-টাকি—আর তো তোমার "রসসিন্দুর"—এর দাম পঞ্চাশ টাকা? যা ইচ্ছে তাই খাতায় লিখে রেখেছ? হরি-হরি-হরি!

এ নিয়ে আর বাদপ্রতিবাদ করেন নি জীবন ডাক্তার। ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এসেছিলেন। এবং ফেরবার পথেই সাহাদের শিবু সাহাকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। ডাক্তারখানা তিনি করবেনই। বুকের ভিতর তখন অনেক আশা। অনেক আকাজ্ক্ষা। রঙলাল ডাক্তারের স্থান তিনি পূর্ণ করবেন। তিনি যাবেন—রোগীর বাড়িতে আশার প্রসন্নতা ফুটে উঠবে। তিনি নাড়ী ধরবেন—রোগীর দেহে রোগ সচকিত হয়ে উঠবে। নবগ্রামের অহঙ্কারী জমিদার-সমাজ সম্ভ্রমে বিনত হবে। শুধু নবগ্রাম কেন? সারা অঞ্চলের ধনী-সমাজ জমিদার-সমাজ বিনত হবে। বড় ঘোড়া কিনবেন। সাদা ঘোড়া। পালকিও রাখবেন একখানা। বেশি দূরের পথে যাবেন পালকিতে। এ অঞ্চল বলতে সীমানা তো কম নয়—পূর্বে গঙ্গার ধার পর্যন্ত—কান্দী-পাঁচথুপি। এদিকে অজয়ের ধার পর্যন্ত। কান্দী গেলে ভূপীর সঙ্গে দেখা করে আসবেন। চিকিৎসা করে তাকে সারিয়ে তুলবার নতুন আকাজ্ক্ষা হয়েছে

তাঁর। জীবনের তখন অনেক আশা। ছেলে বনবিহারীর বয়স মাত্র বছর তিনেক। তাকে ডাক্তারি পড়াবেন। বড় ডাক্তার করে তুলবেন। মেডিকেল কলেজ থেকে এল. এম. এস. পাশ করে আসবে সে।

আজ যারা অবজ্ঞা করে তাঁর পাওনা টাকা দিলে না, উপরন্তু ইঙ্গিতে অসাধুতার অপবাদ দিলে তারাই তাঁর কাছে আসবে বিপদের দিনে। সে দিন তিনি তাদের —! না ফিরিয়ে দেবেন না, কটু বলবেন না। যাবেন। তাঁর বংশের নাম হয়েছে 'মশায়ের বংশ'—বংশের মহদাশয়ত্ব ক্ষুণ্ণ করবেন না।

তিনি পথেই দাম-দর করে জমি বিক্রির কথাবার্তা পাকা করে বাড়িতে এসে বললেন, তুমি বোসো শিবু। আমি দুটো মুখে দিয়ে নি। তারপর বের হব। কাগজ কিনে লেখাপড়া শেষ করে বাড়ি ফিরব। রেজেষ্ট্রির সময় তো তিন মাস—।

শিবু বলছিল—দেখুন দেখি, লেখাপড়ারই তাড়া কিসের গো? আপনি মশায়ের বংশের সন্তান, আজ আপনিই মশাই। আমি টাকা এনে গুনে দিয়ে যাচ্ছি—লেখাপড়া রেজেষ্ট্রি হবে পরে।

শিবু পাঁচশো টাকা এনে দিয়ে গিয়েছিল সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা।

ওদিকে বাড়ীতে তখন আতর-বউ আগুন ছড়াতে শুরু করেছেন। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! সবই অদৃষ্ট! মা খেয়েছি, বাপ খেয়েছি, সারা বালিকা বয়সে মামা-মামীর বাঁদীগিরি করেছি বিনা মাইনেতে। শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ী খেলাম, শ্বশুর খেলাম। এইবার লক্ষ্মী বিদেয় হবেন তার আর আশ্চর্য কি? আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি—মেয়ে হয়েছে ছেলে হয়েছে—ওদের হাত ধরে ভিক্ষে করতে হবে আমাকে। পথে বসতে হবে।

জীবন দত্তের মাথার মধ্যেও আগুন জ্বলে উঠেছিল। তবু সে আগুনকে কঠিন সংযমে চাপা দিয়ে তিনি বলেছিলেন—ছি আতর-বউ! ছি!

—কেন? ছি কেন? আমার অদৃষ্ট তো এই বটে। কোনখানটা মিথ্যে বলো, শ্বশুর দেহ রাখবার আগের মাসেও এ বাড়িতে জমি এসে ঢুকেছে। আজ সবে চার বছর তিনি গিয়েছেন—এরই মধ্যে জমি বেরিয়ে গেল।

—এই বছর যেতে-না-যেতে আমি পাঁচ বিঘের জায়গায় দশ বিঘে কিনব।

—তা আর কিনবে না? কত বড় ডাক্তার হয়ে এলে, একেবারে বিলাতী পাশ সায়েব ডাক্তার!

এবার আর সহ্য করতে পারেন নি জীবন ডাক্তার। কঠিন কণ্ঠে বলেছিলেন—আতর-বউ!

চমকে উঠেছিলেন আতর-বউ সে ডাকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে

গিয়েছিলেন। তারপর—শুরু করেছিলেন কান্না। জীবন ডাক্তার সে কান্না গ্রাহ্য করেন নি! কাঁদতেই ওঁর জন্ম। ওই তাঁর বোধ করি প্রাক্তন। কাঁদুন তিনি। তিনি কী করবেন?

সেই রাত্রে তিনি কলকাতা রওনা হয়েছিলেন।

কলকাতা থেকে ওষুধ-আলমারি কিনে এনে ওই সাইনবোর্ডটা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন—'আরোগ্য-নিকেতন'।

সেতাব মুখুজ্জে এনে দিয়েছিল একটা গণেশ মূর্তি।

সুরেন সিন্দূর দিয়ে তার নীচে লিখেছিল—শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

পাগলা নেপাল তাঁকে একখানা সে-আমলের বাঁধানো নোটবুক এনে দিয়েচিল। নেপাল তখন কাজ করত নবগ্রামের ধনী ব্রজলালবাবুর বাড়িতে। ব্রজলালবাবুর জামাই ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার; তার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল নেপালের। খাতাখানা সে তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করে এনে দিয়ে বলেছিল—নে, রঙলাল ডাক্তারের মতো নোট করে রাখবি। আরও এসেছিল সেদিন স্থানীয় ডাক্তারেরা। কৃষ্ণলালবাবুর বাড়ীর ডাক্তার হরিশ ডাক্তার এসেছিল; এখানকার ইস্কুলের হেডমাস্টার এসেছিল। থানার দারোগা।

আর এসেছিল—শশীকে নিয়ে শশীর পিসীমা।

—বাবা জীবন।

—আপনি? কী হয়েছে? জীবন দত্ত ভেবেছিলেন—শশীরই কোনো অসুখ হয়েছে।

—বাবা, শশীর বড় ইচ্ছে, খানিক আধেক চিকিৎসা শেখে। লেখাপড়া তো হল না। একটু-আধটু শিখিয়ে দিলে করে-কম্মে খাবে।

শশী তখন নিতান্ত কচি। কত বয়স হবে? সতেরা-আঠারো বছর। একটু পাগলাটে ভাব। ওই নেপালের মতো। ফিকফিক করে হাসত।

ওঃ—সে এক মনোহর রাত্রি। খাওয়া-দাওয়া, খেলাধূলা, গান-বাজনা! এরই মধ্যে পাগল নেপাল এক কাণ্ড করেছিল। ওষুধের সঙ্গে কয়েক বোতল গোলাপ-জল ছিল। নেপাল লুকিয়ে গোলাপ-জল মাখতে গিয়ে—তাড়াতাড়িতে মাথায় দিয়েছিল ফ্রেঞ্চ বার্নিশ! আসবাবে দেবার জন্য জীবন দত্ত ওটা এনেছিলেন। তারপর সে এক কাণ্ড! মাথার চুলগুলিতে গালা জমে নেপালের আর দুর্গতির সীমা ছিল না। সে কী হাসি সকলের। শশী হেসেছিল সবচেয়ে বেশি। নিতান্ত তরুণ বয়স, তার উপর সেদিন সে জীবন-মশায়ের মনস্তুষ্টির জন্যে ছিল অতিমাত্রায় ব্যস্ত।

*　　*　　*

সেই শশী বিরক্তি প্রকাশ করে গেছে, তাঁর নিদান হাঁকার জন্য কটু কথা বলে গেছে! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধ।

—মশায়! কে যেন ডাকলে।

বৃদ্ধ জীবন দত্ত চকিত হয়ে ফিরে তাকালেন। অন্ধকারের মধ্যেই তো বসেছিলেন তিনি—হঠাৎ একটা আলোর ছটা এসে পড়েছে। কে তাঁকে ডাকছে। ওঃ, তিনি একেবারে যেন ডুবে গিয়েছিলেন অতীতকালের স্মৃতিতে। এতক্ষণে বর্তমানে ফিরে এলেন। হ্যাঁ—লোক এসেছে; তাঁকে ডাকছে। লোকটার হাতের আলোটা নিচের দিকে আলো ফেলেছে। উপরের দিকটায় হ্যারিকেনের মাথার ঢাকনির ছায়া পড়েছে।

—কে? প্রশ্ন করলেন জীবন দত্ত। পরক্ষণেই মনে হল সম্ভবত রতনবাবুর বাড়ির লোক। বিপিনের অসুখ হয়তো বেড়ে উঠে থাকবে।

না। রতনবাবুর বাড়ির লোক তো নয়। যে গন্ধ লোকটির শরীর এবং কাপড়-চোপড় থেকে ভেসে আসছে তাতে মনে হচ্ছে সাধু-সন্ন্যাসীর গোষ্ঠির কেউ। গাঁজা, ভস্ম, ধূলি-ধোঁয়া-রুক্ষ দেহচর্ম এবং চুলের গন্ধ মিশিয়ে একটা বিশেষ রকমের গন্ধ ওঠে এদের গায়ে, এ সেই গন্ধ। সম্ভবত চণ্ডীমায়ের মহান্তের দূত। কিছুদিন থেকেই বুড়ো সন্ন্যাসীর অসুখের কথা শুনেছেন জীবন দত্ত।

জীবন দত্তের অনুমান মিথ্যা নয়। লোকটি চণ্ডীমায়ের মহান্তের চেলাই বটে। বললে—সাধুবাবাকে একবার দেখতে যেতে হবে।

—এই রাত্রে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্ধ্যা থেকে রক্তভেদ হচ্ছে। বড় কষ্ট। দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বললেন—জীবনকে একবার খবর দে! মালুম হোয় কি আজই রাতমে ছুটি মিলবে। সে একবার দেখুক।

বৃদ্ধের প্রাণ বড় শক্ত প্রাণ। কতবার যে এমন হল! অন্তত বিশ-পঁচিশ বার। রক্তভেদ—নিদারুণ হিক্কা—নাড়ী ছেড়ে যাওয়া, এ সব হয়েও বৃদ্ধ বেঁচে উঠেছে।

একমাত্র কারণ গাঁজা। কিন্তু গাঁজা বুড়ো কিছুতেই ছাড়বে না। মদ খায় না এমন নয়। খায় কিন্তু পর্বে-পার্বণে অতি সামান্য। তন্ত্রের নিয়ম রক্ষা করে। মদ্য-পানকে বলে—ঢুকু ঢুকু! জীবন দত্তই তাকে বরাবর ভালো করেছেন। ডাক্তারি ওষুধ বুড়ো খায় না। ইনজেকশনকে বড় ভয়। মশায়বাড়ির টোটকার উপরেই তার একমাত্র বিশ্বাস। তাও খুব কঠিন হয়ে উঠলে তবে বুড়ো জীবনকে ডাকে, বলে, দেখতো ভাই জীবন। তলব কি আইল? বুড়ো আবার পড়েছে। আজকাল বড় ঘন ঘন পড়ছে।

জীবন দত্ত উঠলেন।

বৃদ্ধ বয়স, রাত্রি প্রহর পার হয়ে গিয়েছে ; বোধহয় সাড়ে দশটা। শ্রাবণ মাস, দিন বড় রাত্রি ছোট, হবে বৈ কি সাড়ে দশটা। তবুও যেতে হবে। উপায় কী? চলো।

বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি ডাকলেন—আতর বউ!

—কী? ভিতর থেকে রুক্ষ স্বরেই জবাব দিলেন আতর-বউ।

—বেরুতে হচ্ছে। ঘুরে আসি একবার।

—এই রাত্রে কোথায় যাবে। কার বাড়ি? না, যেতে হবে না তোমাকে। অনেক ডাক্তার আছে। অল্প বয়েস, বিদ্বান, বড় বড় পাশকরা। তারা যাক। এই বয়েস তোমার—তোমাকে ডাকতে এসেছে শুধু টাকা দেবে না বলে। যেয়ো না তুমি।

জীবন ডাক্তার কোমল স্বরেই বললেন—চণ্ডীতলায় সাধুবাবার অসুখ আতর-বউ।

ওই কথাতেই অনেক কিছু বলা হয়ে গেল। আতর-বউও মুহূর্তে নরম হয়ে গেলেন। তাই বা কেন? একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। বললেন—সাধুবাবার অসুখ? কী হয়েছে?

—কী হবে? সেই যা হয়। রক্তভেদ—পেটে যন্ত্রণা।

—এবার তা হলে বাবা দেহ রাখবেন। বয়স তো কম হল না।

—দেখি! বলে তো পাঠিয়েছেন—জীবনকে ডাকো—তলব আইল কি না দেখুক। দেখি!

ভারী জুতোর শব্দে স্তব্ধ পল্লীপথের দুপাশের বাড়ির দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে বৃদ্ধ হস্তীর মতো জীবন ডাক্তার চললেন—গ্রাম পার হয়ে ; স্বল্প বিস্তৃতির একখানি মাঠ পার হয়ে—নবগ্রামের পূর্বপ্রান্তে ঘন জঙ্গলে ঘেরা দেবাশ্রমের দিকে। বর্ষার রাত্রি—অবশ্য অনাবৃষ্টির বর্ষা—তবুও রাস্তা পিছল, একটু সাবধানেই পথ চলতে হচ্ছিল। আলো নিয়ে সাধুর অল্পবয়সী চেলাটি দ্রুতপদেই চলেছে—ডাক্তার প্রায় অন্ধকারেই চলেছেন। তাতে ডাক্তারের অসুবিধে নাই। অন্ধকারে ঠাওর করে পথ চলা তাঁর অভ্যাস আছে। কিন্তু সাধুর চেলার হাতের আলোটা দুলছে, অসুবিধে হচ্ছে তাতেই। মধ্যে মধ্যে চোখে এসে লাগছে। ডাক্তার বললেন—আলোটা এমন করে দুলিয়ো না হে ভোলানাথ। চোখে লাগছে। চলো, চলো, দাঁড়াতে হবে না। আলোটা দুলিয়ো না।

—কে? মশায় না কি?

সম্মুখের দেবস্থলের প্রবেশপথের ঠিক মুখ থেকে কে প্রশ্ন করলে। ঘন জঙ্গলের

মধ্যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। কণ্ঠস্বরটা চেনা। তবু জীবন দত্ত ধরতে পারলেন না। অন্যমনস্ক হয়ে সাধুর কথাই ভাবছিলেন তিনি। বহুকাল এখানে আছেন সাধু। অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

—রোগীকে আমি ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। হাসতে লাগল সে।

—শশী! চমকে উঠলেন ডাক্তার!—কী দিয়ে ঘুম পাড়ালি?

পাগলা শশী হাসতে লাগল—অসুরের চিকিৎসা আসুরিক।

—কিন্তু তোকে খবর দিলে কে?

—এসে পড়লাম হঠাৎ। গিয়েছিলাম গলাইচণ্ডী, রামহরি লেটকে দেখতে। বেটার খুব অসুখ। দুপুরবেলা আপনাকে কল দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ওই মতির মায়ের নিদানের কথা বলতে গিয়ে ভুলেই গেলাম। বউ-ঠাকরুন বলেন নি আপনাকে? কাল একবার রামহরিকে দেখতে যেতে হবে মশায়।

—সে তো পরের কথা। কাল হবে। এখানকার খবর বল। কী চিকিৎসা করলি মহান্তের? উৎকণ্ঠা অনুভব করছিলেন তিনি। শশীকে যে তিনি জানেন!

শশী বললে—আর কী। গলাইচণ্ডী থেকে ফিরবার পথে ঢুকলাম—ভিজে শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, আর কেমন ছমছম করছিল বুঝেছেন—তাই বলি মাকে একবার প্রণাম করি আর শরীরটাকে তাজা করে নি। বুড়োর কাছে একটান গাঁজা খেয়ে যাই।

—হুঁ তারপর?

—দেখলাম বুড়ো ধুকছে। রক্ত দাস্ত হয়েছে। নাড়ী নাই। যাতনায় ছটফট করছে। শুনলাম তিন দিন গাঁজা খায় নাই। বললাম—যেতে তোমাকে হবে। তা গাঁজা না খেয়ে যাবে কেন—একটান গাঁজা খেয়ে নাও। তা বললে —না। তু বেটা বদমাশ শয়তান। আরে ওহি গাঁজা তো আমার মরণ আসবার পথ তৈয়ার করেছে। এক পাও পথ বাকি; সে আসুক নিজেই ওটুকু পথ তৈয়ার করে। আর গাঁজা কেনো? আমি মশায়, এক ডোজ ক্যানাবিসিণ্ডিকা দিয়েছি। সঙ্গেই ছিল। আমি খাই তো। বাস—খেয়ে দুতিন মিনিটের মধ্যে বুড়ো ঘুমিয়ে পড়ল। দেখুন, বোধ হয় নাড়ীও টিপটিপ করে উঠেছে। গাঁজা-খাওয়া ধাত তো। লেগে গিয়েছে।

হি-হি করে হাসতে লাগল পাগলা।

ষোলো

"মিথ্যে বলে নি পাগলা। এক ডোজ ক্যানাবিসিণ্ডিকাতে বৃদ্ধ সাধুর ঘুম এসেছে; ঘুম যখন এসেছে তখন যন্ত্রণারও উপশম হয়েছে এবং নাড়ির স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বুঝতে কিছু পারা গেল না।

সাধুসন্ন্যাসীর ধাতু-প্রকৃতিও স্বতন্ত্র; সাধারণ মানুষের সঙ্গে অনেক প্রভেদ। জীবনে আচার এবং বিধিনিয়ম পালনের প্রভাব দেহের উপর অমোঘ। দেহের সহনশক্তি আশ্চর্যভাবে বেড়ে যায়। তেমনি আশ্চর্য ক্রিয়া করে ওষুধ। অকর্ষিত মৃত্তিকায় প্রথম চাষের বীজের মতো। সুতরাং বলা তো যায় না। মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হয়েও এদের প্রাণশক্তির কাছে হার মেনে ফিরে যায়। এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখছেন জীবন দত্ত। তাঁর বাপও এ কথা তাঁকে বলে গেছেন। বলেছিলেন —এদের নাড়ী দেখে সহজে নিদান হেঁকো না, বাবা। আগে জেনে নিয়ো—তাঁদের নিজের দেহরক্ষার অভিপ্রায় হয়েছে কি না। মানুষের অভিপ্রায় প্রচণ্ড কাজ করে; যে রোগী হতাশ হয়ে ভেঙে পড়ে তাকে বাঁচানো কঠিন হয়। সাধুদের হতাশা নাই, মনটি ওদের শক্ত। ইচ্ছাশক্তি প্রবল। এবং মৃত্যু বরণের অভিপ্রায় ওঁরাই করতে পারেন।

সাধু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। ডাক্তার বললেন—রাত্রিটা সজাগ থেকো ভোলানাথ। রাত্রে যদি ঘুম ভাঙে—তবে জল খেতে দিয়ো। আর কিছু না। আমি ভোরবেলা আসব।

শশী খুব হাসতে লাগল। আত্মপ্রসাদের আর অবধি নাই তার। ডাক্তার তাকে ডেকে সঙ্গে নিলেন।—আয় একসঙ্গেই যাই।

শশীও সঙ্গ ধরলে। বললে—চলুন—রামহরির কেসটা বলে রাখি! কাল আপনাকে যেতেই হবে!

ডাক্তার বললেন—শশী, আজ যা করেছিস করেছিস, এমন কাজ আর করিস না!

—কী? বুড়োকে ক্যানাবিসিণ্ডিকা দেওয়া?

—হাঁ! অন্যায় করেছিস!

—অন্যায় করেছি তো বুড়ো সুস্থ হল কী করে?

কী করে তা বলা শক্ত! গাঁজা খাওয়া অভ্যেস আছে, সেই গাঁজা না খাওয়ার জন্যেও একটা যন্ত্রণা ছিল রোগের যন্ত্রণার সঙ্গে—সেটা উপশম হয়েছে

—তার উপর মাদকের ক্রিয়া আছে। এখন ঘুম ভেঙে এর ফল হয়তো মারাত্মক হবে।

—উঁহু! বুড়ো সেরে উঠবে এ আমি বলে দিলাম। কুড়ো বাউড়ীর মেয়েটার নিউমোনিয়ায় কেরোসিনের মালিশ দিলে সবাই আপনারা গাল দিয়েছিলেন—কিন্তু সেরে তো গিয়েছিল।

ডাক্তার ধমক দিয়ে বললেন—শশী, এ সব পাগলামী ছাড়্। শেষ পর্যন্ত বিপদে পড়বি।

—আমি পাগল?

—হ্যাঁ। তুই পাগল। আমার আর কোনো সন্দেহ নাই।

একটু চুপ করে থেকে শশী বললে—তা বেশ। পাগলই হলাম আমি। তা বেশ। আবার খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—কাল কিন্তু রামহরিকে দেখতে যেতে হবে। আমি কল দিয়ে রাখলাম।

—রামহরির কী হল?

—সে সাতহ্‌গুনে চোদ্দখানা ব্যাপার। এবার যাবে।

—যাবে তো আমাকে টানাটানি কেন? যাক না। এ বয়সে গেলেই তো খালাস। না, যেতে চায় না কামারবুড়ীর মতো? তা রামহরির এ ইচ্ছে স্বাভাবিক। আবার যেন মালাচন্দন করেছে এই বয়সে!

—হ্যাঁ। বছর পঁচিশেক বয়স মেয়েটার। কিন্তু রামহরি বাঁচবার আশায় আপনাকে ডাকছে না। ডাকছে, নিদান দিতে হবে, বলে দিতে হবে—জ্ঞানগঙ্গা যেতে পারে কি না। বড় ইচ্ছে জ্ঞানগঙ্গা যায় উদ্ধারণপুর কি কাটোয়া। জ্ঞানগঙ্গা গিয়ে বেশীদিন বাঁচলে তো মুশকিল! কণ্ট্রোলের বাজার। এ জেলার চাল ও জেলায় যাবার হুকুম নাই। কিনে খেতে গেলে অনেক টাকা লাগবে।

বকবক করে বলেই চলল শশী।

—চোরের রাজ্য বুঝেছেন, সব চোর। আপাদমস্তক চোর। রাজা চোর, রানী চোর, কোটাল চোর—সব চোর। আমি চোর, তুমি চোর—সব চোর। চালের দর ষোলো টাকা? তাও এ জেলায় ষোলো তো ও জেলায় ছাব্বিশ, আর দু পা ছাড়াও ছত্রিশ—আর এক পা ওদিকে চল্লিশ।

মশায় ঠিক কথাগুলি শুনছিলেন না। তিনি ভাবছিলেন। ভাবছিলেন রামহরির কথা। শশী আপন মনেই বকে চলেছিল। হঠাৎ একবার থেমে—আবার আরম্ভ করলে। এবার কথার সুর আলাদা। দেশের সমালোচনা বন্ধ করে অকস্মাৎ সরস রসিকতায় সুরসিক হয়ে উঠল শশী। বললে—রামহরি জ্ঞানগঙ্গা যাবে—কিন্তু

বেহিসেবি কাণ্ড করে তো যাবে না, কদিন বাঁচবে—আপনাকে বলে দিতে হবে; সেই হিসেব করে চাল ডাল বেঁধে নিয়ে যাবে। বলে, ঠাকুর, তোমার কী বল? দশদিন বেশী বাঁচলে—চাল কম পড়বে। তখন নগদ দামে কিনতে হবে। পাঁচদিন কম বাঁচলে চাল বাড়বে। সে চাল ঘরে ফিরে নিতে নাই, বেচে দিতে হবে। সে সব তো আমার হাত দিয়ে হবে না। হবে পরের হাত দিয়ে। পাঁচভূতে সব তচনচ করে দেবে আমার। বুঝুন ব্যাপারটা—রামহরি যে হিসেব নেবে তার উপায় থাকবে না। ব্যাটা বলে—তাতে আমার স্বর্গে গিয়েও শান্তি হবে না। আমি বলি—স্বর্গে যাওয়াই হবে না তোর। রথে চড়ে বলবি—রোখো-রোখো! আমি নামব। রথ ফিরিয়ে দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখবি। মহামুশকিল। গঙ্গাতীরে মৃত্যু—ভূত হবারও উপায় থাকবে না, সে হলে সান্ত্বনা থাকত রামহরির—ঘাড় ভাঙতে পারত। পিছু পিছু গিয়ে খোনা স্বরে বলতে পারত—দেঁ—আমার টাকা ফিঁরে দেঁ।

হি-হি করে হাসতে লাগল শশী।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রির মধ্যে দুজনে পথ হাঁটছিলেন।

বৃদ্ধ জীবনমশায় আপনার মনে রামহরির কথা ভাবছিলেন। এমনটা কী করে হল? কেমন করে হয়? জ্ঞানগঙ্গা যেতে চায় রামহরি? বিনা ভাবনায়, বিনা কামনায়, বৈরাগ্যযোগ—মুক্তি-পিপাসা কি জাগে? আমি মরব এই কথা ভেবে প্রসন্ন মনে সমস্ত কিছু পিছনে ফেলে অভিসারে চলার মতো চলতে পারে? দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর যুবতী বধূর স্বামী-সন্দর্শনে যাওয়ার কালে বাপের ঘরের উঠানে পাতা খেলাঘর ফেলে যাওয়ার মতো যেতে পারে?

রামহরি প্রথম জীবনে ছিল ছিঁচকে চোর; তারপর হয়েছিল পাকা ধান-চোর; বার দুয়েক জেল খাটার পর হঠাৎ রামহরির দেখা গেল ঘোরতর পরিবর্তন; রামহরি কপালে ফোঁটা-তিলক কেটে গলায় কণ্ঠীমালা পরে হয়ে উঠল ঘোরতর ধার্মিক। জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবসা শুরু করলে। তরকারির ব্যবসা। চাষীর খেত থেকে তরকারি কিনে হাটে হাটে ঘুরতে লাগল অর্থাৎ ফড়ে হয়ে উঠল। মুখে রামহরি চিরকালই ফড়ে অর্থাৎ কথা সে বেশি চিরকালই বলত—এবার ব্যবসায়েও তাই হয়ে উঠল। লোকের বাড়ি ক্রিয়াকর্মে বরাত এবং বায়না নিয়ে তরকারি সরবরাহ করত। কিন্তু ওর অন্তরালে ছিল তার আসল ব্যবসা। নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে দস্তুরমতো কবিরাজের মৃতসঞ্জীবনী চোলাইয়ের পাকা পদ্ধতিতে মদ তৈরি করত। জঙ্গলের মধ্যেই বোতল এবং টিন-বন্দী করে পুঁতে রাখত। ওখানেই শেষ নয়, নদীর চরের পলিমাটিতে সে গাঁজার গাছ তৈরি করে গাঁজাও

উৎপন্ন করত এবং তার কাটতিও ছিল প্রচুর। দেশটা তান্ত্রিকের দেশ ছিল—মন্ত্র হোক বা না হোক, জানুক বা না জানুক, লোকে কারণ করত। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, মুখে কালী-কালী, তারা-তারা রব আর কারণকরণে শতকরা নিরেনব্বুই জন ছিল সিদ্ধপুরুষ। সুতরাং হাজার দরুনে সিদ্ধপুরুষের প্রসাদে রামহরির লক্ষ্মীলাভের পথে সিংহদ্বার না হোক, বেশ একটা প্রশস্ত ফটক খুলে গিয়েছিল। উদ্যোগী পুরুষ রামহরির সাহস ছিল অপার, নবগ্রামে থানার সামনে রাস্তা দিয়ে কুমড়োকাঁকুড়ের বোঝার তলায় অন্তত চার-পাঁচটা বোতল নিয়ে সে সহাস্য মুখে চলে যেত। এই হাটে বসে তাই বিক্রি করত। কুমড়োর মুখ কেটে ভিতরের শাঁস বীজ বের করে নিয়ে তার মধ্যে আনত গাঁজা। বাড়িতে দেব-প্রতিষ্ঠা করেছিল সুপবিত্র নিম্ব কাষ্ঠের গৌরহরি। কিন্তু ঠাকুরটির বক্ষ পঞ্জর ছিল ফাঁপা। দস্তুরমতো মাথা খাটিয়ে বুক এবং পিঠের দুদিক দুখানি স্বতন্ত্র কাঠে গড়ে ভিতরে গহ্বর রেখে পাকা মিস্ত্রী দিয়ে এই দৈব গুদামটি সে তৈরী করিয়েছিল। এবং পিঠের দিকের কাঠের নিচে উপরে দুটি ঢাকনিযুক্ত মুখ রেখেছিল। উপরেরটি খুলে গাঁজা পুরত এবং প্রয়োজনমতো বের করে নিত। এরপর আর-এক ধাপ উপরে উঠে রামহরি রীতিমতো দাসজী হয়ে উঠেছিল। তরকারীর ব্যবসা তুলে দিয়ে মুদীর দোকান এবং ধান কেনার ব্যবসা শুরু করে—ভেক নিয়ে দাস উপাধি নিয়ে গণ্যমান্য হয়ে উঠেছিল কয়েকখানা গ্রামের মধ্যে। শুধু ভেকই নেয় নাই, নিজের স্বজাতীয়া স্ত্রী এবং পুত্রকে দূর করে দিয়ে একটি উচ্চবর্ণের বিধবাকে ঘরে এনে বৈষ্ণবী করেছিল। ক্রমে ক্রমে আরও বোধ হয় দু-তিনটি। এদের জন দুই প্রৌঢ় বয়সে দুয়োরানীর মতো ঘুঁটে কুড়িয়ে মরে পরিত্রাণ পেয়েছে। একজন পালিয়ে। শেষেরটি তরুণী—সেইটিই এখন রামহরির সুয়োরানী।

সেই রামহরি সজ্ঞানে মৃত্যু কামনা করে গঙ্গাতীরে চলেছে? মুক্তি চায় সে? বিস্ময় লাগে বই কি!

শশী তামাক টেনে শেষ করে হুঁকোটা হাতে ধরে নিয়ে বললে—কাল চলুন একবার। আমি বেটাকে বলেছি, ফী পাঁচ টাকা লাগবে। ডাক্তারবাবু তো আর কলে যান না তবু বলে কয়ে রাজি করাব। তা তাতেই রাজি।

কথাটা ডাক্তারবাবুর কানে গেল না। তাঁর মনোরথ চলেছিল ছুটে। পলকে যুগান্তর অতিক্রম করে পিছনের পরিক্রমা সেরে বর্তমানে এসে সেই মুহূর্তেই স্থির হল বোধ করি। তিনি হাসলেন।

শশী বললে—হাসছেন যে?

জীবন বললেন—নবগ্রামের কর্তাবাবুর চিকিৎসার জন্যে কলকাতা যাওয়া মনে আছে তোর শশী ?

—তা আবার নাই। বাড়ি থেকে পালকি করে বেরিয়ে—সব ঠাকুর-বাড়িতে প্রণাম করে—

—সে তো জ্ঞানগঙ্গা যাঁরাই গিয়েছেন—তাঁরা সবাই তা করেছেন রে। সে নয়।

—তবে ?

—কর্তা কাশী গেলেন না, উদ্ধারণপুর গঙ্গাতীর গেলেন না, গেলেন কলকাতা। কলকাতাও গঙ্গাতীর। কিন্তু গঙ্গাতীরে দেহ রাখতে ঠিক যান নি। গিয়েছিলেন চিকিৎসা করিয়ে বাঁচতে।

—তা হবে না ? বিশাল সম্পত্তি, অগাধ ধন, এত কীর্তি—এ সব ছেড়ে মরতে কেউ চায় না কি ?

—হ্যাঁ রে, তাই তো বলছি। তাঁর হয় নি আর রামহরির সেই বাসনা হল। রামহরি যা করেছে তার পক্ষে তো সেও কম নয় রে। অনেক। তার উপর তরুণী পত্নী।

এবার হাঁ করে শশী জীবন ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

জীবনমশায় হেসেই বললেন—হাঁ করে আর তাকিয়ে থাকিস নে। বাড়ি যা। রাত্রি অনেক হয়েছে। কাল যাব। দুপুরের পর গাড়ি পাঠাতে বলিস।

শশী বললে—দু রাস্তার মোড় বুঝি এটা ?

—হ্যাঁ।

এইখান থেকেই পাকা রাস্তা থেকে কাঁচা রাস্তা ধরে জীবন ডাক্তার যাবেন নিজের গ্রামে। পাকা রাস্তায় শশী যাবে নবগ্রাম।

জীবনমশায় বললেন—নেশাভাঙ একটু কম করিস শশী।

শশী মাথা চুলকে লজ্জা প্রকাশ করে বললে—ভাবি তো। পারি না। তারপর অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বললে—চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়েই যাই। ভারি অন্ধকার আর রাত্রি অনেক হয়েছে।

—হতভাগা! আমাকে দাঁড়াতে হবে না। যা—বাড়ি যা। আমাকে দাঁড়াবে ? তোকে দাঁড়াবে কে ? পরক্ষণেই একটা কথা মনে করে জীবন দত্ত সচকিত হয়ে উঠলেন, বললেন—আচ্ছা চল, আমিই তোকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরব।

মনে পড়ল।—মাস কয়েক হল—শশীর মা মারা গেছে। শশী হয়তো এত

রাত্রে ভয় পাচ্ছে একলা যেতে। একটু আগেই বলছিল—গলাইচণ্ডী থেকে ফিরবার পথে ওর গা ছমছম করেছিল অর্থাৎ ভয় পেয়েছিল শশী। ওঃ! সেই জন্যেই সে দেবস্থানে ঢুকেছিল?

জীবনমশায় বললেন—সত্যি বল তো শশী—কী ব্যাপার? তুই কি ভয় পেয়েছিস?

শশী মাথা চুলকে বললে—মানে—আমার মা—

—তোর মা?

—মনে হয় আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। মনে হয় নয় মশায়, সত্যি।

জীবনমশায় বললেন—চল, ওসব কথা থাক।

শশী বললে—মা আমাকে ভয় দেখায় না—আগলায়। বুয়েছেন না। শশী বক বক করলে সারা পথটা। তার মধ্যে রামহরির কথাই বেশী। ওই বেটার নিদেন হেঁকে দেখিয়ে দেন একবার ছোকরা ডাক্তারকে।

সতেরো

প্রদ্যোত ডাক্তার বারান্দায় বসে ছিল। শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি, এমনই গুমোটের মধ্যে ঘরে ঘুম আসা এক অসাধ্য ব্যাপার; তার উপর মশারি। মশা এখানে খুব বেশী ছিল। লোকে বলত বিনা মশারিতে শুয়ে থাকলে মশারা সমবেতভাবে তুলে নিয়ে চলে যেতে পারে। আজকাল মশা কমেছে। ডি. ডি. টি. ক্যাম্পেন শুরু হয়েছে গত বছর থেকে। তবুও প্রদ্যোত বিনা মশারিতে শোয় না। একটি মশাও কামড়াতে পারে এবং সেইটিই অ্যানোফিলিস হতে পারে এবং তার বাহিত বিষটুকুতে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার বীজাণু থাকতে পারে। বাইরে মশারি খাটিয়ে শুলে হয়, কিন্তু তাতে মঞ্জু অর্থাৎ ডাক্তারের স্ত্রী ভয় পায়। শহরের মেয়ে, তার উপর এ অঞ্চল সম্পর্কে ছেলেবেলায় অনেক চোরডাকাত ভূতপ্রেত সাপবিছের গল্প শুনেছে সে। মঞ্জুর মায়ের মাতামহের বাড়ি ছিল এই দেশে। মায়ের মাতামহ অবশ্য বেঁচে নেই, এবং মামাও কোনো কালে ছিল না অর্থাৎ মঞ্জুর মা ছিল মা-বাপের এক সন্তান; থাকবার মধ্যে মঞ্জুর বৃদ্ধা মাতামহী বেঁচে আছে। কানে কালা, চোখেও খুব কম দেখে। সেই গল্প করত। ভূতপ্রেত মঞ্জু বুদ্ধি দিয়ে অবিশ্বাস করে, তর্কও করে, কিন্তু অন্ধকারে কোনো শব্দ উঠলেই চমকে ওঠে। সেই কারণে বন্ধ ঘরে শুতে যাবার আগে যতক্ষণ পারে প্রদ্যোত ডাক্তার বসে থাকে। মধ্যে মধ্যে ফ্লিট স্প্রে

করে দেয়। চারি পাশে বারান্দার নিচে সিঁড়িতে কার্বলিক-অ্যাসিড-ভিজানো খড় ছিটানো থাকে। আরও থাকে ডি. ডি. টি. পাউডার এবং ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো। সাপ পোকা বিছে আসতে পারে না।

সকালবেলা থেকেই প্রদ্যোতের মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। রতনবাবুর ছেলে বিপিনবাবুর কেসে এখানকার হরেন ডাক্তার তাকে কল দিয়েছিল; আকস্মিকভাবে হিক্কার উপসর্গ এসে জুটেছে। কল দিয়েছিল কাল সকালে। একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। মনে হয় হয়তো যে-কোনো মুহূর্তে নিষ্ঠুর পরিণতি এসে উপস্থিত হবে। হরেনের সঙ্গে পরামর্শ করে যা করবার করেছে তারা, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। আজ সকালে কিশোরবাবু প্রস্তাব করলেন—জীবন মশায়কে ডাকা হোক। প্রস্তাবটা বোধ হয় রতনবাবুর, কিশোরকে দিয়ে প্রস্তাবটা তিনিই করিয়েছেন। প্রদ্যোত ডাক্তার কী বলবে? মনে উত্তরটা আপনিই এসে দাঁড়িয়েছিল—'বেশ তো দেখান। আমি কিন্তু আর আসব না'। কিন্তু কথাটা বের হবার আগেই কিশোরবাবু বলেছিল—"আপনি কিন্তু বলতে পাবেন না—আর আসব না। আমার অনুরোধ। আমি শুনেছি আপনি তাঁর উপর অসন্তুষ্ট। কিন্তু তিনি অসন্তোষের লোক নন।"

ডাক্তার বলেছিলেন—এর মধ্যে সন্তোষ অসন্তোষের কথা কী আছে কিশোরবাবু? আপনাদের রোগী, ইচ্ছে হলে ভূতের ওঝাও ডাকতে পারেন।

—আপনি একটু বেশী বলছেন প্রদ্যোতবাবু। বলছেন না? নিজের মর্যাদাটাকে বড় করে বিচার করবেন না। সত্যকে বড় করে খতিয়ে বলুন প্রদ্যোতবাবু। কিশোরবাবু মানুষটি বিচিত্র। তার মধ্যে কোথায় যেন অলঙ্ঘনীয় কিছু আছে। তাকে লঙ্ঘন করা যায় না। সমগ্র দেশের লোকের প্রীতির পাত্র। আজীবন দেশের সেবাই করে আসছেন। এখানে প্রদ্যোত ডাক্তার এসে অবধি কত ছোটখাটো উপকারে ওঁর কাছে উপকৃত তার আর হিসেব নেই। এখানকার লোকগুলি সহজ নয়। মঞ্জু আধুনিকা, সে বাইসিক্ল চড়ে একা যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়, এর জন্য কুৎসা রটিয়েই ক্ষান্ত হয় নি—ওপরে দরখাস্তও করেছিল। প্রদ্যোতের বন্ধু এই জেলারই সদরে ল্যাবোরেটরিতে প্র্যাকটিস করে, সে মধ্যে মধ্যে আসে এখানে—তার সঙ্গে জড়িয়ে কুৎসিত অভিযোগ। এবং হাসপাতালের ওষুধ চুরির অপবাদও ছিল তার সঙ্গে। কয়েকটা কেসে প্রদ্যোত বন্ধুর ল্যাবোরেটরিতে রোগীর রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়েছিল বলে তা নিয়েও অনেক কথা ছিল সে দরখাস্তে। মুখে মুখে এ নিয়ে কথার তো অন্ত ছিল না; বিচিত্র প্রশ্ন সব।—"ও বাবা এ যে দুই বঁধুতে মিলে বেশ ফাঁদ পেতেছে।

রক্ত পরীক্ষা থুথু পরীক্ষা প্রস্রাব পরীক্ষা—দাও টাকা এখন। চোর চোরাটি আধা ভাগ। এতকাল এসব ছিল না—তা রোগ ভালো হত না?"

কিশোরবাবুই এ সমস্ত অপবাদ এবং প্রশ্ন থেকে রক্ষা করেছেন। অযাচিত-ভাবে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন।

এখানে থাকলে দুটি বেলা কিশোরবাবু তাদের খবর নেন। কিশোরবাবুর প্রশ্নে এই কারণেই ডাক্তারকে ভেবে দেখতে হয়েছিল। কিশোরবাবু বলেছিলেন—ভালো করে ভেবে দেখুন ভাই। এখানে প্রশ্ন হল মূল্যবান একটি জীবনের। আর মশায়কে তো আমরা আপনাদের উপরওয়ালা করে ডাকছি না; ডাকছি সাহায্য করবার জন্যে। ওঁকে ডাকছি—উনি নাড়ীটা দেখবেন আর হিক্কাটা থামিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। তাতে আপনাদের যে সব শর্ত আছে তা বলে দিন তাঁকে। কই হরেন চারুবাবু এঁরা তো আপত্তি করছেন না!

হরেন ডাক্তার চারুবাবু মত দিয়ে গেছেন। চারুবাবু বলে গেছেন—খুব ভালো কথা। ওঁর অনেক মুষ্টিযোগ আছে। অব্যর্থ ফল হয়। শুধু আফিং-ঘটিত কিছু যেন না দেন।

এরপর অগত্যা প্রদ্যোতকে মত দিয়ে আসতে হয়েছে। বলতে সে পারে নি—ওঁদের মত ওঁদের, আমার মত আমার! আমি আর আসব না। কিন্তু এ নিয়ে একটা অস্বস্তি তার মনে সেই সকাল থেকেই ঘুরছে! উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন জীবনমশায় নামক এই দেশজ ভিষগাচার্যের ভেষজের ফলের জন্য। একটা বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে সে। ওই নিদানবিশারদ এক্ষেত্রে নিদান হাঁকে নি। তাদের ভুল ধরে নি। চারুবাবুদের সঙ্গে তার আলোচনার কথা বোধ হয় বৃদ্ধ শুনেছে। তবুও অস্বস্তি রয়েছে। ওই ওষুধের ফলের জন্য অস্বস্তি। তার সঙ্গে আরও যেন কিছু আছে। এর উপর একটি রোগী আজ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তার হাতে মারা গিয়েছে।

কী যে হল?

সব থেকে যেটা তাকে পীড়িত করছে সেটা হল তার ভ্রান্তি। সকালবেলা সে দেখে বলে এসেছিল—"রোগী বেশ ভালো আছে। জ্বর ছেড়ে গেছে কাল পথ্য দেব।" একটু যেন ড্রাউজি ভাব ছিল—আচ্ছন্নের মতো পড়ে ছিল রোগী, কিন্তু ডাক্তার সেটাকে দুর্বলতা মনে করেছিল। ছেলেমানুষ শিশু রোগী। রোগীর বুড়ী ঠাকুমা বলেছিল—ভালো কী করে বলছ বাবা তুমি? বালা রুগী—জ্বর ছেড়েছে, ভালো আছে তো মাথা তুলছে কই, খেতে চাচ্ছে কই?

ডাক্তার তাকে বলে এসেছিল—তুলবে মাথা। একটু দুর্বল হয়ে আছে।

ওটা কাটলেই তুলবে। আর আমাদের কথায় বিশ্বাস করুন। না করলে তো চিকিৎসা করতে পারব না।

বিকেলবেলা ছেলেটা হঠাৎ কোলাপ্স করলে। ডাক্তার ছুটে গিয়েছিল। ইনজেকশনও দিয়েছিল বার তিনেক, কিন্তু—। সন্ধ্যার সময় মারা গেছে ছেলেটা।

ডাক্তার ভাবছিল। কোথায় ভুল হল তার? আগাগোড়া? ডায়গনোসিস?

হ্যাঁ তাই। ম্যালেরিয়া বলে ধরেছিল সে। কিন্তু ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। ভুল হয়ে গিয়েছে সেইখানে। কুইনিন ইনজেকশনও সে দিয়েছিল।

ফলটা হয়েও স্থায়ী হল না। ইনট্রভেনাস দেওয়া উচিত ছিল।

ডাক্তার অকস্মাৎ চকিত হয়ে ইজিচেয়ারের উপরেই সোজা হয়ে বসল। কুইনিন অ্যাম্পুলটা—? সেটার ভিতর ঠিক কুইনিন ছিল তো? বিনয়ের দোকান থেকে কেনা অ্যাম্পুল। একালের এই ঔষধ ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস নেই। না—নেই। এরা সব পারে। কলকাতায় জাল ওষুধ তৈরী করার একটা গোপন কিন্তু বিপুল-আয়তন আয়োজনের কথা অজানা নয়। এবং তাদের সঙ্গে ওষুধের দোকানদারদের যোগাযোগের কথাও অপ্রকাশ নেই। বিনয়চন্দ্র পাকা ঝানু ব্যবসাদার। মিষ্টি মুখের তুলনা নেই। সাধুতার সততার এমন সুকৌশল প্রচার করতে পারে লোকটি যে মনে সম্ভ্রমের উদয় হয়। কিন্তু প্রদ্যোত নিজে ডাক্তার— তার কাছে বিনয়ের লাভের প্রবৃত্তির কথাও তো অজ্ঞাত নয়। চার পয়সা যে দাগে ওষুধের খরচ তার দাম চার আনা। এ নিয়ে কথা তার সঙ্গে হয়েছে। কিন্তু বিনয় সবিনয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে— ওর কমে দিলে লোকসান অবশ্যম্ভাবী। বছরের পর বছর বিনয় জমি কিনছে, সঞ্চয় বাড়াচ্ছে। এবার নাকি নতুন একটা বাড়ি করবে। বিনয় সব পারে! প্রদ্যোতের কান দুটো উত্তপ্ত হয়ে উঠল, মনের মধ্যে একটা অসহায় ক্ষোভ জেগে উঠল। ইজিচেয়ার থেকে উঠে নিজের কলবাক্সটা টেনে বের করে বসল। ছোট ছোট কাগজের বাক্সে নানান ইনজেকশন। কুইনিনের বাক্সটা বের করে তার ভিতর থেকে একটা অ্যাম্পুল বের করে সে ভেঙে ফেললে। জিভে চেখে দেখলে। সারা মুখটা তেতো হয়ে গেল।

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বাইরে এসে বসল। ডাকলে—মঞ্জু মঞ্জু! ডাক্তারের স্ত্রী মঞ্জু, মঞ্জুলা।

মঞ্জু রান্নাঘরে রয়েছে। রান্নার লোকটা কিছুই জানে না। এটা যাকে বলে খাঁটি গাঁইয়ার দেশ! শাক শুকতো চচ্চড়ি, থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়, এ ছাড়া কিছু জানে না। আর জানে খেঁড়ো নামক একটি বস্তু—কাঁচা তরমুজের

তরকারি, আর কড়াইয়ের দাল আর টক। অম্বলকে বলে টক। এবং কাঁচা মাছে অম্বল রাঁধে। বড় বড় মাছের মাথা অম্বলে দিয়ে খায়। ভাল রান্না মানে তেলমসলার শ্রাদ্ধ। ডিসপেপসিয়া রোগটি জন্মানোর জন্যে—উৎকৃষ্ট সার দিয়ে জমি প্রস্তুত করা! ডাক্তারের রুচি আধুনিক—স্ট, স্যুপ, সিদ্ধ, সালাদ। এখানকার ওই গ্রাম্য লোকটি আজও পর্যন্ত নামগুলো আয়ত্ত করতে পারে নি। অগত্যা মঞ্জু দাঁড়িয়ে থেকে দেখিয়ে দেয়। তা ছাড়া একটি কোর্স সে নিজে হাতে রান্না করে নেয়। ওটা মঞ্জুর শখ।

—মঞ্জু! আবার ডাকলে প্রদ্যোত।

—আসছি। এবার সাড়া দিলে মঞ্জু।

দীর্ঘাঙ্গী তরুণীটির শ্রীটুকু বড় মধুর এবং কোমল, এর উপরে ওর বর্ণচ্ছটার মধ্যে একটা দীপ্তি আছে যা সচরাচর নয়, সাধারণ নয়। চোখ জুড়িয়ে যায়, মোহ জাগে মঞ্জুকে দেখে। প্রাণচঞ্চলা আধুনিকা মেয়ে মঞ্জু। গান গাইতে পারে, আই. এ. পর্যন্ত পড়েছে ; বাইসিক্ল চড়তে শিখিয়েছে ডাক্তার, বন্দুক ছুঁড়তে শিখিয়েছে।

—কী বলছ। আমার রান্না পুড়ে যাবে।

—কী রাঁধছ ?

—টক। হাসতে লাগল মঞ্জু। কাঁচা মাছের টক। আমার ভারি ভালো লাগে। আগে বুড়ী দিদিমা বলত—আমরা হাসতাম। কিন্তু সত্যি চমৎকার সরষে ফোড়ন দিয়ে আর কাঁচা তেল ছড়িয়ে।

—বোসো তুমি এখানে। একা ভালো লাগছে না। গানটান গাও। মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। ওদের ছেলেটা এমন হঠাৎ মরে গেল।

—রাঁধুনীটা বলছিল।

—কী বলছিল ? ডাক্তার আবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

—বলছিল—পাঁচজনে বলছে পাঁচরকম।

—তবু ভালো ; পাঁচজনে পঞ্চাশ রকম বলে নি। হাসলে প্রদ্যোত।

—তুমি কি সকালে বলে এসেছিলে কাল পথ্য দেবে ?

—হ্যাঁ, কেন ?

—ওই কথাটাই বেশী বলছে লোকে। তাতে চারুবাবু বলছেন শুনলাম—ওরে বাবা মৃত্যুর কথা কি কেউ বলতে পারে ? ওর ওপরে ডাক্তারের হাত নাই।

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। নিশ্ছিদ্র মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। পৃথিবীর উপর একটা ছায়া ফেলেছে এই রাত্রিকালেও। চকিত একটু বিদ্যুতাভাস খেলে গেল সীমাহীন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে। মৃদুগম্ভীর

গর্জনে মেঘ ডেকে উঠল দূরে। অনেক দূরে। ডাক্তার মৃদুস্বরে বললে—শ্রাবণরাত্রির একটা গান গাও।

—আসছি আমি। ওকে বলে আসি—অম্বলটা ওই নামাবে।

—যাক। পুড়ে যাক। না নামায় তো কাল ওটাকে দূর করে দিয়ো। মঞ্জু মৃদু গুনগুনানি সুরে ধরলে—

এসো শ্যামল সুন্দর।
আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা
বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে।

ডাক্তার চোখ বুজলে। সত্যি বৃষ্টি হলে দেশটা জুড়োয়। প্রাণটা বাঁচে। গান শেষ করে মঞ্জু উঠল, বললে—আমি আসছি। ততক্ষণ রেডিয়ো খুলে দিয়ে যাই। রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে। মন তার এখনও পড়ে আছে রান্নাশালে। ছ্যাঁক করে সম্বরা দিতে তার ভারি ভালো লাগে। ডাক্তার চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। তাহলে চারুবাবু তার বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন নি। প্রৌঢ় মোটের উপর লোক ভালো।

রেডিয়োতে যন্ত্রসঙ্গীত বাজছে। গীটার। সুরটা কাঁপছে, কাঁদছে।

চারুবাবু কিন্তু ডিফিটেড সোলজার। হার মেনেছেন ভদ্রলোক। যাকে সাধু বাংলায় বলে আত্মসমর্পণ করেছেন। সারেণ্ডার করেছেন। "মৃত্যুর কথা কেউ বলতে পারে না। ওর ওপর ডাক্তারের হাত নাই।"

আছে। হাত আছে। এখানে যদি একটা ক্লিনিক থাকত! গোড়াতেই যদি ব্লাড কালচার করে নেওয়া হত! এবং ওষুধ যদি খাঁটি হত! কে বলতে পারে—বাঁচত না ছেলেটা?

রেডিয়োতে গান বেজে উঠল—মরণ রে তুঁহু মম শ্যামসমান! ডাক্তার ভ্রূকুঞ্চিত করে উঠে গিয়ে রেডিয়োটা বন্ধ করে দিলে।

কম্পাউণ্ডের ফটকটায় হর্নের শব্দ উঠল। সাইকেল রিক্শার হর্ন। কে এল? কেন? কল? ডাক্তার উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে থেকে ছোট স্টোভল্যাম্পটা বের করে নিয়ে এল। দুটো রিকশা। একটি রিকশায় একটি তরুণী, অজ্ঞান অবস্থা বলে মনে হচ্ছে। এ গাঁয়ের দাইটা তাকে জড়িয়ে ধরে আছে। সর্বাঙ্গ কাপড় দিয়ে ঢাকা। মাথাটা দাইয়ের কাঁধের উপরে ঢলে পড়েছে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় মধ্যে মধ্যে নীল হয়ে যাচ্ছে, বিকৃত হচ্ছে। কাপড়খানার নিচের দিকে রক্তের দাগ! ডেলিভারি কেস! বোধ করি প্রথম সন্তান আসছে। ডাক্তার আলোটা হাতে নেমে পড়ল। ডাকলে—হরিহরবাবু! মিস দাস!

কম্পাউণ্ডার আর মিডওয়াইফ। কিন্তু ও কে? পিছনের রিকশায়?

স্থূলকায় বৃদ্ধ? জীবনমশায়?

জীবনমশায় শশীকে পৌছুতে গিয়েছিলেন। শশীর প্রতিবেশী গণেশ ভটচাজের প্রথম সন্তান-সম্ভবা কন্যা—তখন সূতিকাগারে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। জীবনমশায়কে পেয়ে তারা তাঁকে ছাড়ে নি। জীবনমশায় এক্ষেত্রে কী করবেন? তবু তারা মানে নি। বলেছিল—হাতটা দেখুন।

—হাত দেখে কী করব? আগে তো প্রসব করানো দরকার। যারা প্রসব করাতে পারে তাদের ডাকো। নয়তো হাসপাতালে নিয়ে যাও।

তাই নিয়ে এসেছে। কিন্তু জীবনমশায়কে ছাড়ে নি।

—আপনি থাকুন মশায়! কণ্ঠস্বরে মেয়ের বাপের সে কী আকূতি!

মশায় উপেক্ষা করতে পারেন নি।

শার্টের আস্তিন গুটিয়ে যথানিয়মে হাত ধুয়ে, বীজাণুশোধক লোশন মেখে ডাক্তার তৈরী হয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

—আপনি প্রসবের জন্য কোনো ওযুধ দিয়েছেন?

—না।

—গুড। আপনি কি অপেক্ষা করবেন?

—হ্যাঁ। একটু থাকি। হাসলেন মশায়।

—আচ্ছা। বসুন ওই চেয়ারটায়। নাড়ী দেখে কিছু বলেছেন নাকি?

—নাড়ী দেখেছি। কিন্তু—

ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় জান্তব গোঙানির মতো গোঙানি উঠল।

—ডাক্তারবাবু! মিস দাসের কণ্ঠস্বর।

প্রদ্যোত ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। জীবনমশায় শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন। একটা অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি। কেন তিনি এলেন? ওদের ইচ্ছে প্রসবের পর তিনি একবার নাড়ী দেখবেন। কিন্তু প্রসব হতে গিয়ে যদি—।

—বসুন মশায়। বললে হরিহর কম্পাউণ্ডার। হরিহর গরম জল, তুলো, পরিষ্কার ন্যাকড়া ইত্যাদি নিয়ে যাচ্ছে পাশের ঘরে।

—বেশ আছি হে। হাসলেন মশায়। মেয়েটির বয়স হয়েছে। প্রায় তিরিশ। চিন্তা হচ্ছে তাঁর।

চমকে উঠলেন মশায়। মেয়েটি আবার যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে

—আরও কিছু। হ্যাঁ ঠিক। নবজাতকের প্রথম কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। জয় পরমাপ্রকৃতি! জয় গোবিন্দ!

—হরিহরবাবু, গরম জল। তুলো। প্রদ্যোত ডাক্তারের ধীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আশ্চর্য ধীর এবং শান্ত এবং গম্ভীর।

* * *

তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। মেয়েটির বাবা বললে-–ডাক্তারবাবু!

—সেফ ডেলিভারি হয়েছে। খোকা হয়েছে।

—নীহারের জ্ঞান হয়েছে?

—না।

—হয় নি?

-–না। আজ বাড়ি যান। যা করবার আমি করব। এখানে থেকে গোলমাল করলে কোনো উপকার হবে না। যান, বাড়ি যান। আপনিও বসে আছেন? মাফ করবেন, এখন নাড়ীটাড়ী দেখতে দেব না আমি। কিছু মনে করবেন না যেন। আমার জ্ঞানমতো নাড়ী ভালোই আছে, এই পর্যন্ত বলতে পারি।

ডাক্তার চলে গেলেন নিজের বাসায়।

—মঞ্জু!

—চা ছাঁকছি।

—মেনি থ্যাঙ্কস্, মেনি মেনি থ্যাঙ্কস্ জলদি আনো—চা খেয়ে গিয়ে দরকার হলে আবার ইনজেকশন দেব।

—কেস কি—?

—নট্ গুড্ আবার খারাপও নয় খুব। বাট্ শী মাস্ট লিভ্, বাঁচাতে হবে। চায়ে চুমুক দিয়ে বললে—প্রথমটা আমার কিন্তু ভারি রাগ হয়ে গেছল। দ্যাট্ ওল্ড্ ম্যান' ফেমাস মহাশয় অব্ দিস্ প্লেস—সে সঙ্গে এসেছিল।

—কোনো খারাপ কথা বল নি তো!

—না। তবে এখন ওরা চাইছিল—মশায় একবার নাড়ী দেখে। আমি বলে দিয়েছি, না—তা আমি দেব না।

—ওঁকে চা খেতে ডাকলে না কেন?

—ডাকা উচিত ছিল, না?

—নিশ্চয় ছিল।

চায়ের কাপ নামিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রদ্যোত আবার হাসপাতালের

দিকে চলল। আর একটা ইনজেকশন দিতে হবে। মশায় চলে গেছে। একটু অন্যায় হয়ে গেল। ঢং ঢং শব্দে ঘড়ি বাজছে। রাত্রি বারোটা। রোগীর ঘর থেকে মৃদু যন্ত্রণার শব্দ শোনা যাচ্ছে। যন্ত্রণা কমে এসেছে। শী মাস্ট লিভ; বাঁচাতে হবে মেয়েটাকে। হরিহর বেরিয়ে এল।

—কেমন আছে এখন?

—ভালোই মনে হচ্ছে।

—ভালোই থাকবে। ইনজেকশন বের করুন।

ডাক্তার সিরিঞ্জটা উঁচু করে আলোর সামনে ধরলেন। আবার যেন ফটকটা খুলল? কে এল আবার?

এগিয়ে গেল হরিহর। রতনবাবুর লোক।

—কী হিক্কা খুব বেড়েছে?

—আজ্ঞে না। সেই শহর থেকে রেপোর্ট এসেছে, তাই বুড়োবাবু বললেন ডাক্তারবাবু যদি জেগে থাকেন তো দিয়ে আয়।

বিপিনবাবুর ইউরিন রিপোর্ট।

—হিক্কা কেমন আছে?

—তেমনই আছে। একটুক কম বলে লাগছে।

একটা ক্লিনিক যদি এখানে থাকে! এক্স রে—ইলেকট্রিসিটি না হলে উপায় নাই। ময়ূরাক্ষী স্কীম হতে আরও কয়েক বছর লাগবে। তার আগে সে আর হবে না। কিন্তু একটা ক্লিনিক। কত লোক যে বাঁচে! আজ কি এই মেয়েটাই বাঁচত? হাসপাতাল যন্ত্রপাতি—এসব না থাকলে এ মেয়েটাও আজ মরত।

জীবনমশায় হাত দেখে ঘাড় নেড়ে বলত—কী করবে? এ কার হাত? তোমার, না—আমার?

আঠারো

জীবন দত্ত ডাকে গেলে আতর-বউ ঘুম পেলে ঘুমকে বলেন—চোখের পাতায় অপেক্ষা করো, এখন চোখে নোমো না। সে আসুক, তারপর। শুয়ে শুয়েও জোর করে জেগে থাকেন। চোখের পাতা ঢুলে নেমে আসে, আতর-বউ জোর করে চোখ মেলেন,—পাশ ফেরেন, রাধাগোবিন্দ বলে ইষ্ট নাম করেন; বেশী ঘুম পেলে উঠে বসে পানদোক্তা খান—মধ্যে মধ্যে নন্দকে তিরস্কার করেন; নন্দকে নয়,

নন্দর নাকডাকাকে—বলেন, নাক মানুষের ডাকে, কিন্তু তাই বলে এমনি করে ডাকে? শিঙের ডাক হার মানে। শুধু শিঙের ডাক? মনে হচ্ছে কেউ যেন করাত দিয়ে দরজা কাটছে। নন্দ, অ-নন্দ। শুনছিস, একটু কম করে নাক ডাকা বাপু, পাশ ফিরে শো।

জীবন দত্ত এলেই এ সব সমস্যার সমাধান হয়। তিনি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করেন—কেমন দেখে এলে গো? কোনদিন কোন প্রশ্ন করেন না, নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়েন—এবং আধ মিনিটের মধ্যেই তাঁর নিজের নাক ডাকতে শুরু করে।

নন্দ উঠে হাতমুখ ধোবার জল দেয়, হাতমুখ ধুয়ে ইষ্ট স্মরণে বসেন, তারপর খাবারের ঢাকা খুলে খেতে বসেন। নন্দ তামাক সাজে, হুঁকো-কল্কে হাতে দিয়ে নন্দও গিয়ে শুয়ে পড়ে; খেয়ে উঠে মশায় তামাক খান—আর ভাবেন। রোগের কথা। কোনোদিন মৃত্যুর কথা। যেদিন রোগী মারা যায়—সেদিন ফিরে এসে চিকিৎসাপদ্ধতির কথাটা ভেবে দেখেন, ত্রুটি মনে হলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন; না-হলে মৃত্যুর কথাই ভাবেন। তারপর গোবিন্দ স্মরণ করে শুয়ে পড়েন। যেদিন ডাক থাকে না, সেতারের সঙ্গে দাবা খেলে কাটে, সেদিন ভাবেন—দাবার চালের কথা। একটার আগে কোনোদিন ঘুমোনো হয় না! আজ বাজে বোধ হয় দুটো—আড়াইটে।

* * *

পরদিন ঘুম ভাঙতে দেরি হল।

প্রথমেই মনে হল—গণেশ ভটচাজের মেয়েটির কথা। কেমন আছে? ডাকতে গেলেন নন্দকে; জিজ্ঞাসা করবেন গণেশ ভটচাজের বাড়ির কেউ এসেছে কি না। কিন্তু পরক্ষণেই সাধারণের চেয়ে আয়তনে বড় তাঁর মাথাটি বার বার 'না—না' বলে যেন দুলে উঠল। এবং গম্ভীর কণ্ঠে ডেকে উঠলেন—জয় গোবিন্দ পরমানন্দ!

হাত জোড় করে জানালার দিকে তাকিয়ে বললেন—নমঃ বিবস্বতে ব্রহ্মণ-ভাস্বতে বিষ্ণুর্তেজসে জগৎসবিত্রে স্থচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে—নমঃ!

মৃত্যুধ্রুব এই পৃথিবীতে, এত চঞ্চল হলে চলবে কেন?

মুখহাত ধুয়ে চা খেতে বসলেন। তামাক সেজে দিয়ে নন্দ হুঁকোটি বাড়িয়ে ধরল। বললে—আজকে আট-দশজন রুগী এসেছে।

হুঁকোয় টান দিয়ে মশায় বললেন—নবগ্রামের কেউ এসেছে? গণেশ ভটচাজ?
—না তো।

—হুঁ। মশায় ক্ষুণ্ণ হলেন একটু। কাল রাত্রি বারোটা পর্যন্ত তিনি গণেশের

জন্য বসে ছিলেন, ওই প্রদ্যোত ডাক্তারের রূঢ় কথা শুনে এলেন, আর আজ একটা খবরও দিলে না? বেশ বুঝলেন—মেয়ে ভালো আছে। উৎকণ্ঠা কমে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গিয়েছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি।

নন্দ বললে—চেঁচামেচি করছে সেই বামুন, দাঁতুঠাকুর।

—কেন? কাল তো তাকে এক সপ্তাহের ওষুধ দিয়েছি।

—সে আবার এসেছে। গাঁজা না খেয়ে তার ঘুম হয় নাই। বলছে হয় গাঁজা খেতে বলুক, নয় ঘুমের ওষুধ দিক। এসে থেকে চেঁচাচ্ছে।

—চেঁচাক। পরান খাঁ এসেছে?

—না। এখনও আসে নাই। এইবার আসবে।

বার কয়েক হুঁকোয় টান দিয়ে হুঁকোটা নন্দর হাতে দিয়ে মশায় উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—রোগীদিকে বসতে বলবি। আমি এখন যাব—একবার মহাপীঠে মহন্তকে দেখতে।

নন্দ মাথা চুলকে বললে—তা ওদিকে একবার দেখে ওষুধপাতি লিখে দিয়ে গেলেই তো হত। পরান খাঁ গাড়ি নিয়ে আসবে, সেই গাড়িতেই পথে গোঁসাইকে দেখে আসতেন।

মশায় জবাব দিলেন না। শুধু ফতুয়াটা গায়ে দিয়ে পকেটে স্টেথোসকোপটা পুরে পুরনো জুতো জোড়াটা পরতে লাগলেন। নন্দ গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল—যত বেগারের কাজ; সকালে বিনি পয়সায় রুগী দেখা। এমন করলে রুগী আসবে কেন? হুঁ। এই করেই এমন হল! সেই মিত্তিরিবাবু বলে গিয়েছিল—মহাশয় লোকের কথা সে কি মিছে হয়?

মশায় হাসলেন। মনে পড়েছে। প্রৌঢ় জমিদার গৌরহরি মিত্তিরের কথা বলছে নন্দ। নন্দ ছিল তখন সেখানে, শুনেছিল।

* * *

আরোগ্য-নিকেতনে তখন সে কী ভিড়! চল্লিশ পঞ্চাশ ষাটজন রোগী!

জগৎমশায়ের মৃত্যুর পর আরোগ্য-নিকেতনের দৈন্যদশা এসেছিল। সে দৈন্যদশাকে জীবন দত্ত তখন কাটিয়ে আবার সমৃদ্ধি ফিরিয়ে এনেছেন। রঙলাল ডাক্তারের কাছে শিক্ষা শেষ করে তখন তিনি অ্যালোপাথি, কবিরাজি, মুষ্টিযোগ—তিন ধারার ওষুধ নিয়ে চিকিৎসা করেন। গুরু রঙলাল রহস্য করে বলেছিলেন—ট্রাইসিকেলে চেপে চল তুমি। সে ট্রাইসিকল তাঁর ভাগ্য গুণে এখনকার মোটর-লাগানো তিন চাকার ভ্যান হয়ে উঠেছিল।

আরোগ্য-নিকেতন নাম তখন হয়েছে। তিন-তিনজন লোক

খাটত। অ্যালোপাথি ওষুধের কম্পাণ্ডার ছিল শশী। শশী বলত—রম্‌রম্‌ প্র্যাকটিস।'

মদ খেলে বলত—জীবনমশায়ের প্র্যাকটিস—শা— ; পানসী রে বাবা, পানসীর মতো চলছে—সন্‌ সন্‌ সন্‌ সন্‌।

মদ হতভাগা অল্প বয়স থেকেই খায়। নবগ্রামের বামুনবাড়ির ছেলে। ওর দৌরাত্ম্যে ভাইনাম গ্যালেসিয়া, মৃতসঞ্জীবনী লুকিয়ে রাখতে হত।

কোনোক্রমে পেলেই বোতলে মুখ লাগিয়ে খেয়ে নিত খানিকটা। বলত—রঙলাল দি সেকেণ্ড!

জীবনমশায়ের আকাঙ্ক্ষার কথা না জেনেই বলত।

বাড়িয়ে বলত। সে আকাঙ্ক্ষা তার পূর্ণ হয় নি। রঙলাল ডাক্তারের স্থান পূর্ণ করবার সাধ্য বা ভাগ্য তার নয় ; রঙলালের স্থান পূর্ণ হয় না। তবুও কতকটা পূর্ণ করেছিলেন—কীর্নাহারের নবীন ডাক্তার ; সদর শহরে অবশ্য তখন একজন প্রতিভাবান ডাক্তার এসেছেন। গোকুল ডাক্তার ; মেডিক্যাল কলেজের সোনার মেডেল পাওয়া ছাত্র। আশ্চর্য মানুষের ভাগ্য, এমন ডাক্তারেরও শেষ পর্যন্ত দুর্নাম হয়েছিল। লোকে বলত—গোকুল ডাক্তার ছুঁলে রোগী বাঁচে না। গোকুল ডাক্তারও তাঁকে সম্মান করতেন। নাড়ীতে কী পেলেন—সে কথা জিজ্ঞাসা করে মন দিয়ে শুনতেন।

নবগ্রাম অঞ্চলে তখন তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

জগৎ মশায়ের মৃত্যুর পর এখানে তিনজন ডাক্তার এসে বসেছিল। দুর্গাদাস কুণ্ডু প্রথম পাশকরা ডাক্তার। দুর্গাদাস তাঁকে উপহাস করে বলত—ঘাস-পাতা জড়িবুটির চিকিৎসক।

তারপর হরিশ ডাক্তার। হরিশ তাঁকে মানত। কিশোরের অসুখের সময় ডায়গনিসিসে তাঁর কাছে ঠকে তার শিক্ষা হয়েছিল।

আর এসেছিল এক পাগল। খেতু বাড়ুরী। সে নিজে বলত—কে. এম. ব্রারোরী, হোমিওপ্যাথ। ভালো লোক সরল লোক, কিন্তু পাগল। চুরোট খেত, চায়না কোট পরত। বলত—ওদিকে হরিশ ডাক্তার এদিকে আমি, মাঝখানে দত্তটা চাপা পড়ে মারা গেল! ওকে আর কেউ ডাকবে? নাড়ী দেখে কেমন আছে—এর জন্তে ওকে কে ডাকবে? ফুঃ!

দুর্গাদাস কুণ্ড সর্বপ্রথম এসেছিল—চলেও গিয়েছিল সর্বপ্রথম। বলে গিয়েছিল—জানতাম না এটা গোরুভেড়ার দেশ। ঘাসপাতা জড়িবুটিতে এদের অসুখ সারে। অ্যালোপাথি বিলিতী ওষুধ খাটে না।

এরপর বাড়ুরীও পালাল ছিল শুধু হরিশ। নবগ্রামের ব্রজলালবাবু চ্যারিটেবেল ডিসপেনসারি স্থাপন করলেন, সেখানে চাকরি পেয়ে থাকতে পেরেছিল। মাইনে ছিল তিরিশ টাকা।

জীবন দত্ত তখন হলেন মশায়। আয় কত মনে নাই। হিসেব নাই। দিনরাত্রিতে বিশ্রাম ছিল না। আরোগ্য-নিকেতনে রোগী দেখতে বেলা তিনটে বেজে যেত।

হিন্দু, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, মুসলমান, পুরানো মহুগ্রামের খাঁয়েরা, পশ্চিম-পাড়ার শেখেরা, ব্যাপারীপাড়ার ব্যাপারীরা, মীরপাড়ার মিয়ারাও এসেছেন গোরুর গাড়ি করে। ডুলি এসেছে, গাড়ি এসেছে, পালকি এসেছে। সেদিন পাঁচ ক্রোশ উত্তর থেকে এসেছিলেন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশের এই গৌরহরি মিত্র মহাশয়। খোলা দরজার ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে পালকিতেই শুয়ে ছিলেন।

তিনিই সেদিন আরোগ্য-নিকেতনে প্রথম এসেছিলেন। কিন্তু জীবন মশায় শেষ রাত্রে কলে গিয়েছিলেন নবগ্রামে। ওই নিঃস্ব জমিদার রায়চৌধুরীদের এক শরিকের বাড়ি। বৃদ্ধ গৌরাঙ্গ রায়চৌধুরী অকস্মাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। সন্ন্যাস রোগ। তাঁকে দেখেই তাঁর কর্তব্য শেষ হয় নি, তাঁর জীবন থাকতে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাতেও থাকতে হয়েছিল। বৃদ্ধকে পালকিতে গঙ্গাতীরে রওনা করে দিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। এবং প্রথমেই দেখেছিলেন মিত্র মহাশয়কে। তাঁর কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলেন।

—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে আপনাকে। কিন্তু কি করব? আমাদের এখানকার প্রবীণ জমিদার প্রাচীন জমিদার বংশ—।

সংক্ষেপে বিবরণটুকুও বলতে হয়েছিল।

মিত্র হেসে বলেছিলেন—দত্ত মহাশয়। না, দত্ত আর নয়, আপনি এবার আপনাদের পৈতৃক শুদ্ধ মহাশয়ত্বের অধিকারী হয়েছেন। এ অবশ্য আপনারই যোগ্য কাজ। কিন্তু এদিকেও একটু লক্ষ্য রাখবেন। দূরদূরান্তর থেকে আসে সব, এরাই আপনার লক্ষ্মীর দূত। কষ্ট পেলে অবহেলা করলে ততদিনই আসবে যতদিন আর একজনকে পাবে না।

জীবন মহাশয়ের মনে একটু লেগেছিল। কথাটা লাগবার মতোই কথা। তিনি বলেছিলেন—অবহেলা আমি করি না। সে করলে আমার পাপ হবে, সে সম্পর্কে আমি অবহিত। কষ্ট লাঘবের চেষ্টাও আমি সাধ্যমতো করি।

তাও করতেন। বেলা বেশী হলে—রোগীদের শরবত সাগু বার্লি দিতেন। আরোগ্য-নিকেতনের পাশে তখন ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের সাহায্য নিয়ে কুয়ো করিয়েছিলেন।

বাতাসা পাটালি চিড়ে মণ্ডার দোকানও একটা বসত তখন।

মশায় আরও বলেছিলেন—আর পসারের কথা। সে ভগবানের দয়া, গুরুর শিক্ষা আর আমার নিষ্ঠা। সবচেয়ে বড় কথা—ভাগ্য। যতদিন থাকবার ততদিন থাকবে। এখন বলুন, আপনার কষ্টের কথা বলুন। কী কষ্ট? যিনি দেখেছিলেন—তিনি কোনো ব্যাধি বলেছেন?

মিত্র বলেছেন—একটু নিরালা হলে ভালো হয়।

ওই নন্দই ছিল ঘরে। মশায় নন্দকে বাইরে যেতে ইশারা করেছিলেন। নিরালায় বলেছিলেন—কন্যার বাড়ি যাচ্ছি। শেষ বয়সে তারই স্কন্ধে ভার হয়ে পড়তে হল। বিষয়সম্পদ সব গিয়েছে মামলায়। স্ত্রী গিয়েছেন। এটা ওটা করেই চালাচ্ছিলাম, মদ্যপান করি প্রচুর। আত্মহত্যা করতে পারি না ভয়ে। কন্যা নিয়ে যাচ্ছে, আমারও না গিয়ে উপায় নাই। পথে বের হয়ে ভাবলাম আপনাকে একবার দেখিয়ে যাই। কতদিন বাঁচবো বলতে পারেন? আপনার নাড়ীজ্ঞানের প্রশংসা শুনেছি। দেখুন তো আমার হাতটা।

দমে গিয়েছিলেন ডাক্তার। বলেছিলেন—আমার সে শক্তি নাই। সে শক্তি কদাচিৎ কারও শোনা যায়। রোগ নাই—

—রোগ আছে! লিভারে বেদনা। মাথায় গোলমাল হয়।

—ও মদ্যপানের ফল। মদ্যপান করলে বাড়বে। ছাড়লে কমে যাবে। নীরবে দুটি টাকা রেখে গৌরহরি উঠলেন। জীবন বললে—আমাকে মাফ করবেন। ফী আমি নিতে পারব না। বাড়ীতে এই আরোগ্য-নিকেতনে ফী নেওয়া আমাদের পূর্বপুরুষের নিষেধ আছে।

—কোনো গরিব রোগীকে টাকা দুটো সাহায্য হিসেবে দিয়ে দেবেন। আমি তো ফী না দিয়ে দেখাই না। দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ ঈষৎ কুব্জ মানুষটি ধীরে ধীরে চলে গিয়েছিলেন। স্পষ্ট মনে পড়েছে তাঁর ছবি। এরপরই এসেছিলেন আর-এক অভিজাত বংশের সন্তান—ঠাকুরপাড়ার মিঞা।

—আদাব গো ডাক্তার।

—আদাব আদাব, বসুন। কী ব্যাপার?

এককালে মিঞা সাহেবেরা ছিলেন এ অঞ্চলের অধিপতি—নবাব। খেতাব ছিল ঠাকুর। তাঁরা নাকি যোগী বংশ। মুসলমান সমাজের গুরু। কিন্তু পরবর্তী কালে সম্পদে বৈভবে বিলাসে হয়েছিলেন ভ্রষ্ট। তখন সর্বস্বান্ত। শুধু তাই নয়—বংশধারা পর্যন্ত ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছিল।

একটু চুপ করে থেকে মৃদুস্বরে মিঞা বলেছিলেন—গায়ে যে চাকা-চাকা দাগ

দেখা দিচ্ছে মশায়। পিঠে জানুতে—এই দেখেন পায়ের ডিমিতে একটা হয়েছে। পা-জামাটা তুলে দেখালেন মিঞা সাহেব।

—হুঁ! সাড় আছে?

—উঁহু।

ডাক্তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান। চোখে পড়ে—কানের পেটি নাকের ডগা ঈষৎ লাল হয়েছে। বংশের অভিশাপ! সেই ব্যাধি! তাতেই মৃত্যু হয়েছে কয়েক জনের। দুজন এখনও ভুগছেন।

—ডাক্তার!

—বলুন ঠাকুরসাহেব।

—বলেন?

—কী বলব? বংশের রোগ বলেই মনে হচ্ছে। আপনি সময় থেকে চিকিৎসা করান। আমাদের এখানে ওষুধ নাই। তৈরী করতে অনেক খরচ। আপনি কলকাতা থেকে ওষুধ আনিয়ে ব্যবহার করুন।

—তাই লিখে দেন ডাক্তার।

উঠলেন মিঞা সাহেব।

ডুলি করে এসেছেন নারায়ণপুরের ভটচাজ মশায়।

বহুমূত্র হয়েছে।

বহুমূত্র, বাত, নবজ্বর, পুরানো জ্বর, গ্রহণী, অতিসার।

প্রহ্লাদ বাগ্দী এসেছে। দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল। ডাকাত। জেলখাটা আসামী।

—কী রে, তোর আবার কী?

—আর কী ডাক্তারবাবু—জল-ঘা।

—আবার? জল-ঘা অর্থাৎ উপদংশ। এবার বোধ হয় প্রহ্লাদের পঞ্চমবার।

মাথা চুলকে প্রহ্লাদ বলে—যে গোরু অখ্যাচ্ছি খায়, সে কি ভুলতে পারে মশায়?

হাসলেন ডাক্তার।

নবগ্রামের বড়কর্তার বাড়ি যেতে হবে, ডাক আছে। তাঁর ছোট ছেলের চতুর্থবার প্রমেহ দেখা দিয়েছে।

তাঁর বাবার কথা মনে পড়ত। তিনি বলতেন—জীবনে আয়ু আর পরমায়ু কথা দুটো শুধু কথার মারপ্যাঁচ নয় বাবা! ওর অর্থ হল নিগূঢ়। দীর্ঘ আয়ু হইলেই পরমায়ু হয় না, আর আয়ু স্বল্প হলেই সেটা পরমায়ু হয় না এমন নয়। যার জীবন পবিত্র পরমানন্দময়, পরমায়ু হল তার। নইলে বাবা—শক্তি চর্চা করেও মানুষ দীর্ঘায়ু হয়। রোগকে সহ্য করে, এমন কি জয় করে।

কথাটা তিনি এই প্রহ্লাদ সম্পর্কেই বলেছিলেন। প্রথমবার উপদংশের আক্রমণে প্রহ্লাদ চিকিৎসা করায় নি। এটা ওটা মলম- ব্যবহার করেছিল। দ্বিতীয়বার এসেছিল জগৎ মশায়ের কাছে। সেই উপলক্ষেই বলেছিলেন। প্রহ্লাদ সেবার বলেছিল—লোকে দেখাতে বলছে, তাই—। নইলে—ও আপুনিই ভালো হয়।

প্রহ্লাদ আজও বেঁচে আছে। আজও লাঠি খেলে বেড়ায়। আজও মাটির উপরে বাহু ঠুকে আছাড় খেয়ে পড়ে।

প্রহ্লাদ বলত—তবে চিকিৎসাতে তাড়াতাড়ি সারে। তা ওষুধ দেন।

তখন ইনজেকশন ওঠে নি। ওষুধ নিয়ে—টাকা দিয়ে প্রণাম করে চলে যেত প্রহ্লাদ। এক টাকা ফী-ও দিত।

ডাক্তার বলতেন—ও কী রে? ফী কেন? বাড়িতে আমি ফী নিই কবে?

—এই দেখেন বভিপেনামী না দিলে রোগ যে দেহ ছাড়ে না! আর তো দোব না!

এতকালের খাতার মধ্যে প্রহ্লাদের নামে বাকি হিসাব নেই।

তারপর একের পর এক আসত রোগী। আমাশয়, জর, ম্যালেরিয়া, রেমিটেণ্ট, টাইফয়েডও দু-একটা আসত; গ্রহণী, তা ছাড়া কত রোগ। এক এক রোগীর তিন-চারটে রোগে মিশে সে এক জটপাকানো জটিল ব্যাপার। তাঁর বাবা বলতেন—শাস্ত্রে আছে সকল বিকারের অর্থাৎ রোগের আবিষ্কার আজও হয় নি। যদিও কোনো রোগ নতুন মনে হয় তবে তার নাম জান না বলে সংকুচিত হবে না, লজ্জিত হবে না। লক্ষণ দেখে তার চিকিৎসা করবে। এ যুগে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা, বিজ্ঞানের কল্যাণে ল্যাবোরেটরি হয়েছে। সে যুগে তাঁদের সে সুযোগ ছিল না।

তারপর আরম্ভ হত 'পাইকিরি দেখা'। এ নামটা শশীর আবিষ্কার।

রোগীরা এলে—কার কী অসুখ জেনে কম্পাউণ্ডারেরা দুই ভাগে ভাগ করে রাখত। সহজ রোগীদের আলাদা করে একদিকে বসাত। অবশ্য অবস্থাপন্ন মান্যগণ্য রোগীদের রোগ সহজই হোক আর কঠিনই হোক তাদের দেখার কাল ছিল প্রথমেই।

পাইকিরি দেখার সময় ডাক্তার এসে বাইরে দাওয়ার উপর বসতেন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকত গোপাল কম্পাউণ্ডার! রোগী দেখে ডাক্তার প্রেসক্রিপশন বলতেন—সে লিখত! শশীর উপর তিনি নির্ভর করতে পারতেন না! অন্যমনস্ক শশী কী লিখতে কী লিখবে কে জানে? তা ছাড়া লেখার পর শশী নিজেই পড়তে পারত না কী লিখেছে। ডাক্তারকেই এসে জিজ্ঞাসা করত—কী বলেছেন বলুন তো। লেখাটা ঠিক পড়তে পারছি না।

আরোগ্য-নিকেতনে তখন তিনজন কম্পাউণ্ডার। শশী, গোপাল, আর কবিরাজি বিভাগে ছিল বাপের আমলের বুড়া চরণদাস সিং। নীরবে ঘরের মধ্যে বসে শুঁঠ আমলকী চূর্ণ করত, মোদক পাকাত, পুরিয়া বাঁধত।

ডাক্তার বলে যেতেন কুইনিন সালফেট ১০ গ্রেন, অ্যাসিড সাইট্রিক ২০ গ্রেন, ম্যাগসালফ ১০ গ্রেন, স্পিরিট এনেসি ৫ ফোঁটা, জল—।

আগে এক ডোজ ক্যাস্টর অয়েল খাইয়ে দাও।

সে যেত। আর একজন আসত। আমাশয়। অনেক দিনের। ডাক্তার ডাকতেন—সিংমশায়। চরণদাস এসে দাঁড়াত।

—একে 'রেসা খাদ্‌মে' দেবেন তো। ওটা তাঁদের মুষ্টিযোগ।

—তোমার কী?

—সুর্য্যিফোড়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে মাথা ধরা শুরু হয়—সূর্যাস্তের পর ছাড়ে। এর মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা।

জীবন দত্ত আবার ডাকতেন—সিংমশায়। সুর্য্যিফোড়ের মুষ্টিযোগ বলে দিয়ে নতুন রোগীর দিকে মন দিতেন। হঠাৎ চকিত হয়ে উঠতেন।

তিনদিন অল্প জর, মাথায় যন্ত্রণা। একজ্বরী। জিভ দেখি—জিভ দেখেই ডাক্তার সতর্ক হয়ে বসেন।—দেখি, নাড়ী দেখি। নাড়ী ধরে চোখ বোজেন। ও হাতটা দেখি।

—হুঁ, এসো তো বাপু, টেবিলের উপর শুয়ে পড়ো তো। পেটটা দেখি। ফাঁপ আছে কিনা?—হুঁ।

—তুমি বাপু সাবধানে থাকবে। তোমাকে দুদিন ঘোরাবে বোধ হয়। বুঝেছ?

নাড়ীতে যেন শক্ত রোগের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। স্পষ্ট বিকাশ এখনও হয় নি। তবে মনে হচ্ছে। জিভ পেটও তাই সমর্থন করছে। টাইফয়েড।

—গোপাল, কাগজ আনো।

প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতেই ডাক্তার বললেন—দেখো, দুবার জর ওঠানামা করে কিনা লক্ষ্য রেখো।

—আজ্ঞে না। জর তো নাই। ওই একভাবে—সুতোর সঞ্চারে—

—না না। ভালো করে লক্ষ্য কোরো। ভাত-মুড়ি—এসব খেয়ো না। সাগু খাবে। সাগু। দুধ? উহু—দুধ খেয়ো না। আর নিজে এমন করে এসো না। বুঝেছ? হ্যাঁ! ঘোরাতে পারে দুদিন।

ব্যস। এইবার গ্রামের কটি রোগীর বাড়ি যেতে হবে। তারপর নবগ্রাম। সাহাদের বাড়িতে একটা নিউমোনিয়া কেস, সুবর্ণবাবুর ছেলের রেমিটেন্ট ফিবার,

রমেন্দ্রবাবুর ছোট ছেলের প্রমেহ, বন্ধু নেপালের স্ত্রীর সূতিকা। কেউ ফী দেবে কেউ দেবে না। যারা দেবে, তাদেরও দু-একজনের বাকি থাকবে।

এ ছাড়া পথে আরও কত জন কত বাড়ি থেকে তাঁকে ডাকত!—মশায়, একবার আমার ছেলেকে দেখুন। ছেলে কোলে নিয়ে পথের ধারেই দাঁড়িয়ে থাকত দু-একজন। কারও কারও বাড়ি যেতে হত। বৃদ্ধ, শয্যাশায়ী যারা তারা পথের ধারে দাঁড়ায় কী করে?

—মশায়, একবার যদি আমার মাকে দেখে যান!

মনে পড়ছে, সেদিন সেতাব তাঁকে যোগী বাড়ুজ্জেকে দেখতে ডেকেছিল।

—জীবন, একবার বাপু যোগী বাড়ুজ্জেকে দেখে যা। ছেলেপুলে নাই, আমাকেই বললে যোগী—যদি জীবনমশায়ের সঙ্গে দেখা হয় বোলো, একবার যেন দেখে যান আমাকে। চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারির ওষুধে তো কিছু হল না।

সেতাব নেপাল এরা দুজনে এই সব রোগীদের পৃষ্ঠপোষক ছিল। ওরা তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকত।

জীবন দত্ত হাসিমুখেই যেতেন। ওদের বলতেন—বলিস, বুঝলি, খবর দিয়ে বলিস। আমি দেখে যাব।

নেপাল খবর আনত—হরিহর ডোম খুব ভুগছে। চল একবার যাবি। গোপলা বাউড়ীর মায়ের জ্বর, তাকেও একবার দেখে যাবি চল।

হরিহরের অসুখ ভালো হলে তার কাছে একটা পাঁঠা আদায় করবে নেপাল। সে জীবন দত্ত জানতেন। এবং সেই পাঁঠাটা নিয়ে চাল ডাল ঘি মশলা তরি-তরকারি নেপাল নিজে দিয়ে একদিন ফিস্ট করবে। জীবন দত্তকে দিতে হবে—মাছ-মিষ্টি।

বাড়ি ফিরতে অপরাহ্ণ। পকেটে টাকায় আধুলিতে দশ-বারো টাকা। ফী ছিল তখন এক টাকা। দিনান্তে ফী একবার। দ্বিতীয়বারের ফীয়ের রেওয়াজ ছিল না। জামাটা খুলে দিতেন আতর-বউকে। ছেলে বনবিহারী মেয়ে সুষমা এসে দাঁড়াত।

—বাবা পয়সা।

জীবন দত্ত ফেরবার পথে আধুলি ভাঙিয়ে নিয়ে ফিরতেন। তার মধ্যে পয়সা কিছু থাকতই। বনুর চারটি, সুষমার দুটি। বনু নিত ডবল পয়সা, বলত, বড় পয়সা নোব। সুষমার ছোটবড় বিচার ছিল না; দুটি হলেই সন্তুষ্ট হত। ছেলে আর মেয়ে। নোট-বইটা খুলে লিখে রাখতেন—রমেন্দ্রবাবুর বাড়ির ফী বাকি রইল।

বাড়ির বাইরে তখন আরোগ্য-নিকেতনের সম্মুখে বামনি গাঁয়ের শেখেদের গাড়ি

এসে দাঁড়িয়ে আছে। কৃষ্ণপুরের লোক এসেছে। কায়স্থপ্রধান সমাজ কৃষ্ণপুর। মিত্রদের বাড়ির চিঠি নিয়ে এসেছে—"দত্ত মহাশয়, একবার দয়া করিয়া আসিবেন। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের একজরী জর। রাঘবপুরের কবিরাজ দেখিতেছিলেন কিন্তু কিছু হইতেছে না। ইতি সুরেশচন্দ্র মিত্র।"

গৌরহরি মিত্তিরের কথাটি নন্দ মনে করে রেখেছে! যখন-তখন বলে। জীবন মশায় হাসলেন; আসলে ওটা নন্দর ক্ষোভ। সেকালের আরোগ্য-নিকেতনের গৌরবের যে ওরাও অংশীদার ছিল। পাওনাও হত অনেক। সেকালে ছিল কাঠের কলবাক্স। যেখানে মশায় পায়ে হেঁটে যেতেন সেখানে নন্দ বা ইন্দির যেত কলবাক্স মাথায় নিয়ে। কারুর বাড়ি দু আনা কারুর বাড়ি চার পয়সা প্রাপ্য হত ওদের। আজ বলতে গেলে সময়মতো ওরা মাইনেই পায় না।

দিন যায়, ফেরে না। দিনের সঙ্গে কাল যায়। কালের সঙ্গে গতকালকার নূতনের বয়স বাড়ে, পুরনো হয়, জীর্ণ হয়, যা জীর্ণ তা যায়। তাঁর খ্যাতিও গিয়েছে। তাতে আক্ষেপ নেই, কিন্তু দুঃখ একটু হয় বই কি! উপেক্ষা সহ্য হয় না। তাঁকে উপেক্ষা করলেও তিনি দুঃখ পেতেন না। এ যে বিদ্যাকে উপেক্ষা!

—আসুন! তাকে আহ্বান জানালে মোহান্তের শিষ্য ভোলানাথ। পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে। মহাপীঠের চারিপাশের বনভূমির একটি বিচিত্র গন্ধ আছে। কত রকমের ফুল এবং বিচিত্রগন্ধা লতা যে আছে এর মধ্যে! অনন্তমূলের রাজ্য বললে হয়।

ভোলানাথ বললে, সকাল থেকে আপনার জন্যে তাগাদা লাগিয়েছে বুড়ো। ডাকো মহাশয়কে। নাড়ী দেখুক!

উনিশ

সন্ন্যাসী সকালে সুস্থভাবেই অল্প মাথা তুলে শুয়ে রয়েছেন! যন্ত্রণা নেই। বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। জীবন দত্তকে দেখে বললেন—আইসো রে ভাই মহাশয়, আইসো! কাল রাতে তুমি আসিয়েছিলে ভাই, তখন আমি ঘুমিয়েছি। ওহি—শশী বেটা কী একঠো দাওয়াই দিলে—ব্যস, পাঁচ মিনিট কো ভিতর বে-হোঁশ হইয়ে গেলাম।

—আজ তো ভালো আছেন। ওষুধে তো ভালো ফলই হয়েছে। হাসলেন জীবন।

—কে জানে ভাই। ঘাড় নাড়লেন।

—কেন! কোন যন্ত্রণা রয়েছে এখন? আর অসুখ কী?

—ঠিক সমঝাতে পারছি না। হাতটা তুমি দেখো ভাই। দেখো তো দাদা, ছুটি মিলবে কিনা!

—ছুটি নিতে ইচ্ছে হলেই মিলবে। ইচ্ছে না-হলে তো আপনাদের ছুটি হয় না।

—সে পুণ্য আমার নাই-ভাই।

সে পুণ্য সন্ন্যাসীর নাই সে জীবন দত্ত বুঝেছেন। থাকলে বুঝতে পারতেন—কালকের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে গাঁজা না খাওয়ার যন্ত্রণাটাই ছিল ষোলো আনার মধ্যে বারো আনা কি চোদ্দ আনা। সে সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁর গিয়েছে, মন জীর্ণ হয়েছে বেশী। যাঁদের যোগের সাধনা থাকে তাঁদের মন অদ্ভুত শক্তিশালী, দেহের জীর্ণতা তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না, মনে তখন বাসনা জাগে জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নূতন দেহ লাভের। এ কথা এ দেশের পুরনো কথা—বাবার কাছে শুনেছেন, আরও অনেক প্রবীণের কাছে শুনেছেন। প্রদ্যোতেরা একথা বিশ্বাস করবে না—হাসবে; কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন। মশায় সন্ন্যাসীর হাতখানি তুলে নিলেন।

সন্ন্যাসী ক্ষীণ কণ্ঠেই বললেন—মনে নিছে ভাই কি ছুটি মিলবে। কাল রাতে যেন মনে হইলরে ভাই কী—উধার থেকে দশ-বারোটা খড়মকে আওয়াজ উঠছে। আউর মনে হইল—রঘুবরজীর আওয়াজ মিলছে। ওহি জঙ্গলের পঞ্চতপার আসনসে হাঁকছে, আও ভাইয়া! আও!

কথাগুলির অর্থ বুঝিতে জীবনমশায়ের বিলম্ব হল না।

ও-ধারে—জঙ্গলের মধ্যে এখানকার পূর্বতন মহান্তদের সমাধি আছে। সেখান থেকে খড়মের আওয়াজ শুনেছেন সন্ন্যাসী। অর্থাৎ তাঁরা এসেছিলেন তাঁক আহ্বান জানাতে। রঘুবরজী এই সন্ন্যাসীর গুরুস্থানীয় এবং এঁর ঠিক আগের মহান্ত। তিনি ছিলেন সত্যকারের যোগী। যোগ সাধনায় দেহের ভিতরের যন্ত্রগুলিকে যেমন শক্তিশালী করেছিলেন, বিচিত্র ব্রত পালন করে বাইরে প্রকৃতির প্রভাব সহ্য করবার শক্তিও তিনি তেমনি আয়ত্ত করেছিলেন। বৈশাখে পঞ্চতপা ব্রত করতেন—সূর্যোদয়ের সঙ্গে পাঁচটি হোমকুণ্ড জেলে—ঠিক মাঝখানে আসন গ্রহণ করতেন, সারাদিন আসনে বসে পর পর কুণ্ডে কুণ্ডে আহুতি দিয়ে সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর সে দিনের মতো হোম শেষ করে উঠতেন। আবার শীতে ওই গাছতলায় অনাবৃত দেহে বসে জপ করতেন; প্রথম পাখির ডাকের পর আসন ছেড়ে হিমশীতল পুষ্করিণীতে নেমে সূর্যোদয় পর্যন্ত অর্থাৎ উত্তাপ সঞ্চয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জলে গলা ডুবিয়ে বসে থাকতেন। তিনিও তাঁকে ডেকেছেন, বলেছেন!

সাধারণ মানুষ মৃত্যুর পূর্বে মৃত স্বজনকে দেখেন। তাঁরা নাকি নিতে আসেন। সন্ন্যাসীরা স্বজন বিস্মৃতির গহনে হারিয়ে গিয়েছে। এখানকার মহান্তেরাই তাঁর স্বজন পূর্বপুরুষ—তাঁদেরই তিনি দেখেছেন।

নাড়ী দেখে হাত নামিয়ে দিয়ে জীবন দত্ত বললেন—হাঁ বাবা। ছুটি আসছে আপনার। আজ সন্ধ্যার পর। কাল যখন অসুখ খুব বেড়েছিল—সেই সময়। সেই রকম মনে হচ্ছে বাবা।

এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল সন্ন্যাসীর বিশীর্ণ বার্ধক্যশুষ্ক ঠোঁট দুটিতে। আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ফেললেন তিনি।

আজ চল্লিশ বৎসর সন্ন্যাসী এখানে আছেন। তিরিশ বৎসরের উপর তিনি এই দেবস্থানের মহান্ত। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে এখানে প্রথম এসেছিলেন তিনি। কিন্তু দেখে মনে হত তিরিশ বছরের জোয়ান। লম্বা-চওড়া কুস্তি-করা পালোয়ানী শরীর। শাস্ত্র-টাস্ত্র জানতেন না, গাঢ় বিশ্বাস আর কয়েকটি নীতিবোধ নিয়ে মানুষটির সন্ন্যাস। সন্ত না-হোক সাধু মানুষ ছিলেন।

প্রথম পরিচয় হয়েছিল বিচিত্রভাবে।

দেশের তখন একটি ভয়াবহ অবস্থা। মড়ক চলেছে, মহামারী কলেরা লেগেছে দেশে। এক গ্রাম থেকে আর-এক গ্রাম—সেখান থেকে আর এক-গ্রাম ; বৈশাখের দুপুরে খড়ের চালের আগুনের মতো লেলিহান গ্রাস বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়ল। সেকালে তখন কলেরার কোনো ওষুধ ছিল না। ক্লোরোডাইন সম্বল। কবিরাজিতে ওলাউঠার ওষুধ তেমন কার্যকরী নয়। ক্লোরোডাইন দেবারও চিকিৎসক নাই। যারা আছে তারা নিজেরাই ভয়ে ত্রস্ত। হরিশ ডাক্তার কলেরায় যেত না। হোমিওপ্যাথ ব্রারোরি তখন পালিয়েছে। থাকলে সেও যেত না। নতুন একজন ডাক্তার এসেছিল নবগ্রামে, সেও একদিন রাত্রে পালিয়ে গেল—কলেরা কেসে ডাকের ভয়ে।

চারিদিকে নানা গুজব। সেকালের বিশ্বাসমতো ভয়ঙ্কর গুজব। কলেরাকে না কি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যার মুখে তাকে দেখা যায়। শীর্ণ কঙ্কালসার শরীর, চোখে আগুনের মতো দৃষ্টি, পিঙ্গল রুক্ষ চুল, দন্তর একটি মেয়ে ; পরনে তার একখানা ক্লেদাক্ত জীর্ণ কাপড়, বগলে একটা মড়াবওয়া তালপাতার চাটাই নিয়ে সেই পথ ধরে গ্রামে ঢোকে—যে পথ ধরে গ্রামের শব নিয়ে শ্মশানে যায়। সন্ধ্যায় ঢোকে, যার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয় সেই হতভাগ্যই সেই রাত্রে কলেরায় আক্রান্ত হয়। মরে! তারপর রোগ ছড়ায় ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায়।

লোকে পালাতে লাগল গ্রাম ছেড়ে।

অবস্থাপন্নেরা আগে পালাল। নবগ্রামের বাবুরা তার মধ্যে সর্বপ্রথম। তারপর সাধারণ লোকেরা।

থাকল গরীবেরা আর অসমসাহসী জনকয়েক, তার মধ্যে মাতাল গাঁজালেরা সংখ্যায় বেশী। মদ খেয়ে গাঁজা টেনে ভাম হয়ে বসে থাকত। কালীনাম হরিনাম করে চীৎকার করত।

তিনিও হরিনাম করতেন।

চিরকালই তিনি সংকীর্তনের দলের মূলগায়েনী করেন। গলা তাঁর নাই, সুকণ্ঠ তিনি নন, তবে গান তিনি বোঝেন এবং গাইতেও তিনি পারেন। হ্যাঁ, তা পারেন। দশকুশীতে সংকীর্তন এখনও তিনি গাইতে পারেন। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেবার লোক এখন আর নাই। থাকবে কোথায়? এ সব বড় তালের গানের চর্চা উঠে গেল। কতই দেখলেন! হারমোনিয়ম—গ্রামোফোন, এখন রেডিয়ো। নবগ্রামের কয়েকজনের বাড়িতেই রেডিয়ো এসেছে। শুনেছেন তিনি! সে গান আর এ গান! সেই—"দেখে এলাম শ্যাম—সাধের ব্রজধাম—শুধু নাম আছে।" হায় হায়! "শুধু নামই আছে আর কিছু নাই শ্যাম! রাধা স্বর্ণলতা তমালকে শ্যাম ভেবে জড়িয়ে ধরে ক্ষতবিক্ষত দেহে ধূলায় ধূসরিতা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে হতচেতন হয়ে!"

তিনি প্রতি সন্ধ্যায় সংকীর্তনের দল নিয়ে পথে পথে ঘুরতেন। বিশ্বাস করতেন এই নামকীর্তনে অকল্যাণ দূর হয়। গ্রামে গ্রামে মদ্যপায়ীরা রক্ষাকালী পূজা করাত। তাদেরও সে বিশ্বাস ছিল গভীর।

গভীর রাত্রে পথ-কুকুরে চীৎকার করে চিরকাল। সে চীৎকার যেন বেশী হয়েছে। এবং সে চীৎকারে একটি যেন গূঢ় অর্থ পাওয়া যাচ্ছে। চীৎকারের মধ্যে ক্রোধ নাই—ভয় আছে। তারা রাত্রে ওই পিঙ্গলকেশিনীকে পথে বিচরণ করতে দেখতে পায়। ভয়ার্ত চীৎকার করে তারা। ঘরে ঘরে অর্ধঘুমন্ত মানুষেরা শিউরে ওঠে।

জীবন ডাক্তারের মৃত্যুভয় ছিল না। তিনি ঘুরতেন। কিন্তু কী করবেন ঘুরে?

শেষে ছুটে গিয়েছিলেন রঙলাল ডাক্তারের কাছে। বলুন—ওষুধ বলে দিন।

দীর্ঘকাল পরে বৃদ্ধ রঙলাল তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মেডিকেল জার্নাল পেড়ে বসলেন। তারপর প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন—ওয়ান

সিক্সথ গ্রেন ক্যালোমেল আর সোডা বাইকার্ব। ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াও। এ ছাড়া এখানে এ অবস্থায় আর কিছু করবার নাই।

অনেক প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল ওই ওষুধে। দিন নাই রাত্রি নাই জীবন মশায় ঘুরতেন। পিতৃবংশের সম্মান! গুরু রঙলালের আদেশ! নিজের প্রাণের বেদনা!

রঙলাল ডাক্তার প্রেসক্রিপশন দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ভালো কথা, জীবন। তুমি না কি খুব তারস্বরে চীৎকার করে হরিনাম সংকীর্তন করে কলেরা তাড়াচ্ছ?

অট্টহাস্য করে উঠেছিলেন।

জীবন লজ্জিত যে একেবারে হননি তা নয়। তা হলেও অপ্রতিভ হন নি। বলেছিলেন—কী করব? লোকেরা বিশ্বাস করে ভরসা পায়।

—তুমি নিজে?

জীবন একটু বাঁকা উত্তর দিয়েছিলেন—সবিনয়ে বলেছিলেন—আপনি তো জানেন আমি কোনদিনই নাস্তিক নই।

—তাতে আমি অসন্তুষ্ট নই, আপত্তিও করি না জীবন। নাম সংকীর্তন করলেও আপত্তি করব না, তবে সে সংকীর্তন শুধু সপ্রেমে কীর্তনের জন্য হওয়া উচিত। আমাকে দাও, আমাকে বাঁচাও, আমার শত্রু নাশ করো, এই কামনায় সংকীর্তন আমি পছন্দ করি না। ওতে ফলও হয় না।

জীবন বলেছিলেন—আগুন-লাগা বনের পশুর মতো মানুষ ছুটে বেড়াচ্ছে। জানেন, আমি যেন চোখে দেখছি—। উত্তেজিত হয়ে আবেগের সঙ্গেই জীবন সেদিন রঙলাল ডাক্তারের সামনে দার্শনিকতা করে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন—মরণ তেড়ে নিয়ে চলেছে জীবনকে। একেবারে এলোকেশী এক ভয়ঙ্করী—হাত বাড়িয়ে ছুটেছে, গ্রাস করবে, অনন্ত ক্ষুধা! আর পৃথিবীর জীবকুল ভয়ে পাগলের মতো ছুটছে। ছুটতে ছুটতে এলিয়ে পড়েছে, মৃত্যু তাকে গ্রাস করছে। অহরহই ওই তাড়ায় তেড়ে নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যু! এখানে ভগবানের নাম করে তাকে ডেকে ভরসা সঞ্চয় করা ছাড়া করবে কী মানুষ?

রঙলাল ডাক্তার এর উত্তরে সেদিন ব্যঙ্গ করেন নি। প্রসন্ন হেসে বলেছিলেন, ব্যাপারটা তাই বটে জীবন। হারজিতের একটা লড়াই-ই বটে। কিন্তু ওইটেই যেমন চোখে পড়েছে—তেমনি চোখ যদি আরও তীক্ষ্ণ হত তবে দেখতে পেতে, এক-একটা মানুষ কেমন করে ঘুরে দাঁড়ায়, বলে,—এসো! তুমি যে ওই ভয়ঙ্কর বেশে আসছ, তোমার আসল রূপটা দেখি। কিংবা বলে—তোমাকে আমি ধরা দিচ্ছি, কিন্তু যারা পালাচ্ছে তাদের বাঁচতে দাও। তখন মরণের ভয়ঙ্কর মুখোসটা

খসে যায়। দেখা যায় সে বিশ্ববিমোহিনী। তা ছাড়া তুমি জান না, মরণ যত গ্রাস করছে তার দ্বিগুণ জীবন জন্ম নিয়ে চারদিক থেকে কুক দিয়ে বলছে—কই ধরো তো! হারছে না তারা। আরও একটা কথা বলি। মানুষ হারে নি। মহামারীতে কতবার কত জনপদ নষ্ট হয়েছে। আবার কত জনপদ গড়েছে। শুধু গড়েই ক্ষান্ত হয় নি। সে রোগের প্রতিষেধক বার করে চলেছে। ওখানেই তাকে হারানো যায় নি। সে হারে নি। মরবে সে। কিন্তু এইভাবে সে মরবে না। মহাগজের মতো মরবে সে। যেদিন বৃদ্ধ হবে, জীবনের আস্বাদের চেয়ে মৃত্যুর আস্বাদ ভালো লাগবে, সেইদিন মহাগজ যেমন নিবিড় অরণ্যে গিয়ে বহু শত বৎসরের এক খাদের মধ্যে আকাশ বিদীর্ণ করে ধ্বনি তুলে আমি চললাম বলে দেহত্যাগ করে, তেমনি, করে মরবে। হাতিরা এইভাবে পুরুষানুক্রমিক শ্মশানভূমিতে গিয়ে দেহত্যাগ করে থাকে। কেন জান? পাছে তার রোগ বা পচনশীল দেহ থেকে রোগ উৎপন্ন হয়ে অন্য হাতিদের আক্রমণ করে।

এই মহামারী থামাবার পর সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ। এই মহামারীর পর এখানে তিনি সমাজের প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। নবগ্রামের বাবুদের উপেক্ষা করে সরকার তাঁকে প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত মনোনীত করেছিলেন। সেই প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত হিসাবেই একটি কলহের মীমাংসায় তিনি এসেছিলেন এই মহাপীঠে।

সন্ন্যাসী এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আরে ভাইরা, তুমহারা নাম জীওন মহাশা? তুমি না কি বড়া ভারী বীর? আও তো ভাই পাঞ্জা লড়ে এক হাঁত।

পাঞ্জার লড়াইয়ে তিনি হেরেছিলেন, কিন্তু সহজে হারাতে পারে নি সন্ন্যাসী। বেশ খানিকটা বেগ পেতে হয়েছিল।

তারপর কতদিন কত কথা আলাপ হয়েছে।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। এই চণ্ডীতলার মেলায় জুয়া খেলার আসরে শেষ কপর্দক হেরে সন্ন্যাসীর কাছে এসে বলেছিলেন—আমায় একশো টাকা দিতে হবে গোঁসাইজী। কাল পাঠিয়ে দেব।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে গোঁসাই টাকাটা তাকে দিয়েছিলেন—এই দেবস্থলের তহবিলের টাকা। ডাক্তার এসে আবার বসেছিলেন জুয়ার তক্তাপোশে। ঘণ্টাখানেক পরেই গোঁসাই এসে তাঁকে হাত ধরে টেনে বলেছিলেন—আব উঠো ভাই। বহুত হুয়া।

জুয়াড়ীকে বলেছিলেন—জনতা হায় ইন্ কোন হায়? হিঁয়াকে বড়া ডাগডরবাবু আওর প্রেসিডেন পঞ্চায়েত। ইনকা রুপেয়া যো লিয়া—দে দেও ইনকে।

ডাক্তার বলেছিলেন—না। আর মাত্র কুড়ি টাকা হেরে আছি। ওটা ওর প্রাপ্য। চলুন।

পথে সন্ন্যাসী বলেছিলেন—কথাটা তাঁর অন্তরে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে—বলেছিলেন—কাহে ভাই মহাশা—তুম মহাশা বন্‌শের সন্তান মহাশা—তুম ভাই জুয়া খেলো, রাতভর দাবা খেলো, খানাপিনামে এইসা হল্লা করো এ কেয়া ভাই? ভগবান তুমকো কেয়া নেহি দিয়া, বোলো? কেঁও তুমহারা ঘরকে মতি নেহি?

ওঃ! সে একটা সময়! দেহে অফুরন্ত সামর্থ্য, মনে দুরন্ত সাহস, বিপুল পসার, মান-সম্মান; ঘরকন্না সংসার কোনো কিছুই মনে থাকত না। তবে কোনো অন্যায় করতেন না। জুয়ো খেলাটা ছিল শখ! ওটা সে আমলের ধারা! তবে সংসারে যদি—।

অকস্মাৎ তাঁর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

একটা প্রশ্ন জেগে উঠল মনের মধ্যে। বিপিন—রতনবাবুর ছেলে বিপিনের জীবনে কি—? সংসার-জীবনে বিপিনের গোপন দুঃখ ছিল? অশান্তি? বাইরে ছুটে বেড়াত—প্রতিষ্ঠা যশ কুড়িয়ে বেড়াত কিন্তু তবু তৃষ্ণা মিটত না, ক্ষুধা মিটত না! ছুটত—ছুটত—ছুটত! অথবা রিপু? মানুষের সাধনার পথে আসে সিদ্ধি। সে আসার আগে আসে প্রতিষ্ঠা। জাগিয়ে তোলে লালসা। আরও চাই। এই তো রিপু। ওর তাড়নায় ছুটতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মানুষ। সামনে এসে দাঁড়ায় সেই পিঙ্গলকেশিনী।

*　　　*　　　*

রতন বাবুর ছেলে বিপিনের হেঁচকি থামে নি, তবে কমেছে। রক্তের চাপও খানিকটা নেমেছে। রতনবাবু প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গেই বললেন—তোমার ওষুধে ফল হয়েছে জীবন। তুমি একবার নাড়ীটা দেখো। আমার তো ভালোই লাগছে।

জীবন মশায়ও একটু হাসলেন। হাসির কারণ খানিকটা কথাগুলি ভালো লাগার জন্য; খানিকটা কিন্তু ঠিক বিপরীত হেতুতে। হায়রে, সংসারে ব্যাধি-মুক্তি যদি সহজে সম্ভবপর হত! এত সহজে যদি ভালো হয়ে উঠত মানুষ।

হাসির কারণ আরও খানিকটা আছে। রতনবাবুর মতো মানুষ। পণ্ডিত মানুষ, জ্ঞানী ব্যক্তি, একমাত্র সন্তানের এই ব্যাধি হওয়ার পর তিনি ডাক্তারি বই আনিয়ে এই ব্যাধিটি সম্পর্কে পড়াশুনা করে সব বুঝতে চেয়েছেন, বুঝেছেনও; এবং পৃথিবীতে মানুষের জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের মর্মান্তিক তত্ত্বও তিনি ভালো করেই জানেন—তাঁকেও এইটুকুতে আশান্বিত হয়ে উঠতে দেখে হাসলেন।

রতনবাবু আবার বললেন—দেখো, আমার অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা ছিল যে,

কবিরাজি মতেই চিকিৎসা করাই। বিলাতী চিকিৎসার অদ্ভুত উন্নতি হয়েছে, কিন্তু ওদের ওষুধগুলো আমাদের দেশের মানুষের ধাতুর পক্ষে উগ্র। আমাদের ঠিক সহ্য হয় না। ক্রিয়ার চেয়ে প্রতিক্রিয়ার ফল গুরুতর হয়।

বৃদ্ধ এই নৈরাশ্যের তুফানের মধ্যে একগাছি তৃণের মতো ক্ষীণ আশার আশ্রয় পেতে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন, কথা বলতে তাঁর ভালো লাগছে।

—তবে আমার মনের কথা আমি কাউকে বলি না। বুঝেছ ভাই। ওটা আমার প্রকৃতিধর্ম নয়। বিপিনের নিজের বিশ্বাস নাই। বউমার নাই। বিপিনের বড় ছেলে এম. এ. পড়ছে, সে তো একটু বেশী রকমের আধুনিক-পন্থী। তাদেরও বিশ্বাস নাই। আমি বললে তারা কেউ আপত্তি করবে না, সে আমি জানি; মুখ ফুটে কেউ কোনো কথা বলবে না কিন্তু অন্তরে অন্তরে তো তাতে সায় দেবে না; মনের খুঁতখুঁতুনি তো থাকবে। সে ক্ষেত্রে আমি বলি—না, বলব না। তবে কাল যখন ডাক্তারেরা সকলেই বললেন যে, হেঁচকি থামাবার আর কোনো ওষুধ আমাদের নেই, তখন আমি তোমার কথা বললাম। আজ সকালে ডাক্তারদেরও ডেকেছি, তাঁরাও আসবেন; হাসপাতালের প্রদ্যোত ডাক্তার, হরেন সবাই আসবেন। সকলে মিলে পরামর্শ করে একটা ব্যবস্থা করো ভাই।

গম্ভীর হয়ে উঠলেন জীবনমশায়। বললেন—দেখো রতন, শুধু হেঁচকি বন্ধ করবার জন্য আমাকে তোমরা ডেকেছ! আমি ভাই তার ব্যবস্থাই করেছি। তা কমে এসেছে হয়তো, আজ ওবেলা পর্যন্ত হেঁচকি বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর একটা পথ ধরতে হবে। আমি কবিরাজিও জানি—অ্যালোপ্যাথিও করি। আমি বলছি ভাই—দু নৌকায় দু পা রেখে চলা তো চলবে না। হয় কবিরাজি, নয় অ্যালোপ্যাথি—দুটোর একটা করতে হবে। ওঁরাও ঠিক এই কথাই বলবেন।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—আর আজ এখন তো আমি অপেক্ষা করতে পারব না। আমার বাড়িতে কয়েকজন রোগীই বসে আছে। ভোরবেলা চণ্ডীতলার মোহান্তকে দেখতে গিয়েছিলাম। পথে বিপিনকে দেখে যাচ্ছি। হেঁচকি কমেছে, আমি নিশ্চিন্ত। আমি বিপিনকে দেখে যাই, তারপর ওঁরা আসবেন দেখবেন, পরামর্শ করে যা ঠিক হবে আমি ও-বেলা এসে শুনব।

বৃদ্ধ রতনবাবু বিষণ্ণ হলেন, তবুও যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে প্রসন্নভাবেই বললেন—বেশ! তাই দেখে যাও তুমি! তুমি যা বলবে ওঁদের বলব।

বিপিন সত্যই একটু ভালো আছে। নাড়ীতে ভালো থাকার আভাস পেলেন জীবন দত্ত। কিন্তু ভালো থাকার উপর নির্ভর করে আশান্বিত হয়ে উঠবার মতো

বয়স তাঁর চলে গেছে। বললেন—হ্যাঁ, ভালোই যেন হচ্ছে। তবে ভালো থাকাটা স্থায়ী হওয়া চাই রতন।

—নাড়ী কেমন দেখলে, বলো।

—যা দেখলাম তাই বলেছি রতনবাবু। তোমার মতো লোকের কাছে রেখে-ঢেকে তো বলার প্রয়োজন নাই এবং তা আমি বলবও না। তোমাকে আমি জানি।

রতনবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

জীবন মশায় হেসে বললেন—আমি কিন্তু নৈরাশ্যের কথা কিছু বলি নি রতন। এই ভাবটা যদি স্থায়ী হয় তা হলে ধীরে ধীরে বিপিন সেরে উঠবে। হেঁচকি আজই থামবে। তারপর আর যদি কোনো উপসর্গ না বাড়ে তাহলে দশ-বারো দিনের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি হবে। ভালো-থাকাটাকে স্থায়ী ভাব বলব, বুঝেছ? বলব—হ্যাঁ আর ভয় নাই। সাবধানে থাকতে হবে। আর এখান ওখান প্র্যাকটিস করে বেড়ানো চলবে না। ওই বাড়িতে বসে যা হয়, তাও বেশী পরিশ্রম চলবে না।

—ওই তো! ওই তো রোগের কারণ। বার বার বারণ করেছি। বারবার! কিন্তু শোনে কি। কী বলব? কী করব? উপযুক্ত ছেলে। গণ্যমান্য ব্যক্তি। জীবনের কোনোখানে কোথাও কোনো দোষ নাই, অমিতাচার নাই, অন্যায় নাই; আহারে লোভ নাই, অন্যায় পথে অর্থোপার্জনের মতি নাই, কোনো নেশা নাই; সিগারেট পান পর্যন্ত খায় না; ক্রোধ নাই; বিলাসী নয়, শুধু ওই প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস। তাও তোমাকে বলছি ভাই, প্র্যাকটিস যে অর্থের জন্যে তাও নয়। ওই মামলা জেতার নেশা। এ জেলা ও জেলা, এ কোর্ট ও কোর্ট সে কোর্ট। তারপর মাসে দুবার তিনবার হাইকোর্টে কেস নিয়ে গিয়েছে। ওই মামলা জেতার নেশা, যে মামলার হার হয়েছে, হাইকোর্ট থেকে তাই ফিরিয়ে আনতে হবে। তা এনেছে। ও নেশা কিছুতেই গেল না। ঘর দেখে নি, সংসার দেখে নি, ছেলেপুলে স্ত্রী নিয়ে আনন্দ করে নি, আমার ঘাড়ে সব ফেলে দিয়ে ওই নিয়ে থেকেছে। আমি কতবার বলেছি—বিপিন এও তোমার রিপু। রিপুকে প্রশ্রয় দিয়ো না। প্রশ্রয় পেলে রিপুই ব্যাধি হয়ে দেহ-মনকে আক্রমণ করে, হয়তো—। বাপ হয়ে কথাটা তো উচ্চারণ করতে পারতাম না ভাই।

জীবন দত্ত বললেন—যাক এবার সেরে উঠুক। সাবধান আপনিই হবে।

একটি কিশোর ছেলে এসে দাঁড়াল, আপনার ফী। এইটিই বিপিনের বড় ছেলে। চমৎকার ছেলে।

—এ কি? চার টাকা কেন? আমার ফী দু টাকা!

দুটি টাকা তুলে নিয়ে জীবন মশায় পকেটে ফেলে বেরিয়ে পড়লেন। ছেলেটি

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল। বললে—আপনি কি ডাক্তাররা যখন আসবেন তখন থাকবেন না?

—আমি? আমি থেকে কী করব?

—আপনার মতামত বলবেন।

—আমি তো শুধু হিক্কার জন্য ওষুধ দিয়েছি। ওটা একটা উপসর্গ। মূল চিকিৎসা তো ওঁরাই করছেন। হাসলেন জীবন ডাক্তার।

ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ বললে—ওবেলা একবার আসবেন না?

—আসব? আচ্ছা আসব।

ডাক্তার চলে গেলেন।

—বিপিন বোধ হয় বাঁচবে না। ভালো খানিকটা মনে হল বটে কিন্তু আজ যেন স্পষ্টই তিনি নাড়ী দেখে অনুভব করছেন—মৃত্যু আসছে। আসছে কেন—ইতিমধ্যেই এসে দাঁড়িয়েছে। ছায়া পড়ছে তার। রতনবাবুর কথা ভাবলেন। বড় আঘাত পাবে রতন। নিজের কথা মনে পড়ল। তাঁর ছেলে বনবিহারী মারা গেছে। বিপিনেরই বয়সী সে। একান্ত তরুণ বয়সে বনবিহারী মারা গেছে; নিজের অমিতাচারে মদ্যপান এবং তার আনুষঙ্গিক অনাচার করে নিজেকে জীর্ণ করেছিল, তার উপর ম্যালেরিয়ায় ভুগে নিজেকে ক্ষয় করেছিল সে। বিপিন নিজেকে অতিরিক্ত কর্মভারে পীড়িত করে ক্ষয় করেছে।

রতনবাবুর কথাগুলি মনে পড়ল। 'ঘর দেখেনি, সংসার দেখে নি, ছেলেপুলে স্ত্রী নিয়ে আনন্দ করে নি। শুধু কাজ, কাজ, মামলা মামলা মামলা।' কতবার রতনবাবু বলেছেন—'বিপিন এও তোমার রিপু—!'

রিপুই বটে। বড় ভয়ঙ্কর রিপু। বড় ভয়ঙ্কর। তিনি নিজে ভুগেছেন যে! জীবন্তে মৃত্যু ঘটেছে বলে তিনি তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন। বনবিহারীর মৃত্যুর পর তিনি চিকিৎসায় অমনোযোগী হয়েছেন এবং কাল অগ্রসর হয়ে তাঁকে পুরনো জীর্ণ বলে ঘোষণা করেছে। আজ তাঁর অবস্থা গজভুক্ত কপিত্থের মতো। সত্য বলতে গেলে এ তো তাঁর মৃত্যু।

—কেমন দেখে এলি? রতনবাবুর ছেলেকে?

—সেতাব?

সেতাবের বাড়ি এসে পড়েছেন, খেয়াল ছিল না।

—কী দেখলি?

—দেখব আর কী? আমি তো দেখছি না। দেখছে ডাক্তাররা। আমাকে ডেকেছিল হিক্কা বন্ধের জন্যে। তা কমেছে। বোধ হয় সন্ধ্যা পর্যন্ত হিক্কা থেমে যাবে।

—কিন্তু নাড়ী দেখলি তো?

—দেখেছি।

—কী দেখলি তাই তো শুধাচ্ছি রে!

—প্রদ্যোত ডাক্তার সুদ্ধ যখন দেখছে তখন কী দেখলাম তা বলা তো ঠিক হবে না সেতাব। একালে ওদের ওষুধপত্রের খবর তো সব জানি না ভাই, কী করে বলব?

—হুঁ। তা তুই ঠিক বলেছিস। তবে রতনবাবু তো আমাদের গাঁয়ের লোক, ঘরের লোক—সেই জন্যে। বুঝলি না, অবস্থা আছে, চিকিৎসা করাতে পারেন। কলকাতা নিয়ে যেতে পারেন।

—কলকাতা থেকে আসাটাই ভুল হয়েছে। কলকাতায় থাকলেই ভালো করতেন। এলেন বিশ্রাম হবে বলে। কিন্তু হঠাৎ রোগ বাড়লে কী হবে সেটা ভাবলেন না। ওই হয় রে। সংসারে দীর্ঘকাল চিকিৎসা করে এইটেই দেখলাম যে, ভ্রম হয়, সেবার ত্রুটি হয়, এটা-ওটা হয়। কলকাতা নিয়ে যাওয়া আর চলবে না। মানে—

—তা হলে? কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে সেতাব কথা বলে উঠল; কিন্তু নিজেও কথাটা শেষ করতে পারলে না, নিজেই থেমে গেল।

—না-না সে বলি নি, বলবার মতো কিছু পাই নি। তবে—বুঝলি না—। তবু যেন ভরসা পাচ্ছি না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন ডাক্তার।

এরপর দুজনেই চুপ করে বসে রইলেন।

ডাক্তার হঠাৎ উঠে বললেন—চললাম, রোগী বসে আছে বাড়িতে। চণ্ডীতলা হয়ে যাব। গোঁসাই এখন-তখন, জানিস?

—শুনেছি কাল। আজ বোধ হয় ভালো আছেন একটু। নিশি ঠাকরুন গিয়েছিল চণ্ডীতলা—মায়ের স্থানে জল দিতে; সে বলছিল। শশী নাকি ভালো করেছে গোঁসাইকে একদাগ ওষুধে। বলছিল—কাল জীবনমশায় ভাইঝিটাকে দেখে বললে, জলবারণ খাওয়াতে হবে। তা—শশীকেই দেখাব আমি।

চমকে উঠলেন জীবন দত্ত। শশীকে দেখাবে? হতভাগিনী মেয়েটার মুখ মনে পড়ল। কচি মেয়ে। কত সাধ কত আকাঙ্ক্ষা মনে। মেয়েটাকে হত্যা করবে। শশী একটা পাপ হয়ে দাঁড়াল! সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি তরুণীর মুখ মনে পড়ল।

সেতাব বললেন—তুই কাল নিশির ভাইঝিকে দেখেছিলি নাকি? জলবারণের কথা বলেছিলি?

—বলেছিলাম। আমার বিদ্যেতে ওই এখন একমাত্র ওষুধ। কিন্তু ও কথা থাক। কী বলে—গণেশ ভটচাজের মেয়ের খবর কিছু জানিস? কাল রাত্রে—।

—খুব কাহিল। এখন-তখন অবস্থা শুনছি। কাল তো তুই শুনলাম বলে দিয়েছিলি নাড়ী দেখে।

—না তো? জীবন মশায় চমকে উঠলেন। আমি তো নাড়ী দেখি নি প্রসবের পর। হাসপাতালের ডাক্তার—

কথার উপর কথা দিয়ে সেতাব বললে—হাসপাতালের ডাক্তার শুনলাম কোমর বেঁধে লেগেছে। শুনলাম খুব ইনজেকশন দিচ্ছে। অক্সিজেন দিয়ে রেখেছে। গণেশকে বলেছে আর-একটা অক্সিজেন আনতে হবে।

—চললাম। জীবন মশায় অকস্মাৎ চলতে শুরু করলেন যেন। তরুণ ছোকরাটি বাহাদুর বটে, বীর বটে। শক্তিও আছে, নিজের উপর বিশ্বাসও আছে। যুদ্ধ করছে বলতে গেলে। একবার দেখে যাবেন।

প্রদ্যোত গম্ভীর মুখে বসে আছে আপিসে। গণেশ নাই, গণেশের স্ত্রী আধ ঘোমটা দিয়ে বসে আছে বারান্দায়। মশায়কে দেখে সে মৃদুস্বরে কেঁদে উঠল—ওগো মশাই আমার অর্চনার কী হবে গো! একবার—

—কাঁদবেন না! গম্ভীর স্বরে প্রদ্যোত বললে।

মশায় বললেন—কেঁদো না মা। দেখো, ভগবান কী করেন। এ তো তাঁর হাত মা।

প্রদ্যোত ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলেন—আপনি কি নাড়ী দেখতে চান না কি?

মশায় বললেন—না-না। আমি যাচ্ছিলাম পথে, ভাবলাম একবার খবর নিয়ে যাই। বলেই তিনি ফিরলেন।

—একটু বসবেন না?

—না। দু-চারটে রোগী এখনও আসে তো। তারা বসে আছে।

প্রদ্যোত বললে—মতির মায়ের এক্সরের রিপোর্ট এসেছে। দেখবেন? বিশেষ কিছু হয় নি। এতক্ষণে একটু হাসলে প্রদ্যোত।

—ভালোই তো। আপনার দয়াতেই বুড়ী বাঁচল। মশায় গতি দ্রুততর করলেন! একবার মনে হল—বলেন—'বিপিনের হিক্কা থেমে এসেছে!' কিন্তু তা তিনি বলতে পারলেন না!

কুড়ি

দাঁতু ঘোষাল চীৎকার করছিল।

এসেছে সকালবেলা—আটটা না-বাজতে। এখন সাড়ে দশটা। নবগ্রাম ইষ্টিশানে সাড়ে দশটার গাড়ি চলে গেল, এখনও বসে থাকতে হয়েছে! কেন? এত গুমোর কেন জীবনমশায়ের? কী মনে করে মশায়? দেশে ডাক্তারের অভাব? না—দাঁতু ঘোষাল এতই অবহেলার মানুষ।

নবগ্রামে চারটে ডাক্তার বসে ফ্যা-ফ্যা করছে। চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি ছিল—চার বিছানার হাসপাতাল—তারপর যুদ্ধের সময় দেশে 'মন্বন্তর' হলে দশ বিছানার হাসপাতাল হয়েছিল—এখন পঞ্চাশ বিছানার হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে। একজন ছোট ডাক্তার ছিল—এখন দুজন ডাক্তার হয়েছে—নার্স এসেছে। সেখানে গিয়ে 'এলাম' বলে একটা বিছানায় শুয়ে পড়লেই হল। সময়ে খাওয়া—সময়ে ওষুধ—য-বার খুশি ডাকলেই ডাক্তার। কেবল জাত থাকবে না—আর মান থাকবে না—বলে যায় না। এ ছাড়া কবরেজ দুজন, তার মধ্যে ভূদেব কবরেজ দস্তুরমতো পাশকরা, হোমিওপ্যাথ দুজন—আলি মহম্মদ আর বাঙাল ডাক্তার। দোকানে গেলে কেউ পয়সা নেয় না। জীবন মশায়ের মতিভ্রম হয়েছে, নইলে রোগীদের এমন অবহেলা কখনও করত না। কেবল পুরনো লোক—ধাত চেনে, মশায় বংশের বংশধর—তাই আসে। আর আসবে না। কালই হয় ভূদেব কবরেজের কাছে নয় হরেন ডাক্তারের কাছে যাবে। যে দেশে গাছ থাকে না—সে দেশের ভেরেণ্ডা গাছই 'বিরিক্ষি'। সেকালে ডাক্তার-বৈদ্যের অভাব ছিল, তাই জীবনমশায় ছিল ধন্বন্তরি—নিদান হাঁকত। যেটা ফলত, সেটাই জাহির করত; যেটা ফলত না—সেটার বেলা চুপচাপ থাকত। মরার বদলে বাঁচলে, কে আর তা নিয়ে ঝগড়া করে? এবার এই বাঘা প্রদ্যোত ডাক্তারের হাতে পড়েছে; এবার মজাটা বুঝবে। এই তো মতি কর্মকার বর্ধমান হাসপাতালে মাকে ভর্তি করে দিয়েছে। পায়ের ফটো নিয়েছে, ভিতরে হাড়ের কুচি আছে, কেটে বার করবে—বাস, ভালো হয়ে যাবে। প্রদ্যোত ডাক্তার বলেছে, আসুক ফিরে মতির মা। তারপর নাড়ী দেখার—নিদান হাঁকার ফাঁপা বেলুন ফুটিয়ে দেব।

ঘরে এদিকে রোজগারের অভাবে—হাঁড়ি ঢনঢন আর রোগীদের অবহেলা! বকেই চলেছে দাঁতু।

নন্দ বার কয়েকই বলেছে—এই দেখো ঠাকুর, ভালো হবে না। যা-তা

বোলো না বলছি। কিন্তু দাঁতু ঘোষাল গ্রাহ্য করে নি। বলেছে—তুই বেটা বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড়, পীর চেয়ে খাদিম জিন্দে—সকাল থেকে পাঁচবার বলেছি তামাক দিতে। গ্রাহ্যই করলি না! তোর কি, মাস পোহালেই মাইনে নিবি। চুরি করে মশায় বাড়ির যাও ছিল শেষ করলি। এইবার রোগী তাড়িয়ে লক্ষ্মী ছাড়িয়ে তুই ছাড়বি।

পরান খাঁও প্রতিবাদ করছিল—দেখো, ঘোষাল, কথাগুলান তুমি অন্যায় বলছ। কঠিন রোগী দেখতে গেছেন মশায়, তাতে দেরি যদি হয়েই থাকে—তবে ই সব কথা তুমি কী বলছ? ছি। আর কাকে কী বলছ?

—বলুক খাঁ, ওকে বলতে দাও। ওই কথা ছাড়া অন্য কথা এখন ওর মুখে আসবে না। ওর বুদ্ধিই এখন বিপরীত বুদ্ধি। সর্বনাশ কালে মানুষের বিপরীত হয়। আর মৃত্যুকালের চেয়ে সর্বনাশের কাল তো মানুষের আর হয় না। ঘোষাল যাবে। যাবার কাল যত কাছে আসবে—তত এইটা ওর বাড়বে।

হেসেই কথাগুলি বললেন জীবনমশায়। তিনি আরোগ্য-নিকেতনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। চণ্ডীতলা থেকে গ্রামে ঢুকবার পথটাই সদর রাস্তার উলটো দিকে। সেই পথে কবিরাজখানার পিছন থেকে ঢুকে তিনি বেরিয়ে এলেন সামনে।

দাঁতু ঘোষাল এক মুহূর্তে যেন জমে পাথর হয়ে গেল। ভয়ার্ত বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল জীবনমশায়ের দিকে। হতবাক হয়ে গিয়েছে সে। হাত দুটো শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে।

জীবনমশায় চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসলেন, বললেন—দেরি একটু হয়ে গেল আজ। চণ্ডী মায়ের স্থানের গোঁসইজীর অসুখ। হয়তো বা যাচ্ছেন গোঁসাই। সেখানে যেতে হয়েছিল সকালে উঠেই। নবগ্রামের রতনবাবুর ছেলে বিপিনবাবুর কঠিন অসুখ, সেখানেও যেতে হয়েছিল। যারা এতদূর দেখাতে এসেছে তাদের তো এমন জরুরী অবস্থা নয়।

দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন জীবনমশায়। রোগীর দল তবুও কেউ কোনো কথা বলতে পারলে না। দাঁতু ঘোষালের দিকেই তারা তাকিয়েছিল। দাঁতু দাঁড়িয়েছিল মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীর মতো।

অকস্মাৎ সে ভাঙা গলায় বলে উঠল—কী বললে মশায়? আমি বাঁচব না? আমি মরব?

জীবনমশায় নিস্পৃহ নিরাসক্তের মতো বললেন—এ রোগ তোমার ভালো হবে না ঘোষাল। এই রোগেই তোমাকে যেতে হবে। এ তোমার ভালো হবার

রোগ নয়। তবে দুমাস কি ছমাস কি দুবছর পাঁচ বছর—তা কিছু বলছি না আমি।

দাঁতু এবার চীৎকার করে বলে উঠল—তুই গো-বদ্যি—তুই গো-বদ্যি—হাতুড়ে, মানযুড়ে।

জীবনমশায় বলেই গেলেন—এ যদি তোমার ভালো হবার হত ঘোষাল তবে দুদিন যেতে না যেতেই তুমি কী খাব কী খাব করে ছুটে আসতে না, তামাক গাঁজার জন্মে তুমি খেপে উঠতে না! মৃত্যু-রোগের এ হল একটা বড় লক্ষণ। রোগের সঙ্গে রিপুর যোগাযোগ হলে আর রক্ষে থাকে না। তোমার তাই হয়েছে।

দাঁতু এবার পট করে তার পৈতেগাছটা ছিঁড়ে ফেলে চীৎকার করে উঠল—আমি যদি বামুন হই তবে ছ মাস যেতে-না-যেতে তোর সর্বনাশ হবে। বামুনের মেয়ের অভিশাপে তোর ব্যাটা মরেছে—এবার ব্রহ্মশাপে তোর সর্বনাশ হবে।

বলেই সে হনহন করে নেমে পড়ল, আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ার উপর খানিকটা গিয়েই সে থমকে দাঁড়াল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে—চললাম আমি হাসপাতালে বড় ডাক্তারের কাছে। আজই আমি হাসপাতালে ভর্তি হব। বাঁচি কিনা দেখ।

মশায় হাসলেন। তারপর বললেন—কার কী বলো?

এসে দাঁড়াল একটি লোক। কাম্‌লা—জণ্ডিস হয়েছে। মানুষটা যেন হলুদ মেখে এসেছে। প্রতিবিধান অনেক করেছে। কামলার মালা নিয়েছে—মালাটা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হয়েছে; তাতে সারে নি। হাসপাতালে গিয়েছে—তাতেও বিশেষ কিছু হয় নি। অবশেষে মশায়ের কাছে এসেছে।

জীবন দত্ত বললেন—তাই তো বাবা। হাসপাতালে যখন কিছু হয় নি তখন সময় নেবে। আর ওষুধ যদি কবিরাজি মতে খাও—বোধ হয় তাই ইচ্ছে, নইলে আমার কাছে আসতে না,—মুশকিল হচ্ছে আমি তো ওষুধের কারবার তুলে দিয়েছি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—আমি মোটামুটি চিকিৎসা করাই ছেড়ে দিয়েছি। নতুন কাল, নতুন চিকিৎসা, নতুন রুচি এ তো আমার কাছে নাই! তা ছাড়া আমার নিজেরও আর ভালো লাগে না। তবু এককালে চিকিৎসা করতাম; দু-চারজন পুরনো লোক আজও ছাড়ে না, তাই তাদের দেখি! বুঝেছ না?

একটু হাসলেন। বোধ হয় দাঁতু ঘোষালের প্রসঙ্গটা তাঁর মনের মধ্যে তখনও ঘুরছিল।

—তুমি বরং ভূদেব কবরেজের কাছে যাও। সে ওষুধপত্র রাখে। আর নতুন

কালে কবিরাজি শিক্ষার কলেজ হয়েছে, সেখানে পাশ করেও এসেছে। বুঝেছ না? কবিরাজিতে নিজের ওষুধ ছাড়া চিকিৎসা করে ফল হয় না।

—আজ্ঞে না ডাক্তারবাবু, আপনি দেখুন আমাকে। নইলে আমি হয়তো বাঁচব না! আমার বাবা দাদা সবাই ঠিক এই বয়সে মারা গিয়েছে। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের ভিতর। আমাকে বাঁচান।

—না-না। না বাঁচবার মতো তোমার কিছু হয় নি বাপু। আর, বাঁচা মরার ব্যাপারটাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার। ওর উপরে যদি মানুষের হাত থাকত—! হাসলেন ডাক্তার। শুনলে না, দাঁতু বলে গেল—আমার ছেলের কথা! সে নিজেও ডাক্তার ছিল।—এ কি, কাঁদছ কেন তুমি? আচ্ছা—আচ্ছা! আমিই দেখব। তুমি বসো। আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি, ভূদেবের কাছে কিনে নিয়ে যাও। তারপর আমি ঘরে তৈরি করে দেব। বুঝেছ! ভয় নেই। ভালো হয়ে যাবে। এত ভয় পেয়েছ কেন?

দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন ডাক্তার। লোকটি বড় ভয় পেয়েছে। ভয় রোগের জন্য নয়! বাবা দাদা ঠিক এই বয়সে মরেছে বলে ও বেচারীও ভয় পেয়েছে। ভয়টা খুব অহেতুকও নয়। এমন হয়। বিচিত্রভাবে হয়!

পরান হেসে লোকটিকে বললে—আর কিছু ভয় তুমি করিয়ো না বেটা। মশায় বলেছেন ভয় নাই। উ একেবারে বেদবাক্যি!

পরান তাঁর মন রাখছে সে জীবনমশায় জানেন—কিন্তু এ মন-রাখাটুকু তাঁর ভালো লাগে। পরান লোক ভালো। কৃতজ্ঞতা আছে। সেই তার প্রথম জীবনে জীবন দত্ত তাকে টাইফয়েড থেকে বাঁচিয়েছিলেন; তখন পরানের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, দিনমজুরি করত। জীবন দত্তের বাড়িতেই মজুরি খেটেছে; তখন তিনি তার বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছিলেন—সে কথা পরান আজও ভুলে যায় নি। সে এখন বড় ডাক্তার ডাকতে পারে। দৈনিক চার টাকা ফী দিতেও তার গায়ে লাগে না, তবু সে জীবন দত্ত ছাড়া কাউকে দেখায় না। শুধু কৃতজ্ঞতাই নয়—জীবন-মরণ প্রশ্ন নিয়ে রোগ আসে মানুষের শরীরে, সেখানে কৃতজ্ঞতার ক্ষেত্র খুব বড় নয়, বড় বিশ্বাসের কথা—সেই বিশ্বাস আছে পরানের। যে তাঁকে এত বড় বিশ্বাস করে, তাকে স্নেহ না করে কি পারেন তিনি? তবে বিবির জন্য পরানের ভাবনায় ডাক্তার কিঞ্চিৎ কৌতুক না করে পারেন না। একবার তিনি নিজেই বলেছিলেন, 'পরান! বিবিকে একবার না হয় কলকাতা নিয়ে যাও। এখন সব নানা রকম পরীক্ষা হয়েছে—পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে এসো।' ডাক্তার কথাটা গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন। কৌতুক করেন নি।

ডাক্তার বলেছিলেন—তা হলে এক কাজ করো, হাসপাতালের ওই বড় ডাক্তারকে একদিন কল দাও। ওকে দেখাও। উনি বলে দেবেন—চিঠি দিয়ে দেবেন—কোথায় কার কাছে দেখাতে হবে।

প্রদ্যোত ডাক্তার রোগিণীকে দেখে একটু হেসেছিলেন। বলেছিলেন—অসুখ মনের, শরীরের নয়। এবং—। একটু থেমে বলেছিলেন—কোনো মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তারকে দেখালে ফল হতে পারে।

মশায় কথাটা বুঝেছিলেন, পরান বুঝতে পারে নি; কিন্তু তবুও পরান ওই নতুন ডাক্তারের উপর বিরক্ত হয়েছিল। তার বিবি তার চোখের সামনে রোগে ভুগছে—সে তার সেবা করছে, চোখে দেখে স্পর্শ দিয়ে সে অসুখ অনুভব করছে—আর ডাক্তার বলছে অসুখ নয়।

সে শুধু প্রদ্যোত ডাক্তারকেই বাতিল করে নি—কলকাতায় যাওয়ার কথাও বাতিল করে দিয়েছিল। শুধু প্রশ্ন করেছিল—আপনি কী বুঝছেন বলেন যদি, বুঝেন কি পরানের ভয় আছে—মিত্যু হতে পারে—তা হলে না হয়—!

—না, সে ভয় নেই। তবে ভুগতে পারে। বুঝছ না?

—তা ভুগুক। না হয় ভুগবে কিছুদিন। আপনি ছাড়া কারুর দাওয়াই আমি খাওয়াব না।

সে অবধি এই চলছে। ডাক্তার তিন দিন অন্তর যান। কিন্তু পরানের ইচ্ছা রোজ যান তিনি। ডাক্তার তা যান না। পরান রোজ আসে। খবর বলে যায়, বলে—কিছু বদল করবেন না কি?

—না-না। ওই যা চলছে—চলুক।

—এই পোষ্টাই যদি কিছু দিতেন। আর এই ঘুম হবার ওষুধ! রাতে একবার চোখ বোজে না, ছটফট করে। এ পাশ আর ও পাশ। আর ঢুকঢুক করে জল খাবে।

একটা কিছু দিলেই পরান খুশী।

আজও পরানের একটা ওষুধ চাই। সে ভয়ার্ত জোয়ানটিকে জীবনমশায়ের অদ্ভুত চিকিৎসা-পারঙ্গমতার কথা বোঝাতে বসেচে সেই উদ্দেশ্যেই।

ডাক্তার রোগীর পর রোগী দেখে চলছেন। এই সময় এসে দাঁড়াল এক ছ-ফুট-লম্বা মানুষ—মশায়, একবার যে দেখতে হবে। গম্ভীর ভরাট গলা।

—কী? তোমার কী হল?

—কী হল বুঝতে তো পারছি না। কাশী সর্দি—মধ্যে মধ্যে জ্বর; কিছুতেই ছাড়ছে না।

হাতখানা বাড়িয়ে দিলে—ছ-ফুট লম্বা—তেমনি কাঠামো—এক পরিণত বয়সের জোয়ান। ঘাট মহেশপুরের রানা পাঠক। এ অঞ্চলে রানা পাঠক শক্তিশালী জোয়ান ; লাঠি খেলা, কুস্তি করা, নদীর ঘাটে নৌকা খেয়া দেওয়া; দেবস্থানে বলিদান করা তার কাজ। বছর কয়েক আগে পর্যন্ত প্রতি বৎসর অম্বুবাচীতে. কুস্তি প্রতিযোগিতায় রানা পাঠকের নাম একবার কয়েক দিনের জন্য মুখে মুখে ফিরত। আর-একবার রানার নাম শোনা যেত কালীপুজার সময়। রানার মহিষবলীর কৃতিত্ব লোকের মুখে গল্পের কথা। বাড়ীতে কিছু জমি-জেরাত ছিল—তার ধানে ফসলে আর খেয়াঘাটের নৌকার আয়ে রানা পাঠকের বেশ ভালই চলে যেত। মহেশপুরের ঘাটের ডাক তার একচেটে। ও ঘাটে অন্য কেউ ডাক নিয়ে নৌকা পার করতে পারে না। রানা পাঠকের অসুখ কখনও শোনেন নি মশায়। কিন্তু আজ রানাকে দেখে জীবনমশায় বিস্মিত হলেন। এ কী চেহারা হয়েছে রানার? চোখের কোলে কালি পড়েছে, শক্ত বাঁশের গোড়ার দিকের মতো মোটা কবজির হাড় বেরিয়ে পড়েছে—জামার ফাঁক দিয়ে কণ্ঠ দেখা যাচ্ছে!

—রানা, বাবা এ তুমি ভাল করে দেখাও। তুমি বরং বর্ধমানে গিয়ে দেখিয়ে এসো। নয় তো এখানেই আজকালকার ভালো ডাক্তারদের দেখাও। এ তোমার টোটকাতে কি মুষ্টিযোগে যাবে না!

রানা মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে বললে—উঁহু! ওরা গেলেই বলবে যক্ষ্মা হয়েছে। বুঝলেন না—ওদের এইটে বাতিক। তারপর ফর্দ দেবে ইয়া লম্বা। বুকের ফটো তোলাও, গয়ের থুথু পরীক্ষা করাও—এই করো—তা করো। চিকিৎসা তারপর! যক্ষ্মা হয়তো আমার হয়েছে। বুঝেছেন···একটা মেয়েছেলের কাছ থেকে ধরার কথাই বটে। তায় আবার পরীক্ষা কিসের? এত পরীক্ষাই যদি করতে হবে তো —ডাক্তারি কিসের, আপনি হাত দেখুন। বলে দেন কী করতে হবে। ওষুধ দেন। সে সব আমি ঠিক ঠিক করব। তারপরে আমার পেরমায়ু আর আপনার হাতযশ! আর ওই সব ফোঁড়া-ফুড়ি আমার ধাতে সইবে না মশায়। যক্ষ্মার ওষুধ তো আপনাদেরও আছে।

—আছে। কিন্তু এখন যে সব ওষুধ বেরিয়েছে—সে সব অনেক ভালো ওষুধ রানা। অনেক ভালো।

—আপনি বলছেন?

—বলছি রানা। তাতে তো লজ্জা নাই বাবা। তুমি বরং হরেন ডাক্তারের কাছে যাও। আর ওই বুকের ফটো তোলানোর কথা বললে না বাবা, ওটা করানো ভালো। এক্সরে করলে বোঝা যাবে, চোখে দেখা যাবে কতখানি রোগ হয়েছে।

আবার ভালো হলে একবার এক্সরে করলে বুঝতে পারবে—একেবারে নির্দোষ হল কি না। এখন ধরো—হয়তো একটু থেকে গেল। শরীর ভালো হয়েছে—সেটা ধরা গেল না। সেই একটুই আবার বাড়বে—কিছু দিন পর।

রানা ঘাড় নাড়লে।

বার কয়েক ঘাড় নেড়ে বললে—উঁহু। তা হলে আমি ভূদেব কবরেজের কাছে যাই। উ সব কড়া ডাক্তারী ওষুধ আমার ধাতে সইবে না। তা ছাড়া মশায়, ডাক্তারদের কথা বড় চ্যাটাং চ্যাটাং। বুঝছেন—আমাদিগে যেন মানুষই মনে করে না। আপনি দেখতেন সেকালে—সে পসার তো দেখেছি আমি।—এরা টাকা রোজগার করে অনেক, ফী বেশী। ফী ছাড়ে না। কিন্তু সে পসার নাই। আপনারা রোগীর সঙ্গে আপনার লোকের মতো কথা বলতেন! ঘরের লোকের মতো। আমার আবার মেজাজ খারাপ। কে জানে ঝগড়া হয়ে যাবে কবে! তার চেয়ে কবরেজি ভালো। লোহাতে মাথা বাঁধিয়ে তো কেউ আসে নাই সংসারে, মরতে তো হবেই। আজ নয় কাল! তা কড়া কথা শুনে—খারাপ কথা শুনে মরি কেন?

রানা উঠে চলে গেল।

—রানা। অ-রানা!

—আজ্ঞে!

—কবিরাজিই যদি করবে বাবা তবে তুমি পাকুড়িয়া যাও। সেন মহাশয়দের বংশ বড় বংশ—বড় আটন! বিচক্ষণ বৈদ্য আছেন—ভালো ওষুধ রাখেন—সেখানে যাও। বুঝেছ। এ অবহেলার রোগ নয়।

—পাকুড়ে যাব বলছেন?

—হ্যাঁ তাই যাও। ভূদেব এখনও ছেলেমানুষ। বুঝেছ? ইচ্ছা কর তো ভূদেবকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

—দেখি! টাকাতে কুলানো চাই তো! হাসলো রানা।—আপনার কাছে আসা—সেজন্যেও বটে যে! কম টাকায় চিকিৎসা—এ আর কোথায় হবে?

চলে গেল রানা পাঠক। শক্তিশালী বিপুলদেহ অকুতোভয় রানা বন্যার সঙ্গে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে; কিন্তু অসহায় হয়ে পড়েছে আজ। মৃত্যুর কাছে মানুষ নিতান্ত অসহায়।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জীবনমশায়। রানার কথাই ভাবছিলেন। কথাটা মিথ্যা বলে নি রানা। দরিদ্র দেশ, দরিদ্র মানুষ, টাকা পাবে কোথায়? ডাক্তারেরাই বা করবে কী? তারাই বা খাবে কী? নিজের অবস্থা ভেবেই কথা বলছেন জীবনমশায়! আজ সকাল থেকে চারটি টাকা ফী পেয়েছেন। তাঁর

পিতামহ, পিতা, তিনি—এতকাল পর্যন্ত যে সম্পত্তি করেছিলেন তার অনেক চলে গিয়েছে এই পনরো-কুড়ি বছরের মধ্যে। আজ তিনি প্রায় নিঃস্ব। লোকে বলে ভাগ্য। আতর-বউ নিজের কপালে করাঘাত করে। কিন্তু তিনি তো জানেন—দায়ী তিনি নিজে। তা ছাড়া আর কে দায়ী?

সশব্দে একখানা গোরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল।

—কই, গুরুদেব কই?

নামল শশী। শশীর চোখ লাল। মদ খেয়েছে এই দিন দুপুরে। রামহরিকে দেখবার জন্য নিতে এসেছে। রামহরি মৃত্যু-কামনায় জ্ঞানগঙ্গা যাবে। গত রাত্রের কথাগুলি আবার সব মনে হল মশায়ের। রামহরি যাবে মৃত্যুবরণ করতে?

চারটি টাকা নামিয়ে দিলে শশী।

—আমি বলেছি চারটাকা দিয়ে সারলে হবে না রামহরি। জীবনমশায়কে শেষ দেখা দেখাবে, আরো লাগবে বাবা। আমাদিগে বরং সেকালে চোলাই মদ খাইয়েছ—পাঁটা খাইয়েছ; জীবনমশায়কে তো কিছু খাওয়াও নি। খাইয়ে থাকলে বড় জোর লাউ-কুমড়ো। বেটা উইল-টুইল করছে। বললে, মশায়কে সাক্ষী করব। বেনামী দোব তখন। নিশ্চয় দোব।

হাসতে লাগল শশী।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললে—দাঁতু ঘোষাল বেটা মরত, ও বেটার নিদান হাঁকলেন কেন? বেটা কাঁদছে—প্রদ্যোত ডাক্তার তড়পাচ্ছে।

মশায় সেকথা গ্রাহ্য করলেন না। দাঁতু মরবে, এই রোগেই মরবে, প্রবৃত্তিকে এমন প্রবল রিপু হয়ে উঠতে কদাচিৎ দেখা যায়। কোনোমতেই বাঁচাতে পারবে না প্রদ্যোত। বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন তিনি, বললেন—দাঁড়া গিন্নী বকছে কেন দেখি। আতর-বউয়ের তীক্ষ্ণ তিরস্কার তিনি শুনতে পেয়েছেন।

আতর-বউ তিরস্কার করেছেন তাকেই যাকে আজীবন তিরস্কার করে আসছেন—নিজের অদৃষ্টকে। হায়রে অদৃষ্ট, হায়রে পোড়াকপাল!

নন্দ ও-পাশে চুপ করে বসে আছে, মাথা হেঁট করে মাটি খুঁটছে। নন্দ জড়িত আছে, তাতে সন্দেহ রইল না তাঁর।

মশায় দুজনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—কী হল?

—কিছু না।

নন্দ বললে—দাঁতুকে উ-সব বলবার আপনার কী দরকার ছিল? হাসপাতালের ডাক্তার যা তা বলছে—আমি শুনে এলাম। নিজের কানে।

—নিদান হাঁকবে তো আমার নিদান হাঁকো। দেখো হাত দেখো।

—তোমার নিদান হাত না-দেখেই আমি হাঁকতে পারি।

—বলো, বলো—তাই বলো, কবে মরব আমি। এ জালা আমি আর সইতে পারছি না। শুধু নাই, শুধু নাই আর নাই। আর তুমি ন্যায়ের অবতার সেজে বসে আছ। রতনবাবুরা চার টাকা ফী দিতে এসেছিল—তুমি দু টাকা নিয়ে দু টাকা ফেরত দিয়ে এসেছ। তুমি যাকে দেখছ তাকেই বলে আসছ—মরমে তুমি মরবে।

জীবনমশায় হা-হা করে হেসে উঠলেন এবার। সে হাসিতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন আতর-বউ। জীবনমশায় বললেন—মরবার জন্তেই জন্ম আতর-বউ। সবাই মরবে, সবাই মরবে, কেউ অমর নয়।

ঘোরটা কাটিয়ে আতর-বউ অকস্মাৎ চীৎকার করে উঠলেন—পৃথিবীর কথা আমি জানতে চাই না। আমি কবে মরব তাই বলো।

—আমার মৃত্যুর পর!

নিষ্ঠুর বজ্রের মতো কঠোর কথা! আতর-বউ নির্বাক বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

—আমার মৃত্যু কবে হবে সেইটেই বুঝতে পারছি না। পারলে দিনতারিখ বলে দিতাম। বনবিহারীর মৃত্যু জানতে পেরেছিলাম। তোমাকে বলেছিলাম, তুমি বিশ্বাস কর নি। এটা বিশ্বাস কোরো।

জীবনমশায় বেরিয়ে এলেন। শশী রাঙা চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

—চল। শশী!

শশীর যেন এতক্ষণে চেতনা ফিরে এল। বললে—চলুন। হঠাৎ হেসে বললে—ঠিক বলেছেন। মরবে না কে? সবাই মরবে। ওই হাসপাতালের ডাক্তার, ও বেটা কি অমর না কি।

ডাক্তার বললেন—চুপ কর। ও সব কথা থাক।

হায়রে মানুষ! না—না, হায় কেন? এই তো রামহরি, হাসতে হাসতে মরতে চলেছে।

সত্য সত্যই প্রদ্যোত ডাক্তার কঠিন ক্রোধে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। গনেশ ভট্টচাজের মেয়েকে আর-একবার দেখে একটু আশান্বিত হয়েই এসে আপিসে বসেছে ঠিক এমনই মুহূর্তেই দাঁতু এসে হাউ হাউ করে কেঁদে পড়ল।

প্রদ্যোত ডাক্তারের প্রায় পা চেপে ধরে বললে—ডাক্তারবাবু গো! আমাকে বাঁচান আপনি।

—কী হয়েছে? উঠুন। ভালো করে বলুন। চেঁচাবেন না মেলা।

—ওগো আমাকে বাঁচান গো। আমি আর বাঁচব না।

—কী হয়েছে যে তাই বাঁচবেন না?

—মশায় বললে গো! জীবনমশায়!

—কে? জীবন দত্ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বললে এই তোর মৃত্যুরোগ। শিবের বাবা এলেও বাঁচাতে পারবে না।

—জীবন ডাক্তারের সঙ্গে শিবের বাবার আলাপ-পরিচয় আছে তা হলে? না—মাথা খারাপ হয়েছে লোকটার।

—আজ্ঞে? ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল দাঁতু ঘোষাল।

—উঠুন, কী হয়েছে দেখি। চলুন ওই ঘরে, টেবিলের উপর শুয়ে পড়ুন। বলুন কী হয়েছে।

সমস্ত শুনে ডাক্তার ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন—এই সমস্ত লিখে আপনি আমাকে দিতে পারবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। হাজার বার। এখুনি লিখে দিতে পারি। বেটা কায়েত—

ডাক্তার ধমক দিয়ে বললেন—ও সব কী বলছেন? 'বেটা কায়েত', কী? জানেন আমিও কায়স্থ?

জিভ কেটে দাঁতু বললে—আপনাকে তাই বলতে পারি? আমি বলছি ওই জীবনকে। বেটা হাতুড়েকে। কিন্তু আমি বাঁচব তো? ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে দাঁতু।

—কী হয়েছে তাই বাঁচবেন না? ওষুধ খান—নিয়ম করে চলুন—

কম্পাউণ্ডার হরিহর পাশের ঘরে ওষুধ তৈরি করছিল। সে বললে—তা দাঁতু পারবে না। রোগ তো ওর ডেকে আনা। খেয়ে খেয়ে করেছে। দুদিন ভালো থাকলেই ব্যস ছুটবে কারুর বাড়ি—আজ তোমাদের বাড়ি দুটো খাব। হাসতে লাগল সে।

ডাক্তার বললেন—হাসপাতালে থাকতে হবে আপনাকে, থাকবেন?

—তাই থাকব।

দাঁতু বাঁচতে চায়। সে মরতে পারবে না।

—ওকে ভর্তি করে নিন। বলেই ডাক্তার একটা কাগজ টেনে নিলেন—ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখবেন এই কথা। এই ধরনের নিদান হেঁকে মানুষের উপর মর্মান্তিক পীড়ন—এ যুগে এটা অসহনীয় ব্যাপার। এর প্রতিকার করা প্রয়োজন।

কিছুক্ষণ পর আধলেখা দরখাস্তখানা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। থাক!

লোকটিকে যেন একটা বাতিকে পেয়েছে। মৃত্যু ঘোষণা করে আনন্দ পাচ্ছে! আশ্চর্য! মৃত্যু পৃথিবীতে নিশ্চিতই বটে, সে কে না জানে? তাকে জয় করবার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নাই। সে সাধনা অব্যাহত চলে আসছে। আবিষ্কারের পর আবিষ্কার হয়ে চলেছে। আজও তাকে রোধ করা যায় নি। আজও সে ধ্রুব—তবু তো মর্মান্তিক, বিয়োগান্ত ব্যাপার! তার মধ্যে যেন একটা আধ্যাত্মিক কিছু আরোপ করে এই মৃত্যুদিন ঘোষণা—চমকপ্রদ বটে, রোমান্টিকও বটে—কিন্তু নিষ্ঠুর। ঠিক পশুকে বলি দেওয়ার মতো। পূজা-অর্চনার আড়ম্বরে আধ্যাত্মিকতার ধূম্রজালে আচ্ছন্ন এক কল্পলোক সৃষ্টি করে মৃত্যুকে মুক্তি বলে ঘোষণা করে খড়্গাঘাত করার মতোই নিষ্ঠুর প্রথা। জীবন দত্ত তারই পুরোহিত সেজে বসে আছে।

হি মাস্ট স্টপ; থামতে হবে তাকে। না থামে—থামাতে হবে তাকে, হি মাস্ট বি স্টপ্‌ড্‌।

এই অর্চনা মেয়েটির হাত দেখলেও ও নিদান হেঁকে যেত। ওকে তা না দেখতে দিয়ে ভালো করেছেন তিনি। অদৃষ্টবাদী এই দেশের এই নিদান-হাঁকিয়েরাই যোগ্য চিকিৎসক ছিল। কবচ মাদুলি জড়ি বুটি চরণামৃত কিছু দিতে বাধে না এদের।

লোকটা নিজের ছেলেরও নাকি মৃত্যু ঘোষণা করেছিল এবং করেছিল মায়ের অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর সম্মুখে। উঃ কী নিষ্ঠুর! কল্পনা করা যায় না।

প্রদ্যোত ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরিয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে নার্সদের অফিসের দিকে গেলেন। নার্সকে ডাকলেন—বললেন—ওই পেশেন্ট—ওই বুড়ো বামুনকে ভর্তি করা হয়েছে। ভালো করে নজর রাখবে। ওর স্টুল একজামিনেশন দরকার। আজই করে রাখবে।

তারপর সমস্ত ওয়ার্ডটা ঘুরে বেড়িয়ে এসে দাঁড়ালেন ফাঁকা মাঠে—নতুন বাড়িটার সামনে। সুন্দর হচ্ছে বাড়িখানা। ডিসেন্ট বিল্ডিং। চারিদিকে চারটে উইং থাকলে আরও সুন্দর হত। হবে, স্কীম আছে। পরে হবে।

নতুন কাল। বিজ্ঞানের যুগ। অদৃষ্ট নিয়তি নির্বাসনের যুগ। ব্যাধিকে জয় করবে মানুষ। মৃত্যুর সঙ্গে সে যুদ্ধ করবে। মৃত্যুর মধ্যে অমৃত খুঁজেছে মানুষ—অসহায় হয়ে। এবার জীবনের মধ্যে অমৃত সন্ধানের কাল এসেছে। একালে অনেক আয়োজন চাই। অনেক কিছুর আয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন—এই লোকগুলির নির্বাসন। এই জীবনমশায়দের। নিদান। নিদান। মৃত্যুর সঙ্গে যেন একটা প্রেম করে বসে আছে এদেশ! গঙ্গার ঘাটে গিয়ে জলে দেহ ডুবিয়ে

মরাই এখানে জীবনের কাম্য। মতির মায়ের এক্সরের রিপোর্ট পেয়ে প্রদ্যোত যেন প্রেরণা পেয়েছে একটা। এক্সরে রিপোর্ট নিয়ে মতি আজ সকালে বর্ধমান থেকে ফিরে এসেছে। বর্ধমানের হাসপাতালের ডাক্তার প্রদ্যোতের চেয়ে সিনিয়র হলেও তার সঙ্গে প্রদ্যোত ডাক্তারের বেশ একটু সম্প্রীতি আছে। সে তাকে লিখেছিল —"আমাকে যেন সমস্ত রিপোর্ট অনুগ্রহ করে জানাবেন। কারণ এই কেসটিতে আমি খুবই ইন্টারেস্টেড; এই বুড়ীকে 'মরণ ধ্রুব' বলে খোল করতাল সহযোগে নাম সংকীর্তন করে জ্ঞানগঙ্গা পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল—এখানকার সে আমলের এক জ্ঞানবৃদ্ধ বৈদ্য মহাপ্রভু নিদান হেঁকেছিল—কয় মাস, কয় দিন, কয় দণ্ড, কয় পলে যেন বৃদ্ধার প্রাণ-বিহঙ্গ পিঞ্জর ত্যাগ করবে; এই পায়ের-ব্যথা রোগেই মরবে; সেই কেস আমি জোর করেই হাসপাতালে পাঠাচ্ছি। এখানকার লোকেরা নাকি মনে মনে হাস্য করছে এবং বলাবলি করছে—জীবন দত্ত যখন নাড়ী দেখে বলেছে বুড়ী মরবে, তখন ওকে বাঁচায় কে?

এই কারণেই সেখানকার ডাক্তার রিপোর্টের পুরো নকল মতির হাতে পাঠিয়েছেন। সেই রিপোর্ট পড়ে প্রদ্যোতের মুখে ব্যঙ্গহাস্য ফুটে উঠেছিল—তার সঙ্গে বিরক্তিও জমা হয়েছিল। পড়ে গিয়ে বুড়ীর একটা পায়ের গাঁটে আঘাত লেগেছে, খানিকটা হাড়ের কুচি ভেঙে সেখানে থেকে গিয়েছে, সেই হেতুই বৃদ্ধার এই অবস্থা। ওই জায়গাটা কেটে হাড়ের কুচিটাকে বের করে দিতে হবে এবং হাড়ের যদি আর কোনো অংশ বাদ দিতে হয় দিতে হবে, দিলেই বুড়ী সেরে উঠবে। এতে আশঙ্কার কোনো কারণ নাই।

নিদান! নিদান! নিদান!

কাল সন্ধ্যাতেও এই নিদানের কথা একদফা শুনে এসেছেন। এই বি কে মেডিক্যাল স্টোর্সের মালিক বিনয়দের ওখানে। ওই—ওই একটি রক্তশোষণ-কারী, রোগের সুযোগে মানুষকে সর্বস্বান্ত করে। জালওষুধ বিক্রি করে। মুখে বড় কথা বলে। বাধ্য হয়ে প্রদ্যোতকে ওখানে যেতে হয়, নইলে ওকে ঘৃণা করে প্রদ্যোত।

প্রদ্যোত ডাক্তার ওখানে গিয়েছিল একটা বিশেষ জরুরী ইনজেকশনের অর্ডার দিতে। কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত পাওয়া চাই-ই। তার সঙ্গে আরও দু-চারটে ওষুধ। বিনয়ের দোকানের একটি বিশেষ ব্যবস্থা আছে যে, প্রতিদিন রাত্রি দশটার ট্রেনে তার লোক কলকাতা যায়, সকালে পৌঁছে বরাতী জিনিস কিনে আবার দুপুরেই রওনা হয়ে সন্ধ্যার সময় নবগ্রাম ফিরে আসে। পুরো চব্বিশ ঘণ্টাও লাগে না। এর জন্য সে হাওড়া পর্যন্ত মান্থলি টিকিট করেছে।

ওদের ওখানে মজলিশের মাঝখানেই এই কথা হচ্ছিল। এই মতির মায়ের কথা। কাল যে ছেলেটি তার হাতে মারা গেছে তার কথা। বিপিনবাবুর হিক্কার কথা। বিনয় নিজে ওষুধের দোকান করে, লাভও করে প্রচুর কিন্তু নিজে অ্যালোপাথিতে খুব বিশ্বাসী নয়, কবিরাজিতেই তার নিজের রুচি এবং মধ্যে মধ্যে ডাক্তারদের বলে—আপনাদের এ আমলের চিকিৎসা, ও তো কানাতেও পারে মশায়। রক্ত পরীক্ষা, মল মূত্র থুথু গয়ের পরীক্ষা, এক্সরে, এ সব হবে, তারপর আপনারা চিকিৎসা করবেন। সে আমলে নাড়ী টিপে ধরেই বলে দিত এই হয়েছে। বলে দিত—আঠারো মাস কি ছ মাস কি সাতদিন মেয়াদ। এই আমাদের জীবনমশায়—।

জীবনমশায়ের নিদান হাঁকার গল্প বলেছে। শেষে বলেছে—মতির মাকে মশায় যখন বলেছেন ডাক্তারবাবু—তখন—।

এক্সরে রিপোর্ট এবং চিঠিখানা পেয়ে প্রদ্যোত মনে বল পেয়েছে, প্রেরণা পেয়েছে। এখানকার লোকে এমনভাবে বলে যে মধ্যে মধ্যে নিজেকে যেন দুর্বল মনে হয়। চারুবাবু সুদ্ধ ওদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলেন। হরেন ডাক্তার তরুণ। কিন্তু সে এখানকার ছেলে। সে বিশ্বাস হয়তো করে না, কিন্তু অবিশ্বাস করার মতো দৃঢ়তাও তার নেই। তার বাল্যস্মৃতি তাকে নাড়া দিয়ে দুর্বল করে দেয়। মশায় না কি তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। এবং তার গল্প না কি আশ্চর্য। তার বাল্যজীবনের আরও অনেক আশ্চর্য স্মৃতি আছে।

এবার সে প্রমাণ করবে।

মতির মা বাঁচবে, দাঁতু বাঁচবে।

ডাক্তার বাসার দিকে চলল।

গানের সুর এসে কানে ঢুকল। মঞ্জু গান গাইছে। বেলা প্রায় একটা। রান্নাবান্না হয়ে গেছে—কাজ নাই—গান গাইছে মঞ্জু। আশ্চর্য জীবনময়ী মেয়ে মঞ্জু। মূর্তিমতী জীবনের ঝরনা! উচ্ছ্বসিত আবেগে সম্মুখের পানে বেয়ে চলেছে। বহু যুদ্ধ করে ডাক্তার তাকে জয় করেছেন। তাঁর বাড়িতে এই কারণেই মঞ্জুকে পছন্দ করে না। বলে—দুলালীপনা কি ভালো!

ডাক্তারের ভালো লাগে। মঞ্জুকে ডাক্তার সাইকেল চড়া শিখিয়েছেন। বন্দুক ছুঁড়তে শিখিয়েছেন। মোটর ড্রাইভিং শেখাবেন। বাধা তিনি দেবেন না।

এই তো—এই তো জীবন! গতিশীল উল্লাসময়, ওইখানেই তো আছে সবল জীবনের আনন্দ! দিস্ ইজ লাইফ।

সিঁড়ির উপর ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো আছে। তাই মাড়িয়ে ডাক্তার জুতোর

তলা পরিশুদ্ধ করে নিয়ে উপরে উঠলেন। ওদিকে সাবান, জল, লোশন, তোয়ালে সাজানো রয়েছে।

মন্থর গতিতে ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ তুলে একখানা ছইওয়ালা গাড়ি আসছে। হাসপাতালের পাশ দিয়েই রাস্তা। শ্রাবণের আকাশে মেঘ ঘুরছে—ছায়াচ্ছন্ন ম্লান দ্বিপ্রহর—টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে মধ্যে মধ্যে। গাড়িখানার ছইয়ের ভিতর ঠিক সামনেই বসে কে? পাকা দাড়ি, পাকা চুল, স্থূল স্থবির—মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে, গাড়ির চাকা খালে পড়ছে, ইটে হোঁচট খাচ্ছে, তার সঙ্গে দেহখানা ঝাঁকি খাচ্ছে—ভ্রূক্ষেপ নাই।

জীবনমশায় তো! ডাকে চলেছেন কোথাও।

একুশ

জীবন মশায়ই বটে। গলাইচণ্ডী গ্রামে ডাকেই চলেছেন। শশীর রোগী রামহরি লেটকে দেখতে চলেছেন। আকাশের দিকেই চেয়ে আছেন। গাড়ির ঝাঁকি খাচ্ছেন—ভ্রূক্ষেপ নাই। এই ধারাই জীবন দত্তের চিরকালের ধারা। গোরুর গাড়িতে চড়লেই এমনই ভাবে গভীর চিন্তামগ্ন বা শূন্য মনে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

পিছনে বসে শশী বকেই চলেছে! সে বলছিল, মেয়েছেলেদের ওই বটে গো। টাকা লোকসান সয় না।

জীবনমশায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। বের হবার আগে আতর-বউকে যে কথা তিনি বলেছেন—শশী তা শুনেছে। তারই জের টেনে চলেছে সে। আরম্ভ করেছে—প্রদ্যোত ডাক্তারও একদিন মরবে—এই কথা বলে। মশায়ের কাছে ধমক খেয়ে এখন এসেছে ফীয়ের কথায়।

শশী একটু চুপ করে থেকে আবার বললে, তা ওরা যখন নিজে থেকেই দিতে এল, তখন নিলেন না কেন? তাতে কী দোষ হত?

জীবনমশায় এতেও সাড়া দিলেন না।

শশী আবার বললে—রাগলে আর বউঠাকরুনের মুখের আগল থাকে না। ওই দোষটা ওঁর আর গেল না!

জীবনমশায় আকাশের দিকেই তাকিয়ে আছেন। আতর-বউয়ের কথাগুলি মনে ঘুরছে। কথা নয় বাক্যবাণ; কিন্তু জীবনমশায় ও বাণে বিদ্ধ হয়েও আহত

হন না। স্থবির হাতির মতো চলেন—বাণগুলি গায়ে বিঁধে থাকে, কিন্তু কোনো স্পর্শানুভূতি অনুভব করেন না, তারপর কখন খসে পড়ে যায়। সমস্ত দেহই তো কিছু কিছু ক্ষতচিহ্নে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

শশী কিন্তু বিরক্ত হয়। এই বুড়োর মেজাজটা চিরকাল একরকম গেল। একশোটা কথা কইলে একটা উত্তর দেয়। বুঝতে পারা যায় না কোন কথায় লোকটার মন নাড়া খাবে—সাড়া দেবে। বউঠাকরুন মুখরা বটেন; কিন্তু সে ওই স্বামীর কারণেই মুখরা। ঝগড়া কলহ সবই জীবনমশায়ের সঙ্গে। বাইরের লোকের সঙ্গে ব্যবহারে বউঠাকরুন অন্য মানুষ। শশীর প্রথম জীবনটা কেটেছে এই বাড়িতে; সে তো জানে! পুরো তিন বছর ওই বাড়িতে কেটেছে। বউঠাকরুন সে সময় যে যত্ন যে আত্মীয়তা করেছেন সে তো তার মনে আছে। ডেকে জল খাইয়েছেন, না খেলে তিরস্কার করেছেন। কথাটি বড় ভালো বলতেন—রোজার ঘাড়েও ভূতের বোঝা চাপে শশী, ডাক্তার কবরেজেরও অসুখ করে। সময়ে খা। পিত্তি পড়াস নে।

শুধু এই নয়, বাড়িতে যখন যে জিনিসটা তৈরি করেছেন, ডেকে খাইয়েছেন। বলতেন—খা তো শশী। দেখ তো ভাই কেমন হল!

ভালো জিনিস ন্যাকড়ায় বেঁধে দিয়েছেন—শশী নিয়ে যা বাড়ি। বউকে খাওয়াবি।

শশীর তখন নতুন বিয়ে হয়েছে। শশীর বউয়ের মুখ দেখে একটি আংটি দিয়েছিলেন বউঠাকরুন।

বউঠাকরুনকে তেতো করে দিয়েছে এই বৃদ্ধ! এই মত্ত হস্তী!

মত্ত হস্তীই বটে। কোনো কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। বসে আছে দেখ তো? যেন একটা পাথর।

কী বলবে শশী! শশীর আজ নিজের গরজ! গা চুলকাতে চুলকাতে শশী আবার স্তাবকতা শুরু করলে, বউঠাকরুনের দোষ নাই মশায়। সে আমল মনে পড়লে দুঃখ হয়, আপশোস হয়—হবার কথাই বটে। ওঃ, সে কী পসার, কী ডাক, দিনে রাত্রে খাবার শোবার অবসর নাই। সেই সাদা ঘোড়াটা, এতবড় ঘোড়া দু-বছরের মধ্যেই 'কুম্‌রে' ধরে গেল! আর দেশেও কী জ্বর! হোঁ-হোঁ করে কাঁপুনি—কোঁ-কোঁ করে জ্বর! তার ওপর প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত। ওরে বাবা রে বাবা! সে একটা আমল বটে! গঙ্গায় নৌকা চলা যাকে বলে। সেই হরিশ ডাক্তারের ছেলের মৃত্যু মনে আছে আপনার? এদিকে ঘরে ছেলের এখন-তখন ওদিকে মনের ভুলে মালিশের শিশিতে খাবার ওষুধ লিখে দিয়েছিল হরিশ—তাই

খেয়ে নোটন গড়াঞীর পুত্রবধূ যায় যায়, রাত্রি বারোটায় খোকা চাটুজ্জে ছুটে এসে পড়ল—তার বোন গলায় দড়ি দিয়েছে। দারোগা পুলিশ ছুঁক ছুঁক করছে ঘুষ খাবার জন্যে—আপনি ওদিকে মেলায় পাঞ্জাবী খেলোয়াড়ের ছকের সামনে বসেছেন কোঁচার খুঁটে, টাকা নিয়ে, বাপরে বাপরে! সে কী রাত্রি! মনে আছে।

জীবন ডাক্তার একটা লম্বা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। একটু নড়ে বসলেন।

না। সেদিনের কথা ঠিক মনে নাই, স্পষ্ট মনে পড়ে না। মনে পড়িয়ে দিলে মনে পড়ে। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমনি একটা অস্বস্তি জেগে ওঠে। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেন। কেন এমন হয়েছিল? কেন?

চঞ্চল হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। মনে পড়ে গেল সেই গোপন সংকল্পের কথা। ঘোড়া কিনে ঘোড়ায় চড়ে আতর-বউকে পালকিতে চড়িয়ে একদিন কাঁদী যাবেন। ঘোড়া তিনি কিনেছিলেন। বড় সাদা ঘোড়া। আতর-বউকে অলঙ্কার দিয়েছিলেন অনেক। কিন্তু কাঁদী যাওয়া হয় নি। কেন যে যান নি তা আজও বুঝতে পারলেন না। সংকোচ না ভয় কে জানে! হয়তো বা দুই-ই। যে কারণেই হোক পারেন নি। শুধু প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের মাদকতায় অঞ্চলটাতেই প্রমত্তের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রতিষ্ঠার সেই বোধ করি শ্রেষ্ঠ সময়! চিকিৎসার খ্যাতি তাঁকে সর্বজনমান্য করে তুলেছিল। সরকার পর্যন্ত তাঁকে খাতির করে এখানকার প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত করেছিল। কিন্তু কিছুতেই মন ভরে নি। যা পেয়েছেন তা দুহাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। মনই তৃপ্তি পায় নি তো সঞ্চয় করবেন কোন আনন্দে? যদি বল—প্রতিষ্ঠার আনন্দে, বলতে পার, কিন্তু সেও ফাঁকিতে পরিণত হয়েছে। তাই তো হয়! বাবা বলতেন—রঙলাল ডাক্তারও বলতেন—প্রতিষ্ঠা যদি সত্যকারের আনন্দ না হয়, মনকে যদি ভরপুর করে না দেয়, তবে সে জেনো মিথ্যে—তার আয়ু সামান্য কয়েকটা দিনের, সে দিন কটা গেলেই সে প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় ভুয়ো মিথ্যে। রঙলাল ডাক্তার হেসে ব্র্যাণ্ডির গ্লাস হাতে নিয়ে বলতেন—এই এর নেশার মতো! একদিন বলেছিলেন—নবদম্পতির আকর্ষণের মতো সেটা যদি নিতান্তই রূপ যৌবন ভোগের আনন্দর মতো আনন্দ হয়—তবে রূপ যৌবন যাবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ বিস্বাদ হয়ে তেতো হয়, মিথ্যে হয়। কিন্তু সে যদি ভালোবাসা হয়, তবে সে কখনও যায় না জীবন! যদিও আমি ও দুটোর স্বাদ জানি না। বলে হা হা করে হেসেছিলেন।

বাবা বলতেন—পরমানন্দ মাধবের কথা। তাঁকে না পেলে কিছুই পাওয়া হয় না। তাঁকে পাওয়া যায় কি না জীবনমশায় ঠিক জানেন না। তবে তিনি পান

নি। সম্পদের মধ্যে পান নি, প্রতিষ্ঠার মধ্যেও পান নি, সংসারে আতর-বউ ছেলে-মেয়ে সুষমা সুরমা নিরুপম বনবিহারী কারুর মধ্যে না।

নেশা তিনি করতেন না। নেশা ছিল রোগ সারানোর, রোগীকে বাঁচানোর। আর ছিল দাবা এবং মেলায় জুয়ো খেলা। মনে আছে, হাতের কঠিন রোগী বাঁচবে কি মরবে অন্তরে অন্তরে তাই বাজি রেখে জুয়োর ছকে দান ধরতেন। জিতলে বাঁচবে, হারলে মরবে। মেলে না। তবুও ধরতেন।

সে আমলে জুয়ো খেলাটা দোষের ছিল না, অন্তত বড়লোকের ছেলের দোষের ছিল না। ছেলেবয়স থেকেই অভ্যাস ছিল কিছু কিছু, তারপর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। সেটাকে বাড়িয়ে দিলে আবার আতর-বউ।

শশী বলেছে সেই এক রাত্রির কথা। মনে পড়েছে বই কি! সব মনে পড়েছে। রাত্রি শুধু নয়—রাত্রি দিন, সেকাল, সেকালের মানুষ-জন সকলকে মনে পড়েছে। সেকালের জলটলমল দীঘি, ধানভরা খেত-খামার, শান্ত পরিচ্ছন্ন ছায়াঘন গ্রামগুলি, লম্বা-চওড়া দশাসই মানুষ, মুখে মিষ্ট কথা, গোয়ালে গাই, পুকুরে মাছ, উঠানে মরাইয়ে ধান, ভাঁড়ারে জালায় জালায় চাল, কলাই মুগ মসুর ছোলা অড়হর মাসকলাই, মন মন গুড়—সে কাল—সে দেশ দেখতে দেখতে যেন পালটে গেল।

ম্যালেরিয়া ছিল না তা নয়। ছিল। পুরনো জর দু-চারজনের হত। শিউলি-পাতার রস আর তাঁদের বাড়িতে বাড়ির পাঁচনে তারা সেরে উঠত। হঠাৎ ম্যালেরিয়া এল সংক্রামক ব্যাধির মতো।

শশী হি-হি করে হাসছে। বলছে—হোঁ-হোঁ করে কোঁ-কোঁ করে জর। শশীর প্রকৃতি অনুযায়ী ঠিকই বলেছে শশী। জীবন ডাক্তারের সে স্মৃতি মনে পড়লে সমস্ত অন্তরটা কাতর আর্তনাদ করে ওঠে। উঃ কত যে শিশুর মৃত্যু হয়েছিল সেবার তার সংখ্যা নাই। শিশুমড়ক বলা চলে। মায়ের কান্নায় আকাশ ভরে উঠেছিল।

এ অঞ্চলে তখন তাঁর বিপুল পসার। তিনি ছাড়া ছিলেন হরিশ ডাক্তার। কিশোরের বাবা কৃষ্ণদাসবাবু যাকে প্রথম স্থান দিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। সে তখন ব্রজলালবাবুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে কম্পাউণ্ডার হয়েছে। দেখতে দেখতে আর দুজন ডাক্তার এসে বসল। পাশকরা ডাক্তার নয়, কম্পাউণ্ডারি করত—রোগের মরসুমে ডাক্তার হয়ে এসে বসল। এই নবগ্রামের নরপতি রায় চৌধুরী একখানা হোমিওপ্যাথিক বই কিনে আর ওষুধ কিনে এক পাড়াগাঁয়ে গেল চিকিৎসা করতে। বরদা রায়চৌধুরীর ছোট ছেলে ইস্কুলের পড়া ছেড়ে চলে গেল কলকাতার আর. জি. কর মেডিকেল ইস্কুলে পড়তে। পাগলা নেপালের ছোটভাই—সেও

খানিকটা পাগল ছিল—পাগলা সীতারাম, সে খুলে বসল ওষুধের দোকান। নবগ্রাম মেডিকেল হল। খুচরা ও পাইকারী ওষুধের দোকান।

এই মোড়ক মহামারীর মধ্যে মানুষ চিকিৎসা-ব্যবসায়ে উপার্জনের প্রশস্ত পথ দেখতে পেলে।

ঘরে ঘরে মানুষ নিলে শয্যা। তাঁকে ঘুরতে হত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। বাবুপাড়া, বণিকপাড়া, শেখপড়া, মিয়াপাড়া, জেলেপাড়া, ডোমপাড়া, কাহারপাড়া, বাউড়িপাড়া। হরিশ ডাক্তারের দুপকেট বোঝাই হত টাকায়। তাঁর হত তিন পকেট—চার পকেটও হতে পারত। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তাঁর বংশের ধারা তিনি ক্ষুণ্ণ করেন নি। অর্থ কাম্য ছিল না তা নয়—কিন্তু তার সঙ্গে পরমার্থও ছিল কামনা। ওরই ওপর তো মশায়দের মহাশয়ত্ব। হায় আতর-বউ, আজ সেই তিনি কি রতনবাবুরা চার টাকা দিতে এসেছিল বলেই চার টাকা নিতে পারেন? ছি-ছি!

তিনি ডাকে বের হতেন—পথে যে তাঁকে ডেকেছে তার বাড়িই গিয়েছেন, যে যা দিয়েছে তাই না দেখেই পকেটে ফেলেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে সাহায্য করে এসেছেন। হরিশ এখানে আগন্তুক, সে রোজগার করতেই এসেছিল। জীবন দত্ত, এখানকার তিনপুরুষের চিকিৎসক, মশায়ের বংশ, শুধু তাই নয়—নিজের গ্রামের তিনি শরিক জমিদার, তাঁর কাছে কি উপার্জন বড় হতে পারে? কখনও কোনোদিন মনেও হয় নি। বরং পকেট থেকে মেকি এবং খারাপ-আওয়াজ টাকা আধুলি সিকি বের করে আতর-বউ বকাবকি করলে তিনি কৌতুক অনুভব করতেন।

আতর-বউ বলতেন—হেসোনা! আমার গা জ্বালা করে।

জীবন মশায় তাতেও হাসতেন। কারণ আতর-বউয়ের গাত্রজ্বালা স্থায়ী ব্যাধি। ওই জ্বালা চিতাকাষ্ঠে সঞ্চারিত হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে তবে নির্বাপিত হবে।

সে সময় পর পর দুটো ঘোড়া কিনেছিলেন তিনি। একটা বড় একটা মাঝারি। পায়ে হেঁটে ঘুরে কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না। বছর তিনেকের মধ্যেই দুটো ঘোড়াই অকর্মণ্য হয়ে গেল। কুমরি রোগ—অর্থাৎ কোমরে বাত হল। জীবন ডাক্তারের বিপুল ভার বয়ে দুটো জীবন প্রায় অক্ষম হয়ে গেল। জানোয়ার দুটোর শেষ জীবন হাটের তামাক-ব্যবসায়ীর তামাক বয়ে অতিবাহিত হয়েছে। এর পর আর ঘোড়া কেনেন নি জীবন ডাক্তার। তাঁর শক্তির তো অভাব হয় নি, অভাব হত সময়ের, তা হোক, চারটেয় পাঁচটায় খাওয়া—তাই

খেয়েছেন। মাঠের পথ ভেঙে ডাক্তার হাঁটতেন। লোকে বলত—হাতি চলছে। হাতিই বটে। একদিন সকালে জুতোর কাদা ঘোচাতে গিয়ে ইন্দির লাফিয়ে উঠেছিল—বাপরে! সাপ! একটা মাঝারি কেউটে সাপের মাথা তাঁর জুতোর তলায় চেপটে লেগেছিল। ঠিক জুতোর তলায় কে নিপুণ হাতে কেউটের মাথা এঁকে দিয়েছে। ভাগ্যক্রমে অন্ধকারে ভ্রূক্ষেপহীন মাতঙ্গপদপাতটি ঠিক সাপটার মাথার উপরেই হয়েছিল! ইন্দির জুতোটা এনে তাঁকে দেখাতে তিনি হেসেছিলেন। আতর-বউ শিউরে উঠে মনসার কাছে মানত করেছিলেন—তাঁকে তিরস্কারও করেছিলেন। এমনিই কি মানুষের উপার্জনের নেশা। দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে টাকার জন্যে। তাতেও তিনি হেসেছিলেন—এই কদিন আগেই আতর-বউ যে যা দেয়, ফী নেওয়ার জন্য বলেছিলেন, দাতাকর্ণদের ছেলের গলায় ছুরি দিতে হয় তা জান? তুমি তাই দেবে। সে আমি জানি।

বন্ধুরা তাদের রহস্য করে বলত—দেশের লোকের সর্বনাশ আর ডাক্তারদের পৌষ মাস।

তাতেও তিনি হাসতেন। বুঝতেন বন্ধুদের ফিস্ট খাবার অভিপ্রায় হয়েছে। বলতেন—তাহলে পৌষ মাসে তো কিছু খেতে হয়! ফিষ্টি-টিষ্টি কিছু করো তাহলে।

—দে, টাকা দে!

সেতাব সুরেন্দ্র নেপাল ফিস্টের আয়োজনে লেগে যেত। গন্ধে গন্ধে শশীও জুটত। হরিশ ডাক্তারকেও নিমন্ত্রণ পাঠাতেন।

এ সব হত রাত্রে। দিনে অবকাশ কোথায়? ভোরে উঠে আরোগ্যনিকেতনে রোগী দেখে ডাক থেকে ফিরতেই হয়ে যেত অপরাহ্ন, বেলা চারটে। চারটের পর খাওয়া-দাওয়া সেরে দূরান্তের ডাক। সেখান থেকে ফিরতে নটা, দশটা, বারোটা। তিনটেও হত। বারোটা পর্যন্ত সেতাব সুরেন নেপাল তাঁর অপেক্ষায় থাকত। আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ায় আলো জ্বলত, ইন্দির যোগাত চা আর তামাক, তারা খেলত দাবা। আর বসে থাকত চৌকিদারেরা। জীবনমশায় তখন প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত। জীবনমশায় ফিরে এসে অন্তত একহাত দাবা খেলে চৌকিদারের হাজিরার খাতায় সই করে তবে বিশ্রাম করতেন। কতদিন রাত্রি প্রভাতও হয়ে যেত। খাওয়া-দাওয়ার দিনে ইন্দির আর শশী যেত নবগ্রামের বাজারে। ডাক্তার চিট দিতেন। তেল ঘি নুন মশলা এমন কি সাহাদের দোকান থেকে আসত মদ। সুরেন নেপাল হরিশ ডাক্তার শশী এদের মদ নইলে তৃপ্তি হত না। নেপাল সুরেন যেত পাঁঠার খোঁজে। চৌকিদার যেত, জেলে ডেকে আনত,

সে পুকুর থেকে মাছ ধরে দিত। ডাক্তার আত্মবিস্মৃতই হয়েছিলেন। সে যেন একটা নেশার ঘোর।

মনে পড়ছে সে রাত্রির কথা। হ্যাঁ, জীবনের একটা স্মরণীয় রাত্রি বটে। বাড়ি, সেদিন বিকেলে বাড়ি থেকে বের হবেন—প্রথমে যাবেন হরিশ ডাক্তারের বাড়ি হরিশের ছেলের অসুখ শুনেছেন। তারপর যাবেন মেলায়। মেলা চলছে সে সময়। ভাদ্র মাসে, নাগপঞ্চমীতে মনসাপূজোর মেলা। মেলার কর্তারা এসে নিমন্ত্রণও করে গেছে। জীবনমশায় গিয়ে পুলিসের সঙ্গে একটা রফা করে জুয়ো খেলার বন্দোবস্ত করে দেবেন। এবং সেখানে জুয়ো খেলে জীবনমশায় দশ-বিশ টাকা জুয়াড়িকে দিয়েও আসবেন। ঘরের মধ্যে জামা পরবার জন্যে ঢুকেই দেখলেন আতর-বউ জামার পকেট থেকে টাকা বের করে নিচ্ছেন। স্বামীর সঙ্গে চোখা-চোখি হতেই আতর-বউয়ের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। কোনো কথা বলবার আগেই আতর-বউ বলেছিলেন—জুয়ো খেলে তুমি টাকা দিয়ে আসবে, সে হবে না। তোমার লজ্জা হয় না জুয়ো খেলতে? জীবনমশায় বলেছিলেন—জুয়ো খেলবো না ; টাকা বের করে নিয়ো না। ছেলেদের দেব, চাকরদের দেব—ওরা সব মেলা দেখতে যাবে ; মেলার মধ্যে দু-চারজন হাত পাতে ; দিতে হয়। টাকা রাখো।

—রইল পাঁচ টাকা।

—পাঁচ টাকায় কী হবে?

—না। আর দেব না। কিছুতেই দেব না।

—ভালো।

জামাটা টেনে নিয়ে পাঁচটা টাকার নোটটাও ফেলে দিলেন। তারপর জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল ছেলে বনবিহারী, নতুন বাইসিক্ল হাতে নিয়ে বাপের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে, মেলা দেখতে যাবে, টাকা চাই। গায়ে ডবলবেস্ট কোট, পায়ে পামশু। বনবিহারী বাবুদের ছেলেদের সমান বিলাসী। চাকর ইন্দির দাঁড়িয়ে, নন্দ তখন ছেলেমানুষ, সেও দাঁড়িয়ে ; তারা জানে—মশায় মেলার সময় বকশিশ দেবেন। সকলের দিকে তাকিয়ে যেন আগুন জ্বলে গেল। আতর-বউ পাঁচ টাকার নোটখানা কুড়িয়ে নিয়ে ছেলের হাতে দিলেন। জীবনমশায় বললেন—ইন্দির আমার সঙ্গে আয়।

তিনি ভুলে গেলেন—হরিশের ছেলের অসুখের কথা শুনেছিলেন, ছেলেটির অসুখ করেছে। গত রাত্রে হরিশকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন খাওয়ার জন্য ; হরিশ আসতে পারে নি, লিখেছিল—"ছেলেটার হঠাৎ কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে।

মেয়েরা ভয় পাইতেছে, যাইতে পারিলাম না।" জীবনমশায় ভেবেছিলেন একবার খোঁজ নেবেন। কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ভুলে গেলেন। নবগ্রামে সাহাদের মদের দোকানে এসে সাহাকে ডেকে বললেন—পঞ্চাশটা টাকা চাই সাহা।

সাহা শুধু মদের দোকানই করত না, টাকা দাদনেরও কারবার করত, সাধারণকে টাকা দিত গহনার উপর, সম্মানী ব্যক্তিকে হাণ্ডনোটে।

অবাক হয়ে গেল সাহা—মশায়ের টাকা চাই!

–চাই। কাল-পরশু চেয়ে নিস। আন টাকা।

বিনা বাক্যব্যয়ে সাহা টাকা এনে তাঁর হাতে তুলে দিলে। কোনো স্মরণ-চিহ্নও চাইলে না।

টাকা নিয়ে ইন্দিরকে ছটো টাকা দিয়ে বাকি টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন—মেলা। মেলা ঘুরে গিয়ে বসেছিলেন জুয়োর আসরে। রাত্রি তখন আটটা! বসে গেলেন জুয়োর আসরে। মনে মনে সেদিন কী বাজি রেখেছিলেন মনে নেই। বোধ হয় এক বছরের মধ্যে তিনি যদি মরেন, তবে তিনি জিতবেন।

দশটার সময় ছুটে এসেছিল – এই শশী। শশী তখন হরিশের অধীনে চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির কম্পাউণ্ডার। তার মেলাতে থাকারই কথা, কিন্তু হরিশের ছেলের অসুখের জন্য আসতে পারে নি। ছেলের অবস্থা সংশয়াপন্ন; ওদিকে হরিশের হাতের রোগী নোটন গড়াঞীর পুত্রবধূ মালিশ খেয়ে বসে আছে। ভুল হরিশের। ছেলের অসুখ; বিভ্রান্ত-মস্তিষ্ক হরিশ মালিশের শিশি দিয়ে বলেছে—এইটে খাবার।

—এখুনি চলুন আপনি।

উঠেছিলেন তাই, তখন কোঁচার খুঁটে গোটা বিশেক টাকা অবশিষ্ট, ডাক্তার উঠেই টাকা কটা গোছ করে জাহাজের ঘরে বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—সই! জাহাজ ডোবে তো গেল, ওঠে তো রেখে দিয়ো—কাল নেব।

জাহাজ ডুববে, অর্থাৎ তিনি হারবেন সে তিনি জানতেন। অর্থাৎ তিনি মরবেন না এক বছরের মধ্যে। অনেক দেখতে হবে তাঁকে। এখন হরিশের ছেলেকে দেখতে হবে চলো।

যেতে যেতে হরিশের ছেলে শেষ হয়ে গিয়েছিল! জীবনমশায়কে দেখে বুক চাপড়ে কেঁদে উঠেছিল হরিশ। জীবন! এ কী হল আমার! জীবন! তুমি যদি সকালে একবার আসতে ভাই, তবে হয়তো বাঁচত আমার ছেলে।

জীবনমশায় মৃদু তিরস্কার করেছিলেন হরিশকে – তুমি না ডাক্তার হরিশ! ছি! তোমার তো এমন অধীর হওয়া সাজে না। 'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি'

যমমন্দিরং' এ কথা জানেন যিনি নিয়ন্তা তিনি আর জানেন তত্ত্বজ্ঞানী আর এ সমস্ত না বুঝেও এ কথা তো ডাক্তারের অজানা নয়। চুপ করো। মেয়েদের সান্ত্বনা দাও। আমি যাই গড়াঞীর বাড়ি।

মুহূর্তে হরিশের শোকের উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

গড়াঞীর বাড়ির সামনে তখন নানা গবেষণা চলছে। হরিশের ভাগ্য ভালো ; সময়টা মেলার। লোকজন সবই গিয়েছে মেলায়। নইলে এতক্ষণ হরিশের বিরুদ্ধে থানায় ডায়রি হয়ে যেত। জীবনমশায় এসে বসলেন। প্রথমেই শিশিটা হস্তগত করে পকেটে পুরলেন। তারপর নাড়ী ধরলেন। বিষের ক্রিয়ার লক্ষণ রয়েছে ; কিন্তু প্রশ্ন করলেন—ওষুধটা সবটা খেয়েছে ? পেটে গিয়েছে ? যায় নি। ঝাঁঝালো ওষুধ রোগী বমি করে ফেলে দিয়েছে। ভয় নাই। শশীকে বললেন—ডিসপেনসারিতে স্টমাক পাম্প আছে—নিয়ে আয়।

সেই রাতেই রাত বারোটায় খোকা চাটুজ্জে এসে পড়ল—মশায় রক্ষা করুন। আমার বোন নলিনী গলায় দড়ি দিয়েছে।

চিকিৎসার জন্য খোকা চাটুজ্জে তাঁকে ডাকে নি। অন্য কারণে ডেকেছিল।

জীবনমশায় প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত। তিনিই পারেন পুলিস-লাঞ্ছনার হাত হতে বাঁচাতে। তা তিনি বাঁচিয়েছিলেন। গড়াঞীর পুত্রবধূর পেটের মালিশ বমি করিয়ে বের করে মরণের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নতুন ওষুধ দিয়ে রাত্রি আড়াইটার সময় খোকা চাটুজ্জের বাড়ি এসে বাইরে দাওয়ার উপর বসলেন। রিপোর্ট লিখে বললেন, শ্মশানে নেবার ব্যবস্থা করো। আমি রয়েছি।

সেতাবকে বললেন—দাবার ছক ঘুঁটি আন সেতাব। শুধু তো বসে থাকা যায় না। পাত, ছক পাত।

সব মনে পড়ছে। মনে আছে সবই ; মনে পড়ালেই মনে পড়ে। সেদিন রাত্রি চারটে পর্যন্ত দাবা খেলেছিলেন—বাজির পর বাজি জিতেছিলেন। সেতাব বলেছিল —"তোর এখন চরম ভালো সময় রে জীবন! ডাঙায় নৌকো চলছে।"

তাঁরও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু—!

হঠাৎ আটকে গেল নৌকো।

এই মেলার পরই কিন্তু বনবিহারী প্রমেহ রোগে আক্রান্ত হল। শুনলেন মেলায় সে নাকি মদও খেয়েছিল।

ডাঙায় চলমান নৌকাটা আটকেই শেষ হয় নি, অকস্মাৎ মাটির বুকের মধ্যেই ডুবে গেল।

জীবনমশায় ছেলে বনবিহারীকে ডেকে বলেছিলেন, ছি-ছি-ছি। বনবিহারী মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল! কিন্তু সে নতমুখে তার কঠিন ক্রোধ ফুটে উঠেছিল। জীবনমশায় বলেছিলেন—বংশের ধারাকে যে কলুষিত করে সে কুলাঙ্গার। বাপ লজ্জা পায়, মা লজ্জা পায়, ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ শিউরে ওঠেন—পরলোকের সমাজে তাঁদের মাথা হেঁট হয়! জানতে পারেন নি, দরজার ওপাশে কখন আতর-বউ এসে কান পেতে দাঁড়িয়েছেন। তিনি সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢুকে বলেছিলেন—একটা ভুলের জন্য এত বড় কথা বললে তুমি ওকে? আমার গর্ভের দোষ দিলে! চোদ্দ পুরুষের মাথা হেঁট করেছে বললে? তুমি লজ্জা পেয়েছ বললে! তুমি নিজের কথা ভেবে দেখে কথাটা বলেছ? নিজে তুমি কর নি? ও হয়তো সঙ্গদোষে কোন ভ্রষ্টার পাল্লায় পড়ে একটা ভুল করে ফেলেছে! কিন্তু তুমি? মঞ্জরীর জন্যে তুমি কী কাণ্ডটা করেছিলে—মনে পড়ে না?

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন জীবনমশায়।

আতর-বউ ছেলের সামনে মঞ্জরীর কথা বর্ণনা শেষ করে ছেলের হাত ধরে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। উঠে আয়।

জীবনমশায় বসে রইলেন অপরাধীর মতো। এবং যে মঞ্জরীকে তিনি অপরাধিনীর মতো জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন—আতর-বউ সেই মঞ্জরীকেই তাঁর সামনে মাথা তুলিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল; পাওনাদারের মতো।

প্রতিষ্ঠার এই উৎসবমুখরিত কালে দীর্ঘদিন মঞ্জরীকে তাঁর বারেকের জন্যও মনে পড়ে নি। সেদিন মনে পড়িয়ে দিয়েছিল আতর-বউ। মদ্যপানের ফলে, ব্যভিচারের পাপে ভূপী বোসের ব্যাধি মঞ্জরীর ভাগ্যকে করেছিল মন্দ; তাতে কি তিনি মনে মনে আনন্দ পেয়েছিলেন? তার জন্যই কি তিনি পেলেন এই আঘাত? সেইদিনই তিনি বুঝেছিলেন বনবিহারীর জীবনে মৃত্যুবীজ বপন হয়ে গেল। মানুষের জীবনে মৃত্যু ধ্রুব, জন্মের মুহূর্ত থেকে ক্ষণে ক্ষণেই সে তার দিকে চলে; মৃত্যু থাকে স্থির, হঠাৎ একদিন মানুষ রিপুর হাত দিয়ে তাকে নিমন্ত্রণ পাঠায়; তখন মৃত্যুও তার দিকে এগিয়ে আসে। এক-একজন অহরহ ডাকে। ওই দাঁতুর মতো। দাঁতু মরবে। বনবিহারীর মতোই মরবে। প্রদ্যোত ডাক্তার ওকে বাঁচাতে পারবে না।

হঠাৎ জীবনমশায় সচেতন হয়ে উঠলেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন।

শশী এতক্ষণ পিছনে বসে বৃদ্ধ হস্তীকে আপন মনে গালাগাল দিয়ে চলেছিল। এর মধ্যেই পকেট থেকে ক্যানাবিসিণ্ডিকা-মেশানো পানীয়ের শিশি বের করে সে এক ঢোক খেয়ে নিয়েছে। গাড়িতে তামাক সেজে খাওয়ায় বিপদ আছে। খড়ের

বিছানায় আগুন লাগতে পারে। সেই ভয়েই ও ইচ্ছা সম্বরণ করে দুটো বিড়ি, চার পয়সায় দশটা গোল্ডফ্লেক সিগারেটের একটা সিগারেট শেষ করেছে। এবং মধ্যে মধ্যে দাঁতে দাঁত ঘষে ভেবেছে—বুড়োর পিঠে গোটা দুয়েক কিল বসিয়ে দিলে কী হয়? না-হয় তো—জ্বলন্ত সিগারেটের ডগাটা পিঠে টিপে ধরলে কী হয়? চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে?

মশায়কে নড়েচড়ে বসতে দেখে, ছইয়ের বাইরে মুখ বের করে তাকাতে দেখে শশী বললে—নেমে একবার দেখব নাকি?

—কী?

—ব্যাটা দাঁতু সত্যিই ভর্তি হল কিনা হাসপাতালে?

ঠিক হাসপাতালের সামনে এসে পড়েছে গাড়িখানা।

—না। কে বল তো? গলাখানি বড় মিঠে। গাইছেও ভালো। গানখানিও চমৎকার! ওই বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে—ডাক্তার ছোকরা নয়?

উৎসাহিত হয়ে শশী ছইয়ের পিছন দিক থেকে ঝপ করে লাফিয়ে নেমে পড়ল। বললে—হ্যাঁ ডাক্তারই বটে। ডাক্তারের পরিবার গান করছে। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী। সে একেবারে খাঁটি মেমসাহেব। বাইসিকিলে চড়ে গো। আর চলে যেন নেচে নেচে। গান তো যখন তখন! অঃই। অঃই, দেখুন না।

সামনের বারান্দাতেই স্বামী-স্ত্রী প্রায় ছোট ছেলেমেয়েদের মতো খেলায় মেতেছে। তরুণী স্ত্রী ডাক্তারের হাত চেপে ধরেছে, হাত থেকে জলের মগটা কেড়ে নেবে। সে নিজে জল ঢেলে দেবে। ডাক্তার বোধ করি হাত-পা ধুচ্ছিল।

ডাক্তার দেবে না। সে তাকে নিরস্ত করতে বালতি থেকে জল নিয়ে তার মুখে ছিটিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটি ছুটে চলে গেল ঘরের মধ্যে। আবার ছুটে বেরিয়ে এসে কিছু যেন ছুঁড়ে মারলে ডাক্তারের মুখে। ডাক্তারের মুখ সাদা হয়ে গেল। পাউডার। পাউডার ছুঁড়ে মেরেছে!

শশী খুকখুক করে হাসতে লাগল।

মশায়ের মুখেও একটি মৃদু হাস্যরেখা ফুটে উঠল। গাড়ি মন্থর গমনে চলতে লাগল। গণেশ ভটচাজের মেয়ে তা হলে ভালো আছে। আশা হয়েছে! পরমানন্দ মাধব! না হলে ডাক্তার এমন আনন্দের খেলায় মাততে পারত না। ছোকরার সাহস আছে, ধৈর্য আছে। জেদ আছে। বড় হবার অনেক লক্ষণ আছে। শুধু একটা জিনিস নাই। অন্যমতকে মানতে পারে না। অবিশ্বাস করতে হলে বিশ্বাস করে না-ঠকে অবিশ্বাস করলে যে ঠকা মানুষ ঠকে সেইটেই হল সবচেয়ে বড় ঠকা। তাতেই মানুষ নিজেকে নিজে ঠকায়। আর বড় কটুভাষী!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মশায়। আবার নড়ে বসলেন। কিন্তু দাঁতু বাঁচবে না। দাঁতু নিজেকে নিজে মারছে, তাকে কোন চিকিৎসক বাঁচাবে? অবশ্য পরিবর্তন মানুষের হয়।

এই তো নবগ্রামের কানাইবাবু। তিনি আজ নাই, অনেকদিন মারা গেছেন। জীবন দত্ত তাঁকে দেখেছেন। মাতাল, চরিত্রহীন, দুর্দান্ত রাগী, কটুভাষী লোক ছিলেন তিনি। প্রথমপক্ষ বিয়োগের পর আবার বিবাহ করলেন—দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর স্পর্শে লোহা থেকে সোনা হয়ে যাওয়ার মতো আর এক মানুষ হয়ে গেলেন। মদ ছাড়লেন, ব্যাভিচার ছাড়লেন, কথাবার্তার ধারা পাল্টালেন, সে রাগ যেন জল হয়ে গেল; শুধু তাই নয়, মানুষটি শুধু সদাচারেই শুদ্ধ হলেন না, পড়াশুনা শাস্ত্রচর্চা করে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন জীবনে। তাও হয়। কিন্তু বনবিহারীর হয় নি। দাঁতুরও হবে না। আবার মনে হল রামহরির কথা। বারবার প্রশ্নটা ঘুরে ঘুরে জাগছে মনের মধ্যে। কী আর হল? তবে কি এই নতুন স্ত্রীটি তার জীবনে এমন মধুর আস্বাদ দিয়েছে—যার মধ্যে সে মাধবের মাধুর্যের আভাস পেয়েছে?

হঠাৎ তাঁর একটা কথা মনে হল। তিমি মুখ বাড়িয়ে শশীকে ডাকলেন—লিউকিস।

শশী ইতিমধ্যে রাস্তায় নেমে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে—তামাক সেজে হুঁকো টানছে। হুঁকোটা নামিয়ে সে সবিস্ময়েই জীবন মশায়ের মুখের দিকে তাকালে। হঠাৎ বুড়োর হল কী? লিউকিস বলে ডাকে যে!

এ নাম তার সে আমলের নাম। ম্যালেরিয়ার আবির্ভাবের সময় পাগলা নেপালের ভাই সীতারাম, যে 'নবগ্রাম মেডিক্যাল হল' খুলেছিল—সেই সীতারামের দেওয়া নাম। সেও ছিল আধপাগল। সত্তর বছরের বৃদ্ধ থেকে ষোলো বছরের ছেলে পর্যন্ত সবাই ছিল তার ইয়ার। সকলের সঙ্গেই সে তামাক খেত। অথচ তার চরিত্রের মধ্যে কোথায় ছিল একটি মাধুর্য যে এতটুকু বিরক্ত হত না কেউ।

সে কলকাতার বড় বড় সায়েব ডাক্তারের নাম নিয়ে এ অঞ্চলের ডাক্তারদের নামকরণ করেছিল।

জীবন দত্তের নাম দিয়েছিল—ডাক্তার বার্ড।

হরিশ ডাক্তারকে বলত—ডাক্তার ম্যানার্ড।

শশীকে বলত—লিউকিস।

নতুন ডাক্তার এসেছিল হাসপাতালে—কলকাতার মিত্তিরবাড়ির ছেলে, তাকে বলত—ডাঃ ব্রাউন!

সীতারামের এই রসিকতা সেকালে ভারি পছন্দ হয়েছিল লোকের। ডাক্তারেরা

নিজেরাও হাসতেন এবং মেজাজ খুশী থাকলে পরস্পরকে এই নামে ডেকে রসিকতা করতেন।

এতকাল পরে সেই নাম? বিস্মিত হল শশী। কিন্তু এই নামে সেকালে ডাকলে যে উত্তর সে দিত—সেই উত্তরটি দিতে ভুল হল না তার। ঘাড়টা একটু হেঁট করে সায়েবী ভঙ্গীতে সে বললে—ইয়েস সার।

জীবন মশায় বললেন—সে আমলটা বড় সুখেই গিয়েছে, কী বলিস শশী?

—ওঃ তার আর কথা আছে গো! সে একেবারে সত্যযুগ।

হেসে ফেললেন ডাক্তার। শশীর সবই একেবারে চরম এবং চূড়ান্ত। ভালো তো তার থেকে ভালো হয় না, মন্দ তো—একেবারে মন্দ। হয় বৈকুণ্ঠ নয় নরক।

তারপরই শশী বললে—সীতারাম বেটা শাপভ্রষ্ট দেবতা ছিল, বুঝলেন? তা—হঠাৎ সীতারামকে মনে পড়ল ডাক্তারবাবু?

—নাঃ। তোর নামটা মনে পড়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম রাম-হরির কথা!

—বললাম তো বেটার অবস্থা আজকে খারাপ, বোধ হয় অনিয়ম-টনিয়ম করেছে। তা শুধাবার তো উপায় নাই। মারতে আসবে বেটা। বলে—মরার চেয়ে তো গাল নাই, মরতে তো বসেইছি, না খেয়ে মরব কেন, খেয়েই মরব।

—সে তো গিয়েই দেখব রে। আমি শুধুচ্ছি ব্যাপারটা কী বল দেখি, মানে নতুন বিয়ে করে—

মশায়ের কথার মাঝখানে তাচ্ছিল্য ভরে শশী বলে উঠল—বেটার মতিগতি কী রকম পালটেছে আর কি!

—হুঁ। রামহরির এই স্ত্রীটি বোধ হয় খুব ধার্মিক মেয়ে, দেখতেও বোধ হয় খুব সুন্দরী?

শশী একটু ভেবেচিন্তে বললে—তাই বোধ হয় হবে।

—হুঁ, ডাক্তার স্মিতহাস্য প্রসন্ন মুখে আবার আকাশের দিকে চোখ তুললেন।

নবগ্রামের বাজার সম্মুখে।

ডাক্তার বললেন—বাইরে বাইরে চল বাবা মাঠের পথে। ভিড় ভালো লাগে না।

বাইশ

মাঠের পথেই গাড়ি ভাঙল।

জীবন মশায় এবার একটু দেহ এলিয়ে শুয়ে পড়লেন। শশী বললে—তাই গড়ান একটু। আমি হেঁটেই চলি। আঃ! এ সময় একটু বিশ্রাম না করলে চলবে না। এ সময়টায় জীবনে বোধ করি কখনই তিনি বের হন নি। কোনো ডাক্তারই যায় না। ডাক্তারেরাও তো মানুষ।

অনাবৃষ্টির শেষ শ্রাবণের দুপুরবেলা; মেঘাচ্ছন্নতা রয়েছে, বৃষ্টি নাই। মাঠ শুকনো না-হোক অনাবাদী পড়ে রয়েছে। ফসল নাই কিন্তু আগাছা বেড়েছে। মাঠের এখানে ওখানে বাঁশ উঁচু হয়ে রয়েছে। পুকুর থেকে দুনি করে জল তুলে চাষ করেছে উদ্যোগী চাষীরা। একেবারে সব থেকে নিচু মাঠে চাষ চলছে। সেখানে মানুষ গোরুর মেলা বসে গেছে, গাড়িখানা চলেছে উঁচু মাঠের মাঝখান দিয়ে, দু-চার জন চাষী এখানে কায়ক্লেশে কাজ চালাচ্ছে। দেশে শস্য নাই, আকাশে মেঘ দুর্লভ, মেঘ যদি আসে তাতে বৃষ্টি আরও সুদুর্লভ। বৃষ্টি হলে রোগটা কম হয়। এ তিনি ভালো করে লক্ষ্য করেছেন—যেবার বৃষ্টি ভালো হয়—সেবার ম্যালেরিয়া অন্তত কম হবেই। কত আবিষ্কার হল; মশা ম্যালেরিয়ার বীজ বয়ে নিয়ে বেড়ায়; কলেরার বীজাণু জলের মধ্যে বাড়ে, খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মানুষকে আক্রমণ করে—মাছিতে বয়ে নিয়ে বেড়ায়, ছড়ায়; কলেরার টিকা আবিষ্কার হল; কালাজ্বরের চেহারা ধরা পড়ল; কত কত রোগ আবিষ্কার! হ্যাঁ, দেখে গেলেন বটে। সাধ অবশ্য মিটল না; বড় একজন চিকিৎসক হয়ে এর তত্ত্ব-তথ্য পুরো দেখা এবং বুঝে ওঠা ঘটল না, শুনলেন—বিশ্বাস করে গেলেন—কার্য-করণের রহস্য দেখবার দিব্য দৃষ্টি লাভ হল না এ জন্মে—তবুও অনেক অনেক দেখে গেলেন। একটি সাধ হয় মধ্যে মধ্যে—অনুবীক্ষণ যন্ত্রে বীজাণুগুলিকে চোখে দেখা যায়—তাদের বিচিত্র চেহারা বিচিত্র ভঙ্গি—সেই দেখবার ইচ্ছা হয়, আর ইচ্ছে হয় এক্সরে করানো যখন হয় তখনকার ব্যাপারটা। মানুষের রূপময় দেহ অদৃশ্য হয়ে যায়—দেখা যায় কঙ্কাল—অন্ত্রপাতি—তার ক্ষত। মতির মায়ের পায়ের এক্সরের প্লেটটা একবার দেখতে তাঁর ইচ্ছে হয়।

হঠাৎ জীবন মশায়ের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। শশী হাত নেড়ে ও কী করছে?

কাকে ও যেন ইশারা করছে। কে? কাকে?

—কে রে শশী?

আজ্ঞে?

—কাকে কী বলছিস হাত নেড়ে?

—পুতকী আর মাছির বাচ্চা গো। ঝাঁকের মতো উড়ছে মুখের চারি-পাশে। বর্ষাতে বৃষ্টিবাদলের নাম নাই, এ বেটাদের পঙ্গপাল ঠিক আছে, বেড়েছে—এ বছর বেড়েছে। শশী বারবার শূন্যমণ্ডলে হস্ত তাড়না শুরু করলে।

—গাড়িতে উঠে আয়।

—এই তো—আর এসে পড়েছি। সামনেই তো ডাঙাটা। ডাঙাতে এ আপদ থাকবে না।

সামনেই মস্ত বড় উঁচু টিলা। টিলার ওপারেই চালের উপর গন্নাইচণ্ডী ঢুকবার মুখেই রামহরির বাড়ি। এখন আখড়া। সিধে লাল রাস্তা চলে গিয়ে বেঁকেছে। একজন সাইকেল আরোহী চলেছে। পাড়াগাঁয়েও আজ সাইকেল হয়েছে। দু-চারখানা পাওয়া যাবেই। মশায়ের জীবনে একসময় দুটো ঘোড়া এসেছিল—তারপর গোরুর গাড়িতেই যাত্রা শেষ করলেন।

প্রদ্যোতের সঙ্গে পারবার তাঁর কথা নয়। হাসলেন ডাক্তার। প্রদ্যোত ডাক্তার নাকি মোটর কিনবে। অন্ততপক্ষে মোটর সাইকেল। চার ঘণ্টায় সদর বিশ মাইল পথ গিয়ে আবার ঘুরে আসবে। লোক ছুটে আসছে।

গাড়ি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললে—শিগগির আসুন।

* * *

রামহরির বাড়ির দরজায় কজন শুষ্কমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

জীবন ডাক্তার দেখে বা শুনে চকিত হন নি। হার্টফেল করে মৃত্যু হয়ে থাকবে। বিস্মিত হবার কী আছে? ভিতরে শশী তাঁর পিছনে বসে ছিল; সে সচকিত হয়ে প্রশ্ন করলে—কী হল? বলি—হ্যাঁ হে?

—আপনি যাওয়ার পর বার দুই দাস্ত করে কেমন করছে ডাক্তারবাবু।

মশায় উঠে বসলেন। তাঁর কল-বাক্সটায় হাত দিয়ে ভেবে নিলেন। এ অবস্থায় রোগীর একটা দুটো ইনজেকশন হলে ভালো হয়। তাঁর মকরধ্বজ, মৃগনাভি আছে, কিন্তু ইনজেকশন বেশী ফলপ্রদ। শশী এ সব বিষয়ে নিধিরাম সর্দার। ইনজেকশন দেয় বটে, একটা সিরিঞ্জ তার আছে, কিন্তু সূচগুলো তার নিজের বেশভূষা শরীরের মতোই অপরিচ্ছন্ন। যে পকেটে তামাক-টিকা থাকে—সে পকেটেও সময়ে সময়ে বাক্স রাখতে শশী দ্বিধা করে না। তার উপর ওষুধ শশীর থাকে না। ওষুধ না

থাকলে শশী একটা শিশি থেকে অ্যাকোয়া নিয়ে অম্লান বদনে ইনজেকশন দিয়ে দেয়।

থাক ইনজেকশন। যা হয় মকরধ্বজেই হবে। রামহরি যখন এতটাই প্রস্তুত তখন ইনজেকশন দিয়ে মৃত্যু খানিকটা বিলম্বিত করেই বা হবে কী? জ্ঞানগঙ্গা? নাই বা হল!

মৃত্যু স্থির জেনে তাকে বরণ করতে চাওয়ার মতো মনটাই সবচেয়ে বড়! নেহাতই যদি আয়োজন হয়, তবে মধুর অভাবে গুড় দিয়েই কাজ চলবে। তীর্থপুণ্য-বিশ্বাসী, নামপুণ্য-বিশ্বাসী রামহরির চোখের সামনে দেবতার মূর্তি এবং নাম-কীর্তন তীর্থের অভাব অনেকটা পূরণ করবে। তা ছাড়া জ্ঞানগঙ্গায় মুক্তির কথা মানতে গেলে ভাগ্যের কথাটাও তো ভাবতে হবে, মানতে হবে। রামহরির সে ভাগ্য হবে কী করে?

সঙ্কল্প প্রায় স্থির করেই ঘরে ঢুকলেন জীবন ডাক্তার। রামহরিকে কী বলবেন তার খসড়াও মনে মনে করে নিলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকে রোগীকে দেখেই তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে উঠলেন। এ কী? একখানা তক্তাপোশের উপর রামহরি শুয়ে আছে—নিস্পন্দের মতো। বিবর্ণ পাণ্ডুর দেহবর্ণ। চোখের পাতায় যেন আকাশ-ভাঙা মোহ। দুর্বলতার ঘোর তার পাণ্ডুর দৃষ্টিতে। ক্ষণে ক্ষণে চোখের পাতা নেমে আসছে। আবার সে মেলছে। মেললেও সে দৃষ্টিতে ঔৎসুক্য নাই, প্রশ্ন নাই, কিছু চাওয়া নাই। এ কী অবস্থা? সমস্ত মিলিয়ে এই অবস্থা তো কয়েকটা দাস্তের ফলে সম্ভবপর নয়। তাঁর বহু-অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে এক নজরেই যে বুঝতে পারছেন—এ রোগী তিলে তিলে এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে। ঘরের গন্ধে, রোগীর আকৃতিতে এবং লক্ষণে রোগ যে পুরাতন অজীর্ণ অতিসার—তাতে আর তাঁর সন্দেহ নাই। অ্যালোপ্যাথরা আজকাল একে বলবেন ইনটেস্টাইন্যাল টিউবারকিউলোসিস্। অণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় ক্ষয়রোগের বীজও পাওয়া যাবে। ক্ষয়রোগ—ধীরে ধীরে ক্ষয় করে মানুষকে। এ অবস্থা আকস্মিক নয়। অন্তত দুদিন তিন দিন থেকে এই অবস্থাতেই আছে, তিলে তিলে বেড়ে আজ এই অবস্থায় এসেছে।

শশী নিজেই একটা মোড়া এনে বিছানার পাশে রেখে রামহরির মুখের কাছে ঝুঁকে ডেকে বলল—রাম, রাম! ডাক্তারবাবু এসেছেন। রাম!

—থাক, শশী। ওর সাড়া দিতে কষ্ট হবে! সরে আয়—আমি দেখি।

শশী উঠল—উঠেই আবার হেঁট হয়ে বললে—এখন আবার দলিলপত্র কেন রে বাপু। একখানা দলিল সে তুলে নিলে বিছানা থেকে। দলিলটা বিছানায় পড়ে ছিল।

এবার এগিয়ে এল রামহরির তরুণী পত্নীর ভাইটি। উচ্চবর্ণের বিধবা ভগ্নী রামহরিকে বরণ করে তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে থাকলেও রামহরির এই অসুখে ভগ্নীর বিপদের সময় না এসে পারে নাই। পনেরো-কুড়ি দিন হল এখানে এসে রয়েছে। সে বললে—উইল ওটা। ওর ইচ্ছে ছিল ডাক্তারবাবু এলে তার সামনে টিপছাপ দেবে, ডাক্তারবাবুকে সাক্ষী করবে, তা হঠাৎ এই রকম অবস্থা হলে বললে—কী জানি যদি ডাক্তারবাবু আসবার আগেই কিছু হয়! বলা তো যায় না! বসে নিজে উইল নিয়ে বুড়ো আঙুলের টিপ দিলে, সাক্ষীদের সই করালে; তারপর দেখতে দেখতে এই রকম।

মাথার কাছে একটি তরুণী মেয়ে বেশ ঘোমটা টেনে বসে ছিল। সে গুনগুন করে কেঁদে উঠল। ডাক্তার তার দিকে চাইলেন একবার তারপর নাড়ী ধরে চোখ দুটি বন্ধ করলেন। ক্ষীণ নাড়ী, রোগীর মতোই দুর্বল—মন্দ গতিতে বয়ে চলেছে, যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ওকে চলতেই হবে। থামবার অবকাশ নাই, অধিকার নাই, উপায় নাই। মধ্যে মধ্যে যেন কাঁপছে, চন্দ্রে গ্রহণ লাগলে চাঁদ যেমন কাঁপে—তেমনি কম্পন। মৃদু এবং অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিসাপেক্ষ। অন্ত্রের মধ্যে যে ক্ষয়রোগের কীট গ্রাস করে চলেছে, রেশমকীটের তুঁত পাতা খাওয়ার মতো—তাতে আর সন্দেহ নেই। তবে আপাত মৃত্যুলক্ষণ তিনি অনুভব করতে পারলেন না।

স্টেথোসকোপ দিয়ে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করলেন। এ অবস্থায় কোনো-মতেই আকস্মিক পরিণতি হতে পারে না। নাড়ীর গতির সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গতি—ঠিক যেন মিত্রভাবাপন্ন যন্ত্রী ও বাদকের মতো! দুর্বল হলেও সঙ্গত তো ব্যাহত হচ্ছে না!

ওদিকে শশী অনর্গল বকছিল, এ সব হল খলব্যাধি। হঠাৎ দাস্ত হল, বাস নাড়ী গেল। রোগী চোখ মুদল। আমি আজ সাত দিন থেকে বলছি—ওরে বাপু যা ব্যবস্থা করবার করে ফেল। গঙ্গাতীর যাবি তো চলে যা। ডাক্তারবাবুকে দেখাবি তো ডাকি। তা রোজই বলে—কাল। নিত্য কালের মরণ নাই, ও আর আসে না। ভদ্রলোকের এককথা—কাল। নে, হল তো?

মেয়েটি আবার কাঁদতে লাগল।

শশী আবার বকতে শুরু করলে—হবে কেন? ভাগ্যে থাকলে তো হবে। কর্মফল কেমন দেখতে হবে? গঙ্গায় সজ্ঞানে মৃত্যু, এর জন্যে তেমনি কর্ম চাই। আমাদের শাস্ত্রে বলে—চিকিৎসকেই বা কী করবে—হোক না কেন ধন্বন্তরি—নীলরতনবাবু কি ডাক্তার রায়; আর ওষুধই বা কী করবে—সে হোক না কেন সুধা—আর দশ-বিশ টাকা দামের টাটকা তাজা ওষুধ; আয়ু না থাকলে

কিছুতেই কিছু না। এও তেমনি ভাগ্য—কর্ম। সুমতি হলে কি হবে, মতিভ্রম ঠিক সময়ে এসে সুমতির ব্যবস্থা সব পালটে দেবে।

মশায় উঠলেন। দেখা তাঁর শেষ হয়েছে।

এবার মেয়েটি এসে পায়ে আছড়ে পড়ল—ওগো ডাক্তারবাবু গো! আমার কী হবে গো!

মশায় একবার সবারই মুখের দিকে চাইলেন। তারপর বললেন—ভয় নাই, ওঠো তুমি, ওঠো; ওঠো।

শশী ব্যস্ত হয়ে বললে—ওঠো, ওঠো। উনি যখন বলছেন ভয় নাই তখন কাঁদছ কেন? উনি দু কথার মানুষ নন! ওই হয়েছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। সরো সরো। ওঠো!

বাইরে এলেন মশায়। এবার তাঁর সর্বাগ্রে চোখে পড়ল—সাইকেলখানা।

মশায় ডাকলেন—শশী।

শশী বকছিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই হবে, ওঁর মতো মানুষ, উনি কি দেখবেন যে ওই অবলাটা ভেসে যাবে? ভালো ঘরের মেয়ে, সৎ জাতের কন্যা, মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম—মতিভ্রমের বশে যা করেছে তার ফল শাস্তি সে ভগবান দেবেন। আমরা মানুষ—আমরা ওকে ভেসে যেতে দোব না। বাস!

ডাকবার আগেই ক্রমশ তার স্বর নিস্তেজ হয়ে আসছিল। এবার স্তব্ধ হয়ে গেল।

—ওকে মেরেই ফেলেছিস শশী? ইচ্ছে করে? না জানিস নে, বুঝতে পারিস নি?

—আজ্ঞে?

—এ অবস্থা তো আজ তিনদিন থেকে হয়েছে। বুঝতে পারলি নে তো ডাকলি নে কেন?

—আজ্ঞে না! মা-কালীর দিব্যি!

—শশী! ধমক দিয়ে উঠলেন জীবন ডাক্তার!

—মাইরি বলছি, ঈশ্বরের দিব্যি, গুরুর দিব্যি—

এবার মৃদুস্বরে মশায় বললেন—তোদের কজনকে পুলিসে দেওয়া উচিত। থাম—চেঁচাস নে। যাক এখন শোন, ওই যে ছোকরা সাইকেল চেপে আমাদের গাড়ি দেখতে গিয়েছিল, সে কই? এই যে! ওহে ছোকরা, শোনো। কই দোয়াত-কলম দেখি। আমি লিখে দিচ্ছি ওষুধ। যাঁও নিয়ে এসো বিনয়ের দোকান থেকে। আর বাজারের ডাক্তার হরেনবাবুকে এই চিঠি দেবে। বুঝেছ? জলদি যাবে আর আসবে।

শশীকে দমানো যায় না। শশী ওই শক্তিতেই বেঁচে আছে। সে ছোকরায় হাত থেকে প্রেসক্রিপশন এবং চিঠি দুই নিয়ে দেখলে। বললে, গ্লুকোজ ইনজেকশন দেবেন? ইনট্রাভেনাস?

—হ্যাঁ। তা হলেই কিছুটা ঘোর কাটবে। তার আগে মকরধ্বজ দেব আমি।

—ঘোর কাটবে?

—হ্যাঁ। রামহরির রোগটা মৃত্যু-রোগই বটে। এতেই যাবে। তবে মৃত্যু-লক্ষণ এখনও হয় নি।

—হয় নি? আপনি ইনজেকশন দেবেন তো?

—হরেন ডাক্তারকে আসতে লিখলাম। সে দেবে। না আসে আমিই দেব।

—যদি মরে যায়?

—সে আমি বুঝব শশী। আমার মনে হচ্ছে রামহরি এখন বাঁচবে। অন্তত মাস কয়েক। তখন উইল-টুইল যা করবার করবে। আমি বরং সাক্ষী হব। উইলটার জন্যেই রামহরির মাথা তুলে দাঁড়ানো দরকার।

শশী চুপ করলে এবার।

মশায় আবার বললেন—উইলে কী আছে জানি না। এই শেষ পরিবারকেই এক রকম দানপত্র করেছে সব—এই তো?

একটু চুপ করে ঘাড় নেড়ে বললে—সে তো হবে না শশী। রামহরির অভিপ্রায় জানতে হবে আমাকে। তার প্রথম পক্ষের ছেলে ছিল—সে মারা গেছে। কিন্তু তার ছেলে—রামহরির নাতি আছে, পুত্রবধূ আছে। সে তো হবে না। বাঁচবেই মনে হচ্ছে। কিন্তু তার জন্যও চিকিৎসা প্রয়োজন। চেষ্টা করতে হবে। সে আমি করব।

রামহরি এই জ্ঞানগঙ্গা যেতে চেয়েছিল? রামহরির ছটা রিপুই বোধ করি ঐকতান তুলে মৃত্যুকে ডাক দিচ্ছে আজীবন। স্থির মৃত্যুর দিকে সহজ ছন্দে এগিয়ে যেতে জীবন ভয় পায় না। ভয় পায় মৃত্যু যখন নিজে এগিয়ে আসে। তখন সে ভয়ে আর্তনাদ করে। সে কি জ্ঞানগঙ্গা যেতে পারে? বনবিহারী পারে নি। দাঁতু পারবে না। রামহরিও পারে না। রামহরির ক্লান্ত জীর্ণ দেহ, ক্ষীণ কণ্ঠ, মুহূর্তে মুহূর্তে চোখে আচ্ছন্নতার ঘোর নেমে আসছে ; দু-একবার চোখ মেলছে, তার মধ্যেই দৃষ্টিতে কী আতঙ্ক কী আকুতি!

হরেন ডাক্তার আসা পর্যন্ত বসে রইলেন মশায়। মাঝখানে আর-একবার নাড়ী দেখলেন। নাড়ীর গতি ঈষৎ সবল হয়েছে ; ছন্দ এসেছে। মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। হরেন এসে পৌছতেই তিনি তাকে সব বলে বললেন—একটা গ্লুকোজ ইনজেকশন

তুমি দাও। আমি বলছি—তুমি দাও। আমি দায়ী হব হে। ভয় নাই তোমার।

হাতখানা আর-একবার দেখেছিলেন—মকরধ্বজের উষ্ণতা এবং শক্তি তখন নাড়ীতে এবং শরীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হাত নামিয়ে বললেন—দাও তুমি।

ইনজেকশন শেষ করে হরেন হাত ধুয়ে রোগীর অবস্থা দেখে হাসিমুখেই বললে—এটি আপনার অদ্ভুত মশায়! অদ্ভুত!

জীবনমশায় হাসলেন। আর কী করবেন? এ কথার উত্তরই বা কী দেবেন।

হরেন বললে—আর একটা সুখবর দিই, বিপিনবাবুর হিক্কা থেমে গেছে। এই আসবার আগে খবর পেলাম। উঃ, ভদ্রলোকের হিক্কা দেখে আমি তো আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আজ চার রাত্রি ঘুমুতে পারেন নি, পেটে খাদ্য থাকে নি। আমি আসবার আগে দেখে এলাম ভদ্রলোক ঘুমুচ্ছেন। আপনাকে ওরা ডেকেছিল সকলের আগে, খবর দিয়েছিল কিন্তু তখন আপনি বেরিয়ে এসেছেন। বুড়ো রতনবাবু যে কী কৃতজ্ঞ হয়েছেন সে কী বলব! প্রদ্যোত ডাক্তারও এসেছিল। সে বেশ একটু আশ্চর্য হয়েছে। গম্ভীর হয়ে বললে—এ বিষয়ে এখনি কিছু বলতে পারি নে। আবার আরম্ভ হতে পারে, এবং এ ওষুধের রি-অ্যাকশনও আছে; তবে এখন অবশ্য ক্রাইসিসটা কাটল বটে। বেশ আশ্চর্য হয়েছে প্রদ্যোত ডাক্তার। আসতে আসতে পথে বললে—বৃদ্ধের ব্যাপার ঠিক আমি বুঝি নে। এ ব্যাপারটায় আমার সন্দেহ হচ্ছে কেন জানেন? আজ আবার একটা ডিসপেপসিয়ার রোগী—অবশ্য একটু শক্ত ধরনের বটে—তাকে বলেছে তুই আর বাঁচবি নে। কত দিনের মধ্যে যেন মরবে বলেছে। হরেন এবার মশায়ের দিকেই তাকিয়ে তাঁকেই প্রশ্ন করলে—তাই বলেছেন—না কি?

জীবনমশায় হরেনের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরেই বললেন—আমি ভুল বলি নি বাবা হরেন। দাঁতু এই রোগেই মরবে। তবে কোন সময় আমি নির্দিষ্ট করে বলি নি। এই রোগই ওর মৃত্যুরোগ হয়ে উঠবে। এতে আমি নিশ্চিত। গম্ভীর এবং গভীর স্বরে বললেন—দাঁতুর এ রোগের সঙ্গে ওর প্রধান রিপুর যোগাযোগ হয়েছে। ঘরে আগুন লাগলেই সব ঘরটা পুড়বে তার মানে নাই, জল ঢাললে নিভতে পারে, নেভেও। কিন্তু আগুনের সঙ্গে বাতাস যদি সহায় হয় বাবা, তবে জলের কলসী ঢাললে নেভে না, বাতাসের সাহায্যে আগুন আঁচের ঝাপটায় ভিজে চাল শুকিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে ছাড়ে। দাঁতুর রোগ উদরাময়—তার সঙ্গে ওর লোভ রিপু হয়েছে সহায়। সহায় কেন? ওটা এখন রোগের অঙ্গ উপসর্গে পরিণত হয়েছে। আমার বাবা বলতেন—

জগৎ মশায় বলতেন—বাবা, সংসারে মানুষ সন্ন্যাসীদের মতো শক্তি না পেলেও, সব রিপুগুলিকে জয় করতে না পারলেও গোটা কয়েককে জয় করে। কেউ দুটো কেউ তিনটে—কেউ কেউ পাঁচটা পর্যন্তও জয় করে। কিন্তু একটা—।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—পারে না। একটা থেকে যায়! ওইটেই হল দুর্বল প্রবেশপথ। মৃত্যুবাহিনী ওই দ্বারপথেই মানুষের দেহে প্রবেশ করে। তার উপর বাবা যে দরজার রক্ষক সে যদি সেধে দরজা খুলে ডাকে তবে কি আর রক্ষা থাকে হরেন? রক্ষক তখন রিপু। প্রবৃত্তি তো খারাপ নয় বাবা। সংসারে প্রবৃত্তিই তো রুচি। প্রবৃত্তি যতক্ষণ সুরুচি ততক্ষণ কুখাদ্য খায় না, পেট ভরে গেলে সুরুচি তখন বলে—আর না। তৃপ্তিতে তার নিবৃত্তি আসে। আর প্রবৃত্তি যখন কুরুচি হয়—তখন সেই শত্রু, সেই রিপু। তখন তৃপ্তি তার হয় না; নিবৃত্তি তখন পালায়। তাই রিপুর যোগাযোগে যে রোগ হয়, সে রোগ অনিবার্যরূপে মৃত্যুরোগ।

কথা হচ্ছিল ফেরবার পথে। মশায় পায়ে হেঁটেই ফিরছিলেন। শশী অদৃশ্য হয়েছে। গাড়িখানাও আর পান নি। হরেনও অগত্যা সাইকেল ধরে তাঁর সঙ্গেই হাঁটছিল। হরেন ডাক্তার চুপ করে শুনেই যাচ্ছিল। মাটির দিকে চোখ রেখে পথ চলছিল। কথাগুলি শুনতে মন্দ নয়। অস্পষ্ট বা ভাবালুতা-মেশানো যুক্তি হলেও অসঙ্গত মনে হচ্ছিল না। কিন্তু এত বড় বড় বিজ্ঞান পড়ে এসে এ সব কি পুরো মানা যায়? তবুও পাড়াগাঁয়ের ছেলে সে, বাল্যকালের সংস্কারে ঠিক এরই একটা চাপাপড়া স্রোত ভিতরে ভিতরে আছে; সেই মজাখাতের চোরাবালিতে এই ভাবধারা বেমালুম শুষে যাচ্ছিল—মিশে যাচ্ছিল। এবং জীবনমশায়ের মতো প্রবীণ ব্যক্তির সঙ্গে তর্ক করতেও তার অভিপ্রায় ছিল না।

হরেনের নীরবতায় কিন্তু জীবনমশায় উৎসাহিত বোধ করছিলেন। তিনি বলে চললেন—ওই দেখো না বাবা, রানা পাঠককে। এতবড় শক্তি! একটা দৈত্য। রিপু হল কাম। বুঝেছ, ওর প্রমেহে চিকিৎসা করেছি, উপদংশ হয়েছে কয়েকবার, আমি কাটোয়ায় মণিবাবু ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছি—এবার যক্ষ্মা হয়েছে। বললে, একটি মেয়েছেলের কাছ থেকে ধরিয়েছে। তার মানে মেয়েটাকে যক্ষ্মারোগী জেনেও নিজেকে সম্বরণ করতে পারে নি।

এবার হরেন মৃদু হাসলে।

জীবনমশায় কিন্তু বলেই চললেন—তোমরা দেখ নি—নাম নিশ্চয় শুনেছ। মস্ত বড় কীর্তন-গাইয়ে। সুন্দর দাস গো! নামেও সুন্দর, কাজেও সুন্দর, রূপে সুন্দর, গানে সুন্দর—লোকটিকে দেখলে মানুষের চোখ জুড়োত, মন সুন্দর হয়ে

উঠত। লোকে বলত—সাধক। তা সাধনা লোকটার ছিল। নির্লোভ, অক্রোধ, মিষ্টভাষী, বিনয়ী—মোহ মাৎসর্য এও ছিল না; শুধু কাম। কামকে জয় করতে পারেন নি। শেষ জীবনে তিনি উন্মাদ হয়ে গেলেন—পঙ্গু হলেন। লোকে বললে—কোনো সাধনা করতে গিয়ে এমনটা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস ছিল তাই। কিন্তু গুরু রঙলাল ডাক্তারের কাছে যখন ডাক্তারি শিখছি তখন একদিন যে কথা তোমাকে বললাম সেই কথাই বললেন রঙলাল ডাক্তার। যেন আমার পিতৃ-পুরুষের কথার প্রতিধ্বনি করেই বললেন—জীবন, কথাটা তুমি হয়তো সত্যিই বলেছ হে। সুন্দর দাসকে দেখতে গিয়েছিলাম। মারা গেছে এই তো কিছুদিন। কিন্তু কথাটা প্রায়ই মনে হয়। কখনও ওই বোষ্টম-কীর্তনীয়াদের উপর রাগ হয়—কখনও কিছু। লোকটা অসহায়ভাবে রিপুর হাতে মরেছে হে। ও পাগল হয়েছিল—উপদংশ-বিষে, প্রমেহ-বিষে!

মশায় আবার একটু থেমে বলেছিলেন—দেখ না বাবা, রতনবাবুর ছেলে বিপিনের কেস। বাবা, এখানেও সেই রিপুর যোগাযোগ। মদও এক রিপু বাবা। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি যার নাই সে কি মানুষ? কিন্তু সে যখন রিপু হয় তখন কি হয় দেখ?

চকিত হয়ে হরেন প্রশ্ন করেছিল—তা হলে বিপিনবাবু সম্পর্কে আপনি—?

প্রশ্নটা সে সম্পূর্ণ উচ্চারণ করতে পারে নি।

—না। সেকথা ঠিক বলি নি আমি। তবে বাবা, অত্যন্ত কঠিন—অত্যন্ত কঠিন।

—আজ তো ভালোই আছেন। আমার ভালোই লাগল। হিক্কাটা থেমে গেছে। সুস্থ হয়েছেন—ঘুমুচ্ছেন।

—ভালোই থাক। ভালো হয়েই উঠুক। কিন্তু ভালো হয়ে উঠেও তো ভালো থাকতে পারবে না ও, হরেন। আবার পড়বে। প্রবৃত্তি রিপু হয়ে দাঁড়ালে তাকে সম্বরণ করা বড় কঠিন।

—এ যাত্রা তা হলে উঠতে পারেন বলছেন?

—তাও বলতে পারছি না বাবা। মাত্র তো দুদিন দেখছি। তার উপর মন চঞ্চল হচ্ছে। রতনকে দেখছি। বিপিনের ছেলেকে দেখছি, বুঝেছ, ওই ছেলেটিকে দেখে বনবিহারীর ছেলেকে মনে পড়ে গেল।

মশায় দীর্ঘনিশ্বাসও ফেললেন, আবার হাসলেনও। এবং হঠাৎ বললেন—চণ্ডীতলায় যাব একবার। আসবে না কি? মহান্ত আজ যাবেন। একবার দেখে যাই। আজ রাত্রেই যাবেন।

মহান্ত তখন আবার বার তিনেক দাস্ত গিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন, আঙুলের ডগাগুলি ঠাণ্ডা হয়েছে, চোখের পাতা নেমে এসেছে একটা গভীর আচ্ছন্নতার ভাবে। মধ্যে মধ্যে মুখ বিকৃত করছেন—একটা যেন যন্ত্রণা হচ্ছে, নিষ্ঠুর যন্ত্রণা।

হরেন বললে—বলেন তো একটা ইনজেকশন দিই।

মশায় বললেন—চিকিৎসক হয়ে আমি নিষেধ করতে পারি? দেবে, দাও।

মহান্তের শিষ্য বললে—বাবার নিষেধ আছে। তিনি বারবার নিষেধ করেছেন—সুই কি কোনো ইলাজ যেন না দেওয়া হয়। মশায় বলেছে আজ ছুটি মিলবে। ছুটি চাই আমার। ইয়ে শরীর বিলকুল রদ্দি হোগয়া!

শ্রদ্ধার প্রসন্নতায় মশায়ের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি এবার হরেনের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন—থাক হরেন।

হরেন স্তব্ধ হয়ে মহান্তের প্রায়-নিথর দেহের দিকে তাকিয়ে রইল। হরেন এই গ্রামের ছেলে। ডাক্তার সে হয়েছে, কিন্তু এই ধরনের মৃত্যুর অনেক গল্প সে শুনেছে। আজও মৃত্যুকালে ওষুধ পাশে সরিয়ে রেখে মুখে দুধ গঙ্গাজল দেয়। আগেকার কালের আরও অনেক বিচিত্র গল্প সে শুনেছে। তবু আজকের এ মৃত্যুদৃশ্য তার কাছে নতুন এবং বিস্ময়কর।

দীর্ঘকায় কঙ্কালসার মানুষটি নিথর হয়ে পড়ে আছে। শ্বাস হচ্ছে যেন। তার গতি অবশ্য মৃদু। হঠাৎ মনে হল অত্যন্ত ক্ষীণভাবে ঠোঁট দুটি নড়ছে।

ইঙ্গিত করে সে মশায়কে দেখালে।

মশায় বললেন—ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন। ভিতরে জ্ঞান রয়েছে। গ্রহণীর রোগীর জ্ঞান শেষ পর্যন্ত থাকে।

হরেন তর্ক করলে না। কিন্তু তর্ক আছে।

মশায় বললেন—হাতের দিকে দেখো।

মহান্তের হাতের আঙুল করজপের ভঙ্গিতে ধরা রয়েছে।

শিষ্য ভোলানাথ এসে বললে—তা হলে বের করি মশায়?

—হ্যাঁ বের করবে বই কি। দেহ ছাড়বেন, এখন ঘর কেন?—আকাশের তলায়, মায়ের আঙিনায়।

বাইরে তখন অনেক লোক। সকালবেলা মশায়ের নিদান কথা শুনে মহান্ত শিষ্য ভোলাকে বলেছিলেন—দু-তিন গাঁওয়ের হরিনামকে দলকে খবর ভেজো রে ভোলা। বলো—হমকো আজ ছুটি মিলবে। যায়েগা হম। তুম লোক ভাই, দল লেকে আও। নাম করো। ওহি শুনতে শুনতে হম যায়ে গা। বন্ধন টুটে গা। ভরোসা মিলে গা।

মশাই নিজেই বেরিয়ে এসে বললেন—হরিবোল, হরিবোল! ধরো, ধরো নাম ধরো। জয় গোবিন্দ।

বেজে উঠল খোল করতাল। মশায় নিজেই এসে দাঁড়ালেন সর্বাগ্রে—"নামের তরী বাঁধা ঘাটে—হরি বলে ভাসাও তরী।"

সন্তর্পণে বহন করে এনে আকাশের তলায় দেবীর পাট অঙ্গনে মহান্তকে শুইয়ে দিলে সকলে। শ্বাস ঘন হয়ে উঠেছে।

হরেন অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইল। চিকিৎসক হিসেবে তার চলে আসবার কথা মনে হল না। মনটা যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। বিচিত্র!

তেইশ

মাস দেড়েক পর।

মশায় এবং সেতাব দাবায় বসেছেন। ভাদ্র মাস—আকাশ এরই মধ্যে এবার নির্মেঘ নীল; অনাবৃষ্টির বর্ষা শেষ হয়েছে প্রায় সপ্তাহ খানেক আগে এবং এই এক সপ্তাহের মধ্যেই মাঝ-শরতের আবহাওয়া ফুটে উঠেছে আকাশে মাটিতে। আজ দাবা খেলার আসরও জমজমাট। সতরঞ্চির পাশে দুখানা থালা নামানো রয়েছে, চায়ের বাটি রয়েছে। জন্মাষ্টমী গিয়েছে—আতর-বউ আজ তালের বড়া করেছেন, একটু ক্ষীরও করেছেন—সেই সব সহযোগে চা পান করে দাবায় বসেছেন। মশায় অবশ্য খান নি। অসময়ে তিনি কোনো কালেই এক চা ছাড়া কিছু খান না। ডাক্তারি শেখার সময় রঙলাল ডাক্তারের ওখানে ওটা অভ্যাস করেছিলেন; লোককে কিছু খেয়ে চা খেতে উপদেশ দিলেও নিজে বিকালবেলা খালি পেটেই চা খেয়ে থাকেন। খেতে তাঁর বেলা যায়, ক্ষিদে থাকে না—এ একটা কারণ বটে, কিন্তু আসল কারণ অন্য। সন্ধ্যার পর অর্থাৎ দাবা খেলা অন্তে—সে সাতটাই হোক আর আটটাই হোক আর বারোটাই হোক,—মুখহাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে ইষ্ট স্মরণ করে তবে আহার করেন। পরমানন্দ মাধব!

আতর-বউয়ের মেজাজ আজ ভালো আছে। গত কাল জন্মাষ্টমীর উপবাস করেছিল—আজ সেতাবকে নিমন্ত্রণ করে দুপুরে ব্রাহ্মণভোজন করিয়েছে; বিকেলে জলযোগ করিয়েছে। এবং সেতাবের ভোজন-বিলাসিনী স্ত্রীর জন্য তালের বড়া ক্ষীর বেঁধে দিয়ে খুব খুশিমনেই আছে। শুধু ব্রাহ্মণভোজন নয়, দম্পতিভোজন করানো হয়ে গেল। ব্রত উপবাস করলে আতর-বউ ভালো থাকে। বোধ করি,

পরলোকের কল্পনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আয়োজনও ভালো ছিল। অভিযোগ করতে পায় নি আতর-বউ। মশায়ের পরমভক্ত পরান খাঁকে ডাক্তার কয়েকটি ভালো তালের কথা বলেছিলেন, খাঁ একঝুড়ি খুব ভালো এবং বড় তাল পাঠিয়ে দিয়েছিল। এবং রামহরি লেটের বাড়ি থেকে এসেছিল একটি ভালো 'সিধে'—মিহি চাল, ময়দা, কিছু গাওয়া ঘি, কিছু দালদা, তেল, তরিতরকারি এবং একটা মাছ। রামহরি সেই মরণাপন্ন অবস্থা থেকে বেশ একটু সেরে উঠেছে। এবং রামহরির পুত্রবধূ পৌত্র ফিরে এসেছে, তারাই এখন সেবা-শুশ্রূষা করছে। মশায়ের কাছে তাদের আর কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। রামহরির নতুন বউ তার ভাইকে নিয়ে পালিয়েছে। রামহরির মেজাজ অবশ্য খুবই খিটখিটে—শশীর উপরে শব্দভেদী বাণের মতো কটুবাক্য প্রয়োগ করে। পুত্রবধূ পৌত্রকেও অবিরাম বিদ্ধ করছে। কিন্তু এই খিটখিটে মেজাজের মধ্যেও রামহরি মশায়কে দেখে সজল চোখে বলে—বাবা, আর জন্মে আপনি আমার বাপ্ ছিলেন! সেই দিন থেকে ক্রমান্বয়ে কুড়িদিন তিনি নিত্যই রামহরিকে দেখে এসেছেন।

সিধেটা বোধ করি সেই সম্বন্ধ ধরেই পাঠিয়েছে রামহরি। নইলে একালে চিকিৎসককে উপঢৌকন কি সিধে পাঠানো উঠে গিয়েছে। একালে নগদ কারবার। বুড়ো রামহরি পূর্ব জন্মের বাপের বন্দনা করেছে। একদিন মশায় হেসে রামহরিকে বলেছিলেন—শশী তা হলে কাকা ছিল—না কী বলিস? তোকে তো পথে বসিয়েছিল! অ্যা!

রামহরিও হেসেছিল। মশায় বলেছিলেন—দেখ, তোর আর জন্মের বাবা হয়ে যদি তোর উপর আমার এত মায়া—তবে তোর এই জন্মের বেটার ছেলের উপর কি এত বিরূপ হওয়া ভালো? তবে একটা কথা বলব বাবা। তুমি সেরে এখন উঠলে—কিন্তু এ রোগ তোমার একেবারে ভালো হবে না। সাবধানে থাকবে। বুঝেছ! উইল-টুইল যদি কর—তবে করে ফেলো। আর একটি কথা, যে মেয়েটিকে তুমি শেষে মালাচন্দন করেছ তাকেও বঞ্চিত কোরো না।

রামহরির এই তরুণী স্ত্রীটিও এর মধ্যে খিড়কির পথে আতর-বউয়ের কাছে এসে ধরনা দিয়েছিল। পরামর্শ যে শশীর তাতে মশায়ের সন্দেহ নাই। বোধ হয় কিছু প্রণামীও দিয়ে গিয়ে থাকবে। বোধ হয় নয়, আতর-বউ যখন ওকালতি করেছে তার জন্য তখন ফী নিশ্চয় নিয়েছে। মশায় এ নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কিন্তু প্রশ্ন করেন নি। তিনি নিজেই রামহরিকে এ কথা বলেছেন। আতর-বউ যা করেছে তার দায়িত্ব নিজের। তবে স্বামীকে যদি স্ত্রীর পাপের ভাগ নিতে হয়

নেবেন; ইহলোকে আতর-বউয়ের অগ্নিদাহের জ্বালার উত্তাপ জীবনভোর সইতে পারলেন, পরলোকে আর পাপের ভাগের বোঝা বইতে পারবেন না?

খুব পারবেন!

ডাক্তারেরা বলছে বিপিন ভালো আছে। হিক্কা তার আর হয় নাই। সেখানেও নিত্য যেতে হয়। তিনি নাড়ী না দেখলে রতনবাবুর তৃপ্তি হয় না। প্রদ্যোত ডাক্তারও আসে। সে আসে তাঁর পরে। কোনো কোনো দিন দেখা হয়ে যায়। দু-একটা কথাও হয়। সে শুধু নমস্কার-বিনিময় মাত্র। তিনি হাত দেখেই চলে আসেন। বলে আসেন ভালোই আছে। এর বেশী কিছু না। মনের মধ্যে সেই কথাগুলিই ঘুরে বেড়ায়, মহান্তের তিরোধানের দিনে যে কথাগুলি তিনি হরেনকে বলেছিলেন।

হুঁকোটা হাতে ধরেই সেতাব চাল ভাবছিল।

মশায় বললেন—ও বাবা, ন হরি ব্রহ্মা ন চ শঙ্কর! ওর নিদান হেঁকে দিয়েছি মানিক। তিন চাল! তিন চালেই তোমার মন্ত্রী অকস্মাৎ গজের মুখে পড়ে কাত। মশায় সেতাবের মন্ত্রীকে নিজের গজের মুখে চাপা দিয়ে রেখেছেন। এদিকে কিস্তি দিয়েছেন। সেতাব ভাবছে।

মশায় সেতাবের হুঁকো থেকে কল্কেটা ছাড়িয়ে নিয়ে টানতে শুরু করলেন। তামাকটা কেন পোড়ে মিছিমিছি। সেতাব বল ফেলে দিয়ে, কল্কের দিকে হাত বাড়িয়ে বললে—দে! তোর পড়তা ভালো আজ।

মিথ্যে বলে নি সেতাব! মশায় আজ পর পর দুবাজি জিতলেন। সেতাব কঠিন খেলোয়াড়। ওর সঙ্গে জেতা কঠিন। প্রায়ই চটে যায় বাজি। এক-শো বাজির নব্বুই বাজি চটে যায়—দশ বাজিতে হারজিত হয়! সে-ও সমান সমান।

কঠিন-রোগী থাকলে মশায় অনেক সময় খেলতে বসবার আগে সেকালের জুয়ার বাজির মতো ভাবেন—আজ যদি সেতাব হারে তবে রোগকে হারতে হবে; সেরে উঠবে রোগী। সঙ্গে সঙ্গেই হাসেন। নাড়ী দেখার অনুভূতি মনে পড়ে যায়। ও মিথ্যা হয় না। হবার নয়। রোগের কথাই মাথায় ঘুরতে থাকে। যন্ত্রচালিতের মতো খেলে যান, সেতাব একসময় বলে ওঠে—মাত।

সেতাব তামাক খেয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলে—তোর পড়তা ভালো, সত্যিই ভালো জীবন। রামহরিকে তুই যা বাঁচালি! খুব বাঁচিয়েছিস!

জীবনমশায় বললেন—পরমায়ু পরম ওষধি সেতাব। রামহরির আয়ু ছিল। সারাটা জীবন কুস্তি-কসরত করেছে—সেও এক ধরনের যোগ। সাধারণ মানুষের

সঙ্গে এদের তফাত আছে। ওর সহ্যশক্তি কত! সেইটেই বিচার করেছিলাম আমি। শক্তিই হল আয়ুর বড় কথা। রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে কি ওষুধ? করে জীবনীশক্তি, আয়ু।

সেতাব হেসে বললে—হ্যাঁ, তা হলেও হাতযশটা তো তোমার বটে। সে তোমার চিরকাল আছে। নতুন ছক সাজাতে লাগল সেতাব। সাজাতে সাজাতে বললে—শশীর কথা শুনেছিস?

শুনেছেন, তাও শুনেছেন।

গুটি সাজাতে সাজাতেই ডাক্তার হাসলেন। পরমুহূর্তেই তাঁর কপালের দুপাশে রগের শিরা দুটো মোটা হয়ে ফুলে উঠল। ক্ষোভে থমথমে হয়ে উঠল স্থবির মুখখানা।

সেই প্রথম দিনই শশী রামহরির ওখান থেকে একরকম পালিয়ে এসে মদ্যপান করে সারা নবগ্রামের প্রতি ডাক্তারখানায় চীৎকার করে বেড়িয়েছে—আমি তো তবু কম্পাউণ্ডার। বর্ধমানে রীতিমত পাশ করে এসেছি। ওটা যে হাতুড়ে! পুঁজি তো রঙলাল ডাক্তারের খানকতক প্রেসক্রিপশন আর বাপ-পিতামহের মুষ্টিযোগের খাতা! আর নাড়ী ধরে চোখ উলটে—খানিকক্ষণ আঙুল তুলে টিপে—তারপর বায়ু পিত্ত কফ! মনে হচ্ছে দশ দিন। না হয় ঘাড় নেড়ে—তাই তো, —এই বলা! রামহরিকে বাঁচাবে! কই বাঁচাক দেখি! তাও তো গ্লুকোজ ইনজেকশন দিতে হরেন ডাক্তারকে ডাকতে হয়েছে! আসল কথা রামহরির টাকা—বিষয়! সব, সব বুঝি বাবা, সব বুঝি! রামহরি তো হরে হরে করবে, এখন বাঁচবে বাঁচবে রব তুলে ইনজেকশন, ওষুধ, ফী, গাড়ি-ভাড়া, হেনোতেনো, গোলযোগ বাধিয়ে পঞ্চাশ একশো দেড়শো যা মেলে—তাই বুড়োর লাভ। এ আর কে না বুঝবে! আমার নামে তো যা তা বলেছে; কিন্তু গোঁসাইকে—চণ্ডীতলার গোঁসাইকে কে মারলে? উনি নন? আগের দিন রাত্রে এক ডোজ ওষুধে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। সকালে ভালো রইল। ইনি গিয়ে ফুসমন্তর দিয়ে এলেন—সন্ধ্যেতে যাবেন। ওষুধবিষুধ আর খাবেন না। সারাদিন ওষুধ না পড়ে বিকেলে আবার দাস্ত হল। হবেই তো। বাস, নিদান সার্থক হয়ে গেল।

প্রদ্যোত ডাক্তারও তাই বলে।

বলে—সন্ন্যাসী মরেছে, তার জন্যে কারই বা মাথাব্যথা! কিন্তু ওই লোকটির জীবনের মূল্যে জীবনমশায় নিজেকে নাড়ীজ্ঞানে অভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু আমি বলব—উনি তো ওকে মেরেছেন। ইয়েস ইন দি ট্রু সেন্স অব দি টার্ম। ওষুধ দিলে এবং ওইভাবে ঘর থেকে টেনে বের না করলে সন্ন্যাসী আরও

দু-একদিন—অন্তত আরও ঘণ্টা কয়েক বাঁচত—এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। এ তো নিজের নিদান সত্য করবার জন্য টেনে-হেঁচড়ে, খোল-করতালে রোগীকে চমকে দিয়ে উত্তেজিত করে মেরে ফেলেছে।

কথাগুলি মনে পড়লেই রগের শিরা দপদপ করে ওঠে।

কথাটা উঠতেই এমন মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন জীবনমশায় যে, এ দানটায় হেরেই গেলেন তিনি। খপ করে দাবাটাই মেরে বসল সেতাব! বললে—এই বার!

তাই বটে। এই বারই বটে। বাঁকা পায়ে আড়াইপদ আড়ালে অবস্থিত একটা ঘোড়ার জোরে একটা বড়ের অগ্রগমন সম্ভাবনা তিনি লক্ষ্য করেন নি।

সেতাব হেসে বললে—দেখবি না কি?

ছকের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে মশায় বললেন—না। সবটাই এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। তুই কথা তুলে মনটা চঞ্চল করে দিলি। নন্দ রে, তামাক দে তো বাবা!

—আর একবার চা করতে বল। খেয়ে উঠি। দেরি হলে সে বুড়ী আবার পঞ্চ-উপচার সাজিয়ে বসবে।

অর্থাৎ রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা শুরু করবে। গৃহিণীর খাওয়ার আয়োজন সেতাবের পক্ষে প্রায় বিভীষিকা। যাবার পথে তাঁকে দোকান থেকে দালদা কিনে নিয়ে যেতে হয়। যা হোক কিছু রসনাতৃপ্তিকর তৈরি করেন তিনি। সেতাব উপলক্ষ্য। নিজেই সেতাব মধ্যে মধ্যে বলে—বুঝলি জীবন, এ সেই ষোলো কইয়ের ব্যাপার! সেই যে একজন জোলা ষোলোটা কই মাছ কিনে এনে বউকে বলেছিল—ভালো করে রান্না কর, বেশ পেঁয়াজ গরমমশলা দিয়ে—মাখো-মাখো করে ঝোল রেখে,—লঙ্কাবাটা দিয়ে—যেন জিভে দিলেই পরানটা জুড়িয়ে যায়। বউ রান্না করতে লাগল—জোলা মাকু ঠেলতে বসল ঘরে। একটি করে ছ্যাঁক শব্দ উঠল আর জোলা একটি করে দাগ কাটলে মাটিতে। তারপর ছ্যাঁক শেষ হতেই উঠে গিয়ে বলল—দে খেতে। বউ খেতে দিলে কিন্তু একটি কই মাছ।

—এ কী, আর গেল কোথায়?

—একটা মাছ বেড়াল খেয়ে গেল।

—তা হলেও তো পনেরোটা থাকে।

—খপ করে গর্ত থেকে একটা ইঁদুর বেরিয়ে একটা নিয়ে গেল।

—দুটো গেল। বাকি থাকে চোদ্দটা।

—ভূতে নিয়েছে দুটো। ওই সওড়া গাছের ভূত মাছের গন্ধে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে—

—তাই গেল তবু থাকে বারোটা।

—ভয়ে নড়ে বসতে গিয়ে হাতের ধাক্কায় ছুটো পড়ল আগুনে।

সেতাব হাসেন আর বলেন—বুঝলি, এইভাবে জোলার বউ হিসেব দিলে পনেরোটা কই মাছের। সেগুলি উনোশালে রান্না করতে করতে গুবগুব করে তিনি ভক্ষণ করেছেন। তারপর পনেরোটা মাছের যথাবিহিত হিসেব দিয়ে তিনি চেপে বসে বললেন—

'আমি যে ভালোমানুষের ঝি—
তাই এত হিসেব দি।
তুই যদি ভালোমানুষের পো—
তবে ন্যাজটা মুড়োটা খেয়ে মাঝখানটা থো।'

বলে পরম কৌতুকে সেতাব হা-হা করে হাসেন।

* * *

বাইরে থেকে কে ডাকলে—মশায়! কই? কোথায়?

মশায় একটু চকিতভাবেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন; কিশোরের গলা। কিশোর কলকাতায় গিয়েছিল; ফিরেছে তা হলে। বোধ হয় কিছু নিয়ে এসেছে। সে কলকাতায় গেলেই তাঁর জন্ত কিছু না কিছু আনে। একা তাঁর জন্ত নয়, অনেকের জন্ত। আবালবৃদ্ধবনিতারই প্রিয়জন কিশোর। ছেলেদের জন্ত পেন্সিল, বই, মেয়েদের জন্ত সেলায়ের সরঞ্জাম, দুঃস্থ মধ্যবিত্ত ছেলেদের জন্ত জামা, প্যাণ্ট নিয়ে আসে। তাঁকে চার-পাঁচবার ফাউণ্টেন পেন এনে দিয়েছে, প্রেসক্রিপশন লিখতে। সব হারিয়েছে। মধ্যে মধ্যে জুতো এনে দেয়। যেবার ও সব কিছু আনে না সেবার অন্তত কিছু ফল। কিশোর চিরদিন নবীন কিশোর ছুলাল হয়েই রইল। তিনি সাড়া দিলেন—কিশোর!

—কোথায়? বেরিয়ে আস্থন; অনেক লোক আমার সঙ্গে।

মশায় বেরিয়ে এলেন, কিশোর কোন্ দায় এনে ফেললে কে জানে? কোনো গ্রামে মহামারীর দায়, কোনোখানে হাঙ্গামার দায়—সব দায়েই মাথা পাতা ওর স্বভাব।

বেরিয়ে এসে মশায় বিস্মিত হয়ে গেলেন, কিছু বুঝতে পারলেন না তিনি। এ যে সম্রান্ত নাগরিকের দল। কোট-প্যাণ্ট-পরা, মার্জিতকান্তি, শিক্ষা ও বুদ্ধি-দীপ্ত-দৃষ্টি বিশিষ্ট ব্যক্তি সব। থানার দারোগা সঙ্গে; আরও কজন এথানকার সরকারী কর্মচারীও রয়েছে; প্রদ্যোত ডাক্তারও রয়েছে। নবগ্রামের ধনী ব্রজলাল বাবুর উত্তরাধিকারীরা এথন সদর শহরে বাস করে, ব্রজলালবাবুর বড় নাতিও রয়েছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট রয়েছে। তাঁরা এখানে? তাঁর দরজায়?

তবে কি প্রদ্যোত ডাক্তার সেই দরখাস্ত করেছে? হৃদয়হীন মূর্খ হাতুড়ে নিদান হেঁকে রোগগ্রস্তকে অকালে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়! মহান্তকে তিনি কয়েকদিন—অন্তত কয়েক ঘণ্টা আগেও মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছেন।

রগের শিরা দুটো তাঁর দাঁড়িয়ে উঠল। তিনি কিছু বলবার আগেই কিশোর ভদ্রলোকদের লক্ষ্য করে বললে—ইনিই আমাদের মশায়। তিন পুরুষ ধরে এখানকার আতুরের মিত্র। আতুরস্য ভিষঙ্‌মিত্রং। এই ভাঙা আরোগ্য-নিকেতনই একশো বছরের কাছাকাছি আমাদের হেল্‌থ সেণ্টার ছিল।

দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিগুলির মুখে স্মিত হাস্য-রেখা দেখা দিল। তার কতকটা যে কৃত্রিম তাতে সন্দেহ ছিল না। তাঁরা নমস্কার করলেন মশায়কে। তিনিও প্রতিনমস্কার করলেন।

কিশোর তাঁর হয়ে ওকালতি করছে। এককালে কত করেছেন—সেই কথা বলে একালের অপরাধ মার্জনা করতে বলছে। প্রদ্যোত গম্ভীরমুখে মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর একজন কোট-প্যাণ্ট-পরা তরুণ মৃদুস্বরে তাকে কী বলছে। হরেনও রয়েছে একপাশে।

কিশোর বললে—আর এঁরা হলেন আমাদের নতুন পশ্চিম বাঙলা গড়বার কর্তাব্যক্তি সব। বিশ্বকর্মার দল। কমিউনিটি প্রজেক্টের কথা শুনেছেন তো? একশোখানা গ্রাম নিয়ে নতুন আমলের দেশ তৈরি হবে। এখানেও আমাদের একটা প্রজেক্ট হচ্ছে। নবগ্রাম হবে সেণ্টার। নতুন রাস্তা-ঘাট, ইস্কুল-হাসপাতাল ইলেকট্রিক, অনেক ব্যাপার। সেই জন্যে এ অঞ্চল দেখতে এসেছেন। পথে আপনার 'আরোগ্য-নিকেতনে'র সাইনবোর্ড দেখে জিজ্ঞাসা করলেন। তাই বললাম—'আরোগ্য-নিকেতন' ভেঙেছে, কিন্তু তার প্রাণ এখনও আছে, মশায় এখনও আছেন। তাঁকে না দেখলে এখানকার প্রাণের কি দাম কী শক্তি তা বুঝতে পারবেন না।

অকস্মাৎ মশায়ের মনে হল—শুষ্ক সমুদ্রের বালুরাশির মতো তাঁর অন্তরে কোন গভীর অন্তরতল থেকে উথলে বেরিয়ে আসছে উচ্ছ্বসিত লবণাক্ত জলরাশি। ঠোঁট দুটি তাঁর থরথর করে কেঁপে উঠতে চাইছে। কঠিন দৃঢ়তার সঙ্গে চোয়ালে চোয়ালে চেপে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

কিশোর বললে—আপনার নাড়ীজ্ঞানের কথা বলছিলাম। সেই ডাঃ সেনগুপ্ত এসেছিলেন কলকাতা থেকে—ব্রজলালবাবুর নাতিকে দেখতে। মশায় পাঁচ দিনের দিন প্রথম রোগী দেখেছিলেন। রোগী দেখে বেরিয়ে এলেন। আমিও এলাম;

আমিও ছিলাম সেখানে। তখন আমি আমাদের সেবাসঙ্ঘের সেক্রেটারি; আমি নার্সিং করছিলাম। মশায়ের সঙ্গে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলাম।

* * *

সে অনেক দিনের কথা। অনেক দিন।

টাইফয়েডের ওষুধ হিসেবে 'কাজ' তখন এদেশে সবে ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে।

ব্রজলালবাবুর নাতির অসুখেই মশায় এই কাজের ব্যবহার দেখেছিবেন। কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার সেনগুপ্ত এসে ব্যবহার করেছিলেন কাজ। মহাশয় মহাপ্রাণ ধার্মিক লোক এই ডাক্তারটি।

জীবনমশায় তখন এ অঞ্চলের ধন্বন্তরি। ব্রজলালবাবু লক্ষপতি মানুষ, কীর্তিমান মহাপুরুষ, উইলিয়ম্‌স্ চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির প্রতিষ্ঠাতা। তিনিও তাঁকে স্নেহ করতেন—শুধু স্নেহই নয় তার সঙ্গে সম্ভ্রমও। তিনি মশায়কে আধুনিক সাজে সাজিয়েছিলেন। দেখা হলেই হেসে বললেন—জীবন, এতবড় চিকিৎসক তুমি—তুমি ভালো পোশাক করো! জান, একবার কলকাতায় থিয়েটার দেখলাম। তাতে এক হাল ফ্যাশানের বাড়িতে এক বড় ডাক্তার দেখতে এল রোগী। তা সে রোগী বলে—ওর পায়ে মোজা নেই ও কেমন ডাক্তার? চার টাকা ফী ওকে কক্ষনো দিতে পাবে না। পালাটি চমৎকার। তা কথাটিও সত্যি হে, ভেক চাই।

জীবনমশায় বলতেন—আজ্ঞে কর্তাবাবু, ওসব যদি এ জন্মেই গায়ে দিয়ে শেষ করে শখ মিটিয়ে যাব তবে আসছে জন্মে এসে শখ মেটাব কিসে?

কর্তাবাবু হা-হা করে হেসে বলতেন—কোট-প্যাণ্ট পরবে মশায়, বিলেত-ফেরত সাহেব ডাক্তার হবে।

কর্তাবাবু হা-হা করে হেসে বলতেন—সে ডবল প্রমোশন হবে, কর্তাবাবু, সামলাতে পারব না। শেষে বলতেন—কর্তাবাবু আপনার কথা আলাদা। আপনার মুক্তি কর্মযোগে। বাড়িতে কাশী প্রতিষ্ঠা করেছেন, বৃন্দাবন তৈরি করেছেন—ভগবান বেঁধেছেন, ইস্কুল দিয়েছেন, চিকিৎসালয় দিয়েছেন, মুক্তি আপনার করতলগত। আমরা সাধারণ মানুষ, ভক্তি-টক্তি করে ত্রাণ পাব। ও সব জামা-কাপড়-পোশাকের গরমে ভক্তি উপে যায়, থাকে না। ও সব আমাদের নয়।

কর্তাবাবু কিন্তু এতেও মানেন নি। তাঁর সেবার কলকাতার কাঁকড়া খেয়ে খেয়ে হয়েছিল আমাশয়, সেই আমাশয় মশায় ভালো করেছিলেন। তখন শীতকাল। ভালো হয়ে উঠে ব্রজলালবাবু দর্জি পাঠিয়ে মশায়ের গায়ের মাপ নিয়ে কলকাতা থেকে দামী চায়না কোট তৈরি করে এনে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রজলাল-বাবুর বাড়িতে অসুখ একটু বেশী হলেই তাঁর ডাক পড়ত। সাধারণত দেখত তাঁর

চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির ডাক্তার। তাঁর ডিসপেনসারির ডাক্তারকে তিনি বাড়িতে না ডাকলে অন্য লোকে ডাকবে কেন ?

ব্রজলালবাবুর নাতি—তাঁর দৌহিত্রের অসুখ! একজরী জ্বর। কলকাতা থেকে মাতামহের বাড়ি এসে জ্বরে পড়েছে। ডিসপেনসারিতে এসেছে তখন একজন তরুণ ডাক্তার। হরিশ প্রায় বছর আষ্টেক আগে চলে গেছে। তারপর দুজন এসেছে, দুজনই পসার না হওয়ায় চলে গেছে। তারপর এই তরুণটি, চক্রধারী। যে চক্রধারী এখন চিকিৎসা ছেড়ে প্রায় সন্ন্যাসী। চক্রধারী তাঁর ছেলে বনবিহারীর বন্ধু। চক্রধারীই দেখছিল, পাঁচ দিনেও জ্বরের বৃদ্ধিমুখ কম না পড়ায় তাঁকে ডেকেছিলেন ব্রজলালবাবু। অবশ্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ ঘটে নি তখন। তবু ধনী মানুষ, দৌহিত্র এসেছে কলকাতা থেকে—তাই তাঁকে ডেকে একজনের স্থলে দুজন ডাক্তার দেখানো। শীতকালের দিনে জীবনমশায় চায়না কোটটি গায়ে দিয়েই দেখতে গিয়েছিলেন। কর্তাবাবু রসিকতা করেছিলেন।

—কোট গায়ে দিয়েছ জীবন ? ভক্তিকে উপিয়ে দিলে নাকি ?

মশায় বলেছিলেন—আজ্ঞে, ভক্তিকে এ জন্মের মতো শিকেয় তুলে রাখলাম কর্তাবাবু। সে যা হয় আসছে জন্মে হবে। তা ভক্তিই যখন শিকেয় তুললাম তখন কোট গায়ে দিতে দোষ কী বলুন।

ছেলেটির নাড়ী দেখবার আগে তাঁর কানে এসেছিল কয়েকটি মৃদুস্বরের কথা। কলকাতারই কেউ অসন্তুষ্ট হয়ে পাশের ঘরে বলছিল—এ সব কী করচেন এ রা। হাতুড়ে ডেকে হাত দেখানো—এগুলো ভালো নয় !

জীবনমশায়ের পায়ের ডগা থেকে রক্তস্রোত বইতে শুরু করেছিল মাথার দিকে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে হাত দেখতে বসেছিলেন।

তাঁর বাবা বলেছিলেন—ধ্যানযোগে নাড়ী পরীক্ষা করতে হয়। সেদিন সেই যোগ যেন মুহূর্তে সিদ্ধিযোগে পরিণতি লাভ করেছিল। সেই ধ্যানযোগে তিনি অনুভব করেছিলেন কঠিন সান্নিপাতিক-দোষদুষ্ট নাড়ী !

নাড়ী ছেড়ে উঠে বাইরে এসে হাত ধুয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন—ছেলেটির জ্বর সান্নিপাতিক, মানে টাইফয়েড, কর্তাবাবু। এবং—

—কী জীবন ?

—বেশ শক্ত ধরনের টাইফয়েড। ভালো চিকিৎসা চাই। সদর থেকে কাউকে এনে দেখান।

ওই পাশের ঘরের কথা তাঁর কানে না গেলে হয়তো এমনভাবে তিনি বলতেন না। একটু ঘুরিয়ে বলতেন।

সদরের ডাক্তার এসে দেখে বলেছিলেন—যিনি বলেছেন তিনি বোধ হয় একটু বাড়িয়ে বলছেন। টাইফয়েড বটে—তবে কঠিন কিছু নয়। সেরে যাবে।

জীবনমশায় তাঁর সামনেই ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন—আজ্ঞে না! আমার জ্ঞানে রোগ কঠিন। তবে যদি বলেন আমি হাতুড়ে, সে অন্য কথা।

কিশোর তখন তরুণ! সে বাইরে তাঁর সঙ্গে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল—কী দেখলেন ডাক্তারবাবু? খুব শক্ত?

মশায় তাকে বলেছিলেন—ব্যাপারটা জটিল বাবা কিশোর। সদরের ডাক্তার বুঝতেই পারছে না। জিভের দাগ, পেটের ফাঁপ, দুবার জর ওঠানামা, জরের ডিগ্রি দেখে ও বিচার করছে। আমি নাড়ী দেখেছি। ত্রিদোষদুষ্ট নাড়ী। এবং—। তুমি বোলো না কিশোর, এ রোগ আর ব্রহ্মা-বিষ্ণুর হাতে নাই! এক শিব—যিনি নাকি মৃত্যুর অধীশ্বর, তিনি যদি রাখেন তো সে আলাদা কথা।

দশ দিনের পর থেকে রোগ হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল। শহরের ডাক্তার আবার এসে বললেন—হ্যাঁ, দ্বিতীয় সপ্তাহে এ রোগ বাড়ে। তাই বেড়েছে। তা হোক ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি আমি। কমে যাবে এতেই।

তেরো দিনের দিন রোগ হয়ে উঠল কঠিনতর।

কিশোরকে ডাক্তার বললেন—বিকার আসছে কিশোর। আঠারো দিন অথবা একুশ দিনে ছেলেটি মারা যাবে। মনে হচ্ছে তার আগে সান্নিপাত দোষে একটি অঙ্গ পঙ্গু হয়ে যাবে। কিশোর, আমি দেখতে পাচ্ছি। সান্নিপাতিক জর এমন পূর্ণ মাত্রায় আমি আর দেখি নি বাবা।

চোদ্দ দিনের দিন ছেলে অজ্ঞান হয়ে গেল। মেনিনজাইটিস যোগ দিলে। কলকাতায় লোক গেল, বড় ডাক্তার চাই। যা লাগে।

জীবনমশায় বললেন—তা হলে অবিলম্বে কর্তাবাবু। আজই। নইলে আক্ষেপ করতে হবে! রোগ বড় কঠিন কর্তাবাবু।

সে মুহূর্তেই চোখ পড়েছিল কলকাতার সেই আত্মীয়টির দিকে। একটু হেসে বলেছিলেন—আমার অবিশ্যি হাত দেখে মনে হচ্ছে রোগ অত্যন্ত কঠিন। কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এসেছিলেন, এম. ডি; অল্প বয়স হলেও বিচক্ষণ চিকিৎসক। জাতিতে বৈদ্য; নাড়ী দেখার অধিকার রাখেন; ধীর স্থির মিষ্টভাষী। ডাক্তার সেনগুপ্ত সত্যকারের চিকিৎসক।

তিনি রোগের বিবরণ শুনে ফাজ নিয়ে এসেছিলেন ফাজ সেই প্রথম ব্যবহার হল এ অঞ্চলে।

জীবনমশায়ের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করেছিলেন। নাড়ী দেখে অনুমানের কথা

শুনে বলেছিলেন—আপনার অনুমানই বোধ হয় ঠিক। তবু আমাকে চেষ্টা করতে হবে। শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। কর্তব্য করে যেতে হবে। কী করব?

আঠারো দিনের দিনই ব্রজলালবাবুর দৌহিত্র মারা গিয়েছিল। আঠারো দিনের সকালবেলা বাম অঙ্গ পড়ে গিয়েছিল, বাঁ চোখটি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

চারদিকে জীবনমশায়ের নাড়ী-জ্ঞানের খ্যাতি রটে গিয়েছিল এর পর।

কিশোর বলে চলেছিল—সেকালের জীবনমশায়ের কথা।

শুধু খ্যাতিই নয়—একটা দৃষ্টিও তাঁর খুলে গিয়েছিল এর পর থেকে। তিনি বুঝতে পারতেন। সে আসছে কি না আসছে, নাড়ী ধরলে অনুভব করতে পারতেন অনায়াসে। এবং সে কথা ক্ষেত্রবিশেষে অর্থাৎ রোগী প্রবীণ হলে স্পষ্টই বলতেন; মণি চাটুজ্জের মায়ের বেলা বলেছিলেন—বাবাজী, এবার বুঝি মাথা কামাতে হয় গো!

মণি চাটুজ্জের চুলের শখ ছিল অসাধারণ।

রাম মিত্তিরকে তার বাপের অসুখে প্রথম দিন দেখেই বলেছিলেন—রাম, বাবার কাছে যা জানবার শুনবার জেনেশুনে নিয়ো। উনি বোধ হয় এ যাত্রা আর উঠবেন না।

রোগী অল্পবয়সী হলে ইঙ্গিতে বলতেন—তাই তো হে, রোগটা বাঁকা ধরনের, তুমি বরং ভালো ডাক্তার এনে দেখাও।

কাউকে অন্যভাবে জানাতেন।

এরই মধ্যে একদিন সুরেনের ছেলে শশাঙ্কের বড় ভাই এসে বললে—মশায়-কাকা, একবার শশাঙ্ককে দেখে আসবেন।

—কী হয়েছে শশাঙ্কের?

—জর হয়েছে আজ দিন চারেক।

—আচ্ছা যাব। কাল সকালে যাব বাবা। আজ বন্থ এল কলকাতা থেকে। বাঁশি, বাঁয়া-তবলা এনেছে; গান-বাজনা হবে। একটু খাওয়া-দাওয়াও হবে। আসিস বাবা তুই। আমি কাল সকালেই যাব।

বনবিহারীর বন্ধু শশাঙ্ক। বছর খানেকের ছোট। জমিদারী সেরেস্তার হিসাবনবীশ তাঁর সেই বাল্যবন্ধু সুরেনের ছোট ছেলে। বাল্যকালেই মাতৃবিয়োগ হয়েছিল। সুরেন বেঁচে থাকতেই তার বিয়ে দিয়ে সংসারী করে দিয়ে গেছে। ভালো ছেলে, মিষ্টভাষী ছেলে শশাঙ্ক। কী হল ছেলেটার?

* * *

পরের দিন সকালেই গিয়েছিলেন শশাঙ্ককে দেখতে।

সুরেনের গৃহিণীহীন সংসারে বধূরাই আপন-আপন স্বামী নিয়ে স্বাধীনা। তরুণী বধূটিই শশাঙ্কের শিয়রে বসে ছিল। সম্ভবত শশাঙ্কের জরোতপ্ত কপালে নিজের মুখখানি রেখেই শুয়ে ছিল। মশায়ের জুতোর শব্দে উঠে বসেছে।

শশাঙ্কের কপালে সিঁদুরের ছাপ লেগে রয়েছে। একটু হাসলেন ডাক্তার। মেয়েটি ছেলেটি দুজনেই তাঁর স্নেহাস্পদ। বধূটিও তাঁর জানাশোনা ঘরের মেয়ে, বাল্যকাল থেকেই দেখে এসেছেন। স্নেহের বশেই মশায় মেয়েটির দিকে চাইলেন। চোখ তাঁর জুড়িয়ে গেল। লালপাড়-শাড়ি-পরা ওই গৌরতনু বধূটির নতুন রূপ তাঁর চোখে পড়ল। একটি অপরূপ ছবি দেখলেন যেন। তাঁকে দেখে মেয়েটির মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল। মাথায় ঘোমটা টেনে সে সরে বসল। মনে হল মেয়েটির এই বধূরূপেই তার সকল রূপের চরম প্রকাশ।

ডাক্তার বসে শশাঙ্কের হাত ধরলেন। তাঁর নিজের হাত কেঁপে উঠল, চোখ দুটি চকিতে যেন খুলে গেল, একবার বধূটির দিকে তাকালেন। আবার চোখ বুজলেন।

এ কি? আজ তৃতীয় দিন। এরই মধ্যে এত স্পষ্ট লক্ষণ! আবার দেখলেন। না, ভ্রান্তি নয়। ভ্রান্তি তো নয়! এই বধূটির এমন অপরূপ রূপ মুছে দিয়ে শশাঙ্ককে যেতে হবে? দু সপ্তাহ?

হ্যাঁ তাই! ভ্রান্তি নয়, তিনি বিমূঢ় নন, অন্যমনস্ক তিনি হন নাই। শশাঙ্ককে যেতে হবে। এমন স্পষ্ট মৃত্যুলক্ষণ তিনি কদাচিৎ প্রত্যক্ষ করেছেন নাড়ীতে। শেষ রাত্রের পাণ্ডুর আকাশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণাংশে অগ্নিকোণে শুক্রাচার্যের প্রদীপ্ত স্পন্দিত উদয় যেমন রাত্রি-শেষ ঘোষণা করে—এমন কি দণ্ড পলে-উদয়কালের বিলম্বটুকু পর্যন্ত পরিমাপ করে দেয়, তেমনিভাবে—ঠিক তেমনিভাবে—নাড়ী-লক্ষণ বলছে দু সপ্তাহ! চোদ্দ দিন।

মনে আর অশান্তির সীমা ছিল না। বেদনার আর অন্ত ছিল না। শশাঙ্ক বনবিহারীর বয়সী, কিছু ছোট। মাতৃহীন ছেলেটা তাঁর ডাক্তারখানার সামনে খেলে বেড়াত। তাঁর চোখের সামনে বড় হল। আর এই বধুটি? লালপাড় শাড়িতে শাঁখায় রুলিতে, সিঁথিতে সিঁদুরের রেখায় সুন্দর ছোট কপালখানির মাঝখানে সিঁদুরের টিপে লক্ষ্মীঠাকরুনের মতো এই মেয়েটি?

এই সমস্ত শোভার সব কিছু মুছে যাবে? থান কাপড়, নিরাভরণা মূর্তি—কল্পনা করতে পারেন নি জীবনমশায়। মনে পড়েছে মেয়েটির বাল্যকালের কথা। পাশের গাঁয়ের মেয়ে। এ অঞ্চলে জাগ্রত কালী ঠাকুরের সেবায়েতের মেয়ে। বড় সমাদরের কন্যা। মেয়েটিকে ছেলে বয়সে বাপমায়ে বলত—বিল্লী। পুষি।

ওই আদর-কাঙালীপনার জন্য আর আমিষে রুচির জন্য। একখানি ডুরে কাপড় পরে কালীস্থানের যাত্রীদের কাছে সিঁদুরের টিপ নিয়ে বেড়াত আর পয়সা আদায় করে পেঁয়াজ-বড়া কিনে খেত। অন্তরটা বেদনায় টনটন করে উঠল।

দুদিন পর শশাঙ্কের নাড়ী দেখে তিনি একেবারে আর্ত হয়ে উঠলেন। স্থির জেনেছেন—শশাঙ্ককে যেতে হবে। নাড়ীতে যেন পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন, সে আসছে। ওষুধ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

সেই আর্ত মানসিকতার আবেগে একটা কল্পনা করে আতর-বউকে ডেকে বললেন—দেখো, কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখছি—মা-কালীকে ভোগ দিচ্ছি, মা যেন সেই ভোগ নিজে হাত পেতে নিচ্ছেন। আর আশ্চর্য কী জান? কালী মা যেন আমাদের শশাঙ্কের বউ।

আতর-বউ বলেছিলেন—তা আর আশ্চর্য কী; শশাঙ্কের বউ কালীমায়ের দেবাংশীর মেয়ে! হয়তো—।

—এক কাজ করো আতর-বউ, শশাঙ্কের বউকে কাল নেমন্তন্ন করে খাওয়াও।

—বেশ তো।

আমিষের নানা আয়োজন করে এই বধূটিকে খাওয়াতে চেয়েছিলেন। বড় একটা মাছের মুড়ো তার পাতে দিতে বলেছিলেন। শশাঙ্কের তখন ছদিন জ্বর। জ্বরটা শুধু বেড়েছে; অন্য কোনো উপসর্গ দেখা দেয় নি। বাকুলের কালীবাড়ি থেকে প্রসাদী মাংসও আনিয়েছিলেন। কী যে ভ্রান্তি তাঁর হয়েছিল। মাছের মুড়োটা নামিয়ে দিতেই বধূটি চমকে উঠেছিল।

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সমস্ত আয়োজনের দিকে তাকিয়ে হাত গুটিয়ে উঠে পড়েছিল। আতর-বউ ব্যস্ত হয়ে উঠে বলেছিলেন— কী হল? কী হল?

স্থির কণ্ঠে মেয়েটি বলেছিল—আমার শরীর কেমন করছে। আমি বাড়ি যাচ্ছি।

সন্ধ্যায় ডাক্তার শশাঙ্ককে দেখে বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। মৃত্যুলক্ষণ নাড়ীতে উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবলার বোলে—ঠিক মাঝখানে এসেছে। সেই গতিতে বাজছে। কাল সপ্তাহ শেষ—আর এক সপ্তাহ একদিন, অষ্টাহ।

বাড়ির মুখেই একটা গলি।

ডাক্তারের ভারী পা আরও ভারী হয়ে উঠেছে। পিছন থেকে ডাক শুনলেন—দাঁড়ান। ডাক্তার ফিরে দাঁড়ালেন। দেখলেন একটি কেরোসিনের ডিবে হাতে দাঁড়িয়ে আছে শশাঙ্কের বউ। ডিবের আলো তার মুখের উপর পড়েছে, গৌরবর্ণ মুখের উপর রক্তাভ আলো। সিঁথিতে সিঁদুর ডগডগ করছে। চোখে তার

স্থির দৃষ্টি। তাতে প্রশ্ন। মশায়েরও সে দৃষ্টি অসহ্য মনে হল; চোখ নামিয়ে নিলেন তিনি।

বললেন—কিছু বলছ?

—ও বাঁচবে না? লুকোবেন না আমার কাছে। আশ্চর্য ধীরতা তার কণ্ঠস্বরে। প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না ডাক্তার!

মেয়েটি বললে—না যদি বাঁচে তো কী করব; আপনিই বা কী করবেন? কিন্তু এমনি করে আপনায় নিজের ছেলের মৃত্যু জেনে—তাকে মাছের মুড়ো, মাংস খাওয়াতে পারবেন? সেই কথা মনে পড়ছে মশায়ের।

অবশ্য সেদিন তিনি এতে বিচলিত হন নি। সেদিনের জীবনমশায় অন্য মানুষ ছিলেন। গরলাভরণ নীলকণ্ঠের মতো দৃকপাতহীন। লোকে বলত, মশায় সত্য কথা বলবেই, সে ভালোই হোক আর মন্দই হোক। অনেকে বলত, ডাক্তার-কবিরাজেরা মৃত্যু দেখে দেখে এমনিই হয়ে পড়ে। ঘাঁটা পড়ে যায় মনে। অনেকে বলত, পসার বাড়ায় জীবনমশায় পালটে গিয়েছে—দাম্ভিক হয়েছে খানিকটা।

কারও কথাই মিথ্যে নয়। সবার কথাই সত্য। তবে এগুলি উপরের সত্য—ফুলের পাপড়ির মতো। মাঝখানে যেখানে থাকে মর্মকোষ—সেখানকার সত্য কেউ জানে না। সেখানে একদিকে ছিল বিষ অন্যদিকে অমৃত। সংসার-জীবনের অশান্তি—আতর-বউয়ের উত্তাপ—মঞ্জরীর অভিশাপ—বনবিহারীর মধ্যে ফলেছিল সে অভিশাপ; তিনি জানতে পেরেছিলেন, এ বংশের মহাশয়ত্ব বনবিহারীর মধ্যেই হবে ধুলিসাৎ এবং বনবিহারী যে দীর্ঘজীবি হবে না সেও তিনি জানতেন। অন্যদিকে হয়েছিল ধ্যানযোগে নাড়ী-জ্ঞানের অদ্ভুত বিকাশ। দুইয়ে মিলে তাঁর সে এক বিচিত্র অবস্থা। কখনও আধুনিকদের ব্যঙ্গে বলে ফেলতেন নিষ্ঠুর সত্য। কখনও করুণায় আত্মহারা হয়ে বলে ফেলতেন।

জীবনমশায় একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়েটিকে বলেছিলেন—মা, শশাঙ্ককে যদি বাঁচাতে পারি তবেই এর উপযুক্ত উত্তর হয়। কিন্তু।

কথাটা পালটে নিয়েছিলেন—আমার ছেলের কথা বললে মা! শশাঙ্ক আর বনবিহারী একসঙ্গে খেলা করেছে, পড়েছে—সে সবই তুমি জান। শশাঙ্কও আমার ছেলের মতোই। আজ তার কথাই যখন বলতে পারলাম ইঙ্গিতে, তখন বনবিহারীকেও যদি অকালে যেতে হয়—আর আমি যদি জানতে পারি—তবে শশাঙ্কের বেলা যেমন জানিয়ে দিলাম তেমনি ভাবেই জানাব, রকমটা একটু আলাদা হবে। তোমাকে তো ইঙ্গিতে জানিয়েছি। বন্ধুর বেলা—তোমার কথাই

যদি ফলে মা, তবে আতর-বউকে স্পষ্ট বলব—বন্ধুর বউকেও স্পষ্ট বলব—বন্ধু বাঁচবে না। এবং তার যদি কোনো সাধ থাকে তাও মিটিয়ে নিতে বলব। আমার উপর মিথ্যে ক্রোধ করলে মা। মৃত্যুর কাছে আমরা বড় অসহায়।

অন্য কেউ বললে এই নূতন কালের পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-প্রভাবিত ব্যক্তিগুলি বিশ্বাস তো করতেনই না—উলটে ব্যঙ্গ হাস্য করতেন। কিন্তু কিশোর গোটা বাংলাদেশে পণ্ডিত এবং কর্মী হিসেবে সুপরিচিত, শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়াও আর একটি মহৎ গুণের সে অধিকারী। সে সত্যবাদী। পৃথিবীতে কোনো গুরুতর প্রয়োজনেও সে মিথ্যা বলে না এবং কারও মনোরঞ্জনের জন্যও সত্যকে সে অতিরঞ্জিত করে না।

গল্প দুটি শুনে সকলের মুখেই প্রশংসা-প্রসন্ন বিস্ময় ফুটে উঠল। একজন বললেন —সত্যই অদ্ভুত।

কিশোর হেসে বললে—কী করছিলেন? দাবা খেলছিলেন বুঝি? এরই মধ্যে সেতাব ঘর থেকে উঠে এসে জীবনমশায়ের পিছনে দাঁড়িয়েছে। ধোঁয়া দেখে আগুন অনুমানের মতো কিশোর অভ্রান্ত অনুমান করেছে।

মশায় আজ ছোট ছেলের মতো লজ্জিত হলেন। মাথা হেঁট করে হেসে বললেন —বৃদ্ধ বয়সে অবলম্বন তো একটা চাই! কী করি বলো? তুমিও তো শুনেছি এখনও ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে যাও। অবিশ্যি—তুমি নামেও কিশোর কাজেও চিরকিশোর। লোকে বলে কিশোরবাবু আর সাবালক হল না, চিরকাল নাবালকই থেকে গেল। তাই থেকো বাবা—চিরদিন যেন তুমি তাই থেকো।

বলতে বলতেই তাঁর চোখ দিয়ে দুটি জলের ধারা গড়িয়ে এল। দীর্ঘকাল পর, সুদীর্ঘকাল পর, কতকাল পর তার হিসেব নাই। হিসেব নাই।

মশায়ের চোখে জল দেখে কিশোর একটু অভিভূত হয়েই বললে, আচ্ছা চলি। এঁদের সব দেখিয়ে আনি।

রওনা হয়ে গেলেন তাঁরা। সকলেই যেন কেমন হয়ে গেছেন, নিঃশব্দে অগ্রসর হয়ে গেলেন। কথা যেন হারিয়ে গেছে। দাঁড়াল শুধু হরেন। হরেন এসে বললে—একটা ভালো খবর আছে। বিপিনবাবুর আজ আবার ইউরিন রিপোর্ট এসেছে। দোষ খুব কমে গিয়েছে। ওবেলা যাবেন তো বিপিনবাবুকে দেখতে? আজ আমরা যখন যাব তখনই যদি যান তো ভালো হয়। আজ একবার সকলে মিলে ভালো করে দেখব।

অনমনস্কের মতো মশায় বললেন—সকলে মিলে দেখবে!

চব্বিশ

বিপিন সুস্থ আছে। নিজেই বললে—ভালোই মনে হচ্ছে।

রতনবাবু বললে—আজ ইউরিন রিপোর্ট এসেছে। যে দোষটুকু ছিল—অনেকটা কমে গিয়েছে।

মশায় যখন গেলেন, তখনও ডাক্তারেরা আসে নি। বিপিনের হাতের জন্য হাত বাড়িয়ে মশায় বললেন—ভালো হবার হলে এইভাবেই কমে। আমাদের সে আমলের একটা কথা ছিল রতন—তোমার নিশ্চয় মনে আছে—রোগ বাড়বার সময় বাড়ে তালপ্রমাণ, কমবার সময় কমে তিলে-তিলে।

—তুমি একবার নাড়ী দেখে আমাকে বলো। কী বুঝছ? কী পাচ্ছ?

—রোজই তো বলছি রতন।

—না। আজ কেমন দেখলে—এখন কেমন আছে এ কথা নয়। সেই পুরনো আমলের নাড়ী দেখা দেখো। কত দিনে বিপিন উঠে বসতে পারবে।

বিপিন বললে—এ শুয়ে শুয়ে আর পারছি না। চাকাওয়ালা ইনভ্যালিড চেয়ারে যদি একটু বারান্দায় বসতে পাই—কি একটু বাইরে ঘুরে আসতে পারি তা হলে মনের অবসাদটা কাটে। তা ছাড়া এ যেন লজ্জায় আমি মরে যাচ্ছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের করুণার পাত্র। লোকে আহা উহু করছে, গোটা সংসারের লোকের বোঝা হয়ে ঘাড়ে চেপে রয়েছি—এ আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

মশায় চমকে উঠলেন মনে মনে। প্রতিষ্ঠাবান বিপিনের অন্তরলোকের অবস্থাটা যেন রঞ্জনরশ্মির মতোই কোনো এক রশ্মিচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। মশায়ের কাছে এটিও একটি উপসর্গ।

বিপিনের মুখের দিকে তাকিয়ে তার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলেন। নাড়ীতে উত্তেজনার আভাস ফুটে উঠেছে।

হাতখানি নামিয়ে রাখতেই বিপিন বললে—কবে উঠতে দেবেন?

মশায় বললেন—কাল বলব। আজ তুমি নিজেই চঞ্চল হয়ে রয়েছ।

—চঞ্চল উনি অহরহই। সেইটেই আপনি নিষেধ করুন ওঁকে। বিপিনের খাটের ওদিকে দাঁড়িয়েছিল একটি মেয়ে—বিপিনের স্ত্রী। রোজই থাকে। কথা বলে না। আজ সে বোধ করি থাকতে পারলে না, আজ সে কথা বলে ফেললে। প্রাণস্পর্শী সেবার মধ্যে এ উপসর্গটি তার মনে কাঁটার মতো ঠেকেছে; সব থেকে গভীরভাবে বিদ্ধ করছে বলে মনে হয়েছে। তাই বোধ করি থাকতে পারে নি।

পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসর বয়স; শান্ত শ্রীময়ী মেয়ে; কপালে সিঁদুরের টিপ—সিঁথিতে সিঁদুর উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। ঘোমটা সরিয়ে আজ প্রাণের আবেগে তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করে দাঁড়িয়েছে।

তিনি উত্তর দেবার আগেই উত্তর দিল বিপিন—দুর্বল কণ্ঠস্বর কাঁপছে, চোখ দুটি ঈষৎ প্রদীপ্ত। সে বলে উঠল—নিষেধ করুন। নিষেধ করুন! নিষেধ করলেই মন মানে? মেয়ে জাত! কী করে বুঝবে তুমি আমার এ যন্ত্রণা।

মশায় ব্যস্ত বয়ে বললেন—বিপিন, বাবা! বিপিন!

রতনবাবু ডাকলেন—বিপিন! বিপিন!

দুটি জলের ধারা গড়িয়ে এল বিপিনের দুটি চোখ থেকে। শ্রান্ত ভগ্ন কণ্ঠে সে বললে—আমি আর পারছি না। আমি আর পারছি না।

রতনবাবু গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। বিপিনের স্ত্রী পাখা নিয়ে এগিয়ে এল; বিপিন অভিমানভরেই বললে—না। শ্রীমন্ত, তুমি বাতাস করো।

শ্রীমন্ত বিপিনের ছেলে। সে পাখাখানি নিলে মায়ের হাত থেকে।

মশায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন—রোগীর দিকে লক্ষ্য রেখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলস্যের ভারে চোখের পাতা দুটি ভেঙে পড়ল বিপিনের। হাতখানি স্পর্শ করলেন মশায়। বিপিন আয়ত চোখ দুটি মেলে দেখে আবার চোখ বুজলে। বিপিনের নাড়ীতে স্তিমিত উত্তেজনা অনুভব করতে পারছেন মশায়। দীর্ঘক্ষণ নাড়ী পরীক্ষা করে তিনি বেরিয়ে এলেন।

—জীবন! পিছন থেকে মৃদুস্বরে ডাকলেন রতনবাবু।

—চিন্তিত হবার কারণ নাই রতন। অনিষ্ট কিছু ঘটে নি। কিন্তু সাবধান হতে হবে। এ রকম উত্তেজনা ভালো নয়, সে তো তোমাদের বলতে হবে না!

—সচরাচর এ রকম উত্তেজিত বিপিন হয় না। আজ হল। কিন্তু আমি যা জানতে চাইছি। তোমাদের বংশে নিদান দেবার মতো নাড়ীজ্ঞানের কথা আমি জানি—বিশ্বাস করি। আমি তাই জানতে চাচ্ছি।

হেসে মশায় বললেন—সে নাড়ী দেখার আমল চলে গিয়েছে রতন। এ আমল এ কাল আলাদা। আজ কত ওষুধ কত চিকিৎসা আবিষ্কার হয়েছে। এখন কি আর সে আমলের বিদ্যেতে চলে? ধরো ম্যালেরিয়ার জ্বর, আমার বিদ্যেতে ন দিনে জ্বর ছাড়বে, কিন্তু এখন ইনজেকশন বেরিয়েছে, প্যালুড্রিন এসেছে, তিনদিনে জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। টাইফয়েড দেখে আমরা বলব আঠারো দিন, একুশ দিন, আঠাশ দিন, বত্রিশ দিন, আটচল্লিশ দিন। অথচ নতুন ওষুধে দশ-বারো দিনে জ্বর ছেড়ে

যাবে। আজ নাড়ী দেখে আমি কী বলব? আজ তো ডাক্তারেরা আসছেন, দেখবেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করো।

—আপনি বলছেন না, আপনি লুকোচ্ছেন! কিন্তু নিজের ছেলের বেলায় তো লুকোন নি! নারীকণ্ঠে এই কথাগুলি শুনে চমকে উঠলেন মশায়। ফিরে পিছনের দিকে তাকালেন। পিছনে দাঁড়িয়ে বিপিনের স্ত্রী। কপালে সিঁদুর-বিন্দু, সিঁথিতে সিঁদুরের দীর্ঘ রেখা। উৎকণ্ঠিত মুখে স্থির দৃষ্টিতে প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

স্মৃতি যেন তাঁকে চাবুক দিয়ে নির্মম আঘাত করলে। নিজেকে প্রাণপণে সংযত করে তিনি বললেন—আমি সত্যি বলছি মা, আমি ঠিক কিছু বুঝতে পারছি না। তোমার বাড়ি এলেই আমার নিজের ছেলেকে মনে পড়ে। চঞ্চল হয়ে পড়ি। বুঝতে ঠিক পারি না। এর মধ্যে কোনো লুকোনো অর্থ নাই। আমাকে তোমরা ভুল বুঝো না।

জীবনমশায় হনহন করে বেরিয়ে এলেন।

—ডাক্তারবাবু, ফী-টা; ডাক্তারবাবু।

—কাল। কাল দিয়ো। কাল।

* * *

মর্মান্তিক স্মৃতি একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হচ্ছে—ঠিক যেন সেই! প্রভেদ আছে। সে ছিল তরুণী—ষোলো-সতেরো বছরের নিতান্তই গ্রাম্য মেয়ে। ঠিক এমনি দৃষ্টি নিয়েই প্রথম তার দিকে তাকিয়েছিল শশাঙ্কর স্ত্রী।

সে তাঁকে একরকম অভিসম্পাত দিয়েছিল। সে অভিসম্পাত পূর্ণ হয়েছে। বনবিহারী মরেছে। শশাঙ্ক মরেছিল আগন্তুজ ব্যাধির আক্রমণে। তার নিজের কোনো অপরাধ ছিল না। নিজের প্রবৃত্তি রিপু হয়ে মৃত্যুকে সাহায্য করে নি। একালের বীজাণু পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং একালের বিস্ময়কর বীজাণুনাশক ওষুধ থাকলে হয়তো—। না। আপন মনেই ঘাড় নাড়লেন মশায়। বাঁচত না শশাঙ্ক। একালেও পেনিসিলিন প্রয়োগ করে সকল রোগীকে বাঁচানো যায় না। রোগের কারণ বীজাণুর স্বরূপ নির্ণয় করেও ফল হয় না। তবুও শশাঙ্কের কোনো অপরাধ ছিল না। তার মৃত্যু মানুষের চিকিৎসাবিজ্ঞানে অপূর্ণতা অসম্পূর্ণতা। মৃত্যু ধ্রুব —কিন্তু সে মৃত্যু—আয়ুর পরিপূর্ণ ভোগান্তে—সূর্যাস্তের মতো; প্রসন্ন-সমারোহের মধ্যে। সেই কারণেই শশাঙ্কের কোনো অপরাধ ছিল না এবং ওই বধূটির প্রতি মমতায় তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। মুখে বলতে পারেন নি, ওই বধূটিকে নিমন্ত্রণ করে জীবন শেষবারের মতো মাছ-মাংস খাইয়ে মনের বেদনাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে মেয়ে বিচিত্র মেয়ে! এই অদ্ভুত দেশের অদ্ভুত

মেয়ে। যারা সেই কোন আদিকাল থেকে বৈধব্য পালন করে আসছে, দেহের ভোগকে ছেড়ে দিয়ে ভালবাসাকে বড় করতে চেয়েছে, এ মেয়ে সেই জাতের মেয়ে। অসাধারণ। বুঝতে পারেন নি মশায়।

সে তাঁকে অভিসম্পাত দিয়েছিল।

বিচিত্র যোগাযোগ, বনবিহারী এই অভিসম্পাত ফলবতী করবার জন্য আগে থেকেই সকল আয়োজন করে রেখেছিল তার জীবনে। সেই মেলার পর—প্রমেহ হয়েই শেষ হয় নি। বনবিহারী ক্ষান্ত হয় নি। আবারও হয়েছিল তার ঐ ব্যাধি।

সে স্মৃতি তাঁর মর্মান্তিক।

দেহ যতক্ষণ জীর্ণ না হয় ততক্ষণ মৃত্যু কামনা করা পাপ, সে কামনা আত্মহত্যার কামনার সামিল। তিনি তাই করেছিলেন। আহার, বিহার সমস্ত কিছুর মধ্যে জীবনমশায় হয়ে উঠেছিলেন আর-এক মানুষ। কুলধর্মকে তিনি লঙ্ঘন করেন না। লঙ্ঘন করেছিলেন আয়ুকে রক্ষা করার, দীর্ঘ করার নিয়মকে। কোনো ব্যভিচারের পাপে কলঙ্কিত করেন নি বংশকে—তিনি নিজের উপর অবিচারের আর বাকি রাখেন নি। মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। দুহাতে উপার্জন করে চার হাতে খরচ করেছেন। অন্তর্দাহে যত পুড়েছেন তত সমারোহে বাড়িয়ে তুলেছেন বাইরের জীবনে। শুধু চিকিৎসা-ধর্মেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি, নানান কর্মে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মদ খেয়ে নেশা করে লোক দুঃখ ভুলতে চায়। তিনি কাজের নেশায়, নামের নেশায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর আরোগ্য-নিকেতনের পাশে এই ইন্দারা করিয়েছিলেন তখনই। সেই শুরু। নিজে ছিলেন প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত—সরকারকে ধরে তিনভাগ টাকা আদায় করে সিকি টাকা নিজেই দিয়েছিলেন। গ্রাম থেকে হাসপাতালের সামনে দিয়ে সেই দুর্গম পথ—চোরধরার থানা, ঠ্যাঙভাঙার খন্দ-সঙ্কুল পথকে সুগম করে তুলেছিলেন! তাতেও দিয়েছিলেন সিকি টাকা।

দু-তিনখানা গাঁয়ের মজুরেরা মজুরি না পেলে আরোগ্য নিকেতনের সামনে এসে দাঁড়াত। তিনি যে-কোনো কাজে লাগিয়ে দিতেন।

মশায় বংশের মহাশয়ত্ব তো যাবেই, যাবার আগে রক্তসন্ধ্যার মতো সমারোহ করে তবে যাক।

নিজের দেহের উপর অবিচারেরও শেষ ছিল না।

সারাটা দিন না খেয়ে ঘুরেছেন! কল থাক বা না থাক, ঘুরেছেন—নেপলার

ভাই সীতারামের ওষুধের দোকানে বসে গল্প করেই একবেলা কেটে গেছে। যে ডেকেছে গিয়েছেন—চিকিৎসা করেছেন, ফীজ দিয়েছে নিয়েছেন—না দিয়েছে নেন নি। আবার পরদিন গিয়েছেন। সারা রাত দাবা খেলা তখনই শুরু। গানবাজনার আসর বসিয়েছেন, যে-কোনো ওস্তাদ এলে সংবর্ধনা করেছেন, তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার সমারোহ জুড়ে দিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে উল্লাস করেছেন। কিন্তু সন্ধ্যার সময় কালীমায়ের নাটমন্দিরে জনকয়েককে নিয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতে বিস্মৃত হন নি। কল থেকে ফিরতে রাত্রি হলেও একবার মায়ের ওখানে গিয়ে একা হাত জোড় করে গেয়ে এসেছেন—

রাধাগোবিন্দ জয় রাধাগোবিন্দ!

ওটুকু ভুলে যান নি। মশায় বংশের বৈষ্ণব মন্ত্রের চৈতন্য তাঁর জীবনে হল না। পরমানন্দ মাধবকে পাওয়া তাঁর ভাগ্যে নাই—তবে স্মরণ কীর্তন করতে ভুলে যান নি। উদ্দাম উদ্‌ভ্রান্ততার মধ্যেও ওইটুকু স্থিতি প্রশান্তি ছিল।

আতর-বউ বারবার আপত্তি করত, বলত—পস্তাবে শেষে বলে রাখছি।

হা-হা করে হাসতেন মশায়—কাছাকাছি কেউ না থাকলে বলতেন—আরে মঞ্জরীর জন্যে সে আমলে বাজারে ধার করে খরচ করেও পস্তাই নি আমি। তার বদলে তোমাকে পেয়েছি। আজ রোজগার করে খরচ করছি—তাতে পস্তাব?

—কত রোজগার কর শুনি? আতর-বউয়ের মুখ লাল হয়ে উঠত।

—কত দরকার বলো না। কত টাকা! আজই এখুনি দিচ্ছি তোমাকে। বলো কী গয়না চাই! কী চাই?

—কিছু চাই না। আমি তোমার কিচ্ছু চাই না। মেয়েদের বিয়ে—ছেলের লেখাপড়া হলেই হল। আমি দাসীবাঁদী হয়ে এসেছিলাম—তাই হয়েই থাকব।

—মিছে কথা বলছ। তুমি এসেছিলে শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে। সেই শাসন চিরকাল করছ। বুঝছ না, তোমার ছেলের জন্যে বড় আটন উঁচু আসন তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছি। ছেলে তো তোমার আমার মতো হাতুড়ে হবে না। হবে পাশকরা ডাক্তার। কিন্তু আমাদের ঘর তো নবগ্রামের ব্রাহ্মণ বনেদী জমিদারদের চেয়ে খাটো হয়েই আছে আজও। তাকে উঁচুতে তুলে ওদের সঙ্গে সমান করে দিয়ে যাচ্ছি!

এইখানে আতর-বউ চুপ করত। স্তব্ধ হয়ে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের দোলার মধ্যে পড়ে স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত।

না থেকে উপায় ছিল না! বনবিহারী ওই রোগাক্রান্ত হয়েই ক্ষান্ত হল না; রোগমুক্ত হওয়ার পরই সে লজ্জা-সংকোচ ঝেড়ে ফেলে দিলে অশোভন বেশভূষার

মতো। বৎসর খানেকের মধ্যেই বাপ এবং মায়ের যুধ্যমান অবস্থার সুযোগে প্রায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসল। একদা সে এসে বললে—স্কুলে পড়া আর হবে না আমার দ্বারা।

মশায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—হবে না?

—না। সংস্কৃত, অঙ্ক—ও আমার মাথায় ঢোকে না।

—ততঃ কিম্? হেসেই জীবনমশায় প্রশ্ন করেছিলেন।

অন্তরালবর্তিনী জননী প্রবেশ করে বলেছিলেন—কলকাতায় নতুন ডাক্তারি স্কুল রয়েছে—সেইখানে পড়বে ও। এখানে বছর বছর কত ফেল করবে?

—সেখানেও যদি ফেল করে?

—তখন তোমার মতো ডাক্তার হবে। তুমি তো না পড়ে না পাশ করে মুঠো মুঠো টাকা আনছ। বাপ যখন, তখন কুলবিদ্যেটা না হয় দয়া করে ছেলেকে শিখিয়েই দেবে।

—আমাদের কুলবিদ্যেতে যে সংস্কৃত বিদ্যে কিছু দরকার হয় ভদ্রে!

—কী, কী বললে আমাকে?

—ভদ্রে বলেছি। ভালো কথাই। মন্দ নয়।

—কিন্তু ঠাট্টা করে তো! তোমার মতো অভদ্র আমি দেখি নি। বাপ হয়ে ছেলের উপর মমতা নাই?

চুপ করেই ছিলেন জীবনমশায়। কি বলবেন? ছেলের উপর মমতা? বনবিহারীকে এম. বি. পড়াবার বাসনা ছিল তাঁর। সে বাসনার মর্ম আতর-বউ বুঝবে না। ইচ্ছা ছিল—ইচ্ছা ছিল বনবিহারী এম. বি.—হ্যাঁ তখন এল. এম. এস. উঠে এম. বি. হয়েছে—পড়তে আরম্ভ করলে তার বিয়ের আয়োজন করবেন। ঘটক পাঠাবেন। কান্দীতে কোনো জমিদার-ঘরের মেয়ে আনবেন। গ্রামের জমিদারির এক আনা অংশ নবগ্রামে জমিদারি বলে গ্রাহ্য হলেও কান্দীতে গ্রাহ্য হয় না; বনবিহারী এম. বি. ডাক্তার হলে সে অগ্রাহ্য সাদর সাগ্রহ গ্রাহ্যে পরিণত হবে। কান্দী যাওয়ার বাসনা পূর্ণ করবেন। ওই ভূপীদের জ্ঞাতিগোষ্ঠির ঘরের মেয়ে আনবেন। থাক, সে থাক।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মশায় বলেছিলেন—ভালো তাই হবে। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—তুমি তো বেলগাছিয়া আর. জি. কর মেডিক্যাল স্কুলের কথা বলছ?

—হ্যাঁ, সেখানে পাশটাশের দরকার হয় না।

—জানি বাবা, জানি। কিন্তু সেখানেও ফেল হয়, আমাদের নবগ্রামের

রায়বাবুদের অতীন পাশ করতে পারে নি। স্কুলে পাশ করতে না পার সেখানে পাশ করতে হবে তো? সেইটে যেন মনে রেখো।

—সে পাশ ঠিক করবে। তিন পুরুষ এই বিদ্যে ঘাঁটছে। দেখিস বাবা, ভালো করে পড়িস। হাতুড়ে বলে লোকে যেন মুখ না বাঁকায়। মশায় বংশের এই অখ্যাতিটা তোকে ঘুচোতে হবে।

ডাঃ আর. জি. কর মহাপুরুষ। অল্পবিদ্যা অল্প-সম্বল গৃহস্থ ছেলেদের মহা উপকার করেছিলেন। দেশে তখন ম্যালেরিয়ার মহামারণ চলেছে—বিলাতী ডাক্তারির হাঁকেডাকে, সরকারী অনুগ্রহে, তার পসারে কবিরাজদের ঘরগুলি বন্ধ হতে শুরু হয়েছে। দেশে বৈদ্যের অভাব। সেই সময়ে এই সব আধাডাক্তারেরা অনেক কাজে এসেছিল। শতমারি ভবেদ্ বৈদ্য, সহস্রমারি চিকিৎসক। হাজার হাজার লোক হয়তো এদের ভুলে ক্রটিতে মরেছে ভুগেছে—কিন্তু হাজারের পর লোকেরা বেঁচেছে, সেরেছে।

হাসলেন বৃদ্ধ জীবনমশায়। আর. জি. কর. মেডিক্যাল স্কুলে পড়তে গেল বনবিহারী। বনবিহারীর সঙ্গে গেল মামুদপুরের গন্ধবণিকদের ছেলে—বনবিহারীর অন্তরঙ্গ বন্ধু রামসুন্দর। মাস ছয়েক পরে বনবিহারী প্রথম ছুটিতে বাড়ি এল। গায়ে ডবল ব্রেস্ট কোট, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, সে আর এক বনবিহারী। বনবিহারীর মুখে সিগারেট। গায়ে কাপড়ে জামায় সিগারেটের গন্ধ; ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দুটির আগায় হলদে রঙের দাগ ধরেছে। সিদ্ধ জ্যোতিষী যেমন মানুষের আচারে আচরণে বাক্যে রূপে কর্মে নিজের গণনার রূপায়ণ দেখতে পান, অনিবার্য অবশ্যম্ভাবীকে সংঘটিত হতে দেখেন এবং লীলাদর্শন কৌতুকে মৃদু হাস্য করেন, ঠিক তেমনি হাসিই তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল সেই মুহূর্তে। পর মুহূর্তেই সে হাসি বিস্ময়ে পরিণত হয়েছিল তাঁর। ইন্দির গাড়ি থেকে নামিয়ে রেখেছিল হারমোনিয়মের বাক্স, এক জোড়া বাঁয়া-তবলা, একটা পিতলের বাঁশি, জোড়া দুই মন্দিরা, একজোড়া ঘুঙুর।

তা ভালো, তা ভালো। নৃত্যগীত কলাবিদ্যা চৌষট্টি কলার শ্রেষ্ঠ কলা, তা আয়ত্ত করা ভালো। নাদব্রহ্ম। সঙ্গীতে ঈশ্বর-সাধনা হয়, প্রেম জন্মায়; তা ভালো! এবং দীনবন্ধু মশায় নাম-সংকীর্তন করতেন—জগৎ মশায় পদাবলী শিখেছিলেন, জীবনকে শিখিয়েছিলেন, তিন পুরুষের তিনটে মৃদঙ্গ—আরোগ্য-নিকেতনেরই উপরের ঘরে যত্ন করে রাখা আছে। হাল আমলে তাঁর কেনা বড় খোলখানাই এখন ব্যবহার হয়, এর পর নূতন কালে এবং কালের অবশ্যম্ভাবী

পরিণতিতে বংশের কর্মফলে—অর্থাৎ তাঁর কর্মফলে পরবর্তী পুরুষ খোল তিনখানার সঙ্গে বাঁয়া তবলা মন্দিরা বাঁশি হারমোনিয়ম ঘুঙুর যোগ করলে। তা ভালো! তা ভালো!

সময়টা ছিল সন্ধ্যা। আকাশে মাথার উপরে ছিল একাদশী দ্বাদশীর চাঁদ। জ্যোৎস্না ফুটি-ফুটি করছে। স্থানে স্থানে গাছপালা ঘরবাড়ির ছায়ার মধ্যে অন্ধকার যেখানে গাঢ় হয়েছে—সেইসব স্থানে ফাঁকে ফাঁকে বেশ স্পষ্ট হয়ে ফালি ফালি ধোয়া কাপড়ের মতো এসে পড়েছে। কোথাও কোথাও মনে হচ্ছে ধোয়া কাপড় পরে কেউ যেন রহস্যময়ী আড়ালে গোপনে দাঁড়িয়ে সংকেত জানাচ্ছে। অতর্কিতে এই ছায়া দেখে চমকে উঠেছিলেন জীবনমশায়। প্রশ্ন করেছিলেন—কে? কে ওখানে?

হঠাৎ মঞ্জরীকে মনে পড়ে গিয়েছিল।

বনবিহারীর কুৎসিৎ রোগ প্রথম প্রকাশ হলেও তাকে মনে পড়েছিল। মনে হয়েছিল ভূপীর কুৎসিত রোগে তিনি হেসেছিলেন, তাই বোধ হয় বনবিহারী সেই রোগ ধরিয়ে তাঁকে উপহাস করলে।

পরক্ষণেই হেসেছিলেন—না কেউ নয়। জ্যোৎস্না পড়েছে দুটি ঘরের মাঝের গলিতে।

মঞ্জরী নয়, কৌতুকে সে হাসছে না।

মঞ্জরী তো মরে নি; সে ছায়ামূর্তি ধরে আসবে কী করে? তবে এ তারই অভিশাপ! তাঁর অভিশাপে মঞ্জরীর জীবন ব্যর্থ হয়েছে। মঞ্জরীর অভিশাপ তাঁকে লাগবে না? অথবা তাঁর নিজের অভিশাপ মঞ্জরীর মতো একটা সামান্য মেয়ের জীবন পুড়িয়ে শেষ হয় নি—ফিরে তাঁকে নিজেকেই লেগেছে।

মঞ্জরী বিধবা হয়েছে। ভূপী বোস মরেছে। ওই সেদিন আতর-বউ ছেলের সামনে মঞ্জরীর কথা তুলে তাঁকে মনে করিয়ে দিলে নতুন করে। তারপর তিনি খোঁজ নিয়েছিলেন! মঞ্জরী বিধবা হয়েছে। সন্তান বলতে একটি মেয়ে। সে পেয়েছে বাপের সোনার মতো রঙ আর মায়ের তন্বমহিমা, মুখশ্রী। ভূপী সর্বস্বান্ত হয়ে মরেছে। মেয়েটির কিন্তু ওই রূপের জন্য এবং বংশগৌরবের জন্য বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে। মঞ্জরী এখন মেয়ের পোষ্য। মেয়ের মেয়েকে নিয়ে সে নাকি সব ভুলেছে। পরমানন্দে আছে।

দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন জীবনমশায়।

আতর-বউ এসে ডেকেছিল—বাড়ির মধ্যে এসো! ছেলে এল। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে।

জীবনমশায় বলেছিলেন—আজ রাত্রে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে একটা খাওয়াদাওয়া করব ভাবছি। বন্ধু এল।

—তা করো না।

জীবনমশায় ইন্দিরকে ডেকে একটা ফর্দ তৈরি করে দিলেন—"কালাচাঁদ চন্দ রোকায় অবগত হইবা। ফর্দ অনুযায়ী জিনিসগুলি ফর্দবাহককে দিবা। দাম পরে পাইবা।" ফর্দের শেষে পুনশ্চ লিখে দিলেন—"আমার নামে বরং একটা হিসাব খুলিবা। অতঃপর তোমার দোকান হইতেই জিনিস আনিব। মাহ চৈত্র ও আশ্বিনে দুই দফায় হিসাবমতো টাকা পাইবা।"

নন্দ তখন ছোট। নন্দকে ডেকে বলেছিলেন—নোটন জেলেকে ডেকে আন, বল চার-পাঁচজন জাল নিয়ে আসবে। মাছ ধরানো হবে পুকুরে।

আর ডাকতে পাঠালেন বিখ্যাত পাখোয়াজী বসন্ত মুখুজ্জেকে। গাইয়েও তিনি নিয়ে আসেন।

হোক, গানবাজনা হোক। বাকি যে কটা দিন আছে—সে কটা দিন খেলে হৈ হৈ করেই কাটুক। পরমানন্দ মাধবকে পাওয়া তাঁর ভাগ্যফলও নয়, কর্মফলও নয়।

পঁচিশ

গলির সেই লম্বা ফালি জ্যোৎস্নাটা ধীরে ধীরে আকাশে চাঁদের অগ্রগতির সঙ্গে গলির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে গলির মুখে তখনও যেন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঠিক মানুষের মতো দাঁড়িয়েছিল। ওইটেই শশাঙ্কের বাড়ির গলি। ওই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েই শশাঙ্কের স্ত্রী তাঁকে অভিসম্পাত দিয়েছিল।

বনবিহারী অকালেই মারা গিয়েছে। কিন্তু বনবিহারীর মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাতে বিচলিত বিহ্বল হয়ে মনেমনেও কোনদিন পুত্রশোককে ওই মেয়েটির অভিশাপ বলে স্বীকার করেন নি।

নিজে ডাক্তার হয়েও বনবিহারী মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ করেছিল—মৃত্যু ফিরে যাবে কেন? ডেকে এনে তার সে কী ভয়! সে কী বাঁচবার ব্যাকুলতা! ওই দাঁতুর মতো! ওই মতির মায়ের মতো! যখন মনে পড়ে তখন শোকের চেয়ে দুঃখ হয় বেশী। যে মানুষ মরতে চায় না, জলমগ্ন মানুষের মতো দুহাত শূন্যে বাড়িয়ে আমাকে বাঁচাও বলে ডুবে যায়—তার জন্যেই শোক হয় মর্মান্তিক। নইলে শোক তো শুভ্র শান্ত—জীবনের মহাতত্ত্ব। শান্ত শোক জীবনের কয়েকটা দিনের জন্য

বৈরাগ্যের গৈরিক উত্তরীয় পরিয়ে দিয়ে মনোহর করে তোলে। কানের কাছে সত্যসঙ্গীত ধ্বনিত করে তোলে—বাউল বৈরাগীর মতো। "অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।" অন্য বংশে অন্য কূলে এ হয়তো সম্ভব নয় কিন্তু মশায় বংশে—সে তো অসম্ভব ছিল না। মনে পড়ছিল প্রথম যৌবনে বিখ্যাত শখের দলের অভিমন্যুবধ পালার কথা। সে প্রসঙ্গে চণ্ডীতলার সাধক মহান্ত রঘুবর গোঁসাই কয়েকটি কথা বলেছিলেন যাত্রাদলের অধিকারীকে—সেই কথাগুলি মনে গেঁথে আছে। সপ্তরথীর অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহে কুরুক্ষেত্রের মাটিতে পড়ে ষোলো বছরের কিশোর অভিমন্যু কাতর স্বরে কেঁদেছিল; সুকণ্ঠ প্রিয়দর্শন ছেলেটি কান্না-মেশানো সুরে গান ধরেছিল—

অন্যায় ঘোর সমরে অকালে গেল প্রাণ আমার—
তৃতীয় পাণ্ডব পিতা মাতুল গোবিন্দ যার।

একে একে মা সুভদ্রা, প্রিয়া উত্তরার নাম ধরে সে এক মর্মচ্ছেদী করুণ সঙ্গীত! সারা আসরের লোকের চোখের জলে বুক ভেসে গেল।

গান শেষ হল; অভিমন্যু টলতে টলতে চলে গেলেন সাজঘরে। অঙ্ক শেষ হল—ঐকতান-বাদন শুরু হল। রঘুবর গোস্বামী গম্ভীর কণ্ঠে অধিকারী মশায়কে ডেকে বললেন—অধিকারী মশায়, এ কি হইলো ভাই?

—আজ্ঞে? অধিকারী প্রশ্ন বুঝতে না পেরে প্রশ্নই করল—খুলে বলুন?

—অভিমন্যু এমন করে কাঁদল কেনো ভাই? অর্জুনের ছাওয়াল—কিষণজীর ভাগনা—সে মরণকে ডরে এমন করে কাঁদবে কেনো ভাই? কাঁদবে তো লড়াইমে সে আইলো কেনো দাদা? এমন করে সাত সাত বীরের সাথে লড়াই দিলো কাহে ভাই? সে তো ভাই, হাত দুটা বঢ়ায়ে দিয়ে বন্ধন পরে বাঁচতে পারতো ভাই? ভাঙা রথের চাকা দিয়ে লড়তে কেনো গেলো? অভিমন্যু তো কাঁদবে না। বীর বংশের সন্তান—সে তো ভাই মরণকে ডরবে না!

অধিকারী হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। এমন প্রশ্ন তো সাধারণত কেউ করে না! মানুষ কেঁদে সারা হয়! আসর জমিয়ে তোলে। ধন্য ধন্য পড়ে যায়। তিনি সবিনয়ে সেই কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন—বাবা মানুষ এতে কাঁদে—

কথা কেড়ে নিয়ে গোস্বামী বলেছিলেন—তাই বলে দুখ দিয়ে কাঁদাবে ভাই; যাতনা দিয়ে কাঁদবে? কাঁদন খুব ভালো জিনিস, মনকে ময়লা ধুয়ে যায়—দিল সাফা হয়—ঠিক বাত। কিন্তু তার জন্যে মাথায় ডাণ্ডা মারকে কাঁদাবে দাদা? প্রেমসে কাঁদাও; আনন্দ্‌সে কাঁদাও। তবে তো ভাই! অর্জুন মহাবীর। কিরাত বেশ ধরকে শিব আইলেন, তার সাথে লড়লেন; তার ছাওয়াল মরণকে ডর

না করে বলুক, আওরে তু মরণ! মরণ আসুক—হাত জোড় করকে আসুক। বলুক—হামারা পুরী ধন্য—হামি আজ ধন্য হইলো। মরণকে ডরসে পরিত্রাণকে পথ দেখে মানুষ আনন্দ্‌সে কাঁদুক; তবে তো ভাই!

যাত্রার দলের অভিমন্যুর চেয়ে বহুগুণ দীনতার সঙ্গে কাতর কান্না কেঁদে মরেছিল বনবিহারী। অবশ্য আসল নকলে তফাত আছে কিন্তু যাত্রাদলের ওই মৃত্যুর অভিনয় সত্যও যদি হত—তবুও তাঁর তুলনা ভুল নয়! বনবিহারী মারা গিয়েছে ম্যালেরিয়ায়। বনবিহারী রিপুর প্ররোচনায় দেহখানাকে করে রেখেছিল রোগের বীজের পক্ষে অতি উর্বর ক্ষেত্রের মতো অনুকূল। দাহ্য বস্তুতে সামান্য একবিন্দু আগুন যেমন সর্বধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হয়—ঠিক তেমনভাবেই ম্যালেরিয়া মৃত্যুরোগে পরিণত হল। আর. জি. কর স্কুল থেকে পাশ করেই সে এসেছিল। বিলাসী তরলচিত্ত উল্লাসচঞ্চল উচ্ছৃঙ্খল বনবিহারী। তখন তার ধারণা সে ধনীর সন্তান। জমিদারের সন্তান!

হায়রে সেই এক অংশের জমিদারি! তাঁকেও একদিন অহংকৃত করেছিল। তার উপর বনবিহারী তখন এক অবস্থাপন্ন মোক্তারের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করে তাঁর সম্পত্তিরও ভাবী উত্তরাধিকারের স্বপ্ন দেখছে। বিবাহ অবশ্য তিনিই দিয়েছিলেন। তবে পছন্দ আতর-বউয়ের। তিনিও অমত করেন নি। পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী কন্যাকে তিনি পছন্দ করেছিলেন। শ্বশুর দিয়েছিল দামী সাইকেল, জামাই সাইকেল চড়ে ডাকে যাবে; দিয়েছিল ভালো ঘড়ি, ঘড়ি দেখে নাড়ীর বিট গুনবে, হার্টের বিট গুনবে। নতুন চমৎকার বার্নিশ-করা আলমারি চেয়ার টেবিল, ডাক্তারখানার সরঞ্জাম। আরোগ্য-নিকেতনের ওই দিকে একখানা ছোট কুঠুরীতে বনবিহারী ডাক্তার বসতে শুরু করলে। নতুন সাইন বোর্ড টাঙালে 'সঞ্জীবন ফার্মেসি'। তিনি সকল কাজই করেছিলেন কিন্তু নিজে থেকে কিছু করেন নি। মনের মধ্যে ঘুরেছিল শশাঙ্কের স্ত্রীর কথা। তখন অবশ্য পাঁচ বছর হয়ে গিয়েছে। বনবিহারীও মৃত্যুকে নিমন্ত্রণের পথে অনেকটা এগিয়েছে। মদ ধরেছে।

জীবনমশায় সহজ রোগী বনবিহারীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু আশ্চর্য, এই মশায় বংশের কুলগত চিকিৎসাবিদ্যার বুদ্ধির এতটুকুও বোধ বন্থর মধ্যে স্ফুরিত হয় নি!

হবে কী করে! যে ধ্যানযোগে বিজ্ঞান ধারণায় ধরা পড়ে সে ধ্যান সে কোনদিনই করে নি, করতে চায় নি। রোগীর চেয়ে ভিড় বেশী হত বন্ধুর। নবগ্রামের ব্রাহ্মণবাবুদের ছেলেরা আসত বন্থর ডিসপেনসারিতে। কাপের পর কাপ চা আসত। হাস্যধ্বনিতে আতুরালয়ের মৌন বিষন্নতা যেন চাবুকের আঘাতে

মুহুর্মুহু চকিত ত্রস্ত হয়ে উঠত। রোগীরা বসে থাকত। সংশয়াপন্ন রোগীর স্তিমিত জীবনদীপের শিখাকে সমুজ্জ্বল করবার জন্য শাস্ত্রোক্ত সঞ্জীবনী তৈলের মতো ওষুধ যে ব্র্যাণ্ডি, সে ব্র্যাণ্ডি চলত উল্লাসের জন্য।

এখানে পড়বার সময় ব্যভিচার থেকে তার ব্যাধি হয়েছিল। কলকাতায় পড়তে পড়তে আবারও ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছিল। সে কথা সে তাঁকে জানায় নি। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন, সালসা খাওয়া দেখে ধরেছিলেন। তখন সালভারশন ইনজেকশন উঠেছে বটে কিন্তু খুব প্রচলন হয় নি। রক্তপরীক্ষার এত ব্যাপক প্রসার হয় নি, সহজ সুযোগও ছিল না। দুটি তিনটি ইনজেকশনে ক্ষত নিরাময় হলেই ইনজেকশন বন্ধ করত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তখন সালভারশনের দাম অনেক এবং ওষুধ দুষ্প্রাপ্য। ক্ষত নিরাময়ের পর লোকে সালসা খেত। উইলকিনসন্স সারসা পেরিলা।

তখন দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার চক্রধারী ঘোষ; বনবিহারী থেকে কয়েক বছরের বড়, বনবিহারীর বন্ধু। বনবিহারীর মজলিসে চক্রধারী আসত, বিকেলবেলা এখানেই চা খেত; সন্ধ্যার পর বনবিহারী যেত চক্রধারীর বৈঠকে। সেখানে গানবাজনার আসর বসত—নিরুদ্বেগে নিরুপদ্রব উল্লাস চলত। গানবাজনা পান-ভোজন। গভীর রাত্রে বনবিহারী ফিরত। যেদিন মশায় বাড়িতে থাকতেন সেদিন বনবিহারীর জড়িত কণ্ঠস্বর তাঁর কানে আসত। বনবিহারীর সঞ্জীবন ফার্মেসিতেও মধ্যে মধ্যে নৈশ আড্ডা বসত—পান-ভোজন চলত। সকালবেলা উঠে জীবনমশায় দেখতে পেতেন উচ্ছিষ্ট পাতা, ভুক্তাবশেষ; দাওয়ার ধারে দুর্গন্ধ উঠত, দেখতে পেতেন বমি-করার চিহ্ন, অম্লগন্ধের সঙ্গে বিকৃত মদ্যগন্ধ পেতেন—ভনভন করে মাছি উড়ত; দু-একটা কুকুর তাই চাটত আর মশায়কে দেখে লেজ নাড়ত। কিন্তু বলবার উপায় থাকত না। এ সব ক্ষেত্রে প্রায়ই জড়িত থাকতেন—জামাতা। সুরমা সুষমার তখন বিবাহ হয়েছে।

দুইটি পয়সাওয়ালা বাপের সন্তান; উচ্চ কুলীন। কী করবেন? সেকালের বিচারে তারাই সুপাত্র। তবু তিনি খুঁতখুঁত করেছিলেন। পেয়েছিলেন ভালো ছেলে। স্কুল-মাস্টার। কিন্তু সে অন্য কারও পছন্দ হয় নি। চল্লিশ টাকা মাইনে কি উপার্জন? লোকে নিন্দা করে বলেছে—ছি-ছিছি—ওই বিশ-পঁচিশ বিঘে জমি-সম্বল পরিবার কি মশায় বংশের যোগ্য কুটুম্ব? সবচেয়ে বেশী বলেছিল আতর-বউ এবং বনবিহারী। শুধু ওরাই নয়, তিনি নিজেও দায়ী। তাঁর মনও এতে সায় দিয়েছিল। তবে একটা বিষয়ে তিনি প্রতারিত হয়েছিলেন; তার জন্য মানুষ দায়ী নয়, কাল তাঁকে প্রতারিত করেছিল। তিনি বুঝতে পারেন নি যে কালধর্মে

পরপুরুষ কুলধর্ম ত্যাগ করেছে জীর্ণ কন্থার মতো। এ অঞ্চলের বৈষ্ণব মন্ত্র উপাসক কায়স্থ সমাজের ছেলেরা কালধর্মে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়েছে বা হবে এটা তিনি অনুমান করতে পারেন নি।

মহাসমারোহ করেই তিনি মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন। তারা আসত। তাদের আসার অজুহাতেই মশায়বংশের অন্দরের রান্নাশালে মাংস প্রবেশ করেছিল।

অতীত কথা মনে করতে করতে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধ জীবনমশায়।

ওই চক্রধারী ডাক্তারকে মশায় বলেছিলেন—চক্রধারী, বনবিহারী এত সারসা পেরিলা খায় কেন হে? জিজ্ঞাসা কোরো তো।

চক্রধারী হেসে বলেছিল—বনবিহারী তো নিজেই ডাক্তার; ও সব ওর উপরে ছেড়ে দিন।

—হুঁ। কিন্তু—

—ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। সে সব সেরে গিয়েছে। সারসা পেরিলা খায় শরীর ভালো হবে বলে। আমিও খাই।

—ভালো।

কিন্তু প্রকৃতি অনাচার সয় কতদিন? অমিতাচারী অসতর্ক বনবিহারী পড়ল ম্যালেরিয়ায়। বিচিত্র ব্যাপার; ডাক্তার বনবিহারী কুইনিন খেত না; কুইনিনের বদলে প্রতিষেধক হিসাবে খেত ব্রাণ্ডি! মশায় নিজে খেতেন শিউলি পাতার রস, মধ্যে মধ্যে কুইনিনও খেতেন। বনবিহারী হাসত। দেশে তখন প্রবল ম্যালেরিয়া। বছরের পর বছর—পাহাড়িয়া নদীর বন্যার মতো দেশকে বিধ্বস্ত করে চলেছে। ওই দাঁতুর মতো। জ্বর হলে বনবিহারী ম্যালেরিয়া মিকশ্চারের সঙ্গে আউন্স দুয়েক ভাইনাম গ্যালেসিয়া মিশিয়ে নিত। নিজেই প্রেসক্রিপশন করে নিজের ডাক্তারখানা থেকেই আনিয়ে নিত। নিজের ডাক্তারখানায় না থাকলে পাঠাত নবগ্রামে সীতারামের দোকানে। সীতারাম বনবিহারীর সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। সীতারামও মরেছে অকালে। অমিতাচারের নিমন্ত্রণে মৃত্যু তার জীবনে এসে প্রবেশ করেছিল কদর্যতম মূর্তিতে। কুষ্ঠ হয়েছিল সীতারামের। কখন হয়েছিল উপদংশ—তাকে গোপন করেছিল। তারই বিষজর্জরতায় সীতারামের দেহ-রক্ত কুষ্ঠবীজ সংক্রমণের গুপ্তপথ খুলে দিয়েছিল। হতভাগ্য সীতারাম।

হতভাগ্য বনবিহারী। ক্রমে ক্রমে অমিতাচার অনিয়মের প্রশ্রয়ে রোগ হয়ে উঠল জটিল। আয়ুও ক্ষয় হল, দেহ জীর্ণ হল।

লিভার, প্লীহা, পুরানো ম্যালেরিয়া, রক্তহীনতা, পানভোজনের প্রতিক্রিয়া—সব জড়িয়ে সে এক জটিল ব্যাধি।

জীবনমশায় মনে মনে বনবিহারীর অকালমৃত্যুর কথা অনুমান করেছিলেন। মশায় বংশের আয়ু—মহৎ সাধনার পরমাণু সে পাবে না, পাবার অধিকারীই নয়। কিন্তু এত শীঘ্র যাবে, ভাবতে পারেন নি! অকস্মাৎ একদিন চোখে পড়ে গেল। সকালবেলা বাড়ির ভিতরে দাওয়ায় বসে বনবিহারী চা খাচ্ছিল। আরোগ্য-নিকেতন থেকে কী একটা বিশেষ প্রয়োজন—বোধ করি, টাকা নেবার জন্য তিনি বাড়ি ঢুকছিলেন। পূর্বদ্বারী কোঠাঘরের বারান্দায় বনু বসেছিল, পরিপূর্ণ রৌদ্র উপভোগের জন্য।

বনবিহারীর রৌদ্রালোকিত মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। রক্তহীন বিবর্ণ মুখ বনবিহারীর, দৃষ্টি ক্লান্ত এবং ওই বিবর্ণ পাণ্ডুরতার উপরে যেন একটা পাংশু অর্থাৎ ছাই রঙের সূক্ষ্ম আস্তরণ পড়েছে—নয়?

সেদিন তিনি বিধিলঙ্ঘন করে গোপনে ঘুমন্ত বনবিহারীর নাড়ী পরীক্ষা করেছিলেন; সন্তর্পণে হাতখানি নামিয়ে রেখে নেমে এসেছিলেন। তিনিই সেদিন নিজে চক্রধারীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বনবিহারীর রোগ কি কমেছে চক্রধারী? কী বুঝছ?

চক্রধারী একটু চিন্তিত হয়েই বলেছিল—আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অন্যরকম। আমি বলব বলব ভাবছিলাম। বনবিহারীকে আমি বলেছি। আমার মনে হচ্ছে কালাজ্বর।

—কালাজ্বর?

—হ্যাঁ। বনবিহারীকে একবার কলকাতায় পাঠান। একবার দেখিয়ে আসুক।

—যাক। তাই যাক। তুমি যখন বলছ। যাক।

—আপনি একদিন দেখুন ভালো করে।

—না। দেখা উচিত নয়। আর—যাক। যাক. কলকাতা গিয়ে দেখিয়ে আসুক।

বনবিহারী কলকাতা গেল, সঙ্গে আতর-বউ গেল। মশায় বলেছিল—বউমাকেও নিয়ে যাও সঙ্গে।

—বউমাকে? কেন? না। ওই সর্বনাশীকে বিয়ে করেই বনু আমার গলে গেল রোগে। না। ওর নিশ্বাস আমি লাগতে দেব না।

মশায় আবার বলেছিলেন—ওসব বলতে হয় না আতর-বউ। ওতে ছেলে বউ দুজনের মনেই কষ্ট হয়। বউমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, আমার কথা শোনো, তোমারও সাহায্য হবে, তা ছাড়া বনুর মন ভালো থাকবে। এখন মন ভালো থাকাটা আগে দরকার।

এই শশাঙ্কর বধুটির কথা সেদিন মনে পড়েছিল। মনে মনে বলেছিলেন—তোমাকে মাছের মুড়ো খেতে দিয়েছিলাম। এবং তোমাকে দেওয়া কথা অনুযায়ী আমার পুত্রবধুকে স্বামীসঙ্গ ভোগের জন্তই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

আসামের কালব্যাধি কালাজ্বর। এককালে মৃত্যু-আশ্রিত ম্যালেরিয়াই বলত লোকে। তারপর কালাজ্বরের স্বতন্ত্র স্বরূপ ধরা পড়েছে। জীবাণু আবিষ্কৃত হয়েছে। বাঙালী ডাক্তার ইউ. এন ব্রহ্মচারী তার ওষুধ আবিষ্কার করেছেন।

তাঁর বাবা বলতেন—আসামে এক ধরনের বিষজ্বর আছে। সাক্ষাৎ মৃত্যু; মহামারীর মতো গতিপ্রকৃতি। সেই রোগে ধরল বনবিহারীকে?

না। চক্রধারী নূতন ডাক্তার, নূতন কালের রোগ এবং নূতন ওষুধের উপর একটি ঝোঁক আছে। তিনি নাড়ী দেখে বুঝেছিলেন জীর্ণ জ্বর—পুরনো ম্যালেরিয়া—জীবনকে ক্ষয় করে শেষ সীমান্তে উপনীত করেছে। অন্ধকার মৃত্যুলোকের ছায়ার আভাস ওই আস্তরণ।

তাঁর কথাই সত্য হয়েছিল। রক্তপরীক্ষায় কালাজ্বরের বীজাণুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। কলকাতায় বনবিহারীর শিক্ষকেরা যত্ন করে দেখেই ব্যবস্থাপত্র করে তাকে বায়ুপরিবর্তনে যেতে আদেশ করেছিলেন।

কিন্তু সেখান থেকে ফিরে এল জীর্ণতর হয়ে।

রোগ মৃত্যুরোগে পরিণত যখন হয়—তখন রিপুই জীবনের বুদ্ধিদাতা। অমৃত বলে বিষ খাওয়ার দুর্মতি দেয় সে। পোর্টওয়াইন খেতে দিয়েছিলেন ডাক্তার। বনবিহারী দুদিনে একবোতল পোর্ট খেত, তার সঙ্গে দ্রুত শক্তি সঞ্চয়ের জন্য মুরগী খেতে শুরু করেছিল।

মৃত্যুর তিনদিন আগে মশায় আতর-বউকে বলেছিলেন—বুক বাঁধতে হবে আতর-বউ। বন্ধুর ডাক এসেছে।

আতর-বউ বজ্রাহতের মতো কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত থেকে বজ্রবহ্নিতে জলে উঠেছিলেন, বলেছিলেন—বলতে তোমার মুখে বাধল না? তুমি বাপ!

—আমার যে মশায় বংশে জন্ম আতর-বউ। আমার যে একটা কর্তব্য আছে। বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করানো কর্তব্য।

—না-না-না।

বনবিহারী সে কথা শুনতে পেয়েছিল। হাউ হাউ করে কেঁদেছিল সে। —বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করিয়ো না। তা হলে আমি আর বাঁচব না।

—বেশ, তা হলে কিছু খেতে যদি সাধ থাকে—খেতে দিয়ো।

আতর-বউ তাও পারেন নি।

সেদিনের জরটা ছেড়ে গেলে বনবিহারী নিজেই আচার চেয়ে খেয়েছিল। আতর-বউ দেন নি, দিয়েছিল বনবিহারীর স্ত্রী। পরের দিন বনবিহারী ভালো রইল। চক্রধারী কুইনিন ইনজেকশন দিয়ে গেল।

জীবনমশায় জানতেন—এরপর একটা প্রবল জর আসবে। আগামী কালের মধ্যে।

কখন আসবে জর?

বিনিদ্র হয়েই শুয়েছিলেন। ভাবছিলেন।

গভীর রাত্রে সেদিন আবার ডাক এসেছিল।

—ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!

—কে?

—আজ্ঞা, পশ্চিম পাড়ার হাজি সাহেবের বাড়ির লোক।

—কী? ছেলে কেমন আছে? ডাক্তার উঠে বসেছিলেন। হাজির ছেলের সান্নিপাতিক চিকিৎসা তিনিই করেছেন।

—আসতে হবে একবার। বড় বাড়াবাড়ি।

—যাচ্ছি। চলো!

পথ সামান্য। মাইল দেড়েক। কিন্তু অন্ধকার রাত্রি, ধান খেতের ভিতর দিয়ে পথ। মশায় ভারী পায়ে শব্দ তুলে ভাবতে ভাবতে চলেছিলেন। লোকটা চলেছিল আলো হাতে কাঠের কলবাক্স মাথায় নিয়ে আগে আগে। যমে মানুষে লড়াই। রোগে ভেষজে দ্বন্দ্ব। মনে আছে, সব ভুলে শুধু চিন্তা করেছিলেন—ষ্ট্রিকনিন, ডিজিটেলিস, এড্রেনেলিন। হার্ট, নাড়ী, রেসপিরেশন। গভীর চিন্তায় মগ্ন মশায় যেন ঘুমের ঘোরে পথ চলেছিলেন সেদিন, রাত্রির অন্ধকার, দুপাশের ধানক্ষেত এসব যেন কিছু ছিল না। মধ্যে মধ্যে নক্ষত্র-ঝলমল আকাশের দিকে চোখ পড়েছিল। ক্ষণিকের জন্য, আবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন।

সেখানে গিয়ে রোগীর বিছানার পাশে বসে নাড়ী পরীক্ষা করে আলো তুলে ধরে রোগীর উপসর্গ লক্ষ্য করে চেহারা দেখে গন্ধ বিশ্লেষণ করে অনেক চিন্তা করে ওষুধ দিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ বসে ওষুধের ক্রিয়া লক্ষ্য করে বাড়ি ফিরেছিলেন। হাজির নাতির ক্রাইসিস কাটবে। প্রশান্ত অথচ অবসন্ন মনেই আকাশের দিকে তাকিয়ে ভগবানের কাছে বনবিহারীর মঙ্গল কামনা করেছিলেন। সবই জানেন—তবু কামনা করেছিলেন।

পূর্বদিগন্ত থেকে পাণ্ডুর জ্যোৎস্নাকে গ্রাস করে অন্ধকার সম্প্রসারিত হচ্ছে, দূরের গ্রামান্তর অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে হয়ে অন্ধকারে ঢাকা পড়ছে।

ঠিক রোগীর দেহে মৃত্যুলক্ষণ সঞ্চারের মতো ; নখের কোণ নীল হয়ে উঠছে, হাতপায়ের তালুর পাণ্ডুরতা ক্রমশ সর্বদেহে ব্যাপ্ত হচ্ছে।

বাড়ি ফিরে একবারে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন।

নাঃ। তখনও জ্বর আসে নি। ভালোই আছে বনু। সকলে গাঢ় ঘুমে ঘুমুচ্ছে।

তিনিও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল—তাঁর ঘরের দরজায় কে তাঁকে ডাকছে।—বাবা!

বনু!

কী হল? তাড়াতাড়ি দরজা খুলেছিলেন ; সামনে উঠানে অন্ধকার থমথম করছে, গাঢ় নির্জনতার মধ্যে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। কই বনু? কে ডাকলে? সম্ভবত তাঁর মনের বনু ডেকেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বনুর ঘরের দরজায় গিয়ে ডেকেছিলেন—আতর-বউ!

অ্যাঁ! সাড়া পেয়ে চমকে উঠেছিলেন জীবনমশায়। আতর-বউ জেগেছে। তবে আসছে!

—বনু কেমন আছে?

—শীত শীত করছে বলছে, হয়তো জ্বর আসবে।

আসবে নয়, তখন এসেছে। উঃ, সে কি ভীষণ কম্প!

* * *

সেই কম্পই শেষ কম্প বনুর।

মশায় সেদিন শেষ রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে একা দাঁড়িয়েছিলেন আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ার উপর। উত্তর-পশ্চিম কোণে কালীতলা, দাওয়ার পাশেই কুয়ো, করবীর গাছ দুটো ফুলে ভরা। সামনে শিশির-ভেজা ধূলোয়-ভরা নিথর পথখানা পড়ে ছিল। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে তারাগুলিকে দেখছিলেন, কোথায় কোন তারা? কোথায় সপ্তর্ষি-মণ্ডল, অরুন্ধতী কোথায়? ধ্রুব? ধ্রুবতারা গেল কোথায়? কালপুরুষ? পূর্বদিগন্তে তখন দণ্ড দুয়েক আগে চাঁদ উঠেছে ; কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীর চাঁদ। তাদের মত ক্ষয়-রোগগ্রস্ত চাঁদ ; পাণ্ডু বিবর্ণ, ক্ষয়িত কলেবর, পাঁচভাগের চারভাগ ক্ষয়ে গিয়েছে ; ক্লান্তির আর পরিসীমা নাই যেন। জ্যোস্নাও ম্লান। আকাশে ছড়িয়েছে কিন্তু তাতে আকাশের দ্যুতি খোলে নাই। নীলিমার মধ্যেও যেন পাণ্ডুরতার ছায়া পড়েছিল। আকাশের

দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই শশাঙ্কের বউয়ের কথা মনে পড়েছিল। দৃষ্টি নামিয়ে তাকিয়েছিলেন শশাঙ্কের বাড়ির গলিপথটার দিকে। সেদিনও ওই গলিটার মুখে তখন জ্যোৎস্নার একটা ফালি মলিন-থানকাপড়-পরা একটি বিষন্ন নারীমূর্তির মতো দেওয়ালের গায়ে লেগেছিল; কিন্তু সেদিন আর শশাঙ্কের স্ত্রী বা মঞ্জরী বলে ভ্রম হয় নি।

ঠিক এই সময়েই বঙ্কুর উচ্চ চিৎকার শোনা গিয়েছিল—গেল! গেল! গেল! ধর! ধর! ধর! আঃ! হা-হা-হা মা! মা! মা! প্রলাপ বকতে শুরু করেছিল বঙ্কু!

—বাবা! বঙ্কু! বঙ্কুরে! সাড়া দিয়েছিলেন আতর-বউ।

শেষ সময়ে বঙ্কুর একবার জ্ঞান ফিরেছিল। কেঁদেছিল সে।

—আমাকে বাঁচাতে পারলে না!

মশায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

আতর-বউ ডেকেছিলেন—একবার দেখে যাও। কিছু ওষুধ দাও। লোকে বলে তোমার ওষুধে মরণ ফিরে যায়!

—যায় না। কারুর ওষুধে যায় না। আমাকে ডেকো না।

চক্রধারী অবশ্য এসেছিল; শিয়রে সেই বসেছিল। দুটো ইনজেকশনও সে দিয়েছিল। কিন্তু—। মৃত্যুকে ডাকলে সে কোনো প্রতিরোধই মানে না। সে শক্তির আবিষ্কার হয় নি, হবে না। যতক্ষণ ব্যাধি ততক্ষণ ওষুধ, কিন্তু ব্যাধির হাত ধরে মৃত্যু এসে আসন পাতলে, সব ব্যর্থ।

শুধু দুঃখ হয়েছিল বঙ্কুর জন্যে। কাঁদছে বঙ্কু!

মনে পড়েছিল হাসিমুখে যারা মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের কথা।

* * *

দেখেছেন বইকি এমন রোগী। কদাচিৎ নয়—একটি দুটি নয়। অনেক অনেক দেখেছেন তিনি। একালের ডাক্তারেরা দেখতে পায় না, পাবে না। তিনি দেখেছেন। অনেক দেখেছেন, নিতান্ত সাধারণ মানুষের মধ্যেই দেখেছেন।

নবগ্রামের রায় বংশের ভুবন রায়ের কথা মনে পড়ছে।

তখন মশায়ের বাবার আমল। জীবনমশায়ের তরুণ বয়স। ভুবন রায় তখন প্রায় সর্বস্বান্ত। জগৎ মশায়কে ডেকে পাঠালেন—মশায়কে বোলো, আমাকে যেন একবার দেখে যায়।

জগৎ মশায়ের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন ভুবন রায়। দরিদ্র বৃদ্ধ নিজের বাড়ির ভাঙা দেউড়িতে হুঁকো হাতে বসে থাকতেন। অভাব এমনই প্রচণ্ড

যে, যে-কোনো পথচারীকে তামাক খেতে দেখলে তাকে ডাকতেন, কুশল প্রশ্ন করতেন, পরিশেষে বলতেন—দেখি, তোমার কল্কেটা একবার দেখি।

তরুণ জীবন দত্ত সেদিন ভুবন রায়ের ডাক শুনে মনে মনে হেসেছিলেন; অবশ্য জগৎ মশায়কে বলতে সাহস করেন নি। ভেবেছিলেন, উঃ, মানুষের কী বাঁচবার লালসা! এই বয়স—সংসারের কোথাও কোনো পূর্ণতার আকর্ষণ নাই—তব ভুবন রায় মরতে চায় না।

জগৎ মশায়ের সঙ্গে তিনিও গিয়েছিলেন। ছেঁড়া ময়লা বিছানায় শুয়ে ভুবন রায় ক্ষীণকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন—এসো মশায় এসো। এসো।

—কী হল?

—যেতে হবে কি না দেখ তো ভাই।

—যেতে তো হবেই রায় মশাই। বয়স মানেই কাল—

হেসে রায় বলেছিলেন—সে কথা ভুবন রায় ভুলে যায় নি জগৎ। সেই কাল পূর্ণ হল কিনা দেখো। কাল পূর্ণ না করে অকালে যাওয়া যে পাপ। সে ভুবন রায় যাবে না। লোকে বলে গেলেই খালাস! তা অকালে জেলখানা থেকে পালালে কি খালাস হয় রে ভাই? পালিয়ে যাবেই বা কোথা? আবার এনে ভরে দেবে। এখন খালাসের সময় যদি হয়ে থাকে—দেখো। এখানকার কটি কৃত্য আছে আমাকে সারতে হবে।

ভুবন রায়ের বিষয় থাকতে বন্ধুর কাছে পাঁচশো টাকা নিয়েছিলেন। সে টাকার দলিল ছিল না, বন্ধুও সর্বস্বান্ত ভুবন রায়কে কোনোদিন তাগাদা করতেন না, কিন্তু ভুবন রায় সেটি ভুলতে পারেন নি। অনেকবারই এ সম্পর্কে তাঁর কর্তব্য করবার চেষ্টা করেছিলেন—পারেন নি। কিন্তু কল্পনা ছিল। বন্ধুর কাছে মাফ চেয়ে নিতে হবে। কিন্তু সে কি সহজ? ভেবে রেখেছিলেন—মৃত্যুর পূর্বে সে বন্ধুরই হোক আর নিজেরই হোক, চেয়ে নেবেন মুক্তি। তাই নিজের মৃত্যুর কথা স্থির জেনে তবে বন্ধুকে ডেকে হাত জোড় করে বললেন—আমাকে মুক্তি দাও।

অবশ্য বিঘাখানেক নিষ্কর জমি রেখেছিলেন, সেইটুকু দেবারও সংকল্প ছিল ভুবন রায়ের।

একটি টাকা বালিশের তলা থেকে বের করে মশায়ের হাতে দিয়েছিলেন। জগৎ মশায় হাত জোড় করে বলেছিলেন—আমাকে মার্জনা করুন, রায় মশাই।

—তা হয় না জগৎ। বৈদ্যপ্রণামী না দিলে মুক্তি আসবে না আমার। তারপরেই হেসে বলেছিলেন—আমার শ্রাদ্ধ তো একটা হবেই, তাতেই তুমি এক টাকার জায়গায় দু টাকা নৌকুতো দিয়ো।

বন্ধুর কাছে মুক্তি নিয়ে ভুবন রায়ের হাসিমুখে চোখ বোঁজার কথা অনেকদিন পর্যন্ত মানুষ স্মরণ করে জীবনে ভরসা সঞ্চয় করেছে। তিনি নিজেও করেছেন।

শুধু কি ভুবন রায়? গণেশ বায়েন! এ তো বিশ বছর আগের কথা। তাঁর আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ার সামনে খোলা একখানা গাড়িতে চেপে আশি-পঁচাশি বছরের বুড়ো গণেশের সেই আসার কথা আজও চোখের উপর ভাসছে! লম্বা লাঠিখানায় ভর দিয়ে বুড়ো নেমে শোরগোল তুলেছিল সেদিন। চিরদিনের কালা গণেশের শোরগোল তুলে কথা বলাই অভ্যাস।—ছোটমশায় কই গো? আমাকে আগে দেখো। কই? পরের গাড়ি চেয়েচিন্তে এসেছি। ওরা আবার চলে যাবে, নবগেরামের নটকোণের দোকানে জিনিস নেবে। বুড়োকে আগে বিদেয় করো।

লোকজন সকলেই অবাক হয়েছিল গণেশের দাপট দেখে।

মশায়ও গণেশকে দেখে প্রথমটা চিনতে পারেন নি। কে?

শীর্ণ দীর্ঘদেহ বৃদ্ধ। কে? গণেশ বায়েন নয়? চিতুরার গণেশ বায়েন! হ্যাঁ সেই তো!

গণেশ তাঁর চেয়েও বয়েসে বড়। দশ-পনেরো বছরের বড়। গণেশ তাঁর বিয়েতে ঢোল বাজিয়েছে, মায়ের চন্দনধেনু শ্রাদ্ধে, বাবার বৃষোৎসর্গে ঢাক বাজিয়েছে, বন্ধুর বিয়েতেও বাজনা বাজিয়েছে; গণেশ দাবি করে দীনবন্ধু মশায়ের অর্থাৎ তাঁর পিতামহের শ্রাদ্ধেও সে ঢাক বাজিয়েছে। আশি-পঁচাশি বৎসর বয়স হবে গণেশের। সেই কারণেই গনেশ তাঁকে ছোটমশায় বলত।

জীবনমশায় প্রশ্ন করেছিলেন—গণেশ? কী রে? তোর কী হল?

—অ্যাঁ? কান দেখিয়ে গণেশ বললে—জোরে বলো!

ভুল হয়ে গিয়েছিল তাঁর, গণেশ চিরদিন কালা, বৃদ্ধ বয়সে বেশী হয়েছে। নিজেই চীৎকার করছে অর্থাৎ নিজেই শুনতে পাচ্ছে না নিজের কথা। মশায় কণ্ঠস্বর উঁচু করেই বলেছিলেন—কী ব্যাপার?

—অসুখ! ব্যাধি ধরেছে।

—তোরও অসুখ হল শেষে?

—হবে না? যেতে হবে না?

—হবে না কি?

—তাই তো দেখতে বলছি গো। দেখো। মনে যেন তাই লাগছে, বুঝেছ?

—অসুখটা কী তাই বল আগে।

—পেটের গোলমাল গো!

—পেটের গোলমাল ?

—হ্যাঁ। হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে মুখর বৃদ্ধ বলেই গিয়েছিল—বুঝেছ, আরও হয়তো ছমাস একবছর বাঁচতাম। তা সেদিন ঢাক বাজিয়ে ভাইপো একটা পাঁঠার চরণ এনেছিল ; তা মনে হল জীবনে এলাম পিথিমীতে, মাংস তো খেলাম না। সারা জীবন বাদ্যি বাজিয়ে পেসাদী মাংস পেলাম অনেক, মুখে দিলাম না! অথচ সাধ তো আছে। ও না খেলে তো ছুটি হবে না। তাই বাপু খেলাম। ভালোই লাগল। কিন্তু ওতেই লাগল ফ্যাসাদ। পেটের ব্যামো হল—দুদিন খুব পেটে মোচড় দিলে, তা-পরেতে ঘাটে গেলাম একদিন ; খুব সে ঘাটে যাওয়া। সেই সূত্রপাত। এখন তোমার দুমাস হয়ে গেল—সেই চলেছে। এখন আবার আমেশা হয়েছে। কী রকম মনে হচ্চে বাপু।

জীবনমশায় ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন—এ-অবস্থায় এলি কেন? আসা ঠিক হয় নি। খবর দিলেই তো পারতিস!

কে একজন বলেচিল—তোমার তো টাকা আছে শুনতে পাই হে। না হয় মশায়কে দু টাকা দিতে।

—অ্যাঁ, কী বলছ এঁটে বলো গো!

—বলি, তোমার তো টাকা আছে হে।

—আছে। সাতকুড়ি টাকা আমার আছে। পুঁতে রেখেছি। তাই তো এয়েচি মশায়ের কাছে, মশায় বলুক। আমি তা হলে জীবন-মচ্ছবটা করে ফেলি। ছেলে নাই পরিবার নাই—ভাইপোরা টাকা কটা নেবে, কিছুই করবে না। জমি আছে—সে ওদের পাবার ওরা নিক। টাকাটা আমি জীবন-মচ্ছবটা করে আর মা চণ্ডীর পাট-অঙ্গন বাঁধিয়ে খরচ করে যাব। তা দেখো। ভালো করে দেখে বলো কতদিন আর বাকি।

—বোস্। একটু জিরিয়ে নে।

গণেশ খুব সমঝদারের মতো ঘাড় নেড়ে বলেছিল—হ্যাঁ। সে বুঝেছ, ওই রোগ হতেই আমি বুঝেছি। উঁ-হু ইনি যে-সে নয়। ইনি সেই তিনি। মন ঠিক বলে দিয়েছিল। তবু বলি, কে জানে মুরুক্ষু-সুরুক্ষু মানুষ, যাই ছোটমশায়কে দেখিয়ে আসি। তার তো ভুল হবে না! তা হলে ঠিক আছে! চণ্ডীমায়ের পাট-অঙ্গন বাঁধাবার কাজ লাগিয়ে দিই। তা-পরেতে জীবন-মচ্ছব। হরি হরি বলো মন। হরি হরি বলো।

বলে প্রণাম করে দুটো টাকা নামিয়ে বলেছিল—'না, বোলো না। চ্ছেরকাল বিনাপয়সায় দেখেছ। এই দুই টাকাতে শোধ!

মনে মনে সেদিন প্রশ্ন জেগেছিল—গণেশ কি সত্যিই বুঝতে পেরেছিল ?

শরৎ চন্দের দিদিমার কথা মনে পড়েছিল। বন্ধুর মৃত্যুর মাস আষ্টেক আগের কথা। তাঁকে হাত দেখতে ডেকেছিল।

সেও বুঝতে পেরেছিল। ডাক শুনতে পেয়েছিল। বৃদ্ধা চিরদিনই খেতে-দেতে ভালোবাসত। খাওয়া-দাওয়া আয়োজন করতেও জানত। শরতের দিদিমার হাতের ফুলবড়ি আর পাঁপড় ছিল উপাদেয় সামগ্রী। সেই কারণেই মশায় হাত দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কী খেতে ইচ্ছে হয় গো ?

জিভ কেটে বৃদ্ধা বলেছিল—আমার পোড়াকপাল। এই কথা তুমি জিজ্ঞাসা করলে বাবা ?

—তবে কী সাধ হয় বলো।

—শরৎকে .দেখব শুধু। দেখে বলো, কদিন বাঁচব। শরৎ ফিরে আসা পর্যন্ত থাকব ?

শরৎ তখন বি. এ. পরীক্ষা দিচ্ছে। শরতের মা বলেছিল—বলুন, টেলিগেরাপ করব কি না।

—নাঃ দিন পনেরো দে-বউ আছে। শরৎ তো সাতদিন পরে আসবে ?

—হঁা।

—তা হলে ঠিক আছে। নাতি দেখতে তুমি পাবে দে-বউ। কিন্তু কষ্ট কী বলো। খোরাক কয়েক ওষুধ দেব।

—কষ্ট অস্বস্তি। আর কী ? মনে হচ্ছে—গেলেই সুখ! নিশ্চিন্দি। বাঁচি।

এমন অনেক মানুষকে দেখেছেন। এই যাওয়াই তো যাওয়া। মৃত্যুর সমাদরের অতিথি। একালে তেমন অতিথি বোধ করি মৃত্যু পায় না।

আর কী হবে না ? ঠিক এই সময়েই আতর-বউ চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন—ওরে বরু রে!

* * *

বিপিন সম্পর্কে তিনি বলতে পারবেন না।

বিপিন বনবিহারীর মতো অসহায় আর্তের মতো চীৎকার করে নি, করার কথাও নয়। সে কর্মবীর। সে কাঁদবে না। কিন্তু প্রসন্ন প্রশান্তভাবেও আত্মসমর্পণ করতে পারবে না। তার বেদনা ক্ষোভের হাহাকারে ফেটে পড়বে।

অন্ধকারের মধ্যে আত্মমগ্নের মতো পথ হাঁটছিলেন তিনি। সত্যসত্যই যেন স্থানকাল সম্পর্কে চেতনা ছিল না তাঁর। চেতনা ফিরে এল নবগ্রামের বাজারের আলোয়।

চৌমাথাটায় দোকানে দোকানে আলো জ্বলছে। সেকালের মতো ম্লান আলো নয়। উজ্জ্বল আলো। পেট্রোম্যাক্স, লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি আড়াইশো বাতি, পঁচিশ বাতি, চল্লিশ বাতি। এই আলোর ঝলক তাঁর চোখে লেগে তাঁকে সচেতন করে দিল। সামনে একটা মনিহারির দোকানের ঝকমকে জিনিসগুলি চোখে যেন রঙ ধরিয়ে দেয়। হরেন ডাক্তারের দোকানে ওরা কারা ?

প্রদ্যোত ডাক্তারের স্ত্রী আর সেই আগন্তুক বন্ধুটি। তারা দুজনেই বেরিয়ে এল এই সময়। ডাক্তারের স্ত্রী সুন্দরী মেয়ে, তার উপর সেজেছে। মনোরমা করে তুলেছে নিজেকে। মশায় দাঁড়ালেন। তারা দুজনে চলে গেল, টর্চ জ্বালিয়ে ডান-পাশের অন্ধকার পথ ভেদ করে। ওই পথে তাঁকেও যেতে হবে!

কোলাহল উঠছে চারিদিকে। বাজারের কেনাবেচা চলছে। বেছে অল্প আলো যেদিকটায় পড়েছিল সেই দিকটা ধরে তিনি চৌমাথাটা পার হয়ে মোড় ফিরলেন। এবার পথ আবার অন্ধকার। বাঁচলেন তিনি। বিপিনের কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলে কী বলতেন তিনি? অনেকটা আগে ডাক্তারের স্ত্রী আর ডাক্তারের বন্ধুটি চলেছে।

অন্ধকার রাস্তায় বালি-কাঁকরের উপর মশায়ের পায়ের জুতোর শব্দ উঠছে। এই জায়গাটা নির্জন, বসতিহীন। অনেকটা পিছনে নবগ্রামের বাজারপটির আলোর ছটা শূন্যলোকে ভাসছে! এতটা দূরে বাজারের কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে, ক্ষীণ হয়ে আসছে ক্রমশ। বর্ষার মাঠে ব্যাঙের ডাকের ঐকতান উঠছে। কলরব করছে। ওটা কী যন্ত্রণাকাতর শব্দ! ওঃ, সাপে ব্যাঙ ধরেছে! মশায় থমকে দাঁড়ালেন। আবার চললেন।

বড় পুকুরটার পাশ দিয়ে এসে মাঠের মধ্যে রাস্তার একটা বাঁক ফিরতেই আলো পেলেন মশায়। হাসপাতালের কোয়ার্টারের জানালায় বারান্দায় আলোর ছটা পড়েছে; হাসপাতালের বারান্দায় আলো জ্বলছে। প্রদ্যোত ডাক্তারের বারান্দায় পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। ওই যে ডাক্তারের স্ত্রী আর বন্ধুটি। প্রদ্যোত ডাক্তার বসে রয়েছে। চারুবাবু ডাক্তার। আরও কজন।

এতক্ষণে ফিরছেন ডাক্তারবাবু?

হাসপাতালের বাইরের দেওয়ালের পাশ থেকে কে একটি লোক বেরিয়ে এল। কে? বিনয়? চিনতে পেরে আশ্চর্য হলেন মশায়। বি-কে মেডিক্যাল স্টোর্সের মালিক বিনয়।

—ডাক্তারদের মিটিং হচ্ছে।

—মিটিং?

—হ্যাঁ। আমাকে বয়কটের ব্যবস্থা হচ্ছে।

—তোমাকে বয়কটের ?

—হ্যাঁ। কাল যাব আমি আপনার কাছে। মিটিং শুধু আমাকে নিয়েই নয়, আপনিও আছেন। বলব, কাল সকালে সব বলব। যাব আমি। এখানকার সব ডাক্তার এসেছে ওই দেখুন না। এখন হরেন শুধু আসে নি। চারুবাবু প্রদ্যোতবাবু যাচ্ছে, হরেনকে নিয়ে বিপিনবাবুকে দেখে আসবে; এসে মিটিং হবে। আপনি দেখে এলেন বিপিনবাবুকে ? আপনি থাকলেন না ? ও আপনাকে বলে নাই বুঝি ?

মশায় কোনো জবাব দিলেন না। না, কোনো কথাই তিনি বলবেন না।

বিনয় বললে—আজ সকালে কিশোরদাদা তো খুব বলেছে আপনার কথা। সারা গাঁয়ে একেবারে হৈ হৈ করছে।

এ কথারও কোনো উত্তর দিলেন না মশায়। বিনয় বলেই গেল—প্রদ্যোত ডাক্তার শুনলাম খুব চটেছে।

মশায় এবার বললেন—আমি যাই বিনয়।

বিনয় চকিত হয়ে উঠল—হ্যাঁ। ওরা আসছে। আমি যাই। কাল যাব আমি আপনার কাছে। সে আবার দেওয়ালের পাশ দিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল। চারুবাবু, প্রদ্যোত, প্রদ্যোতের বন্ধু বারান্দা থেকে নেমে চলে আসছে।

ছাব্বিশ

প্রদ্যোত ডাক্তারের বাসায় সেদিন এ অঞ্চলের পাশকরা ডাক্তারেরা সকলেই এসে জমেছিলেন। প্রদ্যোতই উদ্যোগী হয়ে সকলকে ডেকেছে। এখানে একটি কো-অপারেটিভ মেডিক্যাল স্টোর্স খোলার কথা হবে।

বিনয়কে বয়কটের জন্য ঠিক নয়; তবে বিনয়কে মুশকিলে পড়তে হবে বই কি। শুধু তাই নয়, এখানে ছোটখাটো ক্লিনিকও সে করতে চায়। ডাক্তারের বন্ধু ক্লিনিকাল প্র্যাকটিস করেন এই জেলার সদরে! সদর থেকে বিপিনবাবুর ইউরিন ও ব্লাড রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তার নিজেই এসে গতকাল থেকে বসে আছেন। বিপিনের রিপোর্ট আশাপ্রদ বটে কিন্তু পরীক্ষক ডাক্তারের কী একটি সন্দেহ হয়েছে। তিনি আবার একবার ইউরিন ব্লাড নিজে নিয়ে যাবেন। সেই সঙ্গে এই মিটিংয়েও যোগ দিয়েছেন তিনি। প্রদ্যোতের অনুরোধেই যোগ দিয়েছেন। প্রদ্যোত ডাক্তারের মত, একালে

ক্লিনিকের সাহায্য ছাড়া চিকিৎসা করা অন্যায়; যে বিজ্ঞান নিয়ে সাধনা, সেই বিজ্ঞানকে এতে লঙ্ঘন করা হয়। সাধারণ ম্যালেরিয়া বা সামান্য অসুখবিসুখে উপসর্গ দেখে, থার্মোমিটার স্টেথোসকোপের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়তো যায়, কিন্তু অসুখ যেখানে একটু জটিল বলে মনে হয়, যেখানে এতটুকু সংশয় জাগে, সেখানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রক্ত মল মূত্র—এ সব পরীক্ষা না করে চিকিৎসা করার ঘোরতর বিরুদ্ধে সে। নাড়ী পরীক্ষার উপর বিশ্বাস তার নাই। বায়ু পিত্ত কফও বুঝতে পারে না। এবং চোখে উপসর্গ দেখে, রোগীর গায়ের গন্ধ বিচার করে রোগনির্ণয় দু-চারজন প্রতিভাবানের পক্ষে সম্ভবপর বটে, কিন্তু সাধারণ চিকিৎসকদের সে শক্তি নাই। যাঁরা করেন তাঁরা পাঁচটাতে ঠিক ধরেন—পাঁচটাতে ভুল করে পরে শুধরে নেন—পাঁচটাতে ভুল শেষ পর্যন্ত ধরাই পড়ে না। রোগী যখন মারা যায় তখন মনে হয়—চিকিৎসা আগাগোড়াই ভুল হয়েছে। রোগটা বোধ হয় ম্যালেরিয়া ছিল না, কালাজ্বর ছিল; অথবা কালাজ্বর ছিল না, ছিল ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়াকে টি-বি ভুল করতেও দেখা গিয়েছে। সেদিন একটা ছেলের চিকিৎসার মারাত্মক ভুল হয়েছে। ছেলেটা মরা অবধি তার মন পীড়িত হয়ে রয়েছে।

বিনয়ের দোকানে যে সব প্রেসক্রিপশন সরবরাহ হয়, তার মধ্যে অসাধুতা আছে। কোনো ওষুধ না থাকলে নিজেরাই বুদ্ধিমতো একটা বিকল্প দিয়ে চালিয়ে দেয়। তাও না থাকলে সেটা বাদ দিয়েই চালিয়ে দেয়। কোনো ওষুধটা যথানিয়মে ক্রম-রক্ষা করে তৈরি করে না। ওষুধের শিশি স্থির থাকলেই দেখা যায় বিভিন্ন ভেষজ স্তরে স্তরে স্বতন্ত্র হয়ে ভাসছে অথবা তলায় জমে রয়েছে। একদফা ওষুধ এনে তাতেই চালায় ছ মাস, এক বছর। নিস্তেজ, নির্গুণ ওষুধের ক্রিয়া হয় না। সব থেকে বিপদ হয়েছে এখনকার বিশেষ ওষুধগুলি নিয়ে। পেনিসিলিন যে বিশেষ তাপমানে রাখার কথা তা রাখা হয় না। যেসব ওষুধ আলোক-রশ্মিতে বিকৃত হয় সেগুলিও নিয়মমতো রাখে না এরা। মানুষের জীবনমরণ নিয়ে যেখানে প্রশ্ন সেখানে অবহেলা; অজ্ঞতা এবং কুটিল ব্যবসায়-বুদ্ধির স্বেচ্ছাচারে ব্যভিচারে মানুষের জীবন হচ্ছে বিপন্ন। এ ছাড়া জাল ওষুধ চালায় বলেও প্রদ্যোত বিশ্বাস করে।

তার উপর দাম। দরিদ্র মানুষ—সরল গ্রামবাসী অসহায়ভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে এই লোলুপতার খড়্গের নিচে ঘাড় পেতে দিতে বাধ্য হচ্ছে। শুধু দামই নয়, বাকির খাতায় বাকি বেড়েই চলে। এদের পীতপাণ্ডুর চোখের দৃষ্টি দেখলে প্রদ্যোতের করুণাও হয়, রাগও ধরে। এক-এক সময় মনে হয়—মরুক, এরা মরুক, মরে যাক। শেষ হয়ে যাক। নির্বোধ মূর্খেরা নিজেদের অজ্ঞতা মূর্খতা নির্বুদ্ধিতা কিছুতেই

স্বীকার করবে না। বললে শুনবে না। বুঝিয়ে দিলে বুঝবে না, বিশ্বাস করবে না। আজও কবজ মাদুলি জড়ি বুটি ঝাড় ফুঁক ছাড়লে না এরা। এদের বিজ্ঞানবোধ জীবনমশায়ের নাড়ীজ্ঞান পর্যন্ত এসে থেমে গেছে।

তাই অনেক চিন্তা করে সে এখানকার ডাক্তারদের এবং এই বন্ধুটিকে নিয়ে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চায়। বড় একটি ওষুধের দোকান। তার সঙ্গে একটি ছোটখাট ক্লিনিক।

এখানকার অবস্থা দেখে সে যা বুঝেছে তাতে বড় একটি কারবার বেশ সমৃদ্ধির সঙ্গেই চলবে। নবগ্রামে একটি মাঝারি ওষুধের দোকান আজ তিরিশ বৎসরেরও বেশী কাল ধরে ভালোভাবেই চলে আসছে। তার আগে হরিশ ডাক্তারের বাড়িতে এক আলমারি ওষুধ নিয়ে তাঁর নিজস্ব কারবার চলত। জীবনমশায়ের আরোগ্য-নিকেতন নাকি সমারোহের সঙ্গে চলেছে দীর্ঘকাল। আজ উনিশশো পঞ্চাশ সালে কি এখানে ক্লিনিক ও বড় ওষুধের দোকান চলবে না?

আজ নবগ্রামেই দুজন এম. বি. দুজন এল. এম. এফ. রয়েছেন। আশেপাশে চারিদিকে দশ-বারো মাইলের মধ্যে আরও চারজন এল. এম. এফ. আছেন। তাঁদের সকলেরই কোনো রকমে চলে যাচ্ছে। তাঁদের সকলকেই আজ নিমন্ত্রণ করেছেন প্রদ্যোত ডাক্তার। সকলে মিলে অংশীদার হয়ে এই কারবার গড়ে তোলার কল্পনা। তাতে সকলেরই লাভ। তাঁরা ব্যবসায়ীর মতো লাভ করবেন না, তবুও যেটুকু লাভ হবে তাঁরাই পাবেন। প্রেসক্রিপশনে কমিশনও যে যেমন পান পাবেন। এখানকার লোকেও অপেক্ষাকৃত কম দামেই ভালো ওষুধ পাবে।

কোয়ার্টারের বারান্দায় চেয়ার টেবিল বিছিয়ে আসরটি বেশ মনোরম করেই পাতা হয়েছিল। সন্ধ্যার সময়ে চা-পর্ব থেকে শুরু হয়েছে। মাঝখানে একটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বলছে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া আছে। কিছু পাখি শিকার করা হয়েছে—তার সঙ্গে কয়েকটি মুরগীও আছে। রান্না করছে হাসপাতালের কুক। মঞ্জু ঘুরে ফিরে রান্নাবান্নার তদ্বির করছে। বারান্দার আসরে একপাশে একটি অর্গান রাখা হয়েছে। মধ্যে মধ্যে গান গাইবে সে।

* * *

এখানে নবগ্রামের আশেপাশে যারা প্র্যাকটিস করে—তারা সকলেই স্থানীয় লোক। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ডাক্তারিই সব পেশার চেয়ে ভালো পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপই এর প্রধান কারণ। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে আছে দু-চারটে টাইফয়েড, দু-দশটা রেমিটেণ্ট, তার সঙ্গে আমাশয়, পেটের অসুখ। বসন্ত হয়, কিন্তু মহামারী হয়ে দেখা বড় দেয় না, তবে কলেরা মাঝে

মাঝে হয়। সেকালে কলেরা হত মহামারীর মতো, একালের টিকার কল্যাণে তা হয় না। এ ছাড়া এটা-ওটা নানান ব্যাধি লেগেই আছে। সেই কারণে ডাক্তার হতে পারলে নিশ্চিন্ত; উপার্জন হবেই। আগে লেখাপড়া শিখে সকলেই আইনটা পড়ত। চাকরি না পেলে উকিল হবে। কিন্তু উকিলদের পেশা অনিশ্চিত, যার কপাল খুলল সে রাজা, যার হল না সে ফকির বললেও চলে। ডাক্তারিতে তা নয়, কিছু হবেই। কপাল খুললে কথাই নাই। তার উপর বাড়িতে বসে চলে। দশ বছর আগে এখানে চারিপাশে দুজন পাশকরা ডাক্তার ছিল। হাতুড়ে অনেক কজনই করে খেত। এখন এখানে ছজন পাশকরা ডাক্তার। কেউ বর্ধমানে, কেউ বাঁকুড়ায়, জনচারেক কলকাতায় ক্যাম্বেল এবং মেডিক্যাল স্কুলে পড়ে পাশ করে এসেছেন। এঁরা সকলেই বিনয়ের পাইকিরি খদ্দের। বিনয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁদের নেই এমন নয়, আছে; পুরনো ওষুধ বিনয় চালায়। দাম বেশী ঠিক নেয় না তবে কো-অপারেটিভে দাম আরও কম হবে। ক্লিনিকের তেমন প্রয়োজন তারা অনুভব করে না। তবে হলে মন্দ কী? শক্ত রোগে দু-এক ক্ষেত্রে প্রয়োজন হতেও পারে। এবং প্রদ্যোত ডাক্তারকে একটু তুষ্ট রাখারও প্রয়োজন তাদের আছে। দু-একটা শক্ত রোগী, বিশেষ করে অপারেশন কেস, নিয়ে এলে হাসপাতালে সেগুলি করে দেবে প্রদ্যোত ডাক্তার। কিছুটা বিজ্ঞানের প্রেরণার তাগিদও অবশ্যই আছে। তারা সকলেই অপেক্ষা করে রয়েছে। বিপিনবাবুকে দেখে ডাক্তারেরা ফিরলেই আলোচনা আরম্ভ হবে।

প্রদ্যোতেরা বিপিনের কেস আলোচনা করতে করতেই ফিরলেন। বিপিন-বাবু আজ বলেছেন—আপনারা কী বলছেন বলুন। এইভাবে আমি আর বেঁচে থাকতে চাইনে। জীবনমশায় বলে গেছেন আমি বাঁচব না।

রতনবাবু বলেছিলেন—না, তা তো তিনি বলেন নি বিপিন। তাঁর উপর ইনজাস্টিস কোরো না তুমি।

দৃঢ়ভাবে বিপিনবাবু বলেছিলেন—না, ইনজাস্টিস করি নি আমি। তিনি যেভাবে 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না' বলে চলে গেলেন, ফী না নিয়েই চলে গেলেন—তার মানে ও ছাড়া আর কিছু হয় না। বলুন না, আপনিই বলুন, তাঁর মতামত সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়েছে?

বিপিনবাবুর ছেলেটিও বলেছে—হ্যাঁ। উনি একরকম তাই-ই বলে গেছেন ইঙ্গিতে।

বিপিনবাবু বলেছেন—এখন আপনারা বলুন আপনাদের মত। এবং কতদিনে আমি বিছানা ছেড়ে- অন্তত ইনভ্যালিড চেয়ারেও একটু-আধটু ঘুরতে পারব

বলুন। আমার রাশীকৃত কাজ পড়ে রয়েছে। মধ্যে মধ্যে প্রাণের দায়ে মক্কেলরা আসে, তাদের সঙ্গে আপনারা দেখা পর্যন্ত করতে দিচ্ছেন না। তাই বা কখন থেকে দেবেন বলুন। ক্লাকলি বলুন। আমি শুনতে চাই।

চারুবাবু একটু বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, বলেছিলেন—আপনার মতো লোক অধীর হলে আমরা কি করব বিপিনবাবু! আপনি তো নিজেই জানেন এ রোগের কথা। তা ছাড়া চঞ্চল হচ্ছেন আপনি, এতে আপনার অনিষ্ট হবে।

—জানি। জেনেই বলছি। আমি এইভাবে থাকতে পারছি না। জীবন-মশায় তাঁর কথা বলেছেন এবং চলে গেছেন একরকম। এখন আপনাদের পালা। আপনারা বলছেন ভালো আছি আমি। বেশ। এখন বলুন কতদিনে আমি উঠব। অবশ্য পূর্বের জীবন ফিরে পাব না আমি জানি, কিন্তু তার সামান্য অংশ বলুন।

প্রদ্যোত বলেছে—কলকাতায় ডঃ চ্যাটাজি আপনাকে দেখছিলেন। তাঁর নির্দেশমতো এখানে আমরা চিকিৎসা করছি। মতামত তিনি দেবেন। আপনি তাঁকে আনান। আমরা বলতে পারি জীবনমশায়ের সঙ্গে আমরা একমত নই। আপনি আগের থেকে ভালো আছেন এবং এই উন্নতির যদি ব্যাঘাত না হয় তবে ক্রমে ক্রমে সেরে উঠবেন আপনি। কতদিনে, সে বলতে হলে ডাঃ চ্যাটাজির সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

—বেশ, তাই হোক। ডাঃ চ্যাটাজি আসুন। হরেন, তুমি যাও তাঁকে নিয়ে এসো। যা চাইবেন দেব। লজ্জায় ঘেন্নায় আমি দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। এর শেষ কথা জানতে চাই আমি। আর—

মাথা তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে বলেছেন—জীবনমশায়কে যেন আর না ডাকা হয়। আমি মরব কিনা জানতে চাই না। মরবে সবাই একদিন। এ রোগে আমি বাঁচব কিনা জানতে চাই।

কথাটা বলেছেন বাপকে লক্ষ্য করে।

সেই কথা বলতে বলতেই ফিরে এলেন ওঁরা। চাকর চা এনে সামনে নামিয়ে দিলে। হরিহর কম্পাউণ্ডার চারুবাবুর সামনে নামিয়ে দিলে একটি কাচের গ্লাসে দু আউন্স ব্রাণ্ডি এবং একটি সোডার বোতল। চারুবাবুরই এ প্রস্তাবে উৎসাহ বেশী। তিনিই হবেন সোসাইটির চেয়ারম্যান। ব্রাণ্ডির গ্লাসে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে চারুবাবু পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে বললেন—নটা পাঁচ। কাজ শুরু করে দিন প্রদ্যোতবাবু। সময় এখন ভালো। দুর্গা দুর্গা—সিদ্ধিদাতা গণেশ! করুন আরম্ভ।

চারুবাবু আগে থেকেই পাঁজি দেখে রেখেছেন। প্রদ্যোত এসব মানে না, বরং মানা অপছন্দই করে তবু এক্ষেত্রে চারুবাবুর ইচ্ছায় বাধা দেয় নি।

প্রদ্যোত কাগজ-কলম টেনে নিয়ে বসল।

চারুবাবু হেসে বললেন—কি রকম মিটিং মশায়? একটা ওপনিং সঙ হবে না? হারমোনিয়ম—মিসেস বোস উপস্থিত থাকতে!

ডাক্তারের স্ত্রী অত্যন্ত সপ্রতিভ মেয়ে। সে মাথাটি নত করে সসম্রমে বললে—সভাপতির আদেশ শিরোধার্য। এবং অর্গ্যানটার সামনে বসে গেল।

একটা ব্যাঘাত পড়ে গেল।

হঠাৎ হাসপাতালের ফটকে চার-পাঁচজন লোক এসে ঢুকল। একটি মেয়ে বুক চাপড়ে কাঁদছিল—ওরে সোনা রে, ও মানিক রে! ওরে বাবা রে!

প্রদ্যোত একমনে হিসেব কষে যাচ্ছিলেন। কান্না শুনে কাগজ-কলম ধীরতার সঙ্গে গুছিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন।—এত রাত্রে এমন বুক চাপড়ে কাঁদছে—হাসপাতালে ছুটে এসেছে—নিশ্চয় অ্যাকসিডেণ্ট। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের কেস। কিন্তু এখানে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড মানে দুটি বেড এখন। একটি বেড ছিল, প্রদ্যোত এসে অনেক চেষ্টা করে কিশোরবাবুকে দিয়ে চেষ্টা করিয়ে আর-একটা বাড়িয়েছেন। থানা হেলথ সেণ্টার হলে পাঁচটা বেড হবে। কিছু নূতন ব্যবস্থাও করেছেন। কিন্তু ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সব থেকে বড় প্রয়োজন রক্তের। রক্ত কলকাতার ব্লাড ব্যাঙ্কে—দেড়শো মাইল দূরে।

—আমি আসছি। দেখি কী হল? প্রদ্যোত চলে গেল।

চারুবাবু বললেন—এমন কর্তব্যপরায়ণ লোক আমি দেখি নি। আমিও একসময় এখানে ছিলাম তো। আমারও খুব কড়াকড়ি ছিল। বুঝলেন মিসেস বোস, আমিও খুব কড়া লোক ছিলাম। তবে করব কী? সে কালই ছিল আলাদা। তখন হাসপাতাল ছিল বাবুদের, ডি-বি গ্রাণ্ট ছিল এই পর্যন্ত। বাবুরাই হর্তাকর্তা বিধাতা। ডিসপেনসারিতে কাজ করছি, বাবুদের কল এল, আসুন, আরজেণ্ট। কী করব, যেতে হল! গিয়ে দেখি ছোট ছেলে খুব চীৎকার করছে। তারস্বরে। বাবুর মেয়ের প্রথম ছেলে, বারো বছরের মেয়ের ছেলে—বুঝছেন ব্যাপার?

—বারো বছরের মেয়ের ছেলে? মঞ্জুর বিস্ময়ের আর অবধি রইল না।

—তার আর আশ্চর্য কী? সে আমলে এ তো হামেশাই হত। এগারো বছরের মেয়ের ছেলে আমি দেখেছি। চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে না হলে সেকালে হায় হায় পড়ত সংসারে। আর ছেলে হল না। দেবতাস্থানে মানত করত।

মঞ্জু বললে—আমার মায়ের মায়ের মা, গ্রেট-গ্র্যাণ্ডমা—তাঁর ছেলে হয়েছিল

তেরো বছরে ; আমার মায়ের মা। তাই শুনি যখন তখন আশ্চর্য হয়ে যায় সে বুড়ী আজও বেঁচে আছে। ওঃ, যা কালো হয়েছে বুড়ী! জানেন—

হঠাৎ একটা ভয়ার্ত চীৎকারে সকলে চমকে উঠল। কী হল? চীৎকারটা ডাক্তারের বাসার ভিতরে।

কেউ যেন বু-বু করে চেঁচাচ্ছে। কে? ঠাকুরের গলা বলে মনে হচ্ছে!

মঞ্জু দাঁড়িয়ে উঠে ছুটল। সঙ্গে সঙ্গে প্রদ্যোতের বন্ধুও ছুটল।

চারু ডাক্তার বললেন—কী হল, চোরটোর না কি?

হরেন বললে—কী জানি।

—না, কড়াই-ফড়াই উলটে ফেললে পায়ে? না কি? চারুবাবু বললেন—দেখো হরেন!

সকলেই সচকিত হয়ে চেয়ে রইল দরজার দিকে।

চারুবাবু শেষ ব্রাণ্ডিটুকু পান করে ডাকলেন—ও মশায়। ও মিসেস বোস! হল কী?

ওদিকে ভিতরে হাউমাউ করে কী বলছে ঠাকুরটা। কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে না। প্রদ্যোতের বন্ধু ধমকাচ্ছে। ডাক্তারের বউ খিলখিল করে হাসছে।

চারু ডাক্তার বললেন—বলি হরেন!

—আজ্ঞে!

—এ মেয়েটা কী হে? কী হাসছে দেখো তো? আবার বন্দুক নিয়ে না কি শিকার করে!

হরেন বললে—হাঁ, সাইকেলও চড়েন!

চারু ডাক্তার এবার বললেন—এ একটা গেছো মেয়ে! ডাক্তারটি লোক ভালো কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই গেছো মেয়ের পাল্লায় পড়ে গাছে উঠে না বসতে হয়; লেজ না গজায়!

সব ডাক্তারেরাই হেসে উঠল।

চারুবাবু মাথার টাকে হাত বুলিয়ে সরস হেসে বললেন—কিন্তু ওরা আছে বেশ। কপোতকপোতীসম। বেশ! হাসছে খেলছে গাইছে। বেশ আছে! মাঝে মাঝে মনে আপশোস হয় হে। বলি একালে জন্মালাম না কেন? ডাক্তার এবার নিজেই হেসে উঠলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খিলখিল করে হেসে যেন বর্ষার ঝরনার মতো ঝরে পড়তে পড়তে ওদিক থেকে বেরিয়ে এল প্রদ্যোত ডাক্তারের গেছো বধূটি। ডাক্তারের বন্ধুও হাসছিল, সে বল্লে—ইডিয়েট কোথাকার! কাণ্ড দেখুন তো!

চারু ডাক্তার বললেন—কী হল?

মন্টু বললে—ভূত। চারুবাবু—ভূত এসেছিল। আবার সে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে লাগল।

ভূত! চারু ডাক্তারের আমেজ ছুটে গেল।

হ্যাঁ। চারজন ঘরে খাবার আয়োজন করছে, ওদিকে রান্নাঘরে ঠাকুর গরমমশলা বেটে মাংসের সঙ্গে তলে দিচ্ছে; সারি সারি থালা বাটি সাজানো, হঠাৎ টুপটাপ শব্দে ঢিল পড়তে শুরু করে। ঠাকুর তাইতে উঠে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, আপাদমস্তক সাদা কাপড় পরে কে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই বলেছে—এঁকটু মাংস দেঁ! এঁকটু—দেঁ! বাস—ঠাকুর অমনি গোঁ-গোঁ করে উঠেছে।

প্রদ্যোতের বন্ধু বললে—আমার ইচ্ছে হল ব্যাটার গালে ঠাস করে চড় কষিয়ে দিই গোটা কয়েক।

চারু ডাক্তার বললেন—উঁহু। একটা উড়িয়ে দিলে চলবে না। জায়গাটা ভালো নয়। বহু লোকে বহুবার ভয় পেয়েছে এখানে। একটু এগিয়ে গিয়ে একটা বড় গাছ ছিল। সেখানে নানা প্রবাদ ছিল। আর হাসপাতাল যেখানে—ওখানটা তো ছিল মুসলমানের কবরস্থান। ওই জন্যে হাসপাতালে সেকালে রোগী হত না। গোটা সাত বছরে সাতটা রোগী হয় নি। যা গোটা চারেক হয়েছিল তাও মরণ-দশার ভিখিরী আর মারামারি—গোটা দুয়েক অ্যাকসিডেন্ট কেস—প্রায় আনক্লেমড প্রপার্টির মতো। সে সব ওই কিশোরবাবুর সোস্যাল সার্ভিসের দল কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ভরে দিত। একটা ছাড়া মরেছেও সব কটা। এবং সব রোগীকেই ভয় পেত।

মন্টু আবার খিলখিল করে হেসে উঠল, বললে—আপনি ভূত বিশ্বাস করেন নাকি ডাক্তারবাবু?

চারুবাবু বললেন—হ্যাঁ। মানে, করি, করি আবার করিও না। করি না আবার করি, দুই-ই বটে। মানে, কী আছে কী যে নাই—এ ভারি মুশকিল।

প্রদ্যোত ফিরে এলেন। গম্ভীর মুখ। আস্তিন পর্যন্ত জামা গুটানো। ডিস-ইনফেকট্যান্টের মৃদু গন্ধ উঠছে। চেয়ারের উপর বসে পড়ে বললেন—ছোট ছেলে, দু-মাস বয়স। গরম দুধ পড়ে একেবারে—।

চারু ডাক্তার আপনার অজ্ঞাতসারেই একটা দৈহিক যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে উঠলেন—আঃ!

মন্টু সভয়ে শিউরে উঠল। উঃ!

প্রদ্যোতের বন্ধু প্রশ্ন করলে—টিকবে?

—মরে গেছে। স্টোভের উপর শোওয়াবার পর মিনিট কয়েক ছিল।

তারপর বার কয়েক প্যাক্‌স্‌—ব্যস। আমি আর করি নি কিছু। শুধু দেখলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

মন্টু স্থির হয়ে গিয়েছে। তার সকল চঞ্চলতা, হাসি, কৌতুক—সব যেন শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রদ্যোতের বন্ধু বললে—এখানে আবার আর-এক হাঙ্গাম!

—হাঙ্গাম? মানে?

—তোমার ঠাকুর ভূত দেখেছিল। বু-বু শব্দে চীৎকার করে—সে এক কাণ্ড!

—ননসেন্স! বদমায়েশি করছে বেটা! বোধ হয় মাংস-টাংস সরিয়েছে। পরে বলবে ভূতে খেয়ে গেছে।

চারু ডাক্তার বললেন—উঁহু। সব ওরকম করে উড়িয়ে দেবেন না! উঁহু।

প্রদ্যোত হেসে উঠল।—আপনি ভূত মানেন নাকি?

চারু ডাক্তার বললেন—মানি মানে? এই গোরস্থানে—ওদিকে একটা মানুষের বাচ্চা মল অপঘাতে, এদিকে মাংসের গন্ধে ধরে ফেলা পড়ল; খোনা-স্বরে কথা কইলে। ব্র্যাণ্ডির আমেজ কেটে গেল। দিন, এখন আমাদের আর-এক আউন্স ব্র্যাণ্ডি দিন। সব মাটি। এক আউন্সের বেশী না। ব্যস, ব্যস।

প্রদ্যোত গ্লাসটি বাড়িয়ে দিয়ে বললে—সে যা হোক, ভূত থাক বা না থাক, মারামারি নাই। এদিকের কথা বলুন। তা হলে আমাদের এদিকের সব ঠিক তো!

—হ্যাঁ। ঠিক বই কি। না কিসে সব?

—তা হলে কাগজখানা দেখুন, সই করে দিন!

—আপনি পড়ুন ডাক্তার। ইউ সি ব্র্যাণ্ডি খেয়ে চালশের চশমা চোখে দিলে বড্ড বেশী উঁচু-নীচু লাগে আমার। আরে, ওই জন্যে রাত্রে কল এলে আমি যাই না। সে-তার। রাত্রে রোগী মরলে চারু ডাক্তার ইজ নট রেসপনসিবল। পড়ুন—আপনি পড়ুন।

প্রদ্যোত বলে গেল। কোম্পানির নাম হবে নবগ্রাম কো-অপারেটিভ মেডিক্যাল স্টোর অ্যাণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবোরেটরি।

চারু ডাক্তার বললেন গুড।

ক্যাপিটাল পাঁচ হাজার টাকা। শেয়ার দশ টাকা হিসেবে। চারুবাবু একশো শেয়ার নিচ্ছেন। মন্টু বোস একশো। আমার বন্ধু নির্মল সেন একশো। হরেনবাবু পঞ্চাশ।

—না মিঃ বোস। আমার পঁচিশ করুন।

—কেন হে হরেন? তোমার তো চলতি ভালো হে। জীবনমশায় তোমায় ডেকে ইনজেকশন দেওয়াচ্ছেন, ওদিকে রতনবাবুর ছেলে বিপিনবাবুর অ্যাটেণ্ডিং ফিজিশিয়ান তুমি, এই দুটো কেসেই তো তোমার পঞ্চাশের দাম উঠে যাবে হে!

হরেনের মুখখানা লাল হয়ে উঠল। কুর্‌নাহারের ডাক্তার হরিহর পাল এতক্ষণে বললে—তা রামহরিকে জীবনমশায় আর হরেনবাবু বাঁচিয়েছেন খুব। আমাকেই প্রথম ডেকেছিল পাগলা শশী। একেবারে সরাসরি কথা বলেছিল। উইল একখানা করে রেখেছে রামহরি—তাতে সাক্ষী হতে হবে তোমাকে। টিপসই আমরা দিয়ে নোব। তুমি সাক্ষী হয়ে যাও। হাঙ্গামা-হুজ্জুত কিছু হবেই না, ভয় কিছু নাই। যদি হয় বলবে—সজ্ঞানেই টিপসই করেছে রামহরি। টনটনে জ্ঞান ছিল। পঞ্চাশ টাকা—শেষে বলে একশো টাকা। কিন্তু আমি বললাম—ওতে আমি নাই শশীবাবু। মাফ করবেন আমাকে। টাকায় আমার কাজ নাই। আমি যা দেখেছিলাম—তাতে তো প্রায় শেষ অবস্থা। ও কেসটা খুব বাঁচিয়েছেন জীবনমশায়।

চারুবাবু বললেন—ওইটেই জীবনমশায়ের ভেলকি। আমি ভেলকি বলি বাপু। বুঝেছ না। রোগটা ঠাওর করতে পারে। তা পারে। নাড়ীজ্ঞানই বল আর বহুদর্শিতাই বল, যাই বল—লোকটা এগুলো প্রায় ঠিক ঠিক বলে দেয়। আর লোকটির গুণ হচ্ছে—ধার্মিক। কিন্তু ওই একটা ব্যাপার—ওই এ রোগী বাঁচবে না—ওই নিদান—ওইটেতে যেন একটা কেমন ঝোঁক আছে।

প্রদ্যোত ডাক্তার বললেন—আমি কিন্তু কথার মধ্যে একটু ইণ্টেরাপ্ট করছি। আমরা আসল কথা থেকে সরে যাচ্ছি। আমাদের কাজটা পাকা করে নিতে হবে।

হরেন বললে—আমার তা হলে চল্লিশখানা শেয়ার লিখুন।

চারুবাবু বললেন—তোমার দশখানার দাম আমি এখন দিয়ে দেব হে। তুমি আমাকে মাসে মাসে দিয়ো। যাও যাও আপত্তি কোরো না বস্ খতম। ওয়ান টু থি।

টেবিলের উপর চড় মেরে হাসতে লাগলেন। তারপর আবার বললেন—এই তো সাড়ে তিন হাজার উঠে গেল। বাকি দেড় হাজার রইল—এরা দিক। এরা রয়েছে পাঁচজনে, ওরা দুশো করে—মানে, কুড়িখানা করে দেবে। আর বাকি পাঁচশো—আমি বলি ওপন থাক্—দু-চারজন কোয়াক আছে—তারা যদি—

প্রদ্যোত দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—আমি কিন্তু এর বিরোধী ডাক্তারবাবু।

টাকে হাত বুলিয়ে চারুবাবু বললেন—আপনার এখন নতুন রক্ত প্রদ্যোতবাবু। অনেক কোয়াক ভালো চিকিৎসা করে, তাদের ভালো প্র্যাকটিস, তাদের টানুন। এই ধরুন জীবনমশায়।

বাধা দিলেন প্রদ্যোতবাবু। বললেন—এ নিয়ে তর্ক আমি করব না। কিন্তু এ ইনষ্টিটিউশন খাঁটি পাশকরা ডাক্তারদের। এখানে খাঁটি সায়ান্স ছাড়া ভেল্কিকে আমরা প্রশ্রয় দেবার কোনো দরজা খোলা রাখব না। ডাক্তারবাবু, আপনি অস্বীকার করবেন না যে এখানে এখনও দৈব ওষুধ অনেক চলে। কবচ মাদুলি চলে। এই তো আপনাদের এখানকার ধর্মঠাকুরের বাতের তেল ওষুধের খুব খ্যাতি। কলকাতা থেকে লোক আসে। কিন্তু আপনি ডাক্তার হয়ে প্রেসক্রিপশনে অবশ্যই লিখবেন না—ধর্মঠাকুরের তেল এক আউন্স। এবং সে তেলও আপনি এই ডাক্তারখানায় রাখতে বলবেন না। কবচ মাদুলিও আমাদের মেডিক্যাল স্টোর থেকে অবশ্যই বিক্রি হবে না।

—আপনি আমাকে দমিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু। চারু ডাক্তার ঘাড় নাড়তে লাগলেন।—যুক্তি আপনার কাটবার উপায় নেই। উকিল হলে আপনি ভালো উকিলও হতে পারতেন। কিন্তু—

—বলুন কিন্তু কী? খুব গম্ভীর মুখেই প্রদ্যোত প্রশ্ন করলেন। এবং টেবিলের উপর হাত রেখে চারুবাবুর দিকে একটু ঝুঁকেও পড়লেন আগ্রহ প্রকাশ করে।

হেসে ফেললেন চারুবাবু, বললেন—কিন্তু এটা এমন কিছু নয়, মানে ভাবছিলাম আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া অবশ্যই হয়, তাতে জেতে কে?

সমস্ত মজলিশটাই হো-হো করে হেসে উঠল। মিসেস বোস হেসে উঠল সর্বাগ্রে।

হাসি একটু কমে আসতেই চারুবাবু বললেন—তবে ওই পঞ্চাশটা শেয়ার পাবলিকের জন্যে খোলা থাক। কেউ একটার বেশী শেয়ার পাবে না। যারা কিনবে তারা ওষুধ পাবে একটা কনসেশন-রেটে।

—তাতে আমি রাজী। এবং ওটাকে বাড়িয়ে পঞ্চাশের জায়গায় একশো করার পক্ষপাতী আমি।

—বাস-বাস। দিন সই করে দি। নাও, সব সই করো।

সই করে চারু ডাক্তার কাগজখানা প্রদ্যোত ডাক্তারকে এগিয়ে দিয়ে বললেন —খাবার দেরি কত মিসেস বোস? অন্নপূর্ণার দরবারে শিব ভিখারী—তাকে চুপ করেই হাত পেতে থাকতে হয়। কিন্তু শিবের চ্যালারা হল ভূত। তারা খিদে লাগলে মানবে কেন?

—হয়ে গেছে। জায়গা করতে বলে এসেছি। হয়ে যেত এতক্ষণ। ঠাকুরটা যে ভয় পেয়ে মাটি করলে। চাকরটা তাকে আগলাচ্ছে। রান্নাঘর থেকে সব এ ঘরে এনে তবে জায়গা করবে।

—ওই দেখুন। ভূতের চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে।

—দেখছি আমি।

—দাঁড়ান।

—কী?

—আমি বলি কি, মাংসটা—ওটা না খাওয়াই ভালো।

—মাংস বাদ দেব? আপনি কি পাগল হলেন ডাক্তারবাবু?

—উহু। মুসলমানের কবরখানা—তার উপর মুর্গীর মাংস। উহু! মানে ভূত মানি চাই নাই মানি, আমরা ডাক্তার—ভূত মানা আমাদের উচিত নয়—মানবই বা কেন? তবে যখন একটা খুঁত হয়ে গেল, মানে বু-বু করবার সময় ঠাকুরটার থুতু-টুতু পড়ল কিনা কে জানে? কিংবা আরও কিছু হল কিনা কে বলতে পারে—তখন কাজ কী? মানে—আমি, মানে আমার ঠিক রুচি হচ্ছে না।

খাওয়ার সময় দেখা গেল মাংসে রুচি সমাগত স্থানীয় ডাক্তারদের কারুরই প্রায় হল না।

প্রদ্যোত ডাক্তার রেগে আগুন হয়ে উঠলেন ঠাকুরটার উপর। এ ওর বদমাইশি। আপনারা এটা বুঝতে পারছেন না? একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেছে এইবার। এই রকম একটা ব্যাপার করলে আপনারা কেউ মাংস খাবেন না। লোকাল লোক—এখানকার বিশ্বাস অবিশ্বাস জানে। ঠিক হিট করেছে। এইবার ব্যাটারা গোগ্রাসে গিলবে!

চারুবাবু বললেন—তাই থাক। ব্যাটারা খেয়েই মরুক। বুঝেছ না, হেভি ডোজে ক্যাস্টর অয়েল ঠুকবে। তবে বুঝেছ না, আমাদের রুচি মানে বললাম তো। থাক না। যা আসল কাজ তা তো হয়ে গেল—নবগ্রাম কো-অপারেটিভ মেডিকেল স্টোর অ্যাণ্ড ক্লিনিক্যাল ল্যাবোরেটরি। এ একটা মস্ত কাজ আপনি করলেন। ক্লিনিক্যাল টেস্ট ছাড়া এ যুগে এক পা এগুনো যায় না। উচিত না। অ্যাণ্ড—আপনি ওই কথাটা যা বললেন সেটা আমি মানি। ঠিক বলেছেন। কবচ মাদুলি দৈব ওযুধে ফল যদি হয়—আমরা প্রতিবাদ করব না, কিন্তু ওকে প্রশ্রয় দেব না।

তাঁরা চলে গেলেন একে একে।

প্রদ্যোত চাকর এবং ঠাকুরকে ডেকে বললেন—কালই দুজনে মাইনে মিটিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

মঞ্জু বললে—এটা তোমার অন্যায় হল।

—না, হয় নি।

তুমি সে সময়ে ঠাকুরের চেহারা দেখ নি। লোকটা ঠকঠক করে কাঁপছিল। কী, বলুন না মিস্টার সেন ?

সেন বললেন—ভয় লোকটা পেয়েছিল প্রদ্যোত, সেটা মিসেস বোস ঠিক বলেছেন। হি ওয়াজ ট্রেম্‌ব্লিং লাইক এ লীফ। পাতার মতো কাঁপছিল।

প্রদ্যোত বললেন—তোমাদের কথা মানতে হলে—আমি বুঝব—লোকটা অত্যন্ত ভূতবিশ্বাসী ; এটা কবরস্তান—রাঁধছে মুর্গীর মাংস সুতরাং কবর থেকে ভূত উঠে আসবে এই সব মনে মনে কল্পনা করছিল সন্ধ্যে থেকে এবং তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সে ভিশন দেখেছে। এ লোককে আমি হাসপাতালে রাখতে পারব না। আমার রোগীরা ভয় পাবে। কাল ভোরেই ওদের চলে যেতে হবে।

সাতাশ

সমস্ত রাত্রি জীবন মশায়ের ঘুম হল না। মনের মধ্যে একটা ঝড় বয়ে গেল সর্বক্ষণ। শশাঙ্ক, শশাঙ্কের স্ত্রী, বনবিহারী, বনবিহারীর স্ত্রী, আতর-বউ, বিপিন, বিপিনের স্ত্রী, রতনবাবু—যেন তাঁর শয্যা ঘিরে বসেছিল। রতনবাবু, বিপিন, বিপিনের স্ত্রী তাঁকে বারবার প্রশ্ন করেছে—বলুন, আপনি বলুন ! শশাঙ্ক, বনবিহারী, ওদের স্ত্রী, আতর-বউ ভ্রূকুঞ্চিত করে ইশারা করেছে, না-না-না।

নিজেকেও তিনি বারবার বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। মনে পড়ছে—তাঁর বাবা বলেছিলেন—নিদান দেবার সময় সর্বাগ্রে অন্তরে অনুভব করতে হয় পরমানন্দ মাধবকে। তাঁর প্রসাদে জন্মমৃত্যু জীবনমরণ হয়ে ওঠে দিবা এবং রাত্রির মতো কালো এবং আলোর খেলা, পরমানন্দময়ের লীলা। তখন সেই মন নিয়ে বুঝতেও পারবে নাড়ীর তত্ত্ব এবং বলতেও পারবে অসঙ্কোচে। জিজ্ঞাসিত না হয়ে এ কথা বলার বিধি নয়—তবে ক্ষেত্র আছে, যে-ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসিত না হয়েও নিজে থেকেই তোমাকে বলতে হবে। পরমার্থসন্ধানী বৃদ্ধকে বলতে হবে, বলতে হবে—বিশ্বাসবশে মুক্তির অভিপ্রায়ে বা আপনার বৈরাগ্যকে পরিপূর্ণ করে তুলবার জন্য যদি কোনো কাম্যতীর্থে যাবার বাসনা থাকে—তবে চলে যান ! কোনো গুপ্ত কথা যদি গোপন দুশ্চিন্তার মতো অন্তরে আবদ্ধ থাকে—তাকে ব্যক্ত করে নিশ্চিন্ত হোন। কোনো ভোগবাসনা বা মমতাসংক্রান্ত বাসনা যদি মনে অতৃপ্তির আকারে নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের ছলনায় আপনাকে ছলিত করে—তবে তা পূর্ণ করে পূর্ণ তৃপ্তি সঞ্চয় করে নিন।

আর-এক ক্ষেত্রে নিজে থেকে বলতে হবে রোগীর আত্মীয়কে—স্বজনকে।

সেক্ষেত্রে রোগী বৃদ্ধ না হলেও, পরমার্থ-সন্ধানী না হলেও বলতে হবে। কর্মী সম্পদশালী রোগী—যিনি সংসারে, সমাজে বহু কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, জড়িত, যাঁর উপর বহুজন নির্ভর করে, তাঁর ক্ষেত্রে অবশ্যই বলতে হবে তোমাকে। তাঁর আত্মীয়স্বজনকে বলবে; কারণ ওই মানুষটির মৃত্যুতে বহুকর্ম বহুজন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এক্ষেত্রে পূর্বাহ্ণে জানতে পেরে তার যতটুকু প্রতিকার সম্ভব—তা হতে পারবে।

আর-এক ক্ষেত্রে বলতে হবে। যে ক্ষেত্রে রোগী প্রবৃত্তিকে রিপুতে পরিণত করে মৃত্যুকে আহ্বান করে নিয়ে আসছে—সেই ক্ষেত্রে তাকে সাবধান করবার জন্য জানিয়ে দেবে; প্রবৃত্তিকে সংযত করো বাপু!

প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই পরমানন্দ মাধবকে অনুভব করা প্রয়োজন। কিন্তু সে মাধবকে এ জীবনে তাঁর পাওয়া হল না। তিনি কী করে রতনকে বলবেন? না, সে তিনি পারবেন না। মমতার সংসারে আশ্বাসই আশ্রয়, আশাই অসহায় মানুষের একমাত্র সুখনিদ্রা; জ্ঞানের চৈতন্যের কোনো প্রয়োজন নাই।

কালই তিনি হরেনকে বলে আসবেন। এ তিনি পারবেন না! রতনবাবুকে সে যেন বলে দেয়—জীবনমশায়ের মতিভ্রংশ হয়েছে, তিনি আর কিছু বুঝতে পারেন না। বড় ভুল হয়ে যায়। গতকালের নাড়ীর অবস্থা পরদিন মনে থাকে না। অনেক বিবেচনা করেই তিনি বলেছেন—তিনি আর আসবেন না।

ভোরবেলাতেই বিছানা থেকে উঠলেন তিনি।

নাঃ, আর না। বিপিন আরোগ্যলাভ করুক। মতির মা সুস্থ হয়ে ফিরে আসুক। দাঁতু বেঁচে উঠুক। তাঁর সব উপলব্ধি, সব দর্শন, ভ্রান্ত মিথ্যা হয়ে থাক।

নিচে নেমে প্রাতঃকৃত্য সেরে দাওয়ায় এসে বসলেন। সমস্যা এক জীবিকার। তা চলে যাবে।

উপার্জন অনেক করেছেন। জীবনে লক্ষ টাকার বেশী উপার্জন করেছেন—সব খরচ করে দিয়েছেন। ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকার মতো ওষুধের দাম বাকি পড়ে শেষ পর্যন্ত আদায় হয় নি। মেয়েদের বিয়েতে দেনা করেছিলেন, যাদের বাড়িতে দেনা—তাদের বাড়ি চিকিৎসা করে ফীজ নেন নি। আশা করেছিলেন—সুদটা ওতেই কাটান যাবে। কিন্তু তা যায় নি, তাঁরা দেন নি। সুদে আসলে নালিশ, ডিগ্রী করে সম্পত্তি নীলাম করে নিয়েছেন। কোনো আক্ষেপ নাই তাতে। তবে হ্যাঁ, যতটুকু জীবনে প্রয়োজন—ততটুকু থাকলে ভালো হত। রাখা উচিত ছিল। তা তিনি রাখতে পারেন নি। সংসারে হিসেবী বিষয়ী লোক তিনি হতে পারলেন না। লোকে বলে, জগদ্বন্ধুমশায়ের ঘরে দুধেভাতে জন্ম, নিজে দুহাতে রোজগার করেছে। নাড়ি টিপে পয়সা। হিসেব শিখবেই বা কখন—

করবেই বা কেন? ভেবেছিল চিরকাল এমনিই যাবে। দুহাতে রোজগার করে চার হাতে খরচ করেছে।

তাও খানিকটা সত্য বটে বই কি। কিন্তু ওইটাই সব নয়। না—তা নয়।

আতর-বউ বলে—এ সংসারে মন কোনোদিনই উঠল না মশায়ের। তেতো, বিষ লাগল চিরদিন। আমি যে তেতো, আমি যে বিষ! হত সে, অমৃত হত সব। তখন দেখতে—। সে অর্থাৎ মঞ্জরী! কথা শেষ করে, হাসেন আতর-বউ, সে যে কী হাসি—সে কেউ বুঝতে পারবে না; তাঁর সামনে ছাড়া তো ও হাসি আর কারও সামনে হাসে না।

এও খানিকটা সত্য। মশায়ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাসেন, মনে মনে বলেন—সংসারকে তোমরা তেতো করে দিয়েছ তাতে সন্দেহ নেই। তুমি, বনবিহারী, মেয়ে, জামাই সকলে; সকলে মিলে। তবে তোমার বদলে মঞ্জরী হলেও সংসার অমৃতময় হত না। এবং তাতেও তাঁর সংসারে আসক্তি হত না। না। হত না।

তাঁর মনের একটা কোণ তোমরা কোনোদিন দেখতে পাও নি। মনের সে কোণে তাঁর জীবনের শ্মশান-সাধনার আয়োজন। সেখানে অমাবস্যার অন্ধকারে নিজেকে ঢেকে রেখেছেন আজীবন। অহরহ সেখানে মধ্যরাত্রি। মৃত্যু, মৃত্যু আর মৃত্যু। এই নামই সেখানে জপ করে গেলেন আজীবন। মৃত্যু অমৃতময়ী হয়ে দেখা দেয়, বলেছিলেন তাঁর বাবা। সেই রূপ দেখবার যার সাধনার সে বিষয়ের হিসেব, বস্তুর যত্ন করবে কখন? নইলে যে রোজগারটা জীবনে তিনি করেছিলেন—তাতে কি তোমাকে পালকিতে চড়িয়ে নিজে সাদা ঘোড়ায় চেপে কাঁদী ঘুরে আসতে পারতেন না। সাদা ঘোড়া তো হয়েছিল। গহনাও তোমার কম হয় নি: পালকি বেহারার খরচ আর কত? তুমি তো জান না, রোগীর মৃত্যুশয্যার পাশ থেকে উঠে চলে আসবার সময় রোগীর আপনজনেরা যখন ডাকত—একটু দাঁড়ান মশায়, আপনার ফী। হাত পেতে নিয়ে ভাবতে ভাবতে আসতেন সেই বিচিত্ররূপিণীকে; আজও আসেন। এই পরিণাম মহাপরিণাম। অনিবার্য অমোঘ। বারবার প্রশ্ন করেছেন—কি রূপ? কেমন? বর্ণে গন্ধে স্পর্শে স্বাদে সে কেমন? কেমন তার কণ্ঠস্বর? বাবার বলা কাহিনীর রূপও এ সময়ে মনকে পরিতুষ্ট করতে পারে না!

হঠাৎ ধূমকেতুর মতো শশী এসে উপস্থিত হল। এই আশ্বিন মাসেই—শশী তার ছেঁড়া ওভারকোট চড়িয়েছে। হাতে হুঁকো। এই সকালেই চোখ দুটো লাল। নেশা করেছে, কিন্তু মদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না, গাঁজার গন্ধও না, বোধ হয় ক্যানা-

বিসিগুিকা খেয়েছে! বিনা ভূমিকায় বললে—রামহরে বেটা আজ উইল রেজেষ্ট্রী করতে আসছে। আপনাকে সাক্ষী করবে। রামহরের এই শেষ বউকে কিছু দেওয়াতে হবে আপনাকে। আর আমার ফীয়ের অনেক টাকা বাকি, তা ঝকমারুকগে গোটা বিশেক টাকা আমাকে দেওয়াবেন।

শশী বসল চেপে।

শশীকে কী বলবেন—তাই ভাবছিলেন তিনি। হঠাৎ বাইসিক্লের ঘণ্টার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে মুখ ফেরালেন তিনি। বাইসিক্ল আজকাল অতি সাধারণ যান, আশপাশে গ্রামের চাষীর ছেলেরাও আজকাল বাইসিক্ল কিনেছে। তবু ওর ঘণ্টার একটা আকর্ষণ আছে। এ গ্রামে বঙ্কুই প্রথম বাইসিক্ল কিনেছিল।

বাইসিক্ল দুখানা। প্রদ্যোত ডাক্তার আর তার বন্ধু দুজনে চলেছে। এ দিকে এত সকালে কোথায় যাবে?

প্রদ্যোত ডাক্তার নেমে পড়ল সাইক্ল থেকে। বন্ধুটি একটু এগিয়ে গিয়ে নামল। প্রদ্যোতবাবু হঠাৎ নেমেছে বোধ হয়।

—নমস্কার!

প্রত্যাশা করেন নি মশায়। একটু যেন চমকে উঠেই প্রতিনমস্কার করলেন—নমস্কার!

অহীন্দ্র সরকারের বাড়িটা কোথায় বলুন তো। বলে এল—আপনার বাড়ির কাছাকাছি।

—অহীনের বাড়ি? এই তো,—এই গলিটা ধরে যেতে হবে? ওদের বাড়ি যাবেন?

—হ্যাঁ। একটু হাসলেন প্রদ্যোত ডাক্তার।—অহীনবাবুর জামাই আমার ক্লাসফ্রেণ্ড। এক সঙ্গে আই. এসসি. পড়েছিলাম। তার ছেলের অসুখ। অহীনের জামাইয়ের ছেলে? দৌহিত্র? অতসীর ছেলে তা হলে? মতির মাকে যেদিন দেখে গঙ্গাতীর যাবার কথা বলেছিলেন সেদিন ফিরবার পথে মদনের ছেলে বদনের সঙ্গে জল ঘেঁটে খেলা করছিল একটি ছোট ছেলে—চোখ-জুড়ানো—যশোদা দুলালের মতো ফুটফুটে ছেলেটি,—সেই ছেলেটি? তার অসুখ? তিনি এই বাড়ির দোরে রয়েছেন—তাঁকে ডাকে নি, দেখায় নি? কী অসুখ?

ততক্ষণে গলির মধ্যে ঢুকে গেছে প্রদ্যোত এবং তার বন্ধু।

—আজকাল লোকের খুব পয়সা হয়েছে, বুঝলেন মশায়। মেলা পয়সা। আপনাকে আমাকে দেখাবে কেন? অথচ অহি সরকারের বাবার কত্তাবাবার আমল থেকে আপনারা চিরকাল বিনা পয়সায় দেখে এসেছেন।

মশায় অকস্মাৎ দাওয়া থেকে পথের উপর নেমে পড়লেন। ধরলেন ওই গলিপথ। অহি সরকারের বাড়ির দিকে!

* * *

শশী অবাক হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বলে উঠল—এরই নাম মতিচ্ছন্ন। দেবে, প্রদ্যোত ডাক্তার ঘাড় ধরে বের করে দেবে।

বছর চারেকের শিশু। জ্বরে আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে। এদিকের কর্ণমূল থেকে ওদিকের কর্ণমূল পর্যন্ত গোটা চিবুকটা ফুলেছে, সিঁদুরের মতো টকটকে লাল।

প্রদ্যোত ডাক্তার দেখেছে। বন্ধুটিও দেখছে। মা বসে আছে শিয়রে, অহি এবং একটি প্রিয়দর্শন যুবা দাঁড়িয়ে আছে পাশে। মশায় গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। নীরবে পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা বিষম যন্ত্রণা চলছে রোগীর দেহে, রোগীর অনুভবশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে। চেতনা বোধ করি বিলুপ্তির মুখে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মশায়! কোনো ছায়া পড়েছে কী? বুঝতে পারছেন না। দৃষ্টিশক্তি তাঁরও ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

প্রদ্যোত দেখা শেষ করে উঠে দাঁড়াল। মুখ গম্ভীর চিন্তান্বিত। তার চোখ পড়ল মশায়ের উপর।

—আপনি!

—আমি একবার দেখব। তিনি এগিয়ে এলেন রোগীর দিকে। বিছানায় বসে পড়লেন।

অপ্রস্তুত হল অহি সরকার। অতসীও হল। শশী মিথ্যা বলে নাই। আজ তিন পুরুষ ধরে মশায়দের প্রীতির জন্য সরকারদের চিকিৎসা খরচ ছিল না। আজ তাঁকে উপেক্ষা করে—।

অহি বললে—দেখুন না, কোথা থেকে কী হয়। কাল সকালে জামাই এল। ছেলেটা কোলে নিলে, বলল—ছোট একটা ফুসকুড়ি হয়েছে, একটু চুন লাগিয়ে দাও। সন্ধ্যেবেলা কাঁদতে লাগল—বড্ড ব্যথা করছে। ফুসকুড়িটা—মুড়ো ফোড়ার মতো মুখ-টুক নাই—একটু বেড়েছে দেখলাম। তারপর সারারাত ছটফট করছে, জ্বর এসেছে। সকালবেলায় দেখি মুখ ফুলেছে আর জ্বর, হুশ-চেতন নাই। আমি আপনাকেই ডাকতে যাচ্ছিলাম, তা জামাই বললে—এ তো ফোড়াটোড়ার জ্বর, হয়তো কাটতে হবে, কি আর কিছু করতে হবে। এতে ওঁকে ডেকে কী করবেন? তা কথাটা মিথ্যেও বলে নি। তার উপর হাসপাতালের ডাক্তারবাবু জামাইয়ের ক্লাসফ্রেণ্ড। তা আমি বললাম—তোমার ধন—তুমি যাকে খুশি দেখাও বাপু। আমার কি দায় এতে কথা বলতে!

মশায় ছেলেটিকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। প্রদ্যোত ডাক্তার ততক্ষণে বেরিয়ে চলে গিয়েছে। বাইসিকেলে চড়েই চলে গিয়েছে ওষুধ আনতে। ইনজেকশন দেবে। পেনিসিলিন ইনজেকশন।

ছেলেটির মা অতসী ব্যগ্রভাবে বলে উঠল—কেমন দেখলে মশায়দাদু? আমার ছেলে কেমন আছে? কী হয়েছে?

হেসে মশায় বললেন—গালগলা ফুলে জর হয়েছে ভাই! ভয় কী? ডাক্তার-বাবুরা রয়েছেন—আজকাল ভালো ভালো ইনজেকশন উঠেছে। ভালো হয়ে যাবে।

চলে এলেন তিনি; যেমনভাবে এসেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই বের হয়ে এলেন। অহি সরকার পিছনে পিছনে এসে রাস্তায় নেমে ডাকলে—কাকা!

—অহি?

—কী দেখলেন?

—নাড়ী দেখে আর কতটা বুঝব বলো? তবে জরটা বাড়বে।

—এখনই তো—

সে বলবার আগেই মশায় বললেন—দুই হবে—একটু ওপরেই। কম নয়।

—হ্যাঁ দুই পয়েন্ট দুই। আরও বাড়বে?

—বাড়বে বলেই মনে হচ্ছে, বাবা।

—গাল-গলা ফোলা? এমন লাল হয়ে উঠেছে! সামান্য ফোড়া!

ওরা তো রক্ত পরীক্ষা করছেন! দেখো। নাড়ী দেখে বলে যে বেকুব হতে হবে বাবা!

চলে এলেন তিনি, আর দাঁড়ালেন না। বাড়ির দোরে তখন দুখানি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একখানা পরান খাঁয়ের, অন্যখানা রামহরি লেটের। রামহরি উইলে সাক্ষী করাতে এসেছে।

শশী পালিয়েছে রামহরিকে দেখে।

* * *

পরানের স্ত্রী অন্তর্বত্নী! পরান খুশী হয়েছে। একটু লজ্জিতও যেন, সেইটুকু ভালো লাগল মশায়ের। মনটা ভালো থাকলে হয়তো একটু রসিকতাও করতেন। অন্তত মসজিদে-দরগায়-দেবস্থানে মানত মানতে বলতেন; বলতেন—তা হলে একদিন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করো পরান। এবার সন্তান হয়ে বাঁচবে। বুঝেছ? আর বিবিরও সব অসুখ সেরে যাবে। কিন্তু মনটা বিমর্ষ হয়ে আছে। চৈতন্য এবং অচৈতন্যের মাঝখানে—বিহ্বল অবস্থার মধ্যে উপনীত অতসীর ওই ছেলেটির কথাই তাঁর মনকে বিষণ্ণ করে রেখেছে! এখানে রিপু নাই, প্রবৃত্তির অপরাধ নাই

—প্রতিষ্ঠা, সম্পদ, লালসা, লোভ কোনোটার বিশেষ আকর্ষণে বাঁচবার বাসনা উদগ্র নয়। নবীন জীবন বাড়বার, পূর্ণ হবার জন্ম বাঁচতে চায় প্রকৃতির প্রেরণায়। কী প্রাণপণ কঠোর যুদ্ধ! নিজের দাবিতে সে যুদ্ধ করছে। প্রচণ্ড দাবি। প্রচণ্ডতম। নিষ্ঠুর ব্যাধিটা দেখা দিয়েছে কাল-বৈশাখী ঝড়ের মতো। একবিন্দু কালো মেঘে যার আবির্ভাব—সে কিছুকালের মধ্যেই ফুলে ফেঁপে ছেয়ে ফেলবে, ফেলতে শুরু করেছে। তাণ্ডব এখনও শুরু হয় নি। তবে খুব দেরি নাই। দেরি নাই। নাড়ী ধরে তিনি বাতাসের সোঁ সোঁ ডাকের মতো ডাক যেন অনুভব করেছেন। দূরের প্রচণ্ড শব্দের ধ্বনি যেমন মাটিতে অনুভব করা যায়, ঘরের দরজা-জানালায় হাত দিয়ে স্পর্শে অনুভব করা যায়, তেমনিভাবেই অনুভব করেছেন। এ ছাড়া আর উপমা নাই। বিষজর্জরতার মতো একটা জর্জরতা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। গতি তার উত্তরোত্তর বাড়বে—ঝড়ের সঙ্গে মেঘের মতো জ্বরের সঙ্গে বিষ-জর্জরতাও বাড়বে।

গাড়ি এসে থামল আরোগ্য-নিকেতনের সামনে। কে বসে আছে? শশী? আর ওটা? বিনয়? নবগ্রামের বি-কে স্টোর্সের মালিক! কাল ও আসবে বলেছিল বটে।

শশী তাঁকে দেখবামাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।—আজ আমি ছাড়ব না, পায়ের ধুলো নোব। জয় গুরুদেব। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং—তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

রামহরির উইলে মশায় রামহরিকে তার শেষ স্ত্রীকে পাঁচ বিঘে জমি দিতে রাজী করিয়েছেন। রামহরি শশীকেও পনেরোটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। মশায় তাকে বাঁচিয়েছেন—তিনি তার পূর্বজন্মের বাপ—তাঁর আজ্ঞা সে কি লঙ্ঘন করতে পারে? রামহরিরা বিচিত্র। ওরা সারা জীবনটাই পাপ করে যায়, কোনো নীতি-ধর্মই মানে না, কিন্তু দুটি একটি নীতি যা মানে তা কোনো কালে লঙ্ঘন করে না।

—তারপর? বিনয়কুমার, তোমার সংবাদ? বিনয় চুপ করেই বসে আছে। মুখর মানুষ সে। জীবনের সাফল্যের উল্লাসে অহরহই যেন ভেসে বেড়ায়, দুরন্ত হাওয়ার মতো। দুরন্ত কিন্তু উত্তপ্ত হাওয়া নয় বিনয়; সার্থক ব্যবসাদার মানুষ, বর্ষার জলভরা মেঘের স্পর্শে সজল এবং শীতল। বিনয় মিষ্টভাষী মানুষ।

বিনয় বললে—আমার মশায়, অনেক কথা। সংসারে মানুষ দু রকম, এক কমবক্তা আর এক উদ্‌বক্তা। আমি একেই উদ্‌বক্তা, তার উপর অনেক কথা। শশী ডাক্তারের হোক তারপর বলছি আমি!

—কথা অনেক থাকলে কাল আসিস বিনয়। আজ আমার মনটা ভালো নয়।

—কী হল?

—বোস। আসছি আমি!

বেরিয়ে এলেন মশায়। অতসীর ছেলেটি কেমন আছে? ছেলেটির সেই ফুটফুটে মুখখানি চোখের উপর ভাসছে। তার আজকের রোগক্লিষ্ট অর্ধ-চেতনাহীন বিহ্বল দৃষ্টি মনে পড়ছে। তার চিবুক থেকে কর্ণমূল পর্যন্ত রক্তরাঙা স্ফীতিটা —কালবৈশাখীর মেঘ কতটা ছড়াল? ঝড় কতটা বাড়ল?

বেরিয়ে এসেও থমকে দাঁড়ালেন। যাবেন তিনি? উচিত হবে?

কে বেরিয়ে আসছে? প্রদ্যোত ডাক্তারের সেই বন্ধুটি নয়? হ্যাঁ সেই তো!

মশায়ই আজ নমস্কার করলেন—নমস্কার! আবার ওখানে গিয়েছিলেন কি?

—নমস্কার! হ্যাঁ, ছেলেটির রক্ত নিলাম, পরীক্ষা করে দেখব।

কিন্তু সে তো সদরে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করবেন। ফল অন্তত কাল না হলে এখানে জানতে পারবেন না।

—হ্যাঁ। কিন্তু তা ছাড়া তো উপায় নাই। তবে পেনিসিলিন দেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে—স্ট্রেপ্টোককাস ইনফেকশন হয়েছে। হবেও তাই। দেখি।

—স্ট্রেপ্টোককাস ইনফেকশন?

হ্যাঁ। আপনারা যাকে বলেন সান্নিপাতিক। গলার ভিতরে ঘা দাঁড়াবে ছোট ছোট মটরের মতো।

—খানিকটা ডাক্তারি পড়েছিলাম—বাড়িতে। স্ট্রেপ্টোককাস শুনেছি। গলায় ঘা দেখেছি। অবিশ্যি সাধারণ লোকে ওকে সান্নিপাতিক বলে। আসলে সান্নিপাতিক ভিন্ন ব্যাপার। সে খুব কঠিন। কিন্তু—

—কিন্তু কী? আপনার মতে কী?

—জ্বর এখন কত দেখে এলেন?

—একশো তিন। কিছু কম। পেনিসিলিন পড়েছে, পেনিসিলিনের জন্যেও জ্বর একটু বাড়বে।

—না। এ জ্বর ওর রোজই বাড়ছে ডাক্তারবাবু, আমি পাশকরা ডাক্তার নই। তবে চিকিৎসা অনেক করেছি। এর মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টা। একটা প্রচণ্ড বিষ ঢুকেছে রক্তে। ফুলো কতটা বেড়েছে?

অরুণেন্দ্র ডাক্তার অভিভূত হয়ে গিয়েছিল এই বৃদ্ধের কথার আন্তরিকতায়। জ্ঞানের, অনুভূতির আভাসও সে অনুভব করছিল। মনে মনে চিন্তা করতে করতেই অরুণেন্দ্র উত্তর দিলে—অনেকটা বেড়েছে। বাড়ছে। আমাদের ধারণা

স্ট্রেপ্টোককাস ইনফেকশন হয়েছে খুব বেশী। বিকেল পর্যন্ত গলায় ঘা দেখা দেবে। আপনি বলছেন—

—আমি বলছি—আমার আমলের চিকিৎসায় এ রোগের আক্রমণ যা প্রবল তাতে সারবার নয় ডাক্তারবাবু। আমি পারি না। আপনারা ভাগ্যবান—এ আমলে অদ্ভুত ওষুধের সাহায্য পেয়েছেন। যা করবার সময়ে করুন। ঝড়ের মতন আসছে রোগের বৃদ্ধি। টেকাতে পারলেন তো থাকল, নইলে—। আমার এই কথাটা বিশ্বাস করুন।

—আমি বিশ্বাস করি মশায়। আমি বিশ্বাস করি। প্রদ্যোত অবশ্য একটু উগ্র। ছেলেও ও ভালো ছিল আমার চেয়ে। আমি ওকে গিয়ে বলছি।

সাইকেল চেপে সে চলে গেল।

—কী হল গুরুদেব? আবার কী হল প্রদ্যোতের সঙ্গে?

মশায়ের ঘন পাকা ভুরু দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল।—শশী? এখনও রয়েছিস? আজ বাড়ি যা। আজ বাড়ি যা।

—বাড়ি যাব; এই বিনয়ের সঙ্গে যাব।

—বিনয় যাবে পরে। তুই যা। তোর কাজ তো হয়ে গিয়েছে।

বিনয় হেসে বললে—শশী ডাক্তার যাবে কী? সঙ্গ নইলে যেতে পারবে না। একা পথ হাঁটলেই ওর মা পাশে পাশে ফিরবে।

—কে?

—ওর মা গো! মরেও বেচারী ছেলের মায়া ভুলতে পারছে না। শশী কোথায় নালায় পড়বে, কোথায় কোন গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে—তাই সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। জিজ্ঞেস করুন না শশীকে!

শশী নাকি বলে—তার মরা-মা তার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। তাকে পাহারা দেয়। লোক থাকলে অবশ্য থাকে না। কিন্তু শশী একলা পথ চললে তখনই বুঝতে পারে যে তার মাও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। সে নাকি তার কথাও শুনতে পায়! পথ ভুল হলে, কি খানা-খন্দ থাকলে তাকে সাবধান করে দেয়—দেখিস পড়ে যাবি।

বিনয় হাসলে। জীবনমশায় কিন্তু হাসলেন না।

শশীর মাকে ওরা জানে না যে। তিনি জানেন। এমন মা আর হয় না। সন্তানকে স্নেহ করে না কোন মা? কিন্তু শশীর মায়ের মতো এমন স্নেহ তিনি দেখেন নি।

শশীকে শুধু শশী বলে আশ মিটত না. বলতেন—শশীচাঁদ! আমার পাগল গো! একটু-আধটু মদ খায়, নেশা করে—তা ধরে ফেলেছে—করবে কী বলো?

যৌবনে শশী দুর্দান্ত মাতাল হয়ে উঠেছিল! দেশে ম্যালেরিয়া লাগল। শশী চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির কম্পাউণ্ডার। চার আনা আট আনা ফী। কুইনিন আর ম্যাগসালফ ওষুধ—ওই ডিসপেনসারি থেকেই নিয়ে আসে। রোজগার অনেক। তখন শশী চিকিৎসাও খারাপ করত না। ডিসপেনসারির কাজ সেরে শশী প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে বের হত। সর্বপ্রথম খেয়ে নিত আউন্স দুয়েক মদ। তার আগে ডিসপেনসারিতেও আউন্স দুয়েক হত। খেয়ে বোতলে জল মিশিয়ে রেখে দিত। জিনিসটা না থাকলে খানিকটা রেক্টিফায়েড স্পিরিটই জল মিশিয়ে খেত। রোগী দেখা শেষ করে শশী ফিরবার পথে ঢুকত সাহাদের দোকানে। তারপর শুয়ে পড়ত, হয় সেখানেই, নয় তো পথের ধারে কোনখানে কোনো গাছ-তলায়। শশীর মা দাঁড়িয়ে থাকতেন বাড়ির গলির মুখে পথের ধারে। ক্রমে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে, শেষে এসে উঠতেন সাহাদের দোকানে। শশীর প্রতি স্নেহের কাছে লজ্জা তাঁর হার মানত। এসে ডাকতেন।

—সাহা!

—কে? মাঠাকরুন! এই, এই আছেন—শশীবাবু আছেন।

—একটু ডেকে চেতন করিয়ে দাও বাবা।

মায়ের ডাকে শশী টলতে টলতে উঠে আসত। মা নিয়ে আসতেন তার জামা হুকো কল্কে স্টেথোসকোপ! শশী বলত—ওগুলো নে।

বৈশাখের ঝাঁ-ঝাঁ-করা দুপুরে গামছা মাথায় দিয়ে শশীর মায়ের ছেলের সন্ধানে বের হওয়ার একটি স্মৃতি তাঁর মনে আছে। জীবনমশায় কল থেকে ফিরছেন গোরুর গাড়িতে। পৃথিবী যেন পুড়ে যাচ্ছে। রাস্তায় জনমানব নাই, জন্তুজানোয়ার নাই, কাকপক্ষীর সাড়া নাই, অস্তিত্ব নাই; এরই মধ্যে শশীর গৌরবর্ণা মোটাসোটা মা আসছিলেন, মধ্যে মধ্যে দাঁড়াচ্ছিলেন, এদিক-ওদিক দেখছিলেন। সাহাদের দোকানে সেদিন ছেলের সন্ধান পান নি। সাহা বলেছে, শশীবাবু আজ বাইরে কোথা খেয়ে এসেছেন; দোকানে ঢোকেন নি। গিয়েছেন এই পথ ধরে।' মা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন: তাহলে নিশ্চয় রাস্তায় কোথাও পড়ে আছে।

পড়েই ছিল শশী, পথের ধারে একটা বট গাছতলার ছায়ায় শুয়ে বমি করে জামায় কাপড়ে মুখে মেখে পড়ে আছে; পাশে বসে একটা কুকুর পরম পরিতোষের সঙ্গে তার মুখ লেহন করে উদ্গীরিত মাদক-মেশানো খাদ্য খেয়ে মৌজ করছে। মা তাকে ডেকে তুলতে চেষ্টা করে তুলতে পারেন নি। জীবনমশায় তাঁর গাড়োয়ানকে দিয়ে শশীকে তুলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

মত্ত শশী উঠে, জীবন মশায়কে দেখে বলেছিল—কথাটা আজও মনে আছে

জীবনমশায়ের ; বলেছিল—মশায়বাবু গুরুদেব, চলে যান আপনি! মা ছুঁয়েছে—আমি ঠিক হয়ে গিয়েছি ; আমার মায়ের একবিন্দু চোখের জল পৃথিবী ডুবিয়ে দিতে পারে মহাশয়! ইয়েস, পারে! আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের কথা স্মর! অ্যান্টিপোডাস ডাজ নট নো—অ্যান্টিপোডাস জানে না—আমার মায়ের একবিন্দু চোখের জল—!

জীবনমশায় ধমক দিয়ে বলেছিলেন—যা-যা বাড়ি যা!

—যাব, নিশ্চয় যাব! নিজেই যাব! কারুর ধমক খাই না আমি।

খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার বলেছিল—হু ইজ টু অ্যাপ্রিসিয়েট মাই মেরিটস? মাই মাদার! মাই মাদার!

মা লজ্জিত হয়ে শুধু একটি কথাই বারবার বলেছিলেন—বাড়ি চল শশী। বাড়ি চল! বাড়ি চল!

সেই মা যদি মরণেও শশীর মতো ছেলের চিন্তা ছাড়তে না পেরে থাকেন তাতে—। আর পরলোক মিথ্যাই যদি হয়, তবে শশী, শশী তার মাকে ভুলতে না পেরে অসুস্থ মস্তিষ্কে যদি এমনি কল্পনা রচনা করে থাকে, অসুস্থ দৃষ্টিতে যদি মায়াকে কায়া ধরতে দেখে থাকে তবে আশ্চর্য কি?

কত রাত্রে তিনি আতর-বউকে দেখেন—বনবিহারীর ঘরে গিয়ে উঁকি মারছেন। তিনি নিজে? কখনো কখনো চেয়েছেন বই কি।

এই অতসীর ছেলেটি যদি—।

মশায় বললেন—কাল, কাল আসিস বিনয়। কাল। কাল। ছত্রিশ ঘণ্টার আঠারো ঘণ্টা গিয়েছে। আরও আঠারো ঘণ্টা। ঠিক মধ্যস্থলে।

কে আসছে? অহি?

জ্বর বাড়ছে কাকা। ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। ফুলো বাড়ছে। মুখখানা এমন ফুলেছে—অহির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। আপনি একবার—

—না। তুমি ডাক্তারের কাছে যাও! যদি পারে তো ওরাই পারবে বাঁচাতে। আমি জানি না। আমাদের আমলে এ ছিল না।

আঠাশ

বাঁচালে! তাই বাঁচালে প্রদ্যোত ডাক্তার। ধীর অথচ সাহসী, নিজের শাস্ত্রে বিশ্বাসী নির্ভীক তরুণ চিকিৎসক।

তখন বেলা দুটো। মশায় খাওয়া-দাওয়া সেরে সবে উপরের ঘরে এসে গড়িয়েছেন, অহীন সরকার ছুটে এল—মশায় কাকা! কাকা!

—কে? অহীন? গলা শুনেই চিনেছিলেন মশায়। ঝড় তাহলে এসেছে। শায়িত অবস্থাতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। পারলেন না কিছু করতে প্রদ্যোত? নতুন ওষুধ, যার এত নাম—কিছু হল না তাতে?

—একবার আসুন কাকা!

—কী হল?

—বুঝতে পারছি না। প্রবল জ্বর। ফোলা এমন বেড়েছে যে দেখে ভয় লাগছে। ছেলের সাড়া নাই। বেঘোর। আপনি একবার আসুন!

উনি গিয়ে কী করবেন বাবা? পাশকরা ডাক্তারও নয়, আজকালকার চিকিৎসাও জানেন না! হাতুড়ে। তার ওপর উনি গেলে তোমাদের নতুন ডাক্তার যদি বলে—হাত ধরব না, দেখব না? মধুর অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথাগুলি বলতে বলতেই বেরিয়ে এলেন আতর-বউ। তার ওপর তোমার জামাই হালফ্যাশানে লেখাপড়া-জানা ছেলে!

—চুপ করো আতর-বউ। ছি? চলো—আমি যাই অহীন।

—চুপ করব? ছি? আতর-বউ বিস্মিত হয়ে রইলেন স্বামীর মুখের দিকে।

—হ্যাঁ, চুপ করবে বই কি!

বলতে বলতেই বেরিয়ে গেলেন মশায়। আতর-বউয়ের কথার দিকে কান দিলে চলবে না এখন।

স্তব্ধ উৎকণ্ঠায় ঘরখানা যেন নিশীথ রাত্রির মতো গাঢ় হয়ে উঠেছে। ব্যাধির প্রবল আক্রমণে শিশু চৈতন্যহীন—স্তিমিত দৃষ্টি নিথর হয়ে পড়ে আছে। শুধু জ্বরজর্জর ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ছেলেটির বুক পেট উঠছে নামছে; যেন হাঁফাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে অস্ফুট কাতর শব্দ নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে। মুখের ফোলার অবস্থা দেখে চমকে উঠলেন মশায়। এদিকে বুকের উপর পর্যন্ত চলে এসেছে, ওদিকে দুই কর্ণমূল পার হয়ে পিছনের দিকে ঘাড় লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে। চামড়ার নিচেটা যেন রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে।

ঘরের লোকগুলির মুখে ভাষা নাই, উৎকণ্ঠায় ভয়ে ভাষা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, নিষ্পলক আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। নিশীথ আকাশের তারার মতো জেগে রয়েছে। অসহায় গ্রহ-উপগ্রহ সব—অসহায়; তারা তাকিয়ে দেখছে একটি নবজাত গ্রহ বিচিত্র কারণে নিভে যাচ্ছে।

মশায় এসে দাঁড়ালেন বিছানার পাশে। সন্তর্পণে বসে হাতখানি তুলে নিলেন। অহীন বললে—চার। আপনাকে ডাকতে যাবার আগে দেখেছি। প্রদ্যোত

ডাক্তারের বন্ধু অরুণবাবু যখন রক্ত নিয়ে গেলেন তখন ছিল তিন তিনের কিছু কম ছিল। তারপর দেড়টার সময় বেহুঁশ—ডাকে সাড়া দেয় না দেখে জর লেখা হল—একশো তিনি পয়েন্ট দুই। দুটোর সময় প্রায় চার। দু পয়েন্ট কম। তারপর চার দেখে আপনার কাছে গিয়েছিলাম।

হাতখানি নামিয়ে দিলেন মশায়, বললেন—ডাক্তারের কাছে কাউকে পাঠিয়েছ?

—জামাই নিজে ছুটে গিয়েছে।

—তিনি আসুন। তিনি ওষুধ দেবেন।

—আপনি কিছু মুষ্টিযোগ—

—আমার মুষ্টিযোগ কাজ করতে করতে রোগ হাতের বাইরে চলে যাবে বাবা। রোগ রক্তে। ইনজেকশন রক্তে কাজ করবে। তিনি আসুন।

—মশায়দাদু, আমার খোকন— ?

—ভয় কি ভাই? ডাক্তার আসুন। ওষুধ দেবেন। এখন ঝড় উঠেছে দিদি। শক্ত হয়ে হাল ধরে বোসো। ভয় কী? নিষ্পাপ শিশু, বালাধাত; ওষুধ পড়বামাত্র ধরবে। বাইরে বেরিয়ে এসে মশায় বললেন—জর আরও বেড়েছে অহীন—চারের ওপর। এখনও বাড়বে।

—বাড়বে?

—বাড়ছে—এই যে ডাক্তারবাবু এসে গিয়েছেন।

প্রদ্যোতকে নিয়ে এসে পৌছল অহীনের জামাই। অহীন বলে উঠল, জর আরও বেড়েছে বাবা। কাকা বলছেন—হাত দেখছেন—

ডাক্তার ভিতরে চলে গেল বিনা বাক্যব্যয়ে। মশায়ের হাত দেখায় সে অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হল।

মশায় ক্ষুণ্ণ হলেন না। ভিতরেও গেলেন না। দাঁড়িয়ে রহিলেন। রোগী এখানে শিশু। তার জীবনের কোনো ত্রুটিতে মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ নাই। এই মৃত্যুই অকালমৃত্যু। এমন মৃত্যু দেখেছেন অনেক। কিন্তু সেখানে যুদ্ধ করেছেন প্রতিপক্ষ হিসেবে। আজ দেখছেন। ব্যাধির সঙ্গে নয়, এ যুদ্ধ মৃত্যুর সঙ্গে, রোগীর খুব কাছে এসে সে দাঁড়িয়েছে শিয়রে নয়তো পাশে, নয়তো পায়ের তলায়, হয়তো মায়ের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধ, বধির, পিঙ্গলকেশী!

ব্যস্তভাবে কে বেরিয়ে এল। কে? অহি সরকারের ছেলে। একখানা বাইসিকেল টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল। পিছনে এল ডাক্তার নিজে—চীৎকার করে বললে—বলবে, আমি বসে রয়েছি এক্ষুনি আসেন যেন!

—ডাক্তারবাবু? মশায় ডাকলেন।

—বলুন।

—কেমন দেখলেন? আমি ছেলেটিকে ভালোবাসি ডাক্তারবাবু!

—আপনি তো নিজে দেখেছেন। প্রদ্যোত একটু হাসলে।—আপনি যা দেখেছেন ঠিকই দেখেছেন, জ্বর বেড়েছে। সাড়ে চারের কাছে।

কী বুঝছেন?

একটু চুপ করে থেকে প্রদ্যোত বললে—চারুবাবুকে কল দিয়ে পাঠালাম। ওঁর সঙ্গে একটু পরামর্শ করব। আমার একটু ধাঁধা লাগছে। স্ট্রেপ্টোককাসে তো সাধারণত এমনভাবে ফোলে না! এত জ্বর! ভাবছি মাম্‌স নয় তো।

—মাম্‌স নয় ডাক্তারবাবু। সেটা আমি আপনাকে বলছি। রোগীর রক্ত বিষাক্ত হয়েছে। বেশী সময় নেই ডাক্তারবাবু, যা করবার এখুনি করুন।

—তা হলে কী বলছেন? সেলুলাইটিস? ইরিসিপ্লাস? বাঁচবে না বলছেন?

—নিদান হাঁকার দুর্নাম আমার আছে। হাসলেন মশায়—কিন্তু না। সে কথা বলছি না আমি! নাড়ীতে এখনও পাই নি। রোগ কখনও গোড়া থেকেই আসে মৃত্যুকে নিয়ে। কখনও রোগ বিস্তারলাভ করে মৃত্যু ঘটায়! আপনি আপনার ওষুধ দিন, মাত্রা দ্বিগুণ করুন; রোগ হু-হু করে বাড়ছে।

—বলছেন দেব পেনিসিলিন? আট ঘণ্টা অবশ্য পার হয়ে গেছে। চিন্তিত মুখে ঘরের মধ্যে চলে গেল প্রদ্যোত ডাক্তার। আবার বেরিয়ে এল। নিজের সাইকেলটা তুলে নিয়ে চলে গেল। বলে গেল—আসছি। পেনিসিলিন নিয়ে আসছি আমি। পাঁচ লাখ চাই। আড়াই লাখ আছে আমার কাছে।

বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে মশায় প্রদ্যোতের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

চারুবাবু আসবার আগেই প্রদ্যোত পাঁচ লাখ পেনিসিলিন দিয়ে বেরিয়ে এল। খাবার ওষুধ তৈরি করতে লাগল। বসে রইল স্তব্ধ হয়ে রোগীর দিকে চেয়ে।

চারুবাবু এলেন। তখন জ্বর একশো চার পয়েন্ট ছয়—বললেন—তাই তো! মাম্‌স বলছেন?

—না—সেলুলাইটিস কি—

চোখ বিস্ফারিত করে তাকালেন চারুবাবু। বুঝেছেন তিনি। মশায় দেখেছেন না কি?

—দেখেছেন। আমি পাঁচ লাখ পেনিসিলিন দিয়েছি।

—দিয়েছেন? তাই দিন। থাকলে ওতেই থাকবে। মশায় কই?

মশায় গিয়ে বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ বসে আবার নাড়ীটা ধরলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখলেন। ঝড়ের শেষের কিছু পূর্বে যেমন আলোর আভা

ফুটে ওঠে বর্ষামুখর ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যে, তেমনি যেন মনে হচ্ছে। ঝড়ের ঊর্ধ্বগতিতে এখনকার মতো ছেদ পড়ল। জ্বর কমবে এবার। মৃত্যু সরে যাচ্ছে—পায়ে পায়ে পিছনে হটে গেল খানিকটা। আবার রাত্রি তিনটে-চারটের সময় একবার আসবে।

বেরিয়ে এলেন মশায়। চারুবাবু চলে গিয়েছিলেন। প্রদ্যোত ব্যাগ গোছাচ্ছে। মশায় বললেন—জ্বর বাঁধ মেনেছে ডাক্তারবাবু।

—কমবে?

—হ্যাঁ। নাড়ী দেখে এলাম।

—থার্মোমিটার দিয়েছিলেন?

—না। আরও আধঘণ্টা পর দেখবেন। এখন থার্মোমিটারে ধরা যাবে না।

তাই কমল। পাঁচটার সময় জ্বর উঠল তিন পয়েন্ট ছয়। রোগী চোখ মেললে। কথা কইলে। রোগীর চোখে পলক পড়ল, ভাষার মুখরতা ফুটল দৃষ্টিতে।

জীবনমশায় তাকিয়ে রইলেন—রক্তাভ স্ফীতির পরিধির দিকে। পুঞ্জীভূত মেঘের মতো ব্যাধির বিষজর্জরতা জমে রয়েছে, জ্বরের বায়ুবেগ সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়েছে। মৃত্যু এখনও ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো ওই কোণে। শিশুটির দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন—ভয় নাই। চৈতন্য ফিরেছে—কথা বলছে, হাসছে কখনও কখনও, চৈতন্য স্তিমিত হলে আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকবে। বাঁচাও বলে চেঁচাবে না, কাঁদবে না। শেষ মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যাবে, নিস্তরঙ্গ, স্থির হয়ে যাবে প্রশান্তির মধ্যে।

একটা ভারী গলার আহ্বানে মশায়ের চমক ভাঙল।—মশায় আছেন? মশায় ভারী দরাজ গলা কিন্তু ক্লান্ত। ও! রানা পাঠক। রানার টি-বি হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে নয়, তাই-ই বটে। সেদিন ফিরিয়ে দিয়েছেন। আজ এই রাত্রে? বেরিয়ে এলেন মশায়। রানাই বটে।

—কী বাবা রানা? এত রাত্রে?

—আর পারছি না মশায়। অনেক জায়গা ফিরে এলাম। আপনি বলেছিলেন—পারুলেতে কবরেজদের কাছে যেতে, তাও গিয়েছিলাম। কিন্তু পোষাল না। কোথাও টাকা, কোথাও কিছু। মন লাগল না। শেষ আপনার কাছেই ফিরলাম।

আরোগ্য-নিকেতনের ভিতরে আলো জ্বলছিল। সেতাব বসেছিল আপন মনে ছকে গুটি সাজিয়ে, একাই দু পক্ষের হয়ে চাল চালছিল! ঘরে ঢুকে রানা একখানা

পুরনো চেয়ারে বসতে গিয়ে নেড়ে দেখে বললে—ভাঙবে না তো? যক্ষ্মা রোগে ধরলেও আমি তো রানা পাঠক! ওজন আড়াই মণ! হাসলে সে।

—ওটাও শালবৃক্ষের সার বাবা রানা।

কপালে হাত দিয়ে রানা বললে—আমি রানা পাঠক, আমিও নিজেকে দৈত্য মনে করতাম গো! বুক ঠুকে চেঁচিয়ে বলেছি, আশি বছরেও পাকা তাল কাঠের মতো সোজা থাকব, হাতির মতো গণ্ডারের মতো হাঁটব। সোজা চলে যাব দশ-বিশ ক্রোশ! তা—। হতাশার হাসি ফুটে উঠল মুখে, ঘাড় নেড়ে আক্ষেপ করে বললে—পাকা তালেও ঘুন ধরে, পচ ধরে মশায়!

আশ্বাস দিয়ে বললেন—চিকিৎসা করাও বাবা, নিয়ম করো ভালো হয়ে যাবে, ভয় কী।

—ভয়? হতাশার হাসির একটি বিশীর্ণ রেখা রানার মুখে লেগেই ছিল, সেই হাসির চেহারাটা পালটে গেল মুহূর্তে। এ হাসি সাধারণ লোকে হাসতে পারে না। এ রানারাই পারে। অনেককাল আগে—এক ভালুকওয়ালা এসেছিল প্রকাণ্ড বড় ভালুক নিয়ে; সে নিজে ভালুকের সঙ্গে কুস্তি করত। রানা তখন বছর বিশেকের জোয়ান। সে বলেছিল—আমি লড়ব তোমারা ভালুকাকা সাথ। মরেগা, কামড়ায়ে গা—আঁচড়ায়ে রক্তারক্তি করে গা তো তোমরা কুছ দায় নেহি। এবং মালসাট মেরে এই হাসি হেসে বলেছিল—আওরে বেটা বনকা ভালুকা, আও; চলে আও শঙ্গী জোয়ান! এবং দন্তী ও নখী বিপুলকায় জানোয়ারটাকে পরাভূত করেছিল সে। নিজেও জখম হয়েছিল কিন্তু তাতে তার এ হাসি মিলিয়ে যায় নি।

ভয়? রানা বললে—না—না না মশায়, ভয় নয়।

ঠাং ঠাং বাইসিকেলের ঘণ্টা বেজে উঠল। কে? মশায় চকিত হলেন। আবার প্রদ্যোত ডাক্তার এল? কেন? এখন তো আসবার কথা নয়?

রানা বলে গেল—ভয় নয় মশায়। ছেলেগুলো ছোট। অসময়ে যাব? বছরঙ্গের বছরসের সংসারে এলাম—রঙ্গরস ভোগ করতে পেলাম না! আর যাব যাব—একটা পাপ করে তারই ফলে পাপীর মতো যাব? এই আর কি! এখুনি পথে মতে কামারের দরজায় মতের মা-বুড়ীকে তাই বললাম!

—মতির মা ফিরে এল? মশায় ঈষৎ চকিত হয়ে উঠলেন।

পথের দিকে নিবদ্ধ তাঁর উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি রানার মুখের উপর ফিরল। একটা যেন ঝাঁকি খেলেন তিনি। ঘরে ঢুকল বিনয়; বললে—হ্যাঁ এল। দেখে এলাম।

রানা বললে—একটা পা সাদামতো কী দিয়ে ব্যাণ্ডেজের কাপড় লেপন দিয়ে বেঁধে রেখেছে। গোরুর গাড়ি থেকে মতি আর মতির বেটা ধরাধরি করে

নামাচ্ছে। আমি মশায় দেখে থমকে দাঁড়ালাম। বললাম—তা তুই একটা রঙ্গ দেখালি মতির মা! তা ভালো। বুড়ী বললে—তা রঙ্গ বটে ঠাকুর। সে কী কাণ্ডকারখানা। কী ঘর-দুয়োর, কী আলো, কী ব্যবস্থা, কী চিকিচ্ছে। কাটলে কুটলে—তো জানতে নারলাম। তা পরেতে দিন কতক কষ্ট বটে। শুয়ে শুয়ে মল-মূত্র ত্যাগ। তবে যত্ন বটে, ফুটফুটে টুকটুকে ভদ্রঘরের মেয়ে ধবধবে পোশাক পরে, মাথায় টুপি দিয়ে—ওষুধ খাইয়ে দেওয়া, পথ্যি দেওয়া, মুখ মুছিয়ে নেওয়া—বাবা, বলব কী—ময়লা মাটির পাত্তর সরানো—সব করছে! আর ডাক্তার কী সব? মশায় তো আমার নিদেন হেঁকে দিয়েছিল—তা দেখো বাবা ফিরে এসেছি। বলেছে মাস তিনেক পরে এই সব খুলে দেবে—তার পরে ও-কমাস মালিস্—তার পরে পা ফিরে পাব। আমি বললাম—আর কী পেলি মতির মা? অমর বর পেলি না? তা মতে কামার রেগে উঠল, বললে—যাও ঠাকুর যাও। নিজে তো বাঁচবার জন্যে পথে পথে এর কাছে ওর কাছে ঘুরছ—এ দেবতা ও দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়ছ! বললাম—মতে, তোর মায়ের বয়েস হলে কি রানা বাঁচতে চাইত রে? আমার ছেলে দুটো নেহাত নাবালক, একটা কন্যে আছে,—আর আমার দাদা রাঘব বোয়াল, আমি না থাকলে গিলে খেয়ে দেবে। বুঝলি? নইলে রানার মরতে ভয় নাই। কতবার মরণের সঙ্গে লড়েছি। বন্যেতে ভেসে-যাওয়া লোক মরণের মুখ থেকে এনেছি। জিতেছি। এবার না হয় হারব। তাতে কী?

জীবনমশায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, কথাগুলি শুনেছেন বলেও মনে হল না। মাটির মূর্তির মতো নিথর নিস্পন্দ হয়ে গেছেন তিনি।

তাঁর মনে পড়ে গেল প্রদ্যোত ডাক্তারের আজকের চেহারা। ধীর নির্ভীক চিন্তাকুল দৃষ্টি, হাতে ইনজেকশনের সিরিঞ্জে স্পিরিট ভরে ধুচ্ছেন। মধ্যে মধ্যে রোগীর দিকে তাকিয়ে দেখছেন। চিবুক, ঠোঁটের রেখায় দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ফুটে রয়েছে।

বিনয় বললে—দাঁড়ান, তিন মাস কেটেছে, এখনও তিন মাস বাকি। ছ মাসের মেয়াদ দিয়েছিলেন মশায়।

—না। ঘাড় নেড়ে মশায় বললেন—মতির মা বাঁচবে।

—তা বাঁচুক। রাবণের মা নিকষা হয়ে বেঁচে থাকুক।

—নারায়ণ! নারায়ণ! বলে উঠলেন মশায়। যেন সমস্ত পরিবেশটা অশুচি অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে।—থাক ও কথা।

—থাকুক। কিন্তু আপনি আমার চিকিৎসা করুন। বাঁচি, বাঁচি, না বাঁচি, না বাঁচি। মরণে আমার ভয় নাই। নিন্দেও আমি করব না। বিনয় আমাকে

দয়া করেছে, বলেছে ওষুধ যা লাগে ও দেবে। আপনি চিকিৎসা করুন। আমি শুনলাম, বিনয় আজই বললে—হাটকুড়ো কাহারের ছেলে পরানের মুখ দিয়ে ঝলক ঝলক রক্ত উঠত, আপনি তাকে সারিয়েছিলেন।

মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ তিনি সারিয়েছিলেন—কিন্তু সে এ কালরোগ নয়।

বিনয় বললে—আপনি দেখুন মশায়! ব্রাহ্মণকে বাঁচান।

—ওষুধই যখন তুই দিবি তখন প্রদ্যোত ডাক্তারকে দেখানো ভালো। ভালো চিকিৎসক, ধীর চিকিৎসক; আজ আমি দেখলাম।

—উঁহু, আপনি দেখুন। আপনি বাঁচান রানা ঠাকুরকে। রামহরিকে বাঁচিয়েছেন। আর একটা চিকিৎসা দেখিয়ে দেন। শুধু তাই নয় মশায়, সকালবেলা আপনি শোনেন নি আমার কথা। বলেছিলেন—কাল। তা রানা ঠাকুর আমাকে আজই আবার নিয়ে এল আপনার কাছে। আপনাকে আমার ডাক্তারখানায় একবেলা করে বসতে হবে। ডাক্তারেরা নতুন ডাক্তারখানা করে আমাকে মারবার চেষ্টা করছে। আপনি আমাকে বাঁচান।

মশায় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন বিনয়ের মুখের দিকে।

—মশায়!

—কাল। কাল বলব। আজ নয়। কাল। রানা তোমাকেও কাল বলব। আজ নয়। অহি সরকারের নাতিই আজ সব ভাবনা জুড়ে রয়েছে। কাল এসো।

—দেখছে তো প্রদ্যোত ডাক্তার। বারো লাখ পেনিসিলিন দিয়েছে আজ। বাঁচাবই বলে খুব হাঁক মেরেছে বুঝি?

—বিনয়, কাল। কাল। আজ আর কথা বলিসনে বাবা। মশায় উঠে পড়লেন। এরা কি সবাই ভাবে মশায় মৃত্যুঘোষণা ছাড়া আর কিছু করে না! ওতেই তাঁর আনন্দ!

সেতাব আপন মনে একলাই দাবা খেলে যাচ্ছিল, সেও সব গুটিয়ে নিয়ে উঠল। —আমিও আজ চললাম রে।

—যা। মন আজ আমার ওইখানে পড়ে আছে। খেলায় বসবে না। লড়াই চলছে, বুঝছিস না?

সত্যই লড়াই। মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই। তিনিও জীবনে বহুবার করেছেন। হারলে অগৌরব নাই। কিন্তু বেদনা আছে। বিশেষ করে অতসীর ছেলেটির মতো ক্ষেত্রে। টং শব্দে ক্লক ঘড়িতে একটা বাজল। প্রদ্যোত ডাক্তার সিরিঞ্জ পূর্ণ করে ঠিক করে রেখেছে। সে উঠে দাঁড়াল। ঠিক সাড়ে বারোটায়

সে এসেছে। ইনজেকশন শেষ করে সিরিঞ্জ ধুয়ে মুখ তুলে চাইলে। মশায় নাড়ী ধরে বসেছেন তখন। চোখ বুঁজে বসে রয়েছেন।

প্রদ্যোত বললে—আমার যা করবার করে গেলাম। সকালে ঠিক সময়ে আসব আমি। রোগীকে কিন্তু ঘুমুতে দিন। নাড়াচাড়া করবেন না।

চলে গেল সে। মশায় আরও কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে চাইলেন, চাইলেন দরজার দিকে। সরে যাচ্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

বললেন—ভালো আছে।

কীর্তিমান যোদ্ধা প্রদ্যোত ডাক্তার। এ যুগের আবিষ্কার বিচিত্র বিস্ময়কর! আর না! তাঁর কাল গত হয়েছে। আর না। কালকের সংকল্পটা মনে মনে দৃঢ় করলেন তিনি। আর না।

ঊনত্রিশ

'আর না' বলে আরও একবার তিনি চিকিৎসা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বনবিহারীর মৃত্যুর পর। তখন ভেবেছিলেন—আর কেন? পূর্ণাহুতি তো হয়ে গেল! কেউ ডাকতে এলে বলতেন—'ভেবে নিয়ো মশায় মরে গেছে।' শোক-দুঃখ কতটা তা ঠিক তিনি আজও বলতে পারেন না; তিনি চিকিৎসক, মহাশয় বংশের শিক্ষা, ভাবনা তাঁর মধ্যে, মৃত্যু অনিবার্য এ কথাও তিনি জানেন এবং শোকও চিরস্থায়ী নয় এও জানেন। জীবনের চারিদিকে ছ'টা রসের ছড়াছড়ি; আকাশে বাতাসে ধরিত্রীর অঙ্গে ছয় ঋতুর খেলা; পৃথিবীর মাটির কণায় কণায় যেমন উত্তাপ এবং জলের তৃষ্ণা, জীবের জীবনেও তেমনি দেহের কোষে কোষে রঙ ও রসের কামনা! ও না হলেও সে বাঁচে না। মানুষের মনে মনে আনন্দের ক্ষুধা। শোক থাকবে কেন, থাকবে কোথায়? শোকের জন্য নয়, আক্ষেপে ক্ষোভেও নয়, অন্য কারণে ছেড়েছিলেন। প্রথম কারণ জীবনের সব কল্পনা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

বনবিহারীর মৃত্যুর পরই বনবিহারীর স্ত্রী একমাত্র শিশুপুত্রটিকে নিয়ে চলে গেল পিত্রালয়। গেল প্রথমটায় কিছুদিন পর ফিরবে বলে। বন্ধুর স্ত্রী মা-বাপের একমাত্র সন্তান, বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী। মা-বাপ নিয়ে গেলেন সমাদরের সুখে বৈধব্যের দুঃখ প্রশমিত করে দেবেন বলে। কিন্তু সেখানে গিয়ে কিছুদিন পরই লিখে পাঠালেন—"মনো এবং খোকা এখানেই থাক। আমাদের তো আর কেহ নাই; ওই একমাত্র সম্বল। আপনাদের মেয়েরা আছে, দৌহিত্রেরা আছে।

আমাদের কে আছে? অবশ্য ক্রিয়াকর্মে যাইবে। আপনাদের দেখিতে ইচ্ছা হইলে যখন খুশি আসিয়া দেখিয়া যাইবেন। ইহা ছাড়াও মনোর ওখানে যাইতে দারুণ আশঙ্কা! তাহার ভয়—ওখানে থাকিলে খোকনও বাঁচিবে না। কিছু মনে করিবেন না, সে বলে—যেখানে রোগ হইলে আরোগ্যের কথা ভুলিয়া মৃত্যুদিন গণনা করা হয়, সেখানে আয়ু থাকিতেও মানুষ মরিয়া যায়।"

এ ছাড়াও আতর-বউ সম্পর্কে অভিযোগ ছিল। তাঁর কঠোর তিরস্কার কাহারও পক্ষেই সহ্য করা সম্ভবপর নয়।" ইত্যাদি।

সুতরাং আর অর্থ, প্রতিষ্ঠা অর্জন কেন, কিসের জন্য?

দ্বিতীয় কারণ, মনকে সঁপে দিতে চেয়েছিলেন কুলধর্ম ও পিতৃনির্দেশ অনুযায়ী পরমানন্দ মাধবের পায়ে। কিন্তু সেও পারেন নি। তার পরিবর্তে ভাবতেন নিজের জীবনের কথা আর ভাবতেন মৃত্যুর কথা। পরলোক তত্ত্ব চিকিৎসাতত্ত্ব সব তত্ত্ব দিয়ে এই অনাবিষ্কৃত মহাতত্ত্বকে বুঝবার চেষ্টা করতেন। কত রকম মনে হয়েছে। আরোগ্য-নিকেতনের পাশের ঘরখানায় চুপ করে বসে থাকতেন। বাড়ির ভিতরে ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদত আতর-বউ। গভীর রাত্রে উঠে গিয়ে বনুর ঘরে বারান্দায় ঘুরে বেড়াত। কখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত। প্রত্যাশা করত এত অতৃপ্তি এত বাঁচবার কামনা নিয়ে যে বনু মরেছে, মরবার সময়ে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে কেঁদেছে, সে কি গভীর রাত্রের নির্জনতার অবসরে ছায়াশরীর নিয়ে সবকিছুকে ছোঁয়ার জন্য, পাবার জন্য আসবে না? তিনি নিজেও মধ্যে মধ্যে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে ভাবতেন—দেখা যদি দেয় বনু তবে প্রশ্ন করবেন—মৃত্যু কী? মৃত্যু কেমন? কী রূপ? কেমন স্পর্শ? কেমন স্বাদ? বনু কাঁদল। ভুবন রায় ধীরভাবে হিসেব-নিকেশ চোকালেন। গণেশ বায়েন পরমানন্দে জীবন-মহোৎসব করলে! এই বিচিত্র-রূপিণী বহুরূপার আসল পরিচয়টি কী?

দীর্ঘ পাঁচ বছর—তাঁর জীবনে আর কেউ ছিল না, কিছু ছিল না। নিজের নাড়ী পরীক্ষা করতেন। কিন্তু কোনো কূলকিনারা পান নি। মধ্যে মধ্যে গ্রামের কারুর জীবনমৃত্যুর যুদ্ধে আত্মীয়েরা এসে ডাকত—একবার! একবার চলুন!

গিয়েছেন। চিন্তার মধ্যে যাকে ধরতে পারেন নি, ছুঁতে পারেন নি, যার ধ্বনি শোনেন নি, নাড়ী ধরে তার স্পষ্ট অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। তখন মনে হত, তাকে জানতে হলে তাঁর এই পথ।

তারপর একদিন গেলেন তীর্থভ্রমণে। মৃত্যুর কোনো সন্ধান না পেয়ে আবার খুঁজতে গেলেন, পরমানন্দ মাধবকে। গয়ায় বনুকে নিজ হাতে পিণ্ড দিয়ে সরাসরি গেলেন বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে বনুর আত্মার জন্য শান্তি প্রার্থনা করে মন্দিরপ্রাঙ্গণে

একখানি মার্বেল পাথর দিলেন। অন্য একখানা মার্বেল পাথর দেখে কথাটা মনে হয়েছিল। অনেক পাথরের মধ্যে চোখে পড়ল। প্রথমটা চমকে উঠেছিলেন তিনি।

"কাঁদী-নিবাসী ৺ভূপেন্দ্র সিংহের আত্মার
শান্তির জন্য—
হে গোবিন্দ দয়া করো, চরণে স্থান দাও।
মঞ্জরী দাসী।"

তীর্থ থেকে ফিরে নবগ্রাম স্টেশনে নামলেন; দেখা হল কিশোরের সঙ্গে। কিশোর তখন প্রদীপ্তললাট যুবা। পাচ বৎসরই কিশোরকে দেখেন নি মশায়। তিনি নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন ঘরে, কিশোরকে আবদ্ধ রেখেছিল গভর্ণমেণ্ট, রাজা।

কিশোর সবিস্ময়ে বলেছিলেন—মশায়!

তিনিও সবিস্ময়ে বলেছিলেন—কিশোর!

—এই নামছেন আপনি?

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি ছাড়া পেলে কবে? ওঃ, কত বড় হয়ে গিয়েছ তুমি!

হেসে কিশোর বলেছিল—তা হয়েছি। আর ক্ষীর চাঁচি ছানা চুরি করে খাই না।

—সে বুঝতে পারছি। মশায় বলেছিলেন হেসে—অবসর কোথায়? রুচিই বা থাকবে কী করে? এখন প্রভু কংসারির সঙ্গে ধনুর্যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রাখবার পথে সঙ্গীর সাজে সেজেছ যে!

কিশোর একটু লজ্জিত হয়েছিল এমন মহৎ পরিচয়ের ব্যাখ্যায়। পরক্ষণে সে লজ্জাকে সরিয়ে ফেলে সহজভাবে বলেছিল—আপনাকে যে কত মনে মনে ডাকছি এ কদিন কী বলব? আপনি এসেছেন—বাঁচলাম।

—কেন কিশোর? কিসে তোমাকে এমন মরণের ভয়ে অভিভূত করেছিল? মরণের ভয় তো তোমার থাকবার নয়!

—কলেরা আরম্ভ হয়েছে মশায়। নিজের মৃত্যুকে ভয়ের কথা তো নয়; মানুষের মৃত্যু দেখে—মানুষের ভয় দেখে ভয় পাচ্ছি। জানেন তো, ডাক্তারেরা কলেরা কেসে যেতে চান না, গেলে ফী ডবল। চারুবাবুর ফী ছ টাকা—আট টাকা। চক্রধারীর ফী চার টাকা। আমি হোমিওপ্যাথিক একটু-আধটু দি, কিন্তু ভালো তো জানি না! আপনি এলেন—এবার বাঁচলাম। আমাদের ছেলেবেলায় যখন কলেরা হয়েছিল তখন আপনিই গরিব-দুঃখীদের দেখেছিলেন। আজও যে আপনি না হলে উপায় নেই মশায়।

তিনি সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারেন নি। আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে ছিলেন কিছুক্ষণ। সেই পুরানো কালের—উনিশশো পাঁচ সালের মহামারীর কথা মনে পড়েছিল। সেই অন্ধ বধির পিঙ্গলকেশিনী দুই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে; মহাকালের ডমরুতে বেজেছে তাণ্ডব বাদ্য—তারই তালে তালে উন্মত্ত নৃত্যে আত্মহারা হয়ে ছুটে চলেছে সব মৃত্যুভয়ভীত মানুষ, আগুনলাগা বনের পশুপক্ষীর মতো আর্ত কলরব করে ছুটে পালাচ্ছে। ছুটে পালাচ্ছে—পিছনের লেলিহান শিখা বাতাসের ঝাপটায় মুহূর্তে নুইয়ে দীর্ঘায়িত হয়ে তাকে গ্রাস করছে—আকাশে পাখি উড়ে পালাচ্ছে—আগুনের শিখা লকলক জিহ্বা প্রসারিত করে তাকে আকর্ষণ করছে—পাখির পাখা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে—অসহায়ের মতো পড়ছে আগুনের মধ্যে। মহামারীর স্মৃতি তাঁর ঠিক তেমনি।

কিশোর বলেছিল—মশায়!

—কিশোর!

—আপনি চলুন, চলুন আপনি।

—আমি পারব? আমার কি আর সে শক্তি, সে উৎসাহ আছে কিশোর?

কিশোর বলেছিল—এই কথা আপনি বলছেন? মশায়ের বংশের মশায় আপনি।

কিশোরের কথায় মনে পড়েছিল বাবার কথা। গুরু রঙলালের কথাও মনে হয়েছিল। পরমুহূর্তেই তিনি বলেছিলেন—বেশ, যাব। তুমি ডাক দিলে—নিলাম সে ডাক।

সেইবার কলেরার সময় ইনট্রাভেনাস স্যালাইন ইনজেকশন দেখেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে মেডিকাল ভলান্টিয়ার্স এসে উপস্থিত হয়েছিল। একদল সোনার চাঁদ ছেলে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে এল লোকজন। স্যানিটারি ইনসপেক্টার। আর একদল এল, কী নাম যেন তাদের? কোদালি ব্রিগেড! কোদাল ঘাড়ে করে এল শিক্ষিত যুবকেরা।

শুকনো পুকুরের তলায় কুয়ো কেটে তারা জল বের করলে। তাই তো! কথাটা তো কারুর মনে হয় নি! স্যানিটারি ইনসপেক্টারেরা পুকুরে পুকুরে ব্লিচিং পাউডার গুলো দিয়ে জলকে শোধন করলে। অ্যান্টি-কলেরা ভ্যাকসিন ইনজেকশন দিলে। কলেরার টিকে!

সব থেকে বিস্মিত হয়েছিলেন—স্যালাইন ইনজেকশন দেখে।

অবিনাশ বাউড়ীর বউ—সত্যকারের সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, সকালে সে এসে ভদ্রপাড়ার বাসন মেজে ঘরদোর পরিষ্কার করে ঝিয়ের কাজ করে গেল তাঁর চোখের

সামনে। দুপুরে শুনলেন তার কলেরা হয়েছে। বিকেলে গিয়ে দেখলেন সেই স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মেয়েটার সর্বাঙ্গে কে যেন কালি মাখিয়ে দিয়েছে; একগাছা কাঁটার মতো কঙ্কালসার দেহের সকল রস কে যেন নিঙড়ে বের করে দিয়েছে। দেখে শিউরে উঠলেন তিনি। মৃত্যুর ছায়া পড়েছে সর্বাঙ্গে। নাড়ী নাই, হাতের তালু পায়ের তলা বিবর্ণ পাণ্ডুর, হাত পা কনুই পর্যন্ত হিমশীতল।

তরুণ দুটি ডাক্তার তখন তাঁদের দলে এসে যোগ দিয়েছে। চোখে তাদের স্বপ্ন, বুকে তাদের অসম্ভব প্রত্যাশা, ওই কিশোরের জাতের ছেলে। তারা বললে—স্যালাইন দেব একে। বের করলে স্যালাইনের বাক্স।

এ রোগী বাঁচে না একথা মশায় জানতেন, কিন্তু বাধা দেন নি। দাঁড়িয়ে দেখলেন, লক্ষ্য করে গেলেন। নিপুণ ক্ষিপ্র হাতে সাবধানতার সঙ্গে ওরা কাজ করে গেল। শিরা কাটলে, একমুখ বন্ধ করলে—অন্য মুখে স্যালাইনের নলের মুখটা ঢুকিয়ে দিলে। একজন কাচের নলটুকুর দিকে চেয়ে রইল। বুদ্‌বুদের মধ্যে দিয়ে বায়ু না যায়। সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে।

বায়ুতে বুদ্‌বুদ গেলেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। চারিদিকে দাঁড়িয়ে বিস্ময়াভিভূত জনতা। জীবনমশায়ের দৃষ্টিতে কৌতূহল—আনন্দ। অদ্ভুত! অদ্ভুত! মেয়েটার দেহ থেকে মৃত্যুছায়া অপসারিত হয়ে যাচ্ছে, কালি মুছে গিয়ে তার গৌর বর্ণ ফুটে উঠছে। রস-শুষে-নেওয়া শুষ্ক দেহ রস-সঞ্চারে আবার নিটোল পরিপুষ্ট কোমল হয়ে উঠছে, জীবনের লাবণ্য ফিরে আসছে। অদ্ভুত, এ অদ্ভুত! যুগান্তর, সত্যই এ যুগান্তর! মৃত্যু ফিরে গেল?

সে বড় কঠিন! যায় না। বৃদ্ধ জীবনমশাই হাসলেন আজ।

মনে পড়ছে যে!

ইনজেকশন শেষ হল—মেয়েটি হাসিমুখে সলজ্জভাবে মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে নিজেই পাশ ফিরে শুলে। ডাক্তারেরা যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে ব্লিচিং-পাউডার-মেশানো জলে হাত ধুচ্ছে, এই সময় হঠাৎ জলভরা পাত্র ভেঙে যেমন জল ছড়িয়ে পড়ে ঠিক তেমনিভাবেই মুহূর্তের মধ্যেই একরাশি জল ছড়িয়ে পড়ল, মলের আকারে নির্গত হয়ে গেল। এবং মুহূর্তে মেয়েটা আবার হয়ে গেল সেই মৃত্যুছায়াচ্ছন্না, কালিবর্ণ, কঙ্কালের মতো শুষ্ক। অবিনাশ বাউড়ীর স্ত্রী মারাই গেল। কিন্তু জীবনমশায় সেদিন মনে মনে মৃত্যুর সঙ্গে মানুষের সাধনাকেও প্রণাম জানিয়েছিলেন। মৃত্যুকে জয় করা যাবে না, কিন্তু মানুষ অকালমৃত্যুকে জয় করবে। নিশ্চয় করবে! ধন্য আবিষ্কার! ইউরোপের মহাপণ্ডিতদের প্রণাম করেছিলেন। হ্যাঁ—আজ বেদজ্ঞ তোমরাই। এই কথাই বলেছিলেম।

আজ পেনিসিলিনের ক্রিয়া দেখে এবং প্রদ্যোতের উদ্যম উৎসাহ দেখে ঠিক সেই কথাই বলছেন। তোমরা ধন্য।

সেদিন তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে চিকিৎসা আরম্ভ হয়েছিল। মনে পড়ছে, সংকল্প ছিল কলেরার আক্রমণ ক্ষান্ত হলেই আবার তিনি ঘরে ঢুকে বসবেন। কিন্তু তা পারেন নি। বিচিত্রভাবে শুরু হয়ে গেল। ডাক্তারদের সঙ্গে কলেরা-সংক্রামিত পাড়া ঘুরে রোগী দেখে ফিরে এসে কিশোরদের বাড়িতে বসতেন, হাত-পা ধুতেন—ব্লিচিং পাউডারে মাড়িয়ে জুতোর তলা বিশুদ্ধ করে নিতেন—ততক্ষণে দুজন চারজন এসে জুটে যেত; জ্বরে আমাশয়ে পুরানো অজীর্ণ ব্যাধিতে ভুগছে এমনি রোগী সব।

—একবার হাতটা দেখুন।

জীবনমশায় প্রথম প্রথম বলতেন—এই এদের দেখাও।

—না। আপনি দেখুন।

ডাক্তার দুটি বড় ভালো ছেলে ছিল, 'তারা বলত—দেখুন ডাক্তারবাবু, আপনাকেই দেখাতে চায় ওরা।'

মশায় দেখতেন। শুধু বলতেন—এই ন দিন না-হয় এগারো দিনে ওর ছাড়বে। ওষুধ দিতেন না।

তারপর একদিন ঈশানপুরে পরান কাহার তাঁকে টেনে নামালে।

সংসারে কত বিচিত্র ঘটনাই ঘটে!

সে এক দুরন্ত কালবৈশাখীর ঝড়ের অপরাহ্ণ। ঈশানপুরে কলেরার আক্রমণের খবর পেয়ে কিশোর এবং তরুণ ডাক্তার স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে গিয়েছিলেন ঈশানপুরে। গ্রামে ঢোকবার মুখে হঠাৎ উঠল ঝড়। বজ্রাঘাত। বর্ষণ। সবশেষে শিলাবৃষ্টি! আশ্রয় নিয়েছিলেন গ্রামের প্রান্তের প্রথম ঘরখানিতে।

একখানা মাত্র ঘর—কোলে একটা পিঁড়ে, মানে—ঢাকা রোয়াক, মেটে রোয়াক। পাশে আর-একখানা ছিটে বেড়ার হাত তিনেক মাত্র উঁচু ঘর। রোয়াকেও স্থান ছিল না। সেখানটা ঘিরে তখন আঁতুড়ঘর হয়েছে। ঘরের ভিতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে কেউ বলেছিল—কোথায় দাঁড়াবা বাবা? বাইরের পিঁড়েতে ঘিরে আমার পরিবারের সন্তান হয়েছে। ভিতরে আমি রোগা মানুষ শুয়ে আছি। তিনটে শুয়োর আছে, পাঁচ-ছটা হাঁস আছে। আপনারা বরং একপাশে কোনোরকমে দাঁড়াও।

তাই দাঁড়িয়েছিলেন; মসীবর্ণ মেঘ থেকে শিল ঝরছিল অজস্র ধারে, বিচিত্র সে দৃশ্য। লাখে-লাখে শূন্য মণ্ডলটা পরিব্যাপ্ত করে ঝরঝর ধারে ঝরছিল। সবুজ

পৃথিবী সাদা হয়ে যাচ্ছিল। অনেক কাল এমন শিলাবৃষ্টি হয় নি। মশায়েরা ভাবছিলেন মাঠে আজ কতজন কত জীবজন্তু জখম হবে, মরবে। আবার পৃথিবী বাঁচল, শান্ত হল, শীতল হল।

কিশোর কর্মী হলেও কবি মানুষ, ছেলেবেলা থেকে পদ্য লেখে। কিশোর মুখে মুখে পদ্য তৈরী করেছিল—তার একটা চরণ আজও মনে আছে :

'খ্যাপার মাথায় খেয়াল চেপেছে
নাচন দিয়েছে জুড়ে।'

এরই মধ্যে ঘরের দরজার ফাঁক থেকে ক্ষীণ ক্লান্ত কণ্ঠে কে অসীম বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিল—মশায়, বাবা! আপনি?

দরজাটা খুলে গিয়েছিল। বসে বসেই নিজেকে ছেঁচড়ে টেনে কোনো রকমে বেরিয়ে এসেছিল এক কঙ্কালসার মানুষ। যুবা না প্রৌঢ় না বৃদ্ধ তা বুঝতে পারা যায় নি। শুধু চুল কালো দেখে সন্দেহ হয়েছিল—রোগেই জীর্ণ, বৃদ্ধ নয়।

—কে রে?

লোকটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলেছিল—আমার যে নড়বার ক্ষ্যামতা নাই মশায়। আমাকে চিনতে লারছেন বাবা?

—কে? ঠিক চিনতে তো পারছি না বাবা! কী হয়েছে তোমার?

—আমি হাটকুড়ো কাহারের বেটা পরান। আপনকার গেরামে—আপনার পেজা হাটকুড়ো!

হাটকুড়োর ছেলে পরান।

তাঁরই গ্রামের—তাঁরই পুকুরপাড়ের প্রজাই বটে হাটকুড়ো। পরান, শূরবীর পরান। বছর কয়েক আগে প্রেমে পড়ে পরান বাপ মা জাতি জ্ঞাতি সব ছেড়ে প্রেমাস্পদা একটি ভিন্নজাতীয়া মেয়েকে নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করেছিল।

সেই পরানের এই কঙ্কালসার মূর্তি দেখে শিউরে উঠেছিলেন মশায়। তোর এমন চেহারা হয়েছে? কী অসুখ রে?

—রক্ত উঠছে মুখ দিয়ে বাবা। বমি হয়।

—রক্ত উঠছে। টি-বি? নতুন ডাক্তারেরা শিউরে উঠেছিলেন।

—আজ্ঞে লবগেরামের ডাক্তারখানার ডাক্তার বলছে—রাজব্যাধি যক্ষা। জবাব দিয়েছে। বলেই সে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে মশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—তবে এইবার আমি বাঁচব। ভগবান আপনাকে ডেকে এনেছেন ঘরে! আমার কপাল। আপনি একবার দেখো বাবা। আমাকে বাঁচাও। ফুরির আর কেউ নাই বাবা!

'ফুরি' পরানের প্রণয়াস্পদা, তার প্রিয়তমা। যার জন্য সে সব ছেড়েছে। তাকে ও ছেড়ে গেলে তার আর কেউ থাকবে না বলেই পরানের ধারণা। কিন্তু ফুরি আবার বিয়ে করবে। ফুরিও তাঁর গ্রামের মেয়ে, তার কথাও তিনি জানেন, ফুরি লাস্যময়ী স্বৈরিণী। তার জন্য বহু জনেই মোহগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু পরানের মতো তাকে গলায় বেঁধে ঝাঁপ কেউ দেয় নি। সকরুণ হাসিই এসেছিল তাঁর ঠোঁটের রেখায়। কিন্তু সে হাসি স্তব্ধ হয়ে মিলিয়ে গেল মুহূর্তে।

ফুরি এসে দাঁড়িয়েছিল তার আঁতুড়ঘরের দরজায়।—মশায়! বাবা! আমার কেউ নাই বাবা। তাকে দেখে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এই সেই ফুরি? সে স্বৈরিণীর কোনো চিহ্ন অবশেষ নাই মেয়েটার মধ্যে! সদ্য সন্তানপ্রসবের পর সে ঈষৎ শীর্ণ ঈষৎ পাণ্ডুর; কিন্তু রূপের অভাব হয় নি। লাবণ্য রয়েছে স্বাস্থ্য রয়েছে চিক্কণতা রয়েছে। চোখের দৃষ্টিতে গঠনে ফুরির একটি মাধুর্য ছিল সে মাধুর্যও রয়েছে, নাই শুধু লাস্যচাপল্য, যার ফলে ওকে আর চেনাই যায় না ফুরি বলে। ঠোঁটের পাশে গালে ওটা কী? তিল? ওটা তো মশায় কখনও দেখেন নি! তিনি অবশ্য ফুরিকে পথে চলে যেতেই দেখেছেন, দূর থেকেই দেখেছেন, তাঁর মতো মানুষের সামনে ফুরির মতো মেয়েরা বড় একটা আসত না। তাঁকে দেখলে সম্ভ্রমে পাশে সরে দাঁড়াত। তিলটা ঠিক বনবিহারীর স্ত্রী—তাঁর বউমার ঠোঁটের পাশের তিলের মত অবিকল।

কঃ বনবিহারীর স্ত্রীর—তাঁর পুত্রবধূর ধনী বাপ আছে মা আছে। এ মেয়েটার সত্যিই আর কেউ নাই। বাপ-মা মরেছে! এবং ওর মনের ভিতর যে স্বৈরিণী লীলাভরে এক প্রিয়তমকে ছেড়ে তাকে ভুলে গিয়ে আর-একজনকে প্রিয়তম বলে গ্রহণ করতে পারত সে স্বৈরিণীও মরে গেছে। পরান মরে গেলে ওর আর কেউ থাকবে না—এ বিষয়ে আর তাঁর সন্দেহ রইল না।

তিনি দাওয়ায় উঠে পরানের হাত ধরে নাড়ী পরীক্ষা করতে বসেছিলেন।

সেই হল তাঁর নূতন করে নাড়ী-ধরা, চিকিৎসা করতে বসা।

পরানকে তিনি বাঁচিয়েছিলেন।

যক্ষ্মা বা টি বি পরানের হয় নি। পুরানো ম্যালেরিয়া এবং রক্তপিত্ত দুইয়ে জড়িয়ে জট পাকিয়েছিল। চারুবাবু, চক্রধারী রক্তবমি এবং জ্বর দুটো উপসর্গ দেখেই সাংঘাতিক ধরনের গ্যালপিং থাইসিস বলে ধরেছিল। একালে দেশে যক্ষ্মার ব্যাপক প্রসার হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সাধারণ ডাক্তারেরা রক্ত এবং জ্বর

দুটোকে একসঙ্গে দেখলেই টি বি বলে ধরে নিয়েছিল। বিশেষজ্ঞ দেশে ছিল না, পরানেরও দূর শহরে গিয়ে দেখাবার সাধ্য ছিল না।

মশায় তার চিকিৎসার ভার নিয়েছিলেন। নিজেই আসতেন দেখতে। নিজে হাতে ওষুধ তৈরি করে দিতেন। পরান ভালো হল, তিনি হয়ে উঠলেন ধন্বন্তরি। নূতন করে জীবনের আকাশে সৌভাগ্যের সূর্য উদয় হল তাঁর। মাস কয়েক পর পরান সুস্থ দেহে বল পেয়ে কোদাল ঘাড়ে মজুর খাটতে বের হলে লোকের আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

এর পরই একদিন পরানের এখনকার গ্রাম ঘাট-রামপুরের মিয়াদের বাড়ি থেকে ডুলি এসে নেমেছিল আরোগ্য-নিকেতনের সামনে।

বৃদ্ধ সৈয়দ আবুতাহের সাহেব পুরানো আমলের কাশ্মিরী কাজ-করা শালের টুপি সাদা পায়জামা শেরোয়ানী পরে ডুলির বেহারাদের কাঁধে ভর দিয়ে এসে ওই রানা আজ যে চেয়ারখানায় বসেছে ওইখানেতেই বসেছিলেন—আপনার কাছে এলাম মশায়, আপনি পরান কাহারের এতবড় ব্যামোটা সারিয়ে দিলেন। আমারে আরাম করে দ্যান আপনি। আপনারে ঘরে ডাক না দিয়া—নিজে আপনার ঘরে এসেছি। আপনারে ধরবার জন্য এসেছি। আমারে আরাম করে দ্যান কবিরাজ।

বাঁ হাত দিয়ে মশায়ের হাতখানি চেপে ধরেছিলেন। কথা শুনেই বুঝেছিলেন মশায় মিয়া সাহেবের ব্যাধি কী? কথাগুলি জড়িয়ে যাচ্ছিল। মিয়া সাহেবের পক্ষাঘাতের সূত্রপাত হয়েছে, ডান হাতখানি কোলের উপর পড়েছে, ডান দিকের ঠোঁট বেঁকে গিয়েছে, ডান হাতখানি কোলের উপর পড়ে আছে। ডান পা-খানাও তাই।

মশায় ম্লান হেসে বলেছিলেন—এ বয়সে এ ব্যাধির মালিক পরমেশ্বর মিয়া সাহেব। ওই চোখ ওই হাত ওই অঙ্গটা তাঁর সেবাতেই নিযুক্ত আছে ভাবুন। আমার কাছে এর ইলাজ নাই। সে কিম্মতও নাই।

একটু চুপ করে থেকে মিয়া সাহেব বলেছিলেন—বলেছেন তো ভালো মশায়! মশায়-ঘরের ছাওয়ালের মতোই বাত বলেছেন। কিন্তু কী জানেন—শেষ বয়সে নিজেই বাধিয়েছি ফ্যাসাদ, মামলাতে পড়েছি। তাঁর সেবাতে ডান অঙ্গটা দিয়া নিশ্চিন্দি হতে পারছি কই! কিছু করতি পারেন না আপনি?

মশায় বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন—আপনার সঙ্গে মামলা কে করছে? সে কী?

রামপুরের মিয়ারা এ অঞ্চলের মুসলমান সমাজের ধর্মগুরু। তাঁদের সম্পত্তি সমস্তই লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর। এবং নির্ঝঞ্ঝাট। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে তিনি কখনও রামপুরের মিয়াদের আদালতের সীমানায় যাতায়াতের কথা শোনেন নি। তাঁরা

কাউকে খাজনা দেন না, খাজনা পান বহুজনের কাছে ; কিন্তু তাঁদের বংশের প্রথা হল —সুদও নাই, তামাদিও নাই। সে প্রথা তাঁদের প্রজারাও মানে। পঞ্চাশ বছর পরও লোকে খাজনা দিয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে মামলা করলে কে ?

মিয়া বলেছিলেন—কে করবে মশায়! করছে নিজের ব্যাটা-জামাই। ঘরের ঢেঁকি কুমির হল মশায়—তাই তো বাঁচবার লাগি এসেছি আপনার কাছে। ডান অঙ্গটা না থাকলে লড়ি, ঠেকাই কী করে ?

—কাজটা যে আপনি ভাল করেন নি মিয়া সাহেব ; উচিত হয় নি আপনার। মশায় সম্ভ্রমের সঙ্গে বলেছিলেন কথাটা।

মিয়া সাহেব বছর পাঁচেক আগে নতুন বিবাহ করেছেন। উপযুক্ত ছেলে তিনটি —মেয়ে জামাই নাতি নাতনী, বৃদ্ধা দুই পত্নী থাকতে হঠাৎ বিবাহ করে বসেছেন এক তরুণীকে। এবং সে তরুণীটি মিয়া বংশের ঘরের যোগ্য বংশের কন্যা নয়। স্ত্রী-পুত্রদের পৃথক করে দিয়ে, সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে, পৃথক সংসার পেতেছেন। একটি সন্তানও হয়েছে। এখন ছেলেরা শরিক হয়ে মামলা বাধিয়েছে। এদিকে মিয়া সাহেবের দক্ষিণ অঙ্গ পঙ্গু হয়ে পড়েছে !

মিয়া সাহেব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—হাঁ, ইকালে কাজটা নিন্দার বটে, তবে মশায় আপনিও সিকালের লোক, আমিও তাই। আমাদের কালের মানুষের কাছে কি পঞ্চান্ন ষাট বয়সটা একটা বয়স ?

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন—কারেই বা বলি ই কথা ? আপন বয়সী ইয়ার-বন্ধু ছাড়া বলিই বা কী করে। মশায়, প্রথম যখন কাঁচা উমর আমার —ষোলো-সতেরো বছর উমর,—তখুন—সেই কাঁচা নজরে মহব্বতি হয়েছিল এক চাষীর কন্যের সঙ্গে। আমার দিল দেওয়ানা হয়ে গেছিল তার তরে। ধরেছিলাম —উহাকেই শাদী করব। বাপ রেগে আগুন হলেন। আপনি তো জানেন— আমাদের বংশে বাঁদী কি রক্ষিতা রাখা নিষেধ আছে। নইলে না হয় তাই রেখে দিতেন। আমি গোঁ ধরলাম। বাবা শেষমেষ আমাকে লুকায়ে সেই কন্যের শাদী দিয়া পাঠায়ে দিলেন—একেরে দুটো জেলার পারে। আমাদেরই এক মহলে, পত্তনিদারের এলাকায়। মশায়, এতকাল পর হঠাৎ একদিন নজরে পড়ল—এক কন্যে ; ঠিক তেমুনি চেহারা—যেন সেই কন্যে নতুন জোয়ানি নিয়ে ফিরে এসেছে ! লোকে অবিশ্যি তা দেখে না। তা দেখবে কী করে বলেন ? আমার আঁখ দিয়া তো দেখে না ! তাই ভাই, মেয়েটাকে নিকা না করে পারলাম না।

মশায় একটু হেসেছিলেন।

মিয়া সাহেব বলেছিলেন—আপনিও হাসছেন গো মশায় ? তবে আপনাকে

বলি আমি শুনেন। ই শাদী করে আমি সুখী হয়েছি। হাঁ। মনে হয়েছে কি দুনিয়াতে যা পাবার সব আমি পেয়েছি। হাঁ। দুঃখ শুধু আয়ু ফুরায়ে আসছে; দেহখানা পঙ্গু হয়ে গেল ; মেয়েটাকে দুনিয়ার মার থেকে বাঁচাতে পারছি না।

তাঁর চোখমুখের সে দীপ্তি দেখে মশায় বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধের চোখ দুটো জলজল করে জ্বলে উঠেছিল। মনে হয়েছিল তাঁর সমস্ত অন্তরটা যেন প্রবল আবেগে ওই দুটো চোখের জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে, বলছে দেখো, সত্য না মিথ্যা—দেখো!

মিয়া সাহেব বলেছিলেন—মশায়, আমি বলি কি, আপনি আমারে দেখেন —তারপর আমার নসিব। বুঝলেন না?

কম্পিত ডান হাতখানা তোলবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বাঁ হাতের আঙ্গুল কপালে ঠেকিয়ে বলেছিলেন—ইটাকে লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা কারুর নাই। সে যা হয় হবে। ইয়ার লেগে এত ভাবছেন কেন আপনি মশায়? যিনি যক্ষার মতুন ব্যামো ভালো করতি পারেন তিনি যদি এই একটা সামান্য ব্যাধি সারাবারে না পারেন—তবে দোষটা আপনারে কেউ দিবে না, দিবে আমার নসিবের লিখনকে।

মশায় সেকথা শুনেও যেন বুঝতে পারেন নি।

তিনি চলে গিয়েছিলেন দূর অতীতকালে। অন্তরের মধ্যে কোথায় লুকানো গোপন আগুনের আঁচ অনুভব করছিলেন; অতি ক্ষীণ ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছিলেন যেন; চোখ যেন জ্বালা করছিল। সত্যসত্যই তাঁর চোখে জল এসেছিল। মনে পড়েছিল মঞ্জরীর কথা।

মিয়ার চোখ এড়ায় নি। তিনি বলেছিলেন—ইয়ারই তরে আপনার বংশকে বলে মশায়ের বংশ, ইয়ারই তরে লোকে আপনারে চায়। রোগীর দুঃখ-দরদে যে হাকিমের চোখে জল আসে—সেই ধন্বন্তরি গো!

মশায় মুহূর্তে সংবিত ফিরে পেয়েছিলেন; চোখ মুছে মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করেছিলেন। মিয়া সাহেবের চিকিৎসার ভারও নিয়েছিলেন তাঁকেই স্মরণ করে। বলেছিলেন—তাই হবে মিয়া সাহেব! চিকিৎসা আমি করব। আপনার ভাগ্য আর ভগবানের দয়া। আমার যতটুকু সাধ্য। কই দেখি আগে আপনার হাতখানি।

নিজেই তুলে নিয়েছিলেন তাঁর হাতখানি।

সেই হয়েছিল আবার শুরু।

প্রবাদ রটেছিল—পাঁচ বৎসর ঘরে বসে মশায় বাকসিদ্ধ হয়েছেন। মশায় যার নাড়ী ধরে বলেন—বাঁচবে, মরণ তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে থাকলেও ফিরে যায়।

আর যাকে বলেন বাঁচবে না—সেখানে আপনপুরে মরণের টনক নড়ে ; সে মুহূর্তে এসে রোগীর শিয়রে দাঁড়ায় !

বৃদ্ধ মিয়া সাহেবের হাত ধরেই তিনি চমকে উঠেছিলেন। মৃত্যুলক্ষণ তিনি স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন। ধীরভাবে ধ্যানস্থের মতো অনুভব করে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—বিষয় নিয়ে মামলায় আপনি বিব্রত বলছিলেন। মামলা আপনি মিটিয়ে ফেলুন মিয়া সাহেব। মামলা চালাবার সময় আপনার হবে না। একশো আশি দিন। ছ মাস।

—ছ মাস ? মামলা মিটায়ে ফেলব ?

—আমি তাই পেলাম।

পাঁচ মাসের শেষ দিনে মিয়া সাহেব দেহ রেখেছিলেন। মশায়ের নিজেরও যেন বিস্ময় মনে হয়েছিল। এত স্পষ্ট এবং এমন অঙ্কফলের মতো ধারণা এর আগে ঠিক হত না। যে পিঙ্গলকেশীকে ঘরে বসে চিন্তা করে, ধ্যান করে বিন্দুমাত্র আভাসেও পান নি, তাকে তাঁর চিকিৎসাসাধনার মধ্যে বিচিত্রভাবে অনুভব করছেন। নাড়ীর স্পন্দনের মধ্যে লক্ষণের মধ্যে, রোগীর গায়ের গন্ধের মধ্যে তার উপসর্গের মধ্যে, গাত্রবর্ণের মধ্যে, এমন কি আঙুলের প্রান্তভাগের লক্ষণের মধ্যে সেই পিঙ্গলকেশীর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছেন। মধ্যে মধ্যে আরও বিচিত্র অনুভূতি তাঁর হয় এবং হয়েছে। আজই অতসীর ছেলের কাছে বসে বারবার অনুভব করেছেন। তাঁর অশরীরী অস্তিত্ব দরজার মুখ থেকে পা-পা করে এগিয়ে আসছে মনে হয়েছে। আবার পিছিয়ে চলে যাওয়াও স্পষ্ট অনুভব করেছেন। রিপুপ্রভাবমুক্ত নিষ্পাপ শিশু বলেই সে ওষুধের ক্রিয়া মেনে ফিরে গেল। কিন্তু প্রদ্যোত বীর সাহসী যোদ্ধা। বীরের মতো যুদ্ধ করেছে। অস্ত্রও তেমনি অদ্ভুত শক্তিশালী। অদ্ভুত !

নিজের জীবনে আক্ষেপ থেকে গেল, ডাক্তারি পড়া তাঁর হয় নি। হলে—এ বয়সেও এ অস্ত্র নিয়ে ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করতেন তিনি। হয় নি এক সর্বনাশীর জন্য।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজেকেই নিজে বললেন—থাক আর না।

ত্রিশ

ঘুম আসতে রাত্রি তৃতীয় প্রহর পার হয়ে গিয়েছিল। রাত্রি দেড়টার সময় ইনজেকশন দিয়ে প্রদ্যোত বাড়ি গিয়েছিলেন, তারপর ছেলেটির নাড়ী দেখে মশায় বাড়ি ফিরেছিলেন। বিছানায় শুয়ে অনেক কথা মনে পড়েছে ; ঘুম আসতে তিনটে পার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঘুম ভাঙল সকালেই। ছেলেটির জন্য উৎকণ্ঠা নাই। সে তিনি রাত্রেই বুঝে এসেছেন। সংকটের ক্ষণ আসতে আসতে, আসতে পায় নি, গতিকে মোড় ফিরিয়েছে ওষুধ। তবু ঘুম ভাঙল। জ্বর কমেছে, ওই ফুলোটা কিভাবে কমে, কতটা কমেছে দেখতে হবে! রাত্রে ভালো দেখা যায় নি। প্রদ্যোত ডাক্তারকে অভিনন্দন জানাতে হবে, অকুণ্ঠ অভিনন্দন। সে ঘড়ির কাঁটার মতো আসবে, ইনজেকশন দেবে।

আতর-বউ তার আগেই উঠেছেন। নিচে একদফা তেজ বিকিরণ শেষ করেছেন। ভোরবেলা কালীতলায় জল দিতে গিয়ে মতি কর্মকারের মাকে দেখেছেন। কালীমাতার পাশেই মতির বাড়ি ; মতির মা কোঠা ঘরের জানালা খুলে কালীমন্দিরের দিকে তাকিয়ে কাতরস্বরে যন্ত্রণা উপশমের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছিল। মতির মায়ের প্লাস্টার-করা পায়ের যন্ত্রণা কাল কোনো কারণে বেড়েছে। সম্ভবত বর্ধমান থেকে এখানে আসার পথে কোনো কিছু অনিয়ম ঘটে থাকবে। মতির মাকে দেখে আতর-বউ তারই উপর বর্ষণ করেছেন তাঁর রাত্রির অবরুদ্ধ ক্রোধ।

মানুষের এত বাঁচবার সাধ? এত ভয়? মরণে এত দুঃখ! চিরন্তন প্রশ্নগুলি তিরস্কারের সঙ্গে মতির মায়ের কাছে উত্থাপিত করেছেন। বাড়ি ফিরেই স্বামীকে নিচে নামতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন—এত সকালে উঠলে? শুয়েছ তো রাত্রি দুটোর পর!

—ঘুম ভেঙে গেল। ছেলেটার খবর নিং? কেমন আছে?

—ওখানেও কি কিছু হেঁকে বসে আছ না কি?

গভীর স্বরে মশায় ডেকে উঠলেন—নারায়ণ নারায়ণ!

—আর তোমার নারায়ণ নারায়ণ! নিজের সন্তানের মৃত্যুকালে ওষুধ দিতে বললে যে দুধ গঙ্গাজল দিতে বলে, তাকে কিছু বিশ্বাস নাই! কিন্তু সেকাল এককাল ছিল। একাল হলে আর এই ডাক্তারের মতো ডাক্তার হলে আমার বন্থ মরত না। মতির মাকে দেখে এলাম। কোঠার জানালা খুলে কালীমাকে প্রণাম করছে!

মশায় ক্ষুব্ধ হলেন না। একটু হাসলেন। কী বলবেন আতর-বউকে?

জীবনের দুরারোগ্য অথচ অক্ষম ব্যাধির মতো! মৃত্যুর শান্তি কোনোদিন দিতে পারবে না, শুধু ব্যাধির জ্বালা-যন্ত্রণায় কষ্ট দেবে।

স্বামীর মুখে হাসি দেখে আতর-বউও হাসলেন। হেসে বললেন—রতনবাবুর ছেলেকে দেখে কী বলে এসেছ? ছি-ছি-ছি! ও-রকম করে বোলো না, বলতে নাই। বয়স হয়েছে। এখন ভ্রম হবে। সেটা বুঝতে হয়। কাল তখন অনেক রাত, তুমি অহি সরকারদের বাড়িতে। রতনবাবুর লোক এসে চারটি টাকা আর চিঠি দিয়ে গিয়েছে। আমি ব্যস্ত হলাম। কী জানি, এখুনি হয়তো যেতে হবে। বিনয় তখনও বসে ছিল—তাকে ডেকে পড়ালাম। সে বললে—মশায়কে যেতে বারণ করেছে। ডাক্তারেরা সবাই বলছে—ভালো আছে। এক মশায় বলেছেন, মুখে কিছু বলেন নি, ইশারায় বলেছেন—ভালো নয়। তা বিপিনবাবুর ইচ্ছে—। এই নাও চিঠি। রাত্রে দিই নি। কী জানি, মানুষের মন তো!

চিঠি আর চারটি টাকা নামিয়ে দিলেন। মশায় টাকাটা ছুঁলেন না। চিঠিখানাই তুলে নিলেন! হ্যাঁ, তাই লিখেছে রতনবাবু। ক্ষমাও চেয়েছে তাঁর কাছে। লিখেছে—"তোমার ইঙ্গিত যে ধ্রুব সত্য তাহা আমি জানি। এবং সে সত্যকে সহ্য করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুতও করিতেছি। কিন্তু বিপিন তাহা পারিল না। প্রদ্যোতবাবু প্রভৃতি ডাক্তারেরা অন্য মতই পোষণ করেন। সকলেরই মত বিপিন ভালো আছে। এবং কলিকাতা হইতে বড় ডাক্তার চ্যাটার্জি মশায়কে আনিবার কথা বলিয়াছে। বিপিনেরও তাই ইচ্ছা। সুতরাং...।"

যাক, মুক্তি! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মশায়। কিন্তু মুক্তিই বা কোথায়? বিপিন তো—। তাঁকে সে যেতে বারণ করেছে, তিনি যাবেন না, কিন্তু সে পিঙ্গলকেশী তো ফিরবে না। বিপিনের জন্য দুঃখে মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল।

—মশায়! উঠেছেন? মশায়?

ভারী গলা, দীর্ঘায়িত উচ্চারণ; এ রানা পাঠক। ওকে আজ আসতে বলেছিলেন কাল।

—মশায়!

রানা অধীর হয়ে উঠেছে মনে হচ্ছে।

—কাল রাত্রে রক্ত একটু বেশী উঠেছে মশায়!

—এ অবস্থায় তোমার হেঁটে আসা উচিত হয় নি, বাবা।

—কী করব? আপনি যে আসতে বলেছিলেন আজ।

একটু চুপ করে থেকে মশায় বললেন—কিন্তু আমি কী করব বাবা, এ রোগে?

—পরমায়ু থাকলে বাঁচাবেন, না থাকলে সময়ে বলে দেবেন, কালী কালী বলে তৈরি হয়ে যাব—আর যতটা পারবেন কষ্টের লাঘব করবেন। আর কী করবেন?

—মশায়!

—রানা!

—দেখুন আমার হাত। কী ভাবছেন আপনি?

মশায় বললেন—ভাবছি, তুমি প্রদ্যোত ডাক্তারদের দেখিয়ে—

বাধা দিয়ে রানা বললে—আজ্ঞে না। ও লোকটির নাম আমার কাছে করবেন না। ওর নাম না, চারুবাবুর নামও না। ওদের দুজনের কাছে আমি গিয়েছিলাম। সব কথা আপনাকে বলি নি। শুধু বলেছিলাম, ওরা লম্বা ফর্দ দিয়েছে! কিন্তু আরও আছে। আমি বলেছিলাম—এক্সরে, টে—যা বলছেন—কমসমে করিয়ে দেন। বামুন বলে, গরিব বলে ক্ষ্যামাঘেন্না করে নিন। তা হাসপাতালের ডাক্তার বললে—বামুন-টামুন আমি মানি না। আর গরিব বলেই বা তোমাকে দয়া করব কেন? তুমি অসচ্চরিত্র লোক, একটা স্ত্রীলোক থেকে অসুখ ধরিয়েছ। চারুবাবু বললে—তোমাদের ঘরে তো মা-কালী রয়েছে গো, অনেক পয়সা পাও তোমরা। তারপর হেসে বললে—মা-কালীর কাছে পড়ো না হে। মা-কালী সারাতে পারবে না? ওদের কাছে আমি যাব না।

বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল মশায়ের মুখে। রানার অন্তরের ক্ষোভটুকু তিনি অনুভব করতে পারলেন। রানাদের জাত আলাদা। এ কথা ওরাই বলতে পারে।

রানা বলে গেল—আপনাকে বলেছি, একটি মেয়েলোক থেকে আমার মতো অসুরের দেহে রোগটা ঢুকে গেল। কলকাতার এক হতভাগিনী মেয়ে। কলকাতার দাঙ্গার সময় গুণ্ডারা তাকে লুট করে। তারপর এখান ওখান করে তার লাঞ্ছনার আর বাকি রাখে নি। কোথা সেই বেহার পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে আবার কলকাতা—কলকাতায় আমাদের গাঁয়ের ওপাশে গঙ্গারাম-পুরের মুসলমান গুণ্ডা রহমত ওকে পায়, সে তাকে বোরখা পরিয়ে নিয়ে আসে এখানে। নদীর ঘাটে নৌকার উপর উঠিয়েছিল। আমি লগি ধরেছিলাম। আমার গলায় পৈতা। এই দেহ। তার ওপর লগিতে ঠেলা দিয়ে হাঁক মারলাম—জয়কালী! সব হরি হরি বলো! নৌকোতে সবই প্রায় হিন্দু। সবাই হরিবোল বলে উঠল। মেয়েটা তখন সাহস পেয়ে বোরখা ফেলে দিয়ে চীৎকার করে উঠল—আমাকে বাঁচাও। আমি হিন্দুর মেয়ে। ওরা আমাকে ধরে নিয়ে

যাচ্ছে। রহমত ছুরি বার করেছিল—কিন্তু আমার হাতের লগি তখন উঠেছে। মেরে উঠলাম হাঁক। রানা পাঠককে রহমত জানে। বেটা ঝপ করে নদীতে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীটা। মেয়েটাকে নিয়ে গেলাম বাড়ি। মুসলমানেরা এল। বললে—দিয়ে দাও, নইলে ভালো হবে না। আমি বললাম—মন্দকে ভয় করে না রানা। তা তোরা জানিস। পারিস নিয়ে যাস। সেই মেয়ে। বাড়ি ফিরতে চাইলে না। থেকে গেল। তা-পরেতে ঘি আর আগুন। জানতাম না মেয়েটার এ রোগ আছে। মেয়েটাও জানত না ঠিক। ক্রমে জানা গেল। কিন্তু তখন ওকে ছাড়া আমার সাধ্যির বাইরে। চরিত্রহীন বলছে বলুক, আমি ওকে বিয়ে একরকম করেছি। ভালোবেসেছি মেয়েটাকে। ভালোবাসতে গিয়ে রোগ ধরেছে, তার রোগ নিয়েছি, তাতে আমার লজ্জা নাই। সে যে যা বলবে বলুক। মরেও আমার সুখ। আর চারুবাবু বলে কালীর কথা। কালীর কাছে রোগ সারে কি না জানি না। তবে মায়ের ইচ্ছে হলে সারে। কিন্তু কালীর কাছে রোগ সারিয়ে দাও—এ বলতে আমি শিখি নাই মশায়। কালীর কাছে চাই—কালকে যেন ভয় না করি। তাকেই বলে মোক্ষ। কালীর কাছে চাই কালীর কোল! আপনি আমাকে ঘেন্না করবেন না, মা-কালী নিয়েও তামাসা করবেন না আমি জানি। তাই আপনার কাছে আরও আসা।

তা তিনি করবেন না। করেন না। তাঁর বাবা বলতেন—রোগীকে রোগ নিয়ে কখনও কটুকথা বোলো না। কখনও শ্লেষ কোরো না। পাপ-পুণ্যের সংসারে মানুষ পুণ্যই করতে চায়, কিন্তু পারে না। শাসন কোরো, ধমক দিয়ো, প্রয়োজন হলে ভয়ও দেখিয়ো। কিন্তু মর্মান্তিক কথা বোলো না, আর রোগী শরণাপন্ন হলে ফিরিয়েও দিয়ো না।

গুরু রঙলাল বলতেন—মানুষ বড় অসহায়, জীবন। রাগ কোরো না কখনও। ঘৃণাও না।

গুরু রঙলাল অনেক ক্ষেত্রে রোগীর গালে চড় মেরেছেন। ভূপী বোসকে মেরেছিলেন। এক শৌখীন তান্ত্রিক লিভারের কঠিন অসুখ নিয়ে এসেছিল তাঁর কাছে। তিনি মদ খেতে নিষেধ করেছিলেন। সোজা কথা ছিল তাঁর। বলেছিলেন—'মদ খেলে বাঁচবে না। মদ ছাড়তে হবে।' রোগী বলেছিল—'কিন্তু আমার সাধন-ভজন?' রঙলাল ডাক্তার বলেছিলেন—'বিনা মদে। কাঁসার পাত্রে নারকেল জল-টল দিয়ে করবে। পাঁঠা বলির বদলে মাষকলাই ছড়িয়েও তো হয় হে।' লোকটা জিভ কেটে বলেছিল—'বাপরে! তাহলে আর মা দেখাই দেবেন না!

ও আমার মায়ের আদেশ! মা আমাকে দেখা দিয়ে বলেছেন ডাক্তারবাবু!' রঙলাল ডাক্তার খপ করে তার চুলের মুঠো ধরে বলেছিলেন—'কী বললে? মা তোকে দেখা দিয়ে এই কথা বলেছেন? মিথ্যেবাদী! মা মদ খায়? খেতে বলে? যে মদে লিভার পচে—সেই মদ?'

জীবনমশায় জানতেন—এ রোগী বাঁচবে না। প্রবলরিপুপ্রভাবে সে অসহায়। বাঁচেও নি সে।

মানুষ অসহায়, বড় অসহায়! প্রবৃত্তির তাড়নায় সে মর্মান্তিক কলঙ্ক কাহিনী রচনা করে চলে। আজ রচনা করে—কাল অনুশোচনা করে, নিজেকেই নিজে অভিসম্পাত দেয়। মনে-মনে ভাবে আকাশে সূর্য নিভে যাক; কাজ নাই, আলোতে কাজ নাই। অন্ধকারে ঢাকা থাক সব। বহু দেখেছেন তিনি। উপার্জনক্ষম পুত্রের মৃত্যুশয্যায় পিতাকে উইল তৈরি করিয়ে নিতে দেখেছেন, বধূকে বঞ্চিত করে। আরও কঠিন পাপ করতেও দেখেছেন। ভাই-ভাগ্নে এদের কথা তিনি ধরেন না। পুত্রকেও ক্ষমা করেন তিনি! স্ত্রীর মৃত্যুশয্যায় স্বামীর ব্যভিচারে লিপ্ত থাকার ইতিহাস অনেক। স্বামীর মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীও ব্যভিচার করে, ভ্রষ্টা স্ত্রী। ভ্রষ্টা নয় এমন অনেককে গোপনে মাছ চুরি করে খেতে দেখেছেন এই কঠিন লগ্নে। শুধু মা, মায়ের পুণ্য অক্ষয়।

মানুষ বড় অসহায়!

মশায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। রানা ডাকলে—মশায়।

—একটু বসে জিরিয়ে নাও বাবা। কথা বোলো না। অনেকটা হেঁটেও এসেছ। একটু পরে দেখব। বোসো। আমি এদের এই ছেলেটাকে দেখে আসি।

অতসীর ছেলে আজ ভালো আছে। জ্বর কম, ফুলোটাও কমেছে। ফুলোর উপরের রক্তাভার গাঢ়তাও কম হয়েছে। পরিধি কমে নি, কিন্তু বাড়ে নি, থমকে দাঁড়িয়েছে। কাল সকালে জ্বর ছিল একশো দুইয়ের কাছাকাছি, আজ সকালে জ্বর একশো একের নিচে। চৈতন্যের উপর আচ্ছন্নতার যে একটি আবরণ পড়েছিল, সেটি কেটে এসেছে; ফুটফুট করে দু-চারটি কথা বলছে। ঠিক সাতটার সময় প্রদ্যোত ডাক্তারের বাইসিকেলের ঘণ্টা বেজে উঠল। ভোর পাঁচটার ট্রেনে সদর শহর থেকে অরুণেন্দ্র ব্লাড রিপোর্ট পাঠিয়েছে। কঠিন রোগ, মারাত্মক সংক্রমণ হয়েছিল—অরুণেন্দ্র রিপোর্টে লিখেছে—"উইথ এ টেণ্ডেন্সি টু ইরিপ্লাস।' চিকিৎসা তার নির্ভুল হয়েছে। রিপোর্টের জন্য কী উৎকণ্ঠাতেই কাল দিনরাত্রি

সে কাটিয়েছে! পৃথিবীতে অমৃতই শুধু ওষুধ নয়, বিষও ওষুধ। কাল দিন-রাত্রে এমনই ওষুধ অনেকটাই সে দিয়েছে। বৃদ্ধ মশায় অবশ্য তাকে বলেছিলেন—কিন্তু তার উপর পূর্ণ ভরসা করতে সে পারে নি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেই কত ক্ষেত্রে কত ভ্রম হয়, কত ক্ষেত্রে প্রথম দু-তিনবার পর্যন্ত রোগ ধরা পড়ে না। এ তো মানুষের অনুভব-অনুমান। কাল বিকেলে তার যখন সন্দেহ হয়েছিল মাম্‌স বলে এবং যখন ওই বৃদ্ধ বলেছিলেন—"মাম্‌স নয়; কঠিন বিষজর্জরতা রক্ত দূষিত করেছে, ঝড়ের মতো বাড়ছে এবং বাড়বে"—তখন তার খানিকটা রাগ হয়েছিল। বৃদ্ধ যদি বলত 'এ মৃত্যুরোগ', তবে প্রদ্যোত হয়তো রাগে নিজেকে হারিয়ে ফেলত। মৃত্যুরোগ নির্ণয়-শক্তির একটা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স বৃদ্ধের মাথা খারাপ করে দিয়েছে।

দাঁতু ঘোষাল ভালো আছে। বিপিনবাবু ভালো আছেন। মতির মা বর্ধমান থেকে ফিরে এসেছে কাল। বুড়ীর পায়ের যন্ত্রণা কাল রাত্রে বেড়েছে একটু। এই এখুনি এখানে আসার পথে, মতি মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে ছিল। বলেছে—"ডাক্তারবাবু, মায়ের পায়ের যন্ত্রণা যে বেড়ে গেল কাল রাত্রি থেকে! তাহলে—?"

প্রদ্যোতের বুঝতে বাকি থাকে নি—মতি যা বলতে চাইছে অথচ মুখে উচ্চারণ করতে পারছে না সে কথাটা কী। একবার মনে হয়েছিল বলে, তাহলে মশায় যা বলেছিল তাই করো। খোল করতাল বাজিয়ে নিয়ে যাও গঙ্গাতীরে। কিন্তু আত্মসম্বরণ করেছে। বলেছে আসবার সময় দেখব। কিছু নয়, ট্রেনে আসবার সময় পা নিয়ে নড়াচড়া হয়েছে, সেইজন্য বেদনা হয়ে থাকবে।

প্রদ্যোতকে সাদর সম্ভাষণ মশায়ই জানালেন—আসুন। রোগী আপনার দিব্যি কথা বলছে। ভালো আছে।

কপালে হাত ঠেকিয়ে নীরবে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে রোগীর বিছানার পাশে বসলেন।

মশায় বললেন—আমি দেখেছি—

মধ্যপথে বাধা দিয়ে প্রদ্যোত বললে—আমি দেখি!

—বিপদ কেটে গিয়েছে।

—না। বলেই প্রদ্যোত প্রশ্ন করলেন—রাত্রে প্রসাব কেমন হয়েছে বলুন তো?

বৃদ্ধ বুঝতে পারছেন না, ওষুধের প্রতিক্রিয়া আছে। প্রস্রাব বন্ধ হতে পারে। পেটে ফাঁপ দেখা দিতে পারে।

প্রস্রাব কমই হয়েছে। রাত্রি বারোটা থেকে সকাল পর্যন্ত একবার। পেটে ফাঁপ রয়েছে একটু। রোগী বেশ কয়েকবার জলের মতো তরল মলত্যাগও করেছে, পেটের দোষ হয়েছে। প্রদ্যোত ডাক্তার গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখে তারপর ইনজেকশনের সিরিঞ্জ বের করলে।

ইনজেকশন শেষ করে প্রদ্যোত উঠল। কই? মশাই কই?

নাই। চলে গিয়েছেন! অহি সরকার বললে, ওঁর আরোগ্য-নিকেতন থেকে ডাকতে এসেছিল।

প্রদ্যোত একটু দাঁড়িয়ে ভেবে নিল। সে কি কোনো রূঢ় কথা বলেছে? না। বলে নি।

অহি বললে—উনি বলে গেলেন আমাকে ডেকে, বিপদ কেটে গিয়েছে। আপনার খুব প্রশংসা করে গেলেন। বললেন, খুব যুঝেছে। খুব সাহস। খুব ধীর।

প্রদ্যোত বললে, প্রস্রাবের উপর নজর রাখবেন। একটু দেরিতেই হবে। তবু লক্ষ্য রাখবেন। আর পেটে ফাঁপ একটু রয়েছে—ওই ফাঁপটা দেখবেন। বাড়ছে মনে হলেই আমাকে খবর দেবেন। আর একটা কথা, মশায় নাড়ী দেখছেন বারবার, এটা ঠিক হচ্ছে না। আপনারাও চঞ্চল হতে পারেন। আমারও একটু কেমন মনে হয়। বেরিয়ে এল সে।

সাড়ে আটটা বাজছে। হাসপাতালে কত কাজ, কত কাজ! কম্পাউণ্ডার হরিহর এখানকার লোক, বয়স হয়েছে। লোকটি আশ্চর্য রকমের শিথিল-চরিত্র। হবে-হচ্ছে করেই চলা সভব। দু-দশ মিনিটে কী আসে যায়? নার্সেরাও স্থবিধে পায়।

মঞ্জুকে বলে এসেছেন, সে অবশ্য দেখবে। নিয়মিতভাবে সে এসব দেখে। এদিক দিয়ে সে ভাগ্যবান। মঞ্জু তার কর্মের বোঝার ভার মাথায় তুলে নিয়েছে। রোজ সকালে একবার নিজে সে রোগীদের খোঁজ নিয়ে আসে, মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দিয়ে আসে। হাসপাতালটির পরিচ্ছন্নতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার। নিজের বাড়ি থেকে মধ্যে মধ্যে পথ্য তৈরি করে দিয়ে আসে। মেয়েদের সম্পর্কে বলতে গেলে মঞ্জুর জন্যই সে নিশ্চিন্ত। রোগিণীদের ও দিদি! ষাট বছরের রোগিণীও দিদি বলে।

এই দাঁতু ঘোষালটা তো মঞ্জুকে পেয়ে বসেছে। হাসপাতালের ভাতের সঙ্গে মঞ্জুর পাঠানো তরকারি ভিন্ন চীৎকার করবে। মঞ্জুকে রাজ্যের ভূত-প্রেতের গল্প বলে ভাব জমিয়েছে দাঁতু ঘোষাল। লোকটা অত্যন্ত পাজী। হাসপাতালে থেকেও

কী করে যে গাঁজা খায়—গাঁজা খায়—বুঝতে পারে না প্রদ্যোত। ওকে তাড়িয়েই দিত সে। কিন্তু মশায়ের নিদানটার জন্যেই রেখেছে! দেখবে সে।

আরোগ্য-নিকেতনের সামনে দিয়ে যাবার পথে নজরে পড়ল—মশায় কার হাত দেখছেন। ঘাড়টি ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে। বোধ করি চোখ বন্ধ করে রয়েছেন। প্রদ্যোত হাসলে। সে শুনছে, বিনয় মশায়কে তার দোকানে বসবার জন্য ধরেছে। অন্তত কিছু কালের জন্য। যতদিন সে কোনো পাশকরা ডাক্তারকে এনে বসাতে না পারে!

রানার হাতই দেখছিলেন মশায়। ভুজঙ্গগতি। কুটিল সর্পিল ভঙ্গি। এ সাপ রাজগোক্ষুরই বটে, দেহ-বিবরের মধ্যে বাসা বেঁধেছে; তার বিষ-নিশ্বাসে সারাটা দেহ অহরহই জরজর্জর। গায়ের গন্ধ থেকেও বুঝতে পারছেন। সাপের গায়ের গন্ধ চেনে যে প্রবীণ বিষবৈদ্য গর্তের বাহিরে বসেও তার গায়ের গন্ধ পায়। সে গন্ধ তিনিও পাচ্ছেন। ধীরে ধীরে এবার চোখ খুলে চাইলেন। রানার মুখের দিকে তাকালেন! চোখের চারিপাশে কালো ছায়া পড়েছে; চোখ দুটি ক্লান্তিতে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের মতো বিষণ্ণ, তার চারিপাশে রাহুর উদ্যত গ্রাসের মতো গাঢ় কৃষ্ণমণ্ডল। রানার হাতখানি ছেড়ে দিয়ে বিষণ্ণ হেসে বললেন—রোগ তাই বটে বাবা।

রানা হেসেই বললে—সে তো আমি জানি গো! নিজে তো গোড়া থেকেই বলছি। তা কী বুঝছেন? বাঁচব? ভালো হবে? না। একটু হেসে বলল—যদি মরি তো কতদিনে মরব? বলুন আপনি, অসঙ্কোচে বলুন। রানা ভয় করে না।

মশায় চুপ করে রইলেন। ভাবছিলেন—নূতন ওষুধ উঠেছে 'স্টেপ্টোমাইসিন', তার কথা। সে নাকি অব্যর্থ।

রানা আবার বললে—বলুন গো! আপনি মশায়, আপনি ভয় করছেন কেন গো!

মশায় বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন। তিনি হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—আজও কিছু বলব না বাবা। তুমি কাল বিকেলে আসবে—এখানে নয়, বিনয়ের দোকানে। ওখানেই আমাকে পাবে। কিন্তু হেঁটে এমন করে এস না, গোরুর গাড়ি করে আসবে। হাঁটাহাঁটি পরিশ্রম এসব এখন স্থগিত রাখো। আর সেই মেয়েটির সংস্রব একবারে পরিত্যাগ করতে হবে। বুঝেছ?

রানা খুশী হয়ে উঠল। বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। যা বললেন আমি তাই করব। কাল আমি গাড়ি করে বিনয়ের দোকানেই আসব। আর একটা কথা আছে আমার, রাখতে হবে।

—কী বলো। হাসলেন মশায়।

—সে মেয়েটার ব্যামো আমার চেয়েও বেশী। বাঁচবে না। তবে রোগ তো একই। তাকেও আমার সঙ্গে দেখুন না কেন? আপনি বিশ্বাস করুন, আমি তাকে ছোঁব না। কিন্তু তাকে যখন আশ্রয় দিয়েছি—তার ধরুন—তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। একটা দায় তো আমার আছে। তাকে আজ তাড়িয়ে দেওয়াটা কি আমার পাপ হবে না? সে হতভাগী আবার কোথায় কার ঘরে যাবে, বিষ ছড়াবে!

—এনো। তাকেও এনো। দেখব।

রানা চলে গেল।

মশায় বিনয়কে বললেন—এই জন্যেই রানাকে আমি এত ভালোবাসি।

বিনয় হেসে বললে—আমাকেও বাসেন। আমার দোকানে বসতে রাজী হয়ে আমার কী মুখটা যে রেখেছেন আপনি—সে কী বলব?

ইন্দির এসে দাঁড়াল। একখানা ফর্দ হাতে দিলে। বললে—একেবারে মাসকাবারি হিসেব করে জিনিস নিয়ে এলাম। এই ফর্দ।

মশায় হাসলেন, বললেন—উত্তম। গিন্নীকে দাও গে, রেখে দেবে। না হয় ফেলে দেবে। কমিশনে কুলোয় ভালো, না হলে বিনয়কে তালগাছ দিলেই হবে। বিনয়ের দোকানে বিকেলবেলা বসতে তিনি রাজী হয়েছেন। অহি সরকারের বাড়ি থেকে এসে রানার পাশে বিনয়কে বসে থাকতে দেখেই বলেছেন—এসেছিস? আচ্ছা তাই হল, বসব তোর দোকানে। ইন্দির চলে যেতেই সেতাবের দিকে তাকিয়ে মশায় বললেন—বলছিলাম না সংসারচক্র! এই দেখ। বিনয়চন্দ্র মাসকাবারি জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছে।

সেতাব বসে ছিল ঘরের কোণে। সামনে দাবার ছকটি বিছিয়ে ছদিকেই গুটি সাজিয়ে নিবিষ্ট মনে খেলে যাচ্ছিল।

এতক্ষণে মুখ তুলে সেতাব বললে—তালগাছ বেচতে গিন্নী রাজী হয়েছে?

জীবনমশায়ের লাইকার পুকুরে পঁচিশটি তালগাছ আছে। সোজা এবং সুদীর্ঘ আর বহু পুরনো। এ অঞ্চলে গাছ কটির খ্যাতি বহুবিস্তৃত এবং সর্বজনস্বীকৃত। এমন পাকা সোজা তালগাছ একালে সুদুর্লভ। ওই গাছ কটি আতর-বউয়ের সম্পত্তি, তাঁর বক্ষপঞ্জর বললেও অত্যুক্তি হয় না। যুদ্ধের আগেই এমন গাছের দাম

ছিল তিরিশ টাকা! এখন আশি-নব্বুই টাকা লোকে হাসিমুখে দিতে চায়। কিন্তু আতর-বউ তা দেবেন না। ছন্নমতি লক্ষ্মীছাড়া ভাগ্যহীন স্বামীর উপর তাঁর আস্থা নাই। পঁচিশটির দশটি নিজের এবং দশটি স্বামীর পরলৌকিক ক্রিয়ার জন্য রেখেছেন। পাঁচটি রেখেছেন আপৎকালের জন্য।

জীবনমশায় হেসে বলেন—কুড়িটি হল ভবসাগর পারের ভেলা। আর পাঁচটি হল শেষ বয়সে খানা-খন্দ পার হওয়ার নড়ি। তা বিনয় বলে-কয়ে ওই পাঁচটি নড়ির থেকে একটা দিতে রাজী করেছে। বলেছে টাকাটা পোস্টাপিসে জমা রেখে দেব।

একত্রিশ

"এ লজ্জা রাখবার আমার আর জায়গা নাই। মৃত্যু হবার আগেই আমি মরে গেলাম লজ্জায়। আমি আপনাকে দুঃখ দিয়ে গেলাম। শত্রুপুত্রের কাজ করে গেলাম।"

কথাগুলি বিপিনবাবুর প্রায় শেষ কথা। বলে গেছে বাপকে। রতনবাবুকে। এ দেশে চলতি একটা প্রাচীন ধারণা আছে ;—পূর্বজন্মের ক্ষুব্ধ শত্রু পরজন্মে পুত্র হয়ে জন্মায়, বড় হয়, মা-বাপের মনে বিপুল প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে, তারপর একদিন সে মরে, নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে—পূর্বজন্মের শত্রু এ জন্মের বাপের উপর শোধ নিয়ে যায়। মৃত্যুর পূর্বে উচ্চশিক্ষিত বিপিনও এ ছাড়া বলবার কথা খুঁজে পায় নি।

দিন বিশেক পরের কথা

মশায় বসেছিলেন বিনয়ের দোকানে। কথাগুলি বলছিল কিশোর। গতকাল বিপিন রাত্রি সাড়ে এগারোটায় মারা গিয়েছে। দশদিন আগে ডাক্তারেরা বলেছিলেন—বিপিনবাবু ভালো আছেন। অন্তত এবারের মতো বিপদ কেটেছে। এবং আর অবস্থা খারাপ না-হলে ধীরে ধীরে সেরে উঠবেন। আটদিন আগে কলকাতা থেকে ডাক্তার চ্যাটার্জি এসেছিলেন। তিনি ডাক্তারদের মত সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু উৎসাহের সঙ্গে নয়।

রতনবাবু একবার মশায়ের কথা তুলতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন—আমাদের এখানে একজন নাড়ী দেখায় বিশেষজ্ঞ আছেন। তিন পুরুষ ধরে নাড়ী দেখার সুনাম। নিদান দিয়েছেন—।

বাধা দিয়ে প্রদ্যোত বলেছিল—তাঁর কথা বিশ্বাস করলে—

ডাঃ চ্যাটার্জি ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেছিলেন—কী বলছেন তিনি? নিদান-টিদান দিয়েছেন নাকি?

—না। তা ঠিক বলেন নি—তবে—।

ডাঃ চ্যাটার্জি বলেছিলেন—হাত দেখায় অবিশ্বাস আমি করি না! আমার বয়স হয়েছে। প্রথম জীবনটা হাত দেখার উপর নির্ভর করতে হত অনেকটা। আমাদের ডাক্তারেরাও অনেকে খুব ভালো হাত দেখতে পারতেন। পারেনও। কিন্তু চিকিৎসা যখন আমরা করছি আমাদের কথাই বিশ্বাস করুন। তিনি হয়তো বলেছেন—রোগ একেবারেই অসাধ্য। এই এতদিনের মধ্যে—কিছু হবে। আমরা বলছি—না হতেও পারে। অসাধ্য রোগ আমরা বলব না। শেষ পর্যন্ত লড়াই করব। তাঁর কথায় বিশ্বাস করলে রোগীকে—আত্মীয়-স্বজনকে হাল ছেড়ে দিয়ে চরম দুর্ঘটনার জন্যই শুধু অপেক্ষা করতে হবে।

তারপর আবার বলেছিলেন—একটু হেসেই বলেছিলেন—আমিও এদেশের লোক, ডাক্তারি করি অবশ্য। কিন্তু যা তিনি বলেছেন—তা তো বুঝছি। সে তো একটা বড় জিনিস। কষ্টদায়ক দুঃসাধ্য ব্যাধি, কোনো ক্রমে বাঁচলেও সে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকা! এবং সংসারে জন্ম হলেই যেখানে মৃত্যু ধ্রুব সেখানে যদি অনায়াসে স্বচ্ছন্দে জীর্ণ অকেজো দেহটার পতনই কাম্য মনে করতে পারেন, সে তো বড় জিনিস। সেটা আমাদের দিকের কথা, আমরা বলব কেন?

ডাঃ চ্যাটার্জি চলে যাবার তিন দিন পর রোগ হঠাৎ বেঁকে দাঁড়াল। প্রস্রাবের রঙ খারাপ হল, পরিমাণে কমে গেল। এবার প্রস্রাব পরীক্ষার ফল দাঁড়াল শঙ্কাজনক। হার্টের অবস্থা খারাপ দাঁড়াল। হার্টরেট একশো তিরিশ। এবং গতি তার বাড়বার দিকে।

হরেন আবার ছুটে গেল কলকাতা। ডাঃ চ্যাটার্জি বললেন—ওইটেই আমার আশঙ্কা ছিল। তাই দাঁড়াল! এখন—।

একটু চিন্তা করে বলেছেন—হাত আর কিছু নেই।

ঘাড় নেড়েছে বারবার।—নাঃ। হাত নেই। শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন—ডিজিটিলিস ইনট্রাভেনাস দিয়ে দেখ!

হরেন আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল শুনে।—ডিজিটিলিস? ইনট্রাভেনাস? আপনি চলুন তা হলে।

—আমি? আমি গিয়ে আর কী করব? আমি তো বলছি—সামনে চরম অবস্থা। ধ্রুব বললেই হয়। এখন চান্স নিয়ে দেখতে পার। যদি ভালো করে, ক্রাইসিসটা কাটবে। ক্রাইসিসটা কাটলে দরকার হয় যাব।

কিন্তু সে ঝুঁকি এখানে কেউ নিতে চায় নি। হরেন চারুবাবু কেউ না। প্রদ্যোত একটু ভেবেছিল। শেষ পর্যন্ত সেও সাহস করেনি। মনে অস্বস্তিরও শেষ ছিল না।

বিপিনবাবুর তখনও জ্ঞান ছিল। কলকাতার ডাক্তার না আসতেই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। নিজেকে প্রস্তুত করতে গিয়েই বৃদ্ধ পিতার দিকে লক্ষ্য করে ওই কথাগুলি বলেছিলেন।

—এ লজ্জা রাখবার আমার ঠাঁই নাই। মরণের আগেই আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি। আপনাকে দুঃখ দিয়ে গেলাম। শত্রুপুত্রের কাজ করে গেলাম।

অসাধারণ মানুষ রতনবাবু। বিষণ্ণ হেসে তিনি ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—তুমি আমার বীরপুত্র। জীবন-সংগ্রামে ভয় পাও নি, পিছু হট নি, বিশ্রাম নাও নি—যুদ্ধ করতে করতেই পড়লে ; তার জন্য লজ্জা কী ?

—লজ্জা ? বৃদ্ধ বয়সে আবার আপনাকে বর্ম পরতে অস্ত্র ধরতে হবে। এ থেকে আপনাকে আমি রক্ষা করতে পারলাম না। এই লজ্জা। এই তো আমার চরম হার।

রতনবাবু ছেলের মাথায় হাত রেখে চোখের জলের সঙ্গে ঠোঁটের বিচিত্র হাসির সঙ্গে বলেছিলেন—কার কাছে হার ? যার কাছে তোমার হার তার কাছে—রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ থেকে ভীষ্ম দ্রোণ নেপোলিয়ান—হার মেনেছে। ও কথা ভেবো না।

ঘাড় নেড়ে বিপিন বলেছেন—না। হার আমার নিজের কাছে। ডাক্তার চ্যাটার্জি আমাকে বারবার বলেছিলেন। এ কর্মজীবন আপনি ছাড়ুন। এ রোগ রজগুণের রোগ, রাজসিকতা সব ছেড়ে—সাত্ত্বিক জীবন না হলে আপনার রোগ সারবে না, বাড়বে। আমি বলি নি কাউকে। চেষ্টা করেও পারি নি ছাড়তে। হার আমার নিজের কাছে।

এরপর আর কিশোর ঘরে থাকতে পারে নি। বেরিয়ে চলে এসেছিল। এর আগের দিন থেকেই বিপিনের প্রস্রাব বন্ধ হয়েছিল। তারই পরিণতিতে ক্রমশ মোহাচ্ছন্ন হয়ে বিকেলবেলা পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। রাত্রি এগারোটার সময় মৃত্যু হয়েছে।

সমস্ত গ্রামটা—শুধু গ্রামটা কেন,—এ অঞ্চলটা—বিপিনের মৃত্যুতে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। এতবড় একটা মানুষ, কর্মবীর, স্বনামধন্য পুরুষ। তার মৃত্যুতে হওয়ারই কথা। সকালবেলা শবযাত্রার সময় কাতারে কাতারে লোক ভেঙে এসেছে। ম্লান বিষন্ন মুখ। সমস্ত অঞ্চলটার আকাশে যেন একটা ছায়া পড়েছে। জীবনমশায়ও উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বাইরের দিকে। মৃত্যুমুখরা পৃথিবী। হেন ক্ষণ নাই

যে ক্ষণে লয় না ঘটছে, মৃত্যুর রথ না চলছে। জীবন জন্ম দিয়ে মৃত্যুকে ছেয়ে ফেলতে চেষ্টা করছে। তবু তাকে জানা যায় না, জানবার উপায় নাই। তাই তাকে এত ভয়। মধ্যে মধ্যে তো ভয় ঘোচে, মানুষ তো জয় করে মৃত্যুভয়কে, দলে দলে তো ছুটে চলে মৃত্যুবরণ করতে। তখন তো মৃত্যু অমৃত হয়ে যায়। বিপিন যে ধরণের মানুষ, যে শিক্ষা সে পেয়েছিল, তাতে তার দেশের জন্যে মৃত্যুবরণ করা আশ্চর্যের কথা ছিল না, তাই যদি সে করত, তবুও কি এমনি ছায়া পড়ত? তা তো পড়ত না! অকস্মাৎ মশায়ের খেয়াল হল, কিশোর কখন উঠে গিয়েছে! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মশায়। তারপর নিজের নাড়ীটা ধরে বসলেন।

কিছু বুঝতে পারা যায়? কোনো বেলক্ষণ, কোনো ইঙ্গিত? না।

—হাত দেখছেন? নিজের? বিনয় এসে ঢুকল।

—হ্যাঁ।

—শরীর-টরীর—?

—না। হাসলেন মশায়।

—কদ্রু এসেছে। ওর আজ ইনজেকশনের দিন।

—কই?

—হুজুর! এসে দাঁড়াল বুড়ো জুতো-সেলাইওয়ালা।

বিনয়ের এখানে কদ্রুই তাঁর প্রথম রোগী। রানা সেদিন এখানে আসবার আগেই সে এসেছিল। বুড়ো, আমাশয়ের রোগী। পুরানো রোগ। কিন্তু আশ্চর্য রোগী। এমন সাবধানী রোগী আর দেখা যায় না। রোগ তার দুরারোগ্য, আজও সারল না। কিন্তু কদ্রুকে কখনও পাকড়াও করতে পারলে না। রোগ বাড়লেই কদ্রু খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দেয়। চিকিৎসক যদি বলেন—এক পোয়া খাবে তবে সে আধ পোয়ার বেশী খাবে না।

বাতিক তার ওষুধের। বারোমাসই একটা-না-একটা ওষুধ তার খাওয়া চাই-ই। সে ডাক্তারী, কবিরাজী, হাকিমি, টোটকা যা হোক। পালা আছে। কিছুদিন ডাক্তারী তারপর কিছুদিন কবিরাজী।

কদ্রু তাঁর পুরনো রোগী। কদ্রু এ দেশের লোক নয়। বোধ করি বিলাসপুর অঞ্চলের চর্ম-ব্যবসায়ী। সেকালে এ দেশে তাদের যে প্রথম দল এসেছিল তাদের মধ্যে ছিল কদ্রু। কদ্রু তখন নূতন জোয়ান, সঙ্গে বউ আর একটি ছেলে।

মশায় সেকালে ওর ছেলেটাকে কঠিন রোগ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই কারণে কদ্রু সেকালে মশায়কে দেখলেই এসে পথ রোধ করে দাঁড়াত।—জুতোটা বুরুশ করে দিব মহাশা।

জুতো পরিষ্কার না করিয়ে উপায় ছিল না তাঁর। দাঁড়াতেই হত। সে যেখানেই হোক। বাজারে, হাটে, ইস্কুলের সামনে, সবরেজিষ্ট্রি অফিসের অশথতলায় কদ্রু এক-একদিন এক-এক জায়গায় পালা করে বসত। সেদিক দিয়ে যেতে হলেই কদ্রুকে দিয়ে জুতো পালিশ করিয়ে নিতে হত।

পয়সা অবশ্যই দিতেন মশায়। কদ্রুর আগ্রহের দাম দেওয়া যায় না। বনবিহারীর মৃত্যুর পর যখন তিনি ঘর থেকে বের হতেন না তখনও মধ্যে মধ্যে কদ্রু বাড়ি গিয়ে জুতো পালিশ করে দিয়ে এসেছে। তখন কোনোদিন পয়সা পেয়েছে কোনোদিন পায় নি। আজ বছর কয়েক কদ্রু বুড়ো হয়ে অক্ষম হয়েছে। সবরেজেষ্ট্রি অপিসের অশথতলাটি ছাড়া অন্য কোথাও আর যায় না, যেতে পারে না। বিনয়ের দোকান সবরেজেষ্ট্রি অপিসের কাছেই। এবার কদ্রু ঠিক এসে হাজির হয়েছে। জুতোও সাফ করে দিয়েছে। এবার অসুখটা বেশী।

কদ্রুর মৃত্যুকাল নিরূপণ করা কঠিন। কদ্রু রোগকে প্রশ্রয় দেয় না। সাবধানী লোক। কিন্তু রোগটা যেন ক্রমশ গ্রহণীতে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে মনে হচ্ছে। তার পায়ের ধ্বনি এইবার কোনোদিন বেজে উঠবে।

এবার কদ্রু বলেছে—সুই দাও বাবা মহাশা। বেশ ভালো তেজী টাটকা আমদানী দাওয়াই দিয়ে সুই দাও।

—সুই? ইনজেকশন? মশায় হাসলেন—জলদি আরাম চাই কদ্রু?

—হাঁ বাবা। বিনা কামসে খাই কী করে?

কদ্রুর ছেলেরা বড় হয়ে বাপকে ফেলে অন্যত্র চলে গেছে। স্ত্রী মরেছে। কদ্রু এখন একা। কাজেই খাটতে হবে বই কি।

মশায় বলেছিলেন—তার থেকে তুই হাসপাতালে যা না কদ্রু! তোর সাহেবকে ধরলেই তো হয়ে যাবে।

কদ্রুর সাহেব হল কিশোর। কিশোরকে, কেন কে জানে, কিশোরের ছেলেবেলা থেকেই কদ্রু বলে সাহেব। ওই আর-একজন তার ভালোবাসার জন। কিশোরকে সে ভারি ভালোবাসে।

কিশোরের সঙ্গে কদ্রুর আলাপ ফুটবল মেরামতের সূত্র ধরে। তখন কিশোর হাফপ্যাণ্ট, জারসি পরে ফুটবল খেলত। ছেলেদের দলের ক্যাপ্টেন ছিল, বোধ করি সেই কারণেই বলত সাহেববাবু। পরে খদ্দরধারী কিশোর কত আপত্তি করেছে, কখনও কখনও ধমকও দিয়েছে কদ্রুকে, তবু কদ্রু সাহেববাবু নাম ছাড়ে নি।

কদ্রু হাসপাতালে যেতে রাজী হয় নি।—নেহি মা-বাপ। উসমে হামি যাবে না। উ সব বাবু লোক—মেমসাহেব লোক ওষুধ পিলায়, আর তা ছাড়া বাবা,

দিনরাত বিস্তারায় শুয়ে থাকা, ওই সব লোকের সেবা নেওয়া কি আমার মতো চামারের কাজ ?

—আরে! ওই জন্যেই তো ওরা আছে। হাসপাতাল তো সবারই জন্যে। রোগী তো হল হাসপাতালের দেবতা রে। তার জন্যে তুই সরম করিস না।

—না বাবা। না।

—কেন রে? আমি বলছি ভালো হবে। তুই যে রকম নিয়ম করিস তাতে চট করে সেরে যাবি। আর রোগ হলে শুয়ে থাকাই তো নিয়ম।

—তাই তো থাকি বাবা। গাছতলায় চ্যাটাই পেড়ে বসে থাকি, বসে বসেই কাম করি। ঘুম পেলে ঘুমুই।

—সেই হাসপাতালে ঘুমোবি।

—আমি দাওয়াইয়ের দাম দেব বাবা।

—তার জন্যে আমি বলি নি কদ্রু। হাসপাতালে গেলে তোর ভালো হবে।

—নেহি বাবা। হাসপাতালে যে যাবে সে বাঁচবে না। আমি বলে দিলাম।

—কেন?

—হাসপাতালে দেও আছে বাবা। রাতমে ঘুমে ঘুমে বেড়ায়। কবরস্থানের উপর হাসপাতাল; সেই কবর থেকে ভূত উঠেছে।

মশায়ের মনে পড়ে গেল কথাটা। সেদিন রাত্রে প্রদ্যোত ডাক্তারের রান্নাঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে ভূতে নাকি মাংস চেয়েছিল। ডাক্তারেরা কেউ মাংস খান নি। পরের দিন দাঁতু ঘোষাল হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে।

মশায় ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। একটা কথা তাঁর মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে—কিন্তু থাক সে কথা। ভূত একবার তিনি দেখেছিলেন! সে মাছ খাচ্ছিল। রাত্রি তখন একটা। তিনি ডাক থেকে রোগী দেখে ফিরছিলেন। পথে নবগ্রাম ঢুকবার মুখে বাগানওয়ালা পুকুরটার ঘাটের পাশে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিল একটা আপাদ-মস্তক সাদা-কাপড়-ঢাকা মূর্তি। কিছু যেন খাচ্ছিল। জ্যোৎস্নার মধ্যে হাত মুখের কাছে তোলা বুঝতে পারা যাচ্ছিল।

গাড়োয়ানটা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি ভয় পান নি। গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গিয়েছিলেন। দেখেছিলেন প্রেতই বটে। মাছ খাচ্ছে। সে ছবিটা যেন চোখের উপর ভেসে উঠেছে। দেখেছেন তিনি।

এবার তাঁর মুখে এক বিচিত্র ধরণের হাসি দেখা দিল। এ সংসারে সবই আছে। ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য সবই আছে! নাই কে বলে? যদি সত্যিকারের সেই দৃষ্টি থাকে তবে নিশ্চয় দেখতে পাবে।

কদ্রুকে ইনজেকশন দিয়েই চিকিৎসা তিনি শুরু করেছিলেন। বিনয়ের দোকানে নতুন আটনে কদ্রু তাঁর প্রথম রোগী। আজ আবার কদ্রুর ইনজেকশনের দিন। ঠিক সে এসে দাঁড়িয়েছে।

মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছিস?

—না—না। ঘাড় নাড়লে কদ্রু। ভালো না বাবা মহাশা। ভালো না। থোড়াথুড়ি বুখার ভি হয়।

—দেখি হাত দেখি। হাত ধরে মশায় বললেন—বড় দুর্বল হয়ে পড়েছিস কদ্রু। অসুখ বেড়েছে? বেশী ঝাড়া যাচ্ছিস?

—না বাবা। কম হোয়েসে। সো তো কম হোয়েসে।

—তবে? খাচ্ছিস কী?

—কী আর খাব বাবা? থোড়াসে বার্লিকে পানি। ব্যস। আর কুচ্ছু না। কুচ্ছ না।

—কিন্তু খেতে যে হবে রে। না খেয়েই এমন হয়েছে।

—ডর সে মারে খেতে পারি না বাবা মহাশা।

—ডর করলে হবে না। খেতে হবে। না খেয়েই তুই মরে যাবি।

—মরণকে তো ডর নেহি বাবু। বেমারির দুঃখকে ডর করি বাবা। খানাপিনা করব, যদি বেমারি বাড়ে। পেটকে দরদ যদি বেড়ে যায় বাবা? শেষে কি ময়লা মিট্টি খেয়েই মরব বাবা?

মশায় আজও বললেন—তুই হাসপাতালে যা। তোর সাহেববাবু রয়েছেন—বলে দিলেই হয়ে যাবে। আর তুই যেরকম রোগী, হয়তো অল্পেই ভালো হয়ে যাবি।

কদ্রু বললে—ওই তো বাবু, এতনা বড়া বাবু এতনা কিস্মত—কাঁচা উমরমে চলিয়ে গেল। এতনা দাওয়াই, ভারী ভারী ডাকডর! কী করলে হুজুর? কুছ না। হুজুরকে বাতই সাচ হইয়ে গেলো।

—কী? মশায় আর্তচকিতস্বরে প্রশ্ন করলেন।

—হুজুর তো বলিয়ে দিয়েছিলেন—বাবু নেই জীয়েগা, ওহি তো সত্যি হইল হুজুর। কলকাত্তা সে ডাকডর আইল—কুছ হইল না।

মহাশয়ের সমস্ত শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল। এ কী বলছে কদ্রু! চুপ করে বসে রইলেন তিনি, আত্মসম্বরণ করছিলেন।

কদ্রু বলেই গেল—আওর বাত আছে বাবা। উ রোজ আপনাকে বলিয়েছি, বিনয় বাবা ভি জানে—হাসপাতালমে পিরেত আছে, হুঁয়া কোই নেহি বঁচেগা।

বিনয় বাইরে দাঁড়িয়েছিল—ঘরে এসে ঢুকল। বলল—মিথ্যে বলে নি কদ্রু। সেদিন প্রদ্যোত ডাক্তারের বাসায় খাওয়া দাওয়ার জন্যে মাংস রান্না হয়েছিল। জানালার বাইরে থেকে ভূতে মাংস চেয়েছিল। ডাক্তারের রাঁধুনী বামুন চোখে দেখেছে। গণেশ ভটচাজের মেয়ের প্রসব হয়েছিল হাসপাতালে, ডাক্তার কেসটা খুব বাঁচিয়েছে। সে মেয়ে ভয়ে বাঁচে না। গণেশ তাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

মশায় যেন আগুনের ছেঁকা খেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে সবিস্ময়ে বললেন—ভূত?

বিনয় বললে—দাঁতু দেখেছে! কবরস্থান থেকে—

—দাঁতু?

—হ্যাঁ। আজ সকালে মহা হাঙ্গামা করেছে। থাকবে না সে হাসপাতালে। কাল সারা রাত্রি নাকি ঘুমোয় নি ভয়ে।

এ কথায় মশায় যা করলেন তা বিনয়ের কল্পনাতীত। ক্রোধে ঘৃণায় তিনি যেন ফেটে পড়লেন। দাঁতু মরবে। নিদানে আমার ভুল হয় নি। প্রেত দেখা দিয়েছে দাঁতুকে নেবার জন্যে। এ প্রেত দাঁতুর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। অন্যে পায় না দেখতে, আমি পাই।

কদ্রু বিনয় স্তম্ভিত হয়ে গেল কথা শুনে। বিনয়ের মনে হল—মশায়ের মাথায় গোলমাল হল না তো।

মশায় বললেন—ডাক যারা রোগী আছে। উঠব। সেতাব এল না কেন?

বিনয়ের দোকানেই এখন সেতাব আসে ছক গুটি নিয়ে। এখানেই বসে দাবার আসর। বেশ মজলিশ জমে যায়।

* * *

সেতাব আসে নি. সেতাবের বাড়ির দোরে নিশিঠাকরুনের ভাইঝি মারা গিয়েছে। সেই পনেরো বছরের মেয়ে, দুটি সন্তানের জননী—স্থতিকায় যার দেহবর্ণ হয়েছিল অতসী ফুলের মতো। মশায় তার নাড়ী দেখে মৃত্যু স্থির বলে জেনে এসেছিলেন। নিশি শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছিল শশীকে। শশী বিচিত্র উদ্ভট চিকিৎসা-পদ্ধতিতে মেয়েটাকে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিয়েছে খেয়ার ওপারে।

শেষ তিনদিন অবস্থা খুব খারাপ হওয়ায় নিশি হরেনকে ডেকেছিল।

গ্রামের লোক হরেন বিনা ফীজেই দেখেছিল। কয়েকটা ইনজেকশনও দিয়েছিল। আধুনিক মূল্যবান ওষুধ।

নিশি এখন গালাগাল করছে হরেনকে।

মশায় বাড়ি ফিরবার পথে সেতাবের বাড়ী এসেছিলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলে ফিরে গেলেন। কাল রাত্রে বিপিন মারা গিয়েছে; আজ সূর্যোদয়ের পূর্বে বিপিনের শবযাত্রায় এ অঞ্চলের আবালবৃদ্ধ-বনিতা ভিড় করে রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়েছিল, শ্মশান পর্যন্ত বিরাট জনতা অনুসরণ করেছে। সারাটা দিন জীবনের জ্যোতির উপর একটা ম্লান ছায়া ফেলে রেখেছে। মানুষ ক্লান্ত শোকার্ত। আর তারা পারছে না। নিশির ভাইঝির মৃতদেহের পাশে নিশি বিলাপ করে কাঁদছে, ডাক্তারকে গাল দিচ্ছে। দু-তিনটি প্রতিবেশিনী বসে আছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর আর তিন-চারজন কিশোরপন্থী জোয়ান ছেলে। তারাই নিয়ে যাবে শবদেহ।

বাজারটা আজ ম্রিয়মাণ। আলো আছে। কয়েকটাই হ্যাজাক বাতি জ্বলছে। বাতির সংখ্যা বেড়েছে এখন। ডাক্তারদের নতুন কো-অপারেটিভ মেডিক্যাল স্টোর্সে দুটো আলো জ্বলছে। একটা ভিতরে একটা বাইরে। এখনও সব ওষুধের চালান আসে নি, কিছু কিছু নিয়ে দোকান খোলা হয়েছে। চারুবাবু বসে আছেন বাইরে। হরেনও রয়েছে। বিপিনের কথাই হচ্ছে।

মশায় ভাবছিলেন নিশির ভাইঝির কথা। সেদিন ওকে দেখেই মনে পড়েছিল তাঁর জীবনের নাড়ী-পরীক্ষা বিদ্যায় দীক্ষার দিন—তাঁর বাবা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন একটি কঠিন রোগী দেখতে। ঠিক এই রোগী। এমনই বয়সের মেয়ে, এমনি দুটি সন্তানের জননী, আর একটি গর্ভে। বাবা আসবার পথে বলেছিলেন—এই হল মৃত্যুরোগের নাড়ী! মেয়েটি বাঁচবে না, বাবা। আর একটি লক্ষণ দেখলে? মেয়েটির রুচি যাতে রোগ বাড়ে তাতেই।

মেয়েটির হাতে তেলেভাজার তৈলাক্ততা এবং গন্ধ তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। নিশির ভাইঝিও সেদিন আচার চুরি করে খাচ্ছিল। ওঃ, সেদিন মেয়েটিকে খুকী বলাতে ওর কী হাসি। বারো বছর বয়সেই মেয়েটির প্রথম সন্তান হয়েছিল; সাড়ে তেরোতে দ্বিতীয় সন্তানের মা হয়েছে; পনেরোতে তৃতীয়টিকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছে। সে খুকী!

মেয়েটা হাসলে গালের দুদিকে দুটি টোল পড়ত।

অন্ধকার রাত্রে ছায়ামূর্তির মতো কে যেন মনশ্চক্ষুর সামনে দাঁড়াল। কালো কোঁকড়া একপিঠ খাটো চুল। এও মুখে কাপড় দিয়ে হাসে। এও হাসলে গালে টোল পড়ে।

মঞ্জরী বোধহয় মরেছে। মধ্যে মধ্যে নির্জন অবসরে ঠিক এমনিভাবে চকিতের মতো ভেসে উঠে মিলিয়ে যায়।

হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে প্রদ্যোত ডাক্তারের বারান্দায় আলো জ্বলছে। প্রদ্যোত

আজ চুপ করে বসে আছে। বোধ হয় ভাবছে ডাক্তার। ডাক্তার মাত্রই ভাবে। ভাবে কোথাও কোনো ত্রুটি তার ঘটেছে কিনা!

ত্রুটি ঘটে থাকলে নীরব অনুশোচনায় স্তব্ধ হয়ে বসে থাকবে। অন্তরটা হায় হায় করবে। ত্রুটি না থাকলে এমনি গ্লানিহীন উদাসীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকবে। মনটা শূন্য হয়ে যায়। হঠাৎ বাতাস জাগে শূন্য মণ্ডলে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চিকিৎসক ভাবে—অসহায়, মানুষ বড় অসহায়! কারও মনে বিদ্যুচ্চমকের মতো প্রশ্ন জেগে ওঠে—ডেথ! হোআট ইজ ডেথ!

বত্রিশ

বিছানায় শুয়েও মশায় জেগেই ছিলেন। ঘুম আসে নি। তাঁর মনটাও উদাসীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ঘুম আসছে না। বিপিনের মৃত্যু এবং নিশির ভাইঝির মৃত্যু তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দাঁতুর কথা, ওই লোকটার উপর তিক্ততা, মনের কোন কোণে ঢাকা পড়ে গেছে। পাশের বিছানায় আতর-বউ ঘুমুচ্ছে। পাশের খোলা জানালাটা দিয়ে খানিকটা রাত্রির আকাশ দেখা যাচ্ছে। শরতের গাঢ় নীল নক্ষত্রখচিত আকাশের খানিকটা অংশ। কানে আসছে ঝিল্লির অবিরাম একটানা ডাকের শব্দ। তিনিও ভাবছিলেন—মৃত্যু কী? অনিবার্য পরিণতি, দুর্জ্ঞেয় রহস্য; এসবে মন ভরে না। পুরাণের সেই পিঙ্গলকেশিনীর কাহিনীতেও মনের তৃপ্তি হয় না। অজ্ঞান মুমূর্ষু রোগী বিচিত্রভাবে বেঁচে উঠেছে, তাদের দু-একজন বিচিত্র কাহিনী বলে। কেউ বলে সে যেন শূন্যলোকের মধ্য দিয়ে ভেসে যেতে যেতে ফিরে এসেছে; সে শূন্যলোক বিচিত্র। কেউ বলে—সে যেন সমুদ্রের মধ্য দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। দুজনের অভিজ্ঞতা এক-রকম নয়! এতেও নানা প্রশ্ন জাগে মনে। মন ভরে না। একটি কিশোর ছেলের কথা মনে পড়ছে। সে যা বলে গেছে তা অদ্ভুতভাবে মনে গেঁথে রয়েছে তাঁর। অনেকদিন আগের কথা। নবগ্রামের গোবিন্দ পাঠকের ছেলে নসীরাম। মৃত্যুশয্যায়—মৃত্যুর বোধ করি মিনিট পনেরো আগে বলেছিল। সে কী ঘাম। এমন ঘাম তিনি তাঁর সুদীর্ঘ চিকিৎসক-জীবনে কম দেখেছেন। আবীর, শুঁটগুঁড়ো মাখিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেল শুশ্রূষাকারীরা, ফুরিয়ে গেল আবীর, শুঁটগুঁড়ো—যা আনা হয়েছিল! রোমকূপের মুখগুলি থেকে অনর্গল ঘাম বের হচ্ছিল জলাজমি থেকে জল-ওঠার মতো। স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে

কিন্তু জ্ঞান ছিল ছেলেটির। তিনি দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে দেখছিলেন। নাড়ী তার আগে থেকেই নেই। কে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল—নন্থ, নন্থ, নন্থ—! অ নন্থ!

ধীরে ধীরে ক্লান্ত চোখের পাতাদুটি খানিকটা খুলে গিয়েছিল, চোখের দৃষ্টিতে সাড়া দেওয়ার ইঙ্গিত ফুটে উঠেছিল। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিল—অঁ্যা?

—কী কষ্ট হচ্ছে তোমার? খুব কষ্ট?

ক্লান্তির সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলেছিল—না।

—তবে?

একটু চুপ করে থেকে চোখ বুজতে বুজতে বলেছিল—মনে হচ্ছে—আমি—।

—কী?

—আমি যেন অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। তোমাদের কথা ভালো শুনতে পাচ্ছি না। তোমাদের ভালো দেখতে—।

ঘাড় নেড়ে জানাতে চেষ্টা করেছিল—পাচ্ছে না দেখতে। যেন আবরণ পড়েছে এবং সে আবরণ ক্রমশ ঘন হয়ে উঠছে।

এর চেয়ে ভালো বিবরণ তিনি আর শোনেন নাই।

ঠিক এই সময়টিতেই কে ডাকল—মশায়!

—কে? কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে জানালা দিয়ে বাইরের পথের দিকে তাকালেন মশায়। আলো হাতে দুজন লোক। কারা? কার কী হল?

—কে?

—আজ্ঞা আমরা পরান খাঁ সাহেবের বাড়ি থেকে আসছি।

—কী হল? বিবি তো ভালো আছে।

—আজ্ঞা না। বড় বিপদ! বিবি বিষ খেয়েছে মালুম হচ্ছে।

বিষ খেয়েছে? কী বিপদ? ধড়মড় করে উঠলেন মশায়। আশ্চর্য! মানুষ আবার বিষও খায়, গলায় দড়িও দেয়, কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়েও মরে, জলে ঝাঁপ দেয়।

পরান খাঁ দু হাতে মাথা ধরে চুপ করে বসেছিল। মুখখানা তার ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। বিবি কল্কেফুলের বীজ বেটে খেয়েছে। পরান তাঁকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল, পরানেরও চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। বললে—সরকারী

ডাকতার ঠিক বলছিল মশায়। রোগ-রোগ উয়ার সব মিছা কথা; মেয়েটা নষ্ট মেয়ে। আমার মতো বুড়ো ওকে ছোঁয় তাই রোগের ছলা করে পড়ে থাকত। বিষ খেয়ে গলগল করে বুলছে সব।

বাঁধা বন্য মহিষের মতো গরজে মাথা নেড়ে পরান বললে—ওই হারামি গোলাম—ছামুতে পেলে বেটার গলার নলিটা আমি ছিঁড়ে নিতাম। ওই হারামির হারামি—রব্বানি! আর উয়ার মা। হারামজাদী বাঁদী। এককালে হারামজাদী আমার—।

অশ্লীল কথা উচ্চারণ করলে পরান।

মশায় বললেন—এখন ওসব কথা থাক পরান। এখন ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে।

—মরে যাক, মরে যাক। কসবী শয়তানী জাহান্নামে যাক মশায়, আপুনি শুধু শুনে যান উয়ার নিজের মুখে যে শয়তানী বিষ খেয়েছে। ওই নফর ওই হারামি রব্বানির লেগে খেয়েছে। নইলে আমাকে ফাঁসাবে ওই শয়তানেরা!

পরান দুহাতের মুঠোয় নিজের বাবরি চুল ছিঁড়ে দন্তহীন মুখের মাড়িতে মাড়িতে টিপে বললে—আঃ নিজের ঘরে আমি নিজে শয়তান ঢুকায়েছি! আঃ!—সরকারী ডাকতার ঠিক বুলেছিল!

পরানের বিবি নিজে মুখেই সব বলছে। গোঙাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে কথা বলছে। গোঙাতে গোঙাতেই বলছে।—পোড়া নসিব! পোড়া নসিবের সবই তো মানায় নিয়েছিলাম কোনো রকমে। খাঁ, রব্বানিকে তুমি ঘরে ঢুকালেই বা ক্যানে; উয়ার মাকেই বা রাখলা ক্যানে? রেখে, যা হবার হয়ে যখন গেল, তখুন তারে দূর করেই বা দিলা ক্যানে?

ঘটনাটা ঘটেছে এই।

কাল বিকেলবেলা থেকে পরানের বিবি বমি করতে আরম্ভ করেছিল! প্রথমটা ওটাকে অন্যতম গর্ভলক্ষণ বলেই মনে হয়েছিল সকলের। কিন্তু বার-বার বমি এবং সেই বমির সঙ্গে কয়েতবেল-বনফুল, লঙ্কার খোসা ইত্যাদি উঠতে দেখে প্রশ্ন ওঠে—এসব বিবি পেলে কোথায়? কে এনে দিলে?

বিবির তখন প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। অনুসন্ধান করতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে। পরানের বিবির খাস-ঝি ও রব্বানির মা অত্যন্ত সমাদর এবং অনেক তরিবত কয়েতবেল গুড় লঙ্কা নুন মিশিয়ে চাটনি করে এনে খাইয়েছে। তার সঙ্গে কাঁচা বনফুল। এ আজ নূতন এবং একদিন নয়, এ চলছে কয়েক দিন ধরেই। কোনোদিন বাজারের মিষ্টি, কোনোদিন তেলেভাজা, কোনোদিন অন্য কিছু

আসছেই। নিজের হাতে মুখে তুলে দিয়ে সাকিনা বেওয়া বিবিকে খাইয়েছে। এনে জুগিয়েছে রব্বানি। নতুন নক্সাপেড়ে শাড়িও নাকি দিয়েছে বুড়ী পরানের বিবিকে। পরানের বড় বিবি কথাটা বলেছে। সে নিজের চোখে দেখেছে রব্বানিকে কাপড় হাতে বাড়ি ঢুকতে, নিজের মায়ের হাতে দিতে; এবং সেই কাপড় নতুন বিবির পরনেও সে দেখেছে।

পরানের বুকের মধ্যে লোহার ডাণ্ডস পড়েছিল। রাগের মাথায় সে প্রথমেই বড় বিবির চুলের মুঠো ধরে টেনে বলেছিল—ঝুটা বাত!

বড় বিবি আল্লার নামে কসম খেয়েছিল। বড় বিবিকে ছেড়ে দিয়ে পরান খুঁজেছিল সাকিনা বেওয়া আর বাঁদীর বাচ্চা রব্বানিকে। কিন্তু তারা দুজন তখন ফেরার। খুব হৈ চৈ করতে পরান পারে নি। আশপাশ গ্রামে হিন্দু মুসলমান দুই জাতের মধ্যেই তার দুশমন আছে। আজ চার-পাঁচ বছর ধরে নতুন-কেনা জমি নিয়ে তাদের সঙ্গে পাঁচ-সাতটা মামলা চলছে। রব্বানি মাকে নিয়ে তাদেরই কারুর বাড়িতে যে আশ্রয় নিয়েছে এতে সন্দেহ নাই। পরান বিষদাঁতভাঙা সাপের মতো নিষ্ঠুর আক্রোশে ঘুরে আক্রমণ করেছিল নতুন বিবিকে। প্রায়-অচেতন অবস্থার মধ্যেই তার চুলের মুঠো ধরে বারবার টেনে তাকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিল। হয়তো মেরেই ফেলত। কিন্তু নিবারণ করেছিল বড় বিবি।—'করছ কি সাহেব, খামে যে মরে যাবে। মরে গেলে যে ফাঁসিকাঠে বেঁধে টান দিবে গো! খেদায়ে দাও ওরে।'

তাও পরান পারে নাই। তাকে তালাক দিয়ে তাড়িয়ে দেবে, হারামজাদী হাসিমুখে মাঠ পার হয়ে রব্বানির হাত ধরে তার আশ্রয়ে গিয়ে উঠবে তা হবে না। ঘরে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। আজ সন্ধ্যেবেলা ঘাটে যাবার জন্য মিনতি জানিয়েছিল নতুন বিবি। খুলে দিয়েছিল বড় বিবি। ঘাটে অবশ্য পাহারা ছিল। ঘাটের পাশে ছিল কলকে ফুলের গাছ। পাহারাদারের চোখ এড়িয়ে কয়েকটা ফল পেড়ে আঁচলে লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল। তারপর কখন খেয়েছে। এখন অর্ধ-চেতন অবস্থা। মরে গেলে ক্ষতি নাই। জাহান্নামে যাক নষ্টদুষ্ট আওরত, কসবী খানকী হারামজাদী। মশায় শুধু নিজের কানে শুনে রাখুন—হারামজাদী নিজে বিষ খেয়েছে। পরানের এতে কোনো দায় নাই। সে নির্দোষ।

* * *

সুন্দরী তরুণী মেয়ে। বিষের ঘোরে অর্ধ-অচেতন। বিষের যন্ত্রণায় ভেতরটায় মোচড় দিচ্ছে। দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। মুখ নাক দিয়ে গেঁজলা বেরিয়ে আসছে, বুকে চাড়া দিয়ে উঠছে, যেন বুকটা শতধা বিদীর্ণ হয়ে যেতে চাইছে।

চোখ দুটি অর্ধনিমীলিত, লাল, সর্বনাশের ঘোর লেগেছে। বিস্রস্ত বেশবাস, মাথার একরাশ চুল খুলে এলিয়ে ধুলায় ধূসর হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে চারিপাশে। লোকেদের টানাটানিতে চিমটিতে মধ্যে মধ্যে জ্ঞান আসছে, তখন মুখর হয়ে উঠছে সে।

—আঃ। মরতেও আমারে দিবা না। মরণেও আমার একতিয়ার নাই? হারে নসিব! হারে নসিব!

হেসে আবার বলে—পারবা না মিয়া; পারবা না। রব্বানি খাকের কাছে যাতি দিতে আমারে না পার। কিন্তু ইবার যে বঁধুর সাথে আসনাই করে তার হাত ধরছি—তার হাত ছাড়াইতে তুমি পারবা না—পারবা না—পারবা না। আঃ আমারে একবার ছেড়ে দাও, খানিক ঘুমায়ে লই।

অঃ—। আঃ—।

বলতে বলতে আবার বিষের ঘোরের একটা ঝলক ছড়িয়ে পরে তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেয়; ঢলে পড়ে মেয়েটি, মাথাটি হেলে পড়তে চায়।

মশায় বললেন—পরান, তুমি হাসপাতালে নিয়ে যাও বিবিকে।

—হাসপাতালে? না। আমি তো বুলেছি মশায়—

–মাথা খারাপ করো না পরান। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। আমি আর সে মশায় নই পরান। যখন প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত ছিলাম তখন এরকম অনেক কেসের হাঙ্গামা আমার হুকুমে মিটে গিয়েছে। আজ সেদিন নাই। আজ আমাকে যখন ডেকেছ, আমি যখন এসেছি, দেখেছি, তখন আমাকে খবর দিতে হবে থানায়। তা ছাড়া আমি চিকিৎসক। আমি রোগীকে বাঁচাতে আসি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরণ দেখতে আসি না।

পরান গুম হয়ে বসে রইল কয়েক মিনিট। তারপর বললে, গাড়ি জুড়ে নিয়ে আয়রে হানিফ! জলদি! আপনি তা হলে সঙ্গে চলেন মশায়!

রাত্রি তখন দুটো।

মশায় ডাকলেন—ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!

প্রদ্যোত উঠে এল—কে?

—আমি জীবন দত্ত।

—আপনি এত রাত্রে?

—বিষ খেয়েছে একটি মেয়ে! কল্কেফুলের বীজ। তাকে নিয়ে এসেছি। পরান খাঁয়ের স্ত্রী।

—আমি আসছি এক্ষুনি। ওদিকে কম্পাউণ্ডার নার্সরা উঠেছে? তাদের ডেকেছেন?

—ডেকেছি।

—এক মিনিট। আসছি আমি।

ঘরের মধ্যে ঢুকে, একটা হাফশার্ট গায়ে দিয়ে সে বেরিয়ে এল। কোনো প্রশ্ন করলে না, কোনো মন্তব্য করলে না। হাসপাতালে এসে সামনেই কম্পাউণ্ডার হরিহরকে দেখে প্রশ্ন করলে, সব তৈরি করতে কতক্ষণ সময় লাগবে?

হরিহর বললে—মিনিট পনেরো লাগবে বৈকি? পটাশ পারমাঙ্গানেট লোশন আমি খাইয়ে দিয়েছি খানিকটা।

ডাক্তার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল পরান বলে—আমি চললাম ডাক্তারবাবু, মেয়েটা বাঁচলে পর পুলিসে দিবেন, না বাঁচলে লাশ চালান দিবেন; সেখানে ফেড়েফুড়ে দেখে যা করবার করবে। সালাম!

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বললে—আঃ, তখুনি যদি আপনার কথায় গোসা না করতাম! আপনাকে যদি দেখাইতাম! মশায় বুড়ো লোক, সিকেলের লোক, নাড়ী দেখে মরণ তাকতে পারে। ই ধরতে পারে না। চলে গেল পরান।

প্রদ্যোত ঘরে ঢুকে গেল। মশাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন! এই হতভাগিনী মেয়েটাকে ফেলে যেতে তাঁর পা উঠছে না। হতভাগিনীর এতখানি ছলনা তিনি বুঝতে পারেন নি। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন, তা তিনি পারেন নি। তবে এটা তিনি জানতেন; বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি তরুণীর বিরূপ মনোভাবও তাঁর অজানা নয়; কিন্তু তার এমন বিচিত্র প্রকাশের স্বরূপটি তিনি অনুমান করতে পারেন নি। পরানের অতিরিক্ত সমাদর ও পত্নীপ্রীতিকেই এর কারণ বলে ধরেছিলেন। এবং আদরিণী ভাগ্যবতী মেয়ের দুলালীপনাকে পিতা যেমন স্নেহের চক্ষে দেখেন সেই চক্ষেই দেখেছেন। তিনি ভাবছিলেন সন্তান হলেই সেই সন্তানের স্নেহে তার জীবনের অপূর্ণতা পূর্ণ হয়ে যাবে। তার সন্তানধারণশক্তিকেই তিনি সবলতর করবার চেষ্টা করে এসেছেন। সে চেষ্টা তাঁর ফলবতীও হয়েছে। কিন্তু সে যে যৌবনপ্রভাবাচ্ছন্ন মনের বিচিত্র তৃষ্ণার তাড়নায় এই কুটিল পথে ফলবতী হতে পারে সে তিনি ভাবেন নি। প্রদ্যোত ডাক্তার বোধ করি ভেবেছিল। মশায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। মেয়েটার প্রতি শত মমতায় যেন তিনি জড়িয়ে গেছেন। মেয়েটি কতবার তাঁর দিকে সজল চোখে চেয়ে বলেছে, বুঝতে পারি না মশায়-বাবা! মনে হয় হেথায় অসুখ, হেথায়, হেথায়, হেথায়। সব্বখানে গো বাবা, কুনখানে লয়। কী অসুখ তাও ঠিক ধরতে নারি। কনকনানি, বেথা, যেন বল নাই, সাড় নাই। আবার সময়ে সময়ে ছুঁলে পরেতেই যেন চিড়িক মেড়ে ওঠে

বলতে বলতে চোখের জল গড়িয়ে পড়ত। কতদিন প্রশ্ন করেছে, মশায়-বাবা, আমি বাঁচব তো?

চোখে দেখেছেন সে কী ভয়!

সেই মেয়ে আজ বিষ খেয়েছে। মুখরা হয়ে উঠেছে। বলেছে—পারবা না মিয়া, পারবা না। যে বঁধুর হাত ধরেছি সে বঁধুর হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবাক না!

হরিহর বেরিয়ে এল, বলল—আপনি কি বসবেন মশায়?

—হ্যাঁ বসব হরিহর। পরান তো চলে গেল। আমি পারছি না। হতভাগিনীর শেষটা না দেখে যেতে পারছি না।

দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল প্রদ্যোত ডাক্তার। কম্পাউণ্ডিং রুমে গিয়ে একটা কি নিয়ে এল। হরিহর বললে—উনি থাকবেন স্যার।

—থাকবেন? বেশ তো! তা একা বাইরে বসে থাকবেন? আসুন না, ভিতরে।

মশায় হেসে বললেন—আমি বাইরেই থাকি। বেশ থাকব।

শেষ রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বসে রইলেন। আকাশে নক্ষত্রদের স্থান পরিবর্তন ঘটছে। কালপুরুষ অনেকটা সরেছে। বৃশ্চিকের বাঁকা লেজের ডগায় ওই দেখা যাচ্ছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল পাক খাচ্ছে। ওই বশিষ্ঠের নিচে অরুন্ধতী। অরুন্ধতী যে দেখতে পায়, সামনে অন্তত আরও ছমাস পরমায়ু নাকি নিশ্চিত। আরও ছমাস তিনি তা হলে নিশ্চয় বাঁচবেন। সে অবশ্য তিনি নাড়ী দেখেও বলতে পারেন। কিন্তু? হঠাৎ মনে হল—যদি তিনি বিষ খান এই মেয়েটার মতো, তা হলেও কি বাঁচবেন? নাড়ী দেখে সে কথা তো বলা যায় না। অরুন্ধতী দেখে কি তা বলা যায়? অবশ্য বিষ তিনি খাবেন না, কখনই খাবেন না। অধিকাংশ লোকেই খায় না। মর্মান্তিক শোকে ক্ষোভে ব্যর্থতাতেও খায় না। মরণকে মানুষের বড় ভয়। মদ খেয়ে মরে, ব্যাভিচার করে মরে, অনাচার করে মরে বনবিহারীর মত। ওই নিশির ভাইঝির মতো। বিপিনের নাম তিনি এদের সঙ্গে করবেন না। কিন্তু এরাও বিষ খেয়ে মরতে পারে না। সে এক আলাদা জাত আছে। এই মেয়েটার জাত। মেয়েদের মধ্যেই এ জাত বেশী।

'নারায়ণ! নারায়ণ! গোবিন্দ হে!'

হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে ডেকে উঠলেন মশায়। গোবিন্দ রক্ষা করেছেন, ভূপীকে না পেলে সে এমনিভাবে বিষ খেতে পারত। হ্যাঁ পারত! সে এই জাতের মেয়ে ছিল।

চঞ্চল হয়ে মশায় বারান্দা থেকে নিচে নেমে এসে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়ালেন। পরমানন্দ মাধব!

হাসপাতালের লম্বা ঘরটার মধ্যে থেকে মৃদু আলোর আভাস বেরিয়ে আসছে। রোগীরা ঘুমুচ্ছে। তন্দ্রার মধ্যে কেউ কেউ অসুখে এ-পাশ ও-পাশ করছে। আশপাশে কোয়ার্টার্সগুলি নিস্তব্ধ। অন্ধকারের মধ্যে ঘন কালো ছবির মতো দেখাচ্ছে। পরিত্যক্ত কবরস্থানটার মাঝখানে বটগাছটার পত্রপল্লবের মধ্যে বাতাসের বেগে সরসর শব্দ উঠছে একটানা। হঠাৎ পায়ের তলায় পট করে একটা শব্দ উঠল: এঃ, একটা ব্যাঙ।

—কে? একটি সাদা-কাপড়পরা মূর্তি, হাসপাতালের বারান্দার উপর। মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—কে! নারীমূর্তি একটি।

মৃদুস্বরে উত্তর এল —আমি একজন নার্স। আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে? বসুন।

—নাঃ, বেশ আছি। কেমন আছে মেয়েটি?

—ভালো না।

—নারায়ণ হে! গম্ভীর স্বরে আবার ডাকলেন মশায়। নার্সটি চলে গেল ঘরের মধ্যে।

ব্যাঙটা তাঁর পায়ের চাপে ফেটে পিষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিচিত্র। তিনিই হলেন এই মুহূর্তে মৃত্যুর দূত। কোথায় নেই মৃত্যু? কিসে নেই মৃত্যু?

—মশায়!

—কে? হরিহর?

হ্যাঁ।

—কী হল?

—আর কী? শেষ হয়ে গেল। হল না কিছু।

প্রদ্যোত ডাক্তার বেরিয়ে এল। বললে—পারলাম না কিছু করতে। দেখবেন নাকি?

—নাঃ। আমি যাই তা হলে।

আচ্ছা! প্রদ্যোত যেন হঠাৎ প্রশ্ন করলে—আপনি ওদের বাড়ীতে গিয়ে তো মেয়েটিকে দেখেছিলেন। তখন কি নাড়ী দেখে জানতে পেরেছিলেন বাঁচবে না?

—ওর হাত আমি দেখিনি ডাক্তারবাবু।

—দেখেন নি?

—না। আমি আপনার এখানেই আনবার ব্যবস্থা করেছিলাম। আপনি দেখবেন, চিকিৎসা করবেন, আধুনিক চিকিৎসা আপনাদের। আমি নাড়ী দেখি নি।

তেত্রিশ

দুদিন পরে মশায় বসেছিলেন আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ায়। সামনে পড়ে রয়েছে একখানা পত্র। সাদা কাগজের চারিধারে কালো বর্ডার দেওয়া ছাপা নিয়ন্ত্রণপত্র। বিপিনের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণলিপি। মশায় বাড়ির ভিতর থেকে আসবার আগেই রতনবাবুর লোক এসে দিয়ে গিয়েছে। কৃতী প্রতিষ্ঠাবান বিপিনের শ্রাদ্ধ যোগ্য মর্যাদার সঙ্গেই করতে হবে বইকি। রতনবাবু তা করবেন। মশায় শুনেছেন, রতনবাবু বলেছেন—তা না করলে চলবে কেন?

পরানের বিবির দেহটা পোস্টমর্টেমের জন্য চালান গেছে। হতভাগিনীর সৎকারও হল না?

গতকাল সন্ধ্যায় নবগ্রামে একটি শোকসভাও হয়ে গিয়েছে। মশায় যান নি। এ সভায় সমিতিতে কেমন অস্বস্তি বোধ করেন তিনি। কিশোর এ সভার উদ্যোক্তা। সভায় গ্রাম-গ্রামান্তরের লোক এসেছিল। ডাক্তারেরা সকলেই ছিলেন। বিপিন এখানকার হাসপাতালে পাঁচহাজার টাকা দিয়ে গিয়েছে। রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালের সঙ্গে ক্লিনিক হবে ওই টাকায়। বিপিনের যোগ্য কাজই বিপিন করে গিয়েছে। রোগার্তের বন্ধুর কাজ করেছে। অকালমৃত্যুর গতি রুদ্ধ হোক। বাপকে যেন সন্তানের শ্রাদ্ধ করতে না হয়।

নবগ্রামের তরুণ ছেলে একটি, নতুন উকিল হয়েছে, সে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেছে—"আমাদের এখানে ডাক্তার এসেছে, হাসপাতাল হয়েছে—নতুনকালের ওষুধপত্রও এসেছে তবুও হাতুড়ের যুগের অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে আমাদের যায় নি। বিপিনবাবুর দানে সেই অন্ধকার দূর হল।"

কথাটা মিথ্যা নয়। অধিকাংশ ডাক্তারেরাই হাত দেখতে জানেন না, যা জানেন তাকে ঠিক নাড়ীজ্ঞান বলা চলে না। কিন্তু তবু যেন কথাটা তাঁকে একটু লেগেছে।

নারায়ণ! নারায়ণ! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। মনটা খচখচ করছে। এই তরুণ ছেলেটির সঙ্গে প্রদ্যোত ডাক্তারের বন্ধুত্বটা একটু গাঢ়।

আট-দশজন রোগী এসেছে। রোগী আবার দু-একজন করে বাড়ছে। যেদিন থেকে তিনি বিনয়ের দোকানে বসেছেন সেই দিন থেকেই এর সূত্রপাত হয়েছে।

বিনয় মধ্যে মধ্যে হেসে বলে—দেখুন। দেশে ম্যালেরিয়া কমে গিয়েছে। ডি-ডি-টি ছড়িয়ে মশার বংশ নির্বংশ হয়ে গেল। থাকবে কোথা থেকে।

টাইফয়েড এখানে কম। ওদিকে হাসপাতাল হয়েছে। রোগীরা ওসব রোগে হাসপাতাল যাচ্ছে। চারুবাবু হরেন বসে আছে! আপনার রোগী বাড়ছে।

তা বাড়ছে। কতকগুলি পুরনো রোগে রোগীরা তাঁর কাছে আসে। তিনি সারাতে পারেন। বিশেষ করে পুরনো রোগে ডাক্তারেরা যখন রোগ নির্ণয় করতে না পেরে রক্তপরীক্ষা এক্স-রে ইত্যাদির কথা বলেন তখন তারা তাঁর কাছে আসে। আর আসে এ দেশের বিচিত্র কতকগুলি ব্যাধি। যে সব রোগের নাম পর্যন্ত দেশজ; যার সঠিক পরিচয় এখনও নূতন মতে সংগ্রহও হয় নি। রোগীগুলিকে বিদায় করছিলেন মশায়, ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে লাঠি হাতে এসে দাঁড়ালে 'মরি' বষ্টুমী।

—জয় গোবিন্দ! মশায় বাবা গো পেনাম।

ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে 'মরি'। মাথার চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা, কপালে তিলক, পঞ্চান্ন-ষাট বছরের প্রৌঢ়া মরি বষ্টমী দীর্ঘদিন পর এল। একসময় নিত্য আসত। ওর ছেলে এবং মেয়ে দুজনেরই হয়েছিল যক্ষ্মা। তাদের জন্য ওষুধ নিতে আসত। সে অনেক দিনের কথা। মরির বোষ্টম মরে ছিল যক্ষ্মায়। কিন্তু মরির কিছু হয় নি। এতকাল পর মরিকে সেই কালে ধরলে নাকি? এতকাল পর?

মরি এখানকার নিয়মকানুন জানে। মশায়ও জানেন মরির ধরনধারন। এখন 'কী হয়েছে' প্রশ্ন করলে মরি বলবে—'সকল জনাকে বিদেয় করুন বাবা তারপর বলছি!'

সকলের হয়ে গেলে তাঁর দুটি পায়ে হাত রেখে বলবে—বাবা ধন্বন্তরি, আপনার অমৃতের ভাণ্ডার, আমি অভাগিনী আমি পাপী—আমার ভাগ্যে বিষ, বিষের জ্বালায় ছুটে এসেছি। দয়া করুন।

দয়াতে অবশ্য মরির জ্বালা জুড়ায় নি। যক্ষ্মাতেই স্বামী-পুত্রকন্যা গিয়েছে।

মরি ছেলেমেয়ের মৃত্যু বসে বসে দেখেছে। কাঁদে না। বলেছে—যার ধন সেই নিলে—আমি কেঁদে কী করব? আমি কাঁদব না। শুধু ঠাকুর, তোমার চরণে এইটুকুন নিবেদন, আমাকে নাও। আশ্রয় দাও। বড় তাপ! প্রভু, চরণছায়ায় আমাকেও জায়গা দাও, একপাশে এককোণে।

শেষ রোগীটিকে বিদায় করে মশায় বললেন—কী হল মরি, ডাক এল না কি তোর? হঠাৎ তুই?

মরি এগিয়ে এসে ঠিক আগের মতন পা দুটি ধরে বললেন—না বাবা, মরির সে ভাগ্যি হয় নাই। ছেলেবেলায় বারোমাস রোগে ভুগতাম; দু-তিনবার মরমর হয়েছিলাম, তাই বাবা-মায়ে নাম রেখেছিল মরি। তাই সেই ছেলে কালেই সকল

ভোগ শেষ হয়েছে, এখন মরি পাকা তালগাছের মত শক্ত। আমি এসেছি বাবা, আপনার কাছে, এসেছি কালীর দেবাংশী ওঝা মশায়ের জন্তে অভয়ার জন্তে। আপনকার বন্ধু মিশ্র মশায়ের বেটার বউ—

শশাঙ্কের বউ?

চঞ্চল অধীর হয়ে উঠলেন মশায়। শশাঙ্কের স্ত্রী! সমস্ত শরীরে একটা যেন কম্পন বয়ে গেল।

—হ্যাঁ বাবা। সেই পাঠালে। বললে—তুমি একবার মশায় জেঠার কাছে যাও মরি। আমার স্বামীর তুদিনের জ্বরে হাত দেখে—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। কিন্তু কিসের জন্তে—কি হয়েছে?

—বড় অসুখ বাবা। বললে—আমাকে একবার দেখে যেতে বলবি—আমাকে বলে যান আর কতদিন আমার বাকি?

—গোবিন্দ! গোবিন্দ! নারায়ণ নারায়ণ! কিন্তু হয়েছে কী?

—রোগ নানানখানা! ভুগছে আজ ছ মাস। গুসগুসে জ্বর, খুসখুসে কাশি; সবই সেই কালরোগের মতো।

যক্ষ্মা?

ডাক্তারেরা তাই বলেছে। হরেন ডাক্তার দেখেছে, চারুবাবুও দেখেছেন; সেদিন হাসপাতালের প্রদ্যোতও দেখে এসেছে। ইনজেকশন অনেক হয়েছে। পেনিসিলিন অনেক কয় লক্ষ। কিন্তু কোনো ফল হয় নি। কাশি সমান রয়েছে। জ্বর ছাড়ে নি। কোনো জটিলতার একটি পাকও এতটুকু শিথিল হয় নি।

মরি বললে—বাবা আপনি তো জানেন, এখানে স্বামী গেল হতভাগী মেয়ের, বাপ এখানকার সম্পত্তি বেচে এক তোড়া নোট নিয়ে মেয়েকে বাড়ি নিয়ে গেল। বাপের বাড়িতে সর্বময় কর্তা হয়ে ছিল। ভাইয়ের ছেলে নিয়ে আর মাকালীর সেবা নিয়ে সংসারে সে কি আঁটসাঁট। বাপ গেল, মা গেল, ভাইরা ভিন্ন হল, অভয়া যে ভাইপোকে মানুষ করেছিল—তার বিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে ভিন্ন হয়েছিল। এখন ভাইপোর হাতে সব, অভয়ার হাত শূন্য, এখন এই রোগ শুনে ভাইপো তাকে ভিন্ন করে দিয়েছে। বাবা, গোয়াল বাড়িতে একখানা ঘর নিকিয়ে-চুকিয়ে পরিষ্কার করে সেইখানে নির্বাসন দিয়েছে। কেউ আসে না, উঁকি মারে না, নিশ্বাসে রোগ ধরে যাবে।

মরি হাসলে এইখানে। হেসে বললে—আমি শুনলাম। শুনে বলি—আমার স্বামী পুত্র কন্তে তিন গিয়েছে এই রোগে, আমি বিছানার পাশে বসে থেকেছি। আমার তো কিছু হয় নাই। তা আমি যাই, ব্রাহ্মণকন্তে অনাথা—তার শয্যের

শেষ কালটা থাকি। কাল আমাকে হঠাৎ বললে—মরি, তুমি একবার মশায়ের কাছে যাও আমি তো হেঁটে যেতে পারব না, ক্ষমতা নাই। গোরুর গাড়িও ভাইপোরা দেবে না। তাঁকেই বোলো আমাকে একবার দেখে যেতে। অন্য কিছু নয়, কতদিন আর বাকি সেইটা জানব।

*　　*　　*　　*

বৈশাখের শস্যক্ষেত্রের মতো ধূলিধূসর শুষ্ক রুক্ষ। মুখে-চোখে কোথাও একবিন্দু সরসতার চিহ্ন নাই। সমস্ত অঙ্গে যেন একটা আবরণ পড়েছে। শীর্ণ দেহ ভেঙ্গে পড়েছে। জীর্ণ মলিন শয্যার উপর শুয়ে আছে। ঘরখানার চারিদিকে অন্ধকার জমে আছে। শশাঙ্কের স্ত্রী হেসেই বললে—দেখুন তো মুক্তি আমার কতদূরে? কতদিনে খালাস পাব। আপনি ছাড়া আর তো কেউ বলে দিতে পারবে না।

কথাগুলি স্পষ্টভাবে বোঝা গেল না। কাশিতে স্বরভঙ্গ হয়েছে। কণ্ঠনালী যেন রুদ্ধ হয়ে রয়েছে। ধরা ভাঙা গলায় স্বর-বিকৃতির মধ্যে কথা যেন চাপা পড়ে যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে ফুটো-হাপর-থেকে-বের-হওয়া ফসফস আওয়াজের মতো কণ্ঠস্বরে কথা হারিয়ে যাচ্ছে। হাতখানি সে তুলে ধরলে মশায়ের সামনে।

—দেখছি মা। একটু পরে।

তিনি তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। মরি দাঁড়িয়ে ছিল; তাকে বললেন—দরজাটা ভালো করে খুলে দে তো মরি।

মুক্ত দ্বারপথে আলো এসে পড়ল অভয়ার মুখের উপর। আলোকিত ললাটের উপর হাতখানি রাখলেন মশায়। অভয়া তাকিয়ে রইল হেমন্তের আকাশের দিকে। ক্লান্তি আছে, কষ্টভোগের চিহ্ন আছে, কিন্তু ক্ষোভ নাই, ভয় নাই, প্রসন্ন তার দৃষ্টি।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে দেখে হাতখানি তুলে নিলেন। এ হাত নামিয়ে রেখে ও হাত।

—কতদিনে যাব? হাতখানা নামিয়ে রাখতেই অভয়া প্রশ্ন করলে।

—দেখি মা!

প্রশ্নোত্তরের মধ্যে বিবরণ জেনে ভালো করে পরীক্ষা করে মশায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সংসার কি তেতো হয়ে গেছে মা? সইতে পারছ না?

একটু হাসলে অভয়া। বিচিত্র হাসি। এ হাসি অভয়ারাই হাসতে পারে। সকল মেয়ে পারে না। অভয়া বললে—তেতো খেয়েই তো জন্ম কাটল বাবা। সইছে না তো বলি নি।

—জানি মা। সে হলে শশাঙ্ক যেদিন গিয়েছিল সেই দিনই তুমি কিছু করে

বসতে। পুকুরে জলের অভাব হয় নি, বাড়িতে দড়ির অভাব হয় নি, সংসারে বিষের অভাব নেই। সে জানি। তাই তো বলছি মা! আরও সইতে হবে। এ তোমার জটিল রোগ—পাঁচটি রোগে জট পাকিয়ে জটিল করেছে। মৃত্যুরোগ নয়। যক্ষ্মা তোমার নয়।

—নয়? উঠে বসল অভয়া।

—না।

—ডাক্তারেরা যে সকলে একবাক্যে বলে গেল।

—তারা তো এক্সরে করতে বলেছেন।

—হ্যাঁ।

—এক্সরে করবার দরকার নাই মা। ওঁরা বুঝতে পারেন নি। ভুল চিকিৎসা হয়েছে। তুমি এক মাস দেড় মাসের মধ্যেই সেরে উঠবে মা। সংসারে তোমাকে আরও কিছুদিন থাকতে হবে।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অভয়া।

—আমি ওষুধ পাঠিয়ে দেব। নিয়মের কথা তোমাকে বলতে হবে না। তুমি শুদ্ধাচারিণী নির্লোভ—আমি তো জানি।

অকস্মাৎ দুটি জলের ধারা নেমে এল মেয়েটির দুই চোখের দুটি কোণ থেকে। চোখ ফেটে যেন জল বের হল। কিন্তু নির্নিমেষ দৃষ্টিতে যেমন সে বাইরের শূন্যলোকের দিকে চেয়ে ছিল তেমনিই চেয়ে রইল।

—মা!

—আপনি আমাকে সেদিন বাপের মতো স্নেহ করে নেমন্তন্ন করেছিলেন—আমি—।

—ও সব কথা থাক মা। অল্পদিনেই তুমি সেরে উঠবে, আমি বলে যাচ্ছি। আমি একদিন অন্তর এসে দেখে যাব তোমাকে।

অভয়া আবার বললে—বনবিহারী ঠাকুরপোর অসুখের সময় আমি মা-কালীর কাছে মানত করেছিলাম. পূজো দিয়েছিলাম। ইচ্ছে হয়েছিল পুষ্প নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে আসি। কিন্তু পারি নি। তিনি মারা গেলে মনে হয়েছিল জিভটা কেটে ফেলি।

মশায় হেসে বললেন—ও নিয়ে তুমি ভেবো না মা। মানুষের শাপে মানুষ মরে না। মানুষ মরে মৃত্যু ধ্রুব বলে। তবে অকালমৃত্যু আছে। বনবিহারী মরেছে নিজের কর্মফলে।

বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল অভয়ার ভাইপো। অভয়া যাকে সন্তানস্নেহে মানুষ

করেছে ; যে তার যথাসর্বস্ব নিয়ে যক্ষ্মার ভয়ে এই ঘরে নির্বাসন দিয়েছে। তাকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন মশায়। পরক্ষণেই নিজেকে শান্ত করলেন। বেচারীর চোখে মুখে কী উদ্বেগ—কী ভয় !

—দেখলেন মশায় ?

—হ্যাঁ, কোনো ভয় নাই। এক মাস দেড় মাসের মধ্যেই বউমা ভালো হয়ে উঠবেন।

—ডাক্তারেরা যে বলে গেলেন—

—যক্ষ্মা ? না, যক্ষ্মা নয়। পার তো এক্সরে করে দেখতে পার। না পার, এক মাস অপেক্ষা করো। পনেরো দিন। পনেরো দিনেই ফল বুঝতে পারবে। বলতে বলতে মশায় নিজেই একটু সংকোচ অনুভব করলেন। কণ্ঠস্বর একটু বেশী উঁচু হয়ে উঠেছে, কথাগুলি যেন বেশী শক্ত হয়ে গেল।

নারায়ণ নারায়ণ ! মনে মনে নারায়ণ স্মরণ করলেন তিনি।

চৌত্রিশ

দেখো, বিনয়, মৃত্যু সংসারে ধ্রুব। যে জন্মায় তার মৃত্যু হবেই। মৃত্যুর বহু পথ, সে অনিবার্য। কেউ রোগে মরে, কেউ আঘাতে মরে, কেউ ইচ্ছে করে মরে, আত্মহত্যা করে। তবে রোগই হল মৃত্যুর সিংহদ্বারের পাকা সড়ক। রোগমাত্রেই মৃত্যুর স্পর্শ বহন করে ; সব রোগে মানুষ মরে না কিন্তু খানিকটা এগিয়ে দেয় ; জীবনীশক্তি ক্ষয় করে ঠেলে দেয় খানিকটা। চিকিৎসক চিকিৎসা করে, তার জ্ঞানমত যে বাঁচবে বলে মনে হয় তাকে সে মরবে বলে না। যে মরবে বলে মনে হয় তার ক্ষেত্রে কেউ আকারে ইঙ্গিতে জানায়, বলে বড় ডাক্তার আনুন, কেউ নিজের মত স্পষ্ট করে বলে দেয়। তারও ক্ষেত্র আছে। শশাঙ্কের বউ আমার মতে বাঁচবে। তাই বলেছি।

বিনয়ের দোকানে বসেই কথা বলছিলেন মশায়। আরও একদিন পর। শশাঙ্কের স্ত্রীকে দেখে মশায় যা বলে এসেছেন তাই নিয়ে এখানে বেশ খানিকটা উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছে। নবগ্রামের ডাক্তারেরা—হরেন, চারুবাবু, প্রদ্যোত তিনজনেই ভ্রূ কুঞ্চিত করেছেন। প্রদ্যোত বলেছে—হাত দেখে বলেছে যক্ষ্মা নয় ?

কথাটা নিয়েছ হৈ চৈ করছে শশী ডাক্তার। সে বলে বেড়াচ্ছে—শতমারী ভবেদ্, বৈদ্য, সহস্রমারী চিকিৎসক। দু-চার হাজার রোগী মেরে জীবনমশায় আমার

মরা বাঁচাতে লেগেছে। রামহরে বেটাকে আমাশয় পেটের অসুখ থেকে বাঁচিয়ে এবার শশাঙ্কের বউকে যক্ষ্মা থেকে বাঁচাবে। রানা পাঠককে বাঁচাবে।

—শশীর দোয়ারকি করছে দাঁতু ঘোষাল। বিনয় বললে—সে বামুন হাসপাতাল থেকে কাল চলে এসে শশীর সঙ্গে জুটেছে। শশী তাকে বলেছে, দেঁতো, জীবন দত্ত যদি যক্ষ্মা ভালো করতে পারে তো আমি আর তোর বদহজম সারাতে পারব না! খুব পারব! ক্যানবিসিণ্ডিকা খাইয়ে তোকে সারিয়ে দোব।

মশায় চকিত হয়ে উঠলেন—দাঁতু হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে, না ডাক্তার ছেড়ে দিয়েছে?

জোর করে চলে এসেছে। হাসপাতালে ভূত-ভূত গুজব শুনেছে—তার উপর পরশু রাত্রে পরানের বিবি মরেছে বিষ খেয়ে—হাসপাতালের টেবিলের ওপর। দাঁতু কাল বণ্ড লিখে দিয়ে এসেছে।

মশায় অকস্মাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, বাইরের জানালা দিয়ে গাছের পল্লবের মাথায় আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনটা যেন খোলা পথে শূন্যলোকের অন্তহীনতার মধ্যে কিছু খুঁজে বেড়াতে লাগল। মুখে ফুটে উঠল ক্ষীণ রেখায় একটু হাসি।

—মশায়!

ভারী গলায় ডাক দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল রানা পাঠক।

—আমি একটু ভালো আছি মশায়। দু-তিন দিন থেকে জ্বর কম হয়ে গিয়েছে। কাল বোধ হয় হয়ই নাই। সে এসে বেঞ্চে বসল। মেঝের উপর নামিয়ে দিলে সের পাঁচেক একটা মাছ।

মশায় রানার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ওকে দেখতে লাগলেন। রানার মুখে কোনো পরিবর্তনের ছাপ দেখা যায় কি না। রানা বললে—হাসপাতালের ডাক্তার, হরেন ডাক্তার, চারুবাবু ওদের আজ দুটো কথা বলে এলাম গো!

মুখের দিকে দেখতে দেখতেই ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—কী বলে এলে?

রানা বললে—ওই ওদের কো-অপারেটিভ না কো-অপারেটিভ ডাক্তারখানা হয়েছে, সেইখানে ওরা শশাঙ্কের বউয়ের রোগ নিয়ে, আমার রোগ নিয়ে আপনার নামে পাঁচ কথা বলছিল। আমি দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। শুনে আমিও দু কথা বললাম। তা ওই নতুন ডাক্তার ফট করে বললে—তুমি বাঁচবে না বাপু। মশায় তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। বাঁচতে চাও তো কোথাও কোনো যক্ষ্মা হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হও। তা আমিও দু-চার কথা বললাম।

—কটু কথা বলেছ নাকি ?

—তা দু-চারটে শক্ত কথা বলেছি। কটু নয় এমন কিছু। বলেছি দু-চারটে। কত বড় শক্ত রোগ আরাম করেছেন তার কথা। সেই কাহারের রক্তবমি-করা যক্ষ্মা ভালো করার কথা বলেছি।

—না-না। সে কাহারের রোগটা যক্ষ্মা ছিল না বাবা। রক্তপিত্ত হয়েছিল তার।

—তা চক্রধারী তো বলেছিল যক্ষ্মা। চারুবাবুও বলেছিল।

—মানুষ মাত্রেরই ভুল হয় বাবা।

—এই তো শশাঙ্কের স্ত্রীকেও বলেছিল যক্ষ্মা। আপনি বলেছেন যক্ষ্মা নয়।

—হ্যাঁ। আমার বিচারে এটাও ওঁরা ভুল করেছেন। শশাঙ্কের স্ত্রী সেরে উঠবে। এক্স-রে করলে এখুনি বুঝতে পারবেন। ভালো নাড়ী দেখতে পারলেও ধরতে পারতেন। আসল হল যকৃতের দোষ। বিধবা মেয়ে, শরীরকে বড় কষ্ট দেয়, অবেলায় খায়, উপবাস মাসে তিন-চারটে। লিভার খারাপ থেকেই কাশিটা হয়েছে। তার উপর পুরনো জ্বর। ওঁরা ধরতে পারেন নি।

—আমার তো যক্ষ্মা বটে। তা আমিও তো ভালো আছি।

—ভালো আছ ?

—তাই তো মনে হচ্ছে। জ্বর আজ দুদিন কমে গিয়েছে। সামান্য, খুব সামান্য। নিজেও তো নাড়ী দেখতে জানি। ওদের ওই পারাকাঠি আমার লাগে না। নিয়ম করে খাই দাই! ভালো লাগছে একটু। তা ছাড়া সে সর্বনাশী তো খালাস দিয়েছে আমাকে।

সেই মেয়েটি মরেছে। আশান্বিত হয়ে উঠেছে রানা।

—দেখুন, হাতটা দেখুন।

হাত দেখে বুক দেখে মশায় বললেন—ওই ওষুধই খেয়ে যাও। ওই নিয়মই করে যাও বাবা। দেখো!

—কী দেখলেন বলুন। আমার কাছে আবার লুকুবেন না মশায়। আপনি তো রানাকে জানেন। মরণকে আমার ভয় নাই। মরতে সাধও নাই। মরব শুনলে কাঁদব না আমি। তবে যদি ভালো হই, আর কিছু কাল বাঁচি, তা কেন চাইব না। যক্ষ্মা যখন হয়েছে, তখন যাবার নোটিশ আমার হয়ে গিয়েছে, সে আমি জানি। এখন যদি দশদিন মানে কিছুদিন জামিনে খালাস পাই তো সাধ-আহ্লাদটা মিটিয়ে নি। এই আর কি! ভগবানের নাম ভালো করে করি নাই, তাও করে নি। এই আর কি। আপনি নির্ভয়ে বলুন।

—বলবার সময় এখনও হয় নাই বাবা। তবে খারাপ হয় নাই—এটুকু বলতে পারি। আরও পনেরো দিন পরে এসো বাবা।

—ব্যস্, ব্যস্! তাই আসব। এখন মাছটা রইল। ওটা আপনার জন্যে এনেছিলাম।

—মাছ কেন আনলে রানা? আমার বাড়িতে খাবে কে?

—পেলাম পথে, নিয়ে এলাম আপনার জন্যে। ইচ্ছে হল। জেলেরা নদীতে মাছ ধরছিল, নদী আমার এলাকা, জমা পাই। দাঁড়ালাম। দেখলাম বেশ মন দুই-আড়াই মাছ উঠল। এ মাছটা চমৎকার লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আপনাকে—নিয়ে এলাম। ঘরে খান, বিনয়-টিনয়কে দেন। পাড়ায় দেন। আমাকে আশীর্বাদ করুন। বাঁচি মরি—শিগগির শিগগির হয়ে যাক, যেন না ভুগি! চললাম তা হলে।

বিচিত্র মানুষ রানা। ভয় নাই। কিন্তু রানা বাঁচবে না।

বিনয় বললে—আজ রাত্রে তা হলে আপনার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া। বাজার করে মাছ নিয়ে দি গিন্নীমায়ের কাছে।

মশায় হাসলেন—দে! বিনয় চলে গেল।

ঘরে একা বসে নিজের নাড়ী দেখছিলেন। আজকাল প্রায় দেখেন। মৃত্যুর পদধ্বনি যদি শুনতে পান। এখন ওই একটি কামনা তাঁর মনে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠেছে। তিনি তাকে সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করবেন। সতর্ক হয়ে বসে থাকবেন। তার পদধ্বনি, তার রূপ, তার স্বর, তার স্পর্শ, তার স্বাদ তিনি প্রত্যক্ষ করবেন। রূপ থাকলে দেখবেন, স্বর থাকলে শুনবেন, স্পর্শ যদি থাকে—তা তিনি অনুভব করবেন। পারলে বলে যাবেন।

সে আতর-বউ? সে মঞ্জরী? সে কেমন? সে কে?

* * *

একটি তরুণী মেয়ে এসে তাঁর ঘরে ঢুকল। সবিস্ময়ে তিনি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শান্ত দৃষ্টি, বড় বড় দুটি চোখ, প্রসন্ন মুখশ্রী, ফরসা রঙ, বাইশ-তেইশ বছরের একটি মেয়ে। সাদা ব্লাউজ, ফিতেপাড় সাদা শাড়ি, গলায় একছড়া সরু হার চিকচিক করছে, হাত দুখানি নিরাভরণ, বাঁ হাতে একটি কালো স্ট্র্যাপে বাঁধা ছোট হাতঘড়ি। প্রসন্নতা মেয়েটির সর্বাঙ্গে।

দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।

মেয়েটি বললে—আমি এখানে নার্স হয়ে এসেছি। আপনার নাম শুনেছি।

হাসপাতালের সামনে দিয়ে আসেন যান দেখি। বড় ইচ্ছে হয় কথা বলতে। আজ বাজারে এসেছিলাম, দেখলাম আপনি একা বসে আছেন।

—বোসো মা, বোসো। আলাপ করতে এলে, দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে কেন? আর আমার মতো বুড়ো মানুষকে তোমার সঙ্কোচ কী? বোসো। সেদিন রাত্রে হাসপাতালের দাওয়ায় তুমিই দাঁড়িয়েছিলে?

—আপনাকে দেখছিলাম।

—আমাকে?

—আপনার অনেক গল্প শুনেছি আমি।

—কার কাছে?

—আমার মার কাছে। আমার মাকে, আপনি বাঁচিয়েছিলেন। আমি তখন খুব ছোট। আমার জন্ম এইখানে। ওই আপনাদের গ্রামে।

—কে মা তুমি? আমি তো—। বিস্ময়ের আর সীমা রইল না তাঁর।

—কী করে চিনবেন? আমার মায়ের বাবা এখানে চাকরি করতে এসেছিলেন। সে আপনার মনে থাকবে কী করে? কত লোককে আপনি বাঁচিয়েছেন—আপনার কি মনে আছে? কিন্তু যারা বেঁচেছে তাদের মনে থাকে।

—থাকে? হাসলেন জীবন মশায়।

—আমার তো রয়েছে। আমি প্রায় মরে গিয়েছিলাম। মা বলে। তাই তো আমি হাসপাতালে সকলের সঙ্গে তর্ক করি। ওরা বলে পাশ-করা তো নন, কোয়াক তো!

মশায় হাসলেন।

মেয়েটি বললে—আমি বলি, না। তা উনি নন। আমি মায়ের কাছে শুনেছি। আপনারা মশায়। মানে মহাশয়ের বংশ।

বিস্ময়ের আর সীমা রইল না মশায়ের।—তোমার মা কে ভাই?

হেসে বললেন—ভাই বললাম, তুমি আমার ছেলের ছেলের বয়সী, কিছু মনে কোরো না।

—না। আপনি আমার দাদুই তো। আমার মা আপনাকে জ্যেঠামশায় বলত।

—কে? কে তোমার মা?

চুপ করে রইল মেয়েটি। একটু পর বললে—একদিন আপনার বাড়ি যাব। সব বলব।

মেয়েটি হেঁট হয়ে টুপ করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। মশায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—আমাকে প্রণাম করছ? আমি কায়স্থ। তুমি ব্রাহ্মণ কি বৈদ্য নও তো?

—না। আর হলেই বা কী? আপনি মশায়!

আর মশায়! শেষ হয়ে গিয়েছে মহাশয়ত্ব। কিন্তু আশ্চর্য। পৃথিবীতে এমন কৃতজ্ঞতাও আছে? কবে কোন কালে ওকে ওর স্মৃতির কালের সীমার বাইরে কোন অসুখ থেকে বাঁচিয়েছিলেন—তার জন্য ওর এত কৃতজ্ঞতা!

—আজ আমি যাই দাদু।

সচেতন হয়ে উঠলেন মশায়, বললেন—তোমার পরিচয় তো ঠিক পেলাম না। কিন্তু তোমার নাম?

—সীতা।

—সীতা?

লঘুপদক্ষেপে চলে গেল মেয়েটি।

—মহাশা। কদ্রু এসে দাঁড়াল।—ভালো আছি মহাশা। আওর থোড়া দাওয়াই।

পঁয়ত্রিশ

মাস কয়েক পর—মাস তখন চৈত্র। বেশ গরম পড়েছে। অপরাহ্ণবেলায় আরোগ্য-নিকেতনের বারান্দায় সেতাবের সঙ্গে মশায় দাবায় বসেছিলেন।

মশায় ক্রমাগত হারছিলেন। বাঁ হাতে ডান হাতের কব্জিটি ধরে বসে চাল ভাবছিলেন। হঠাৎ বললেন—নাঃ, মাত ঠেকানো যাবে না। আমার হার।

সেতাব বললে—তোর হল কী বল দেখি?

মশায় হাসলেন।

—খেলায় মন নেই একেবারে? কী হয়েছে আজকাল? কেবল নাড়ী দেখছিস। বাঁ হাতে ডান হাতের নাড়ী ধরেই বসে থাকিস! হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে সেতাব বললে—জীবন?

মশায় হেসে বললেন—নাঃ কিছু না। তবে ভালো লাগে না রে আর। তাই দেখি। কিন্তু নাঃ, কিছু পাই না।

সেতাব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উদাস হয়ে বসে রইল। দাবা সাজাতে ভালো লাগল না।

বাড়ী থেকে এই মুহূর্তে বেরিয়ে এল সীতা। সেই নার্স মেয়েটি। চায়ের বাটি

হাতে এসে বাটি দুটি নামিয়ে দিয়ে বললে—চললাম দাদু। আজ সন্ধ্যে থেকেই ডিউটি।

—এসো। সস্নেহে পিঠে হাত দিয়ে মশায় বললেন—কাল কখন আসবে ?

—সকালে স্নান করে ঘুমিয়ে নিয়ে তারপর আসব।

—চলো, বিনয়ের ওখানে যাবার পথে একবার কদ্রুকে দেখে যাব।

মেয়েটি চলে গেল।

সেতাব ঘাড় নেড়ে উৎসাহ প্রকাশ করে বললে—হাসপাতালের ডাক্তার কদ্রু বেটাকে খুব বাঁচালে।

—নিশ্চয়। কেউ ভাবে নি—এ অপারেশন করে ডাক্তার ওকে বাঁচাতে পারবে। চারুবাবু হরেন এরাও ভাবে নি। চারুবাবু তো বলেছিলেন, হাত পাকিয়ে নিচ্ছে বুড়োর উপর ছুরি চালিয়ে, নিক। কদ্রু বেটাও মলে খালাস। স্ট্রাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া এখানে অপারেশন হয় ? হয় সবই, চাই সাহস আর আত্মবিশ্বাস! তা প্রদ্যোত ডাক্তারের আছে।

স্ট্রাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া হয়েছিল কদ্রুর। প্রথমটায় পেটের দরদ বলে কদ্রু নিজের ঘরেই পড়েছিল। কিশোর খোঁজ পেয়ে তাকে জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল। অপারেশন না করলেও কদ্‌রু মরত। প্রদ্যোত কারুর কথা শোনে নি, সে অপারেশন করেছে ; এবং কদ্‌রু বেঁচেছে। ধীরে ধীরে সেরে উঠছে সে। মশায় রোজ একবার করে দেখে যান কদ্‌রুকে। প্রদ্যোতের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়, সে হেসে নমস্কার করে বলে—"আপনার কদ্‌রু ভালোই আছে।" একদিন বলেছিল—"ওর হাত দেখে ওকে একটু বলে যান যে ভালো আছে। নইলে ও বিশ্বাসই করে না যে ও ভালো আছে। এমন রোগী পাওয়া ভাগ্যের কথা!"

সেতাব আবার ছকে গুটি সাজাতে আরম্ভ করে বললে—তুই কিন্তু ওই মেয়েটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করছিস জীবন।

ওই সীতা মেয়েটির কথা বললে সেতাব। ওই মেয়েটির সঙ্গে কয়মাসেই মশায়দের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ শুধু মশায়ের সঙ্গে নয়, মশায়গিন্নীর সঙ্গেও।

মশায় হাসলেন—বাড়াবাড়ির উপরে কি মানুষের হাত আছে রে ? দাঁতুকে দোষ দিতাম। লোভ—লোভ—লোভ। এও দেখছি মায়া, মায়া ছাড়াবার উপায় নাই। ছাড়ব ভাবতে গেলে অন্তর ছটফট করে আরও নিবিড় পাকে জড়িয়ে পড়ে।

মশায় উদাস দৃষ্টি তুলে আকাশের নীলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সেতাব স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। এতটা মাখামাখি সেতাবেরও একটু কটু ঠেকে। সেই সূত্র থেকে এ যেন শত সহস্র লক্ষ পাকে জড়িয়ে পড়ল জীবন। জীবন যদি যুবা হত, এমন কি প্রৌঢ়ও হত এবং জীবন যদি জীবনমশায় না হত তবে লোকে তার দুর্নাম রটাত। তবুও লোকে প্রশ্ন করে—এত কিসের মাখামাখি বলতে পার? সেতাবকেই প্রশ্ন করে। জীবনমশায়কে রক্ষা করবার জন্যই বলে—এটাও বোঝ না বাপু? ছেলেপুলে নাতিনাতনী সব যখন ছাড়লে তখন ওটা এসে পড়ল, ওরাও জড়িয়ে ধরলে আর কি! লোকে তবুও ছাড়ে না। বলে—নার্স টার্সদের জাতজাত তো সব গোলমেলে ব্যাপার। সেতাব বলে—সে বাপু আগেকার কালে ছিল—একালে নয়! জীবনের স্ত্রীও মেয়েটিকে ভালোবেসেছে। আতর-বউ ভালোবেসেছে সেটা তো কম কথা নয়। নিত্যই মেয়েটি একবার করে আসে। আতর-বউকে বই পড়ে শোনায়। আতর-বউয়ের দুঃখের কাহিনী শোনে। এ সব জেনেও সেতাবের মনে সন্দেহ হয় যে, মেয়েটি অত্যন্ত সুচতুরা; সে এই বৃদ্ধ-দম্পতির জীবনের শূন্যতার সুযোগ নিয়ে তাদের দোহন করছে। টাকাপয়সাও নেয়, এঁরাও—অন্তত জীবনও —দেয়!

শেষ বয়সে জীবনের ভাগ্যটা যেন ফিরে গেল। জীবনের নামডাক আবার অনেকটা ফিরে এসেছে। রামহরি লেটকে বাঁচিয়ে সূত্রপাত হয়েছিল, তারপর এই শশাঙ্কের বউয়ের রোগে জীবনের চিকিৎসা দেখে লোকে অবাক হয়ে গিয়েছে। ডাক্তারেরা বলেছিল যক্ষ্মা, জীবন বলেছিল—যক্ষ্মা নয়। অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। মাস দেড়েকের মধ্যেই সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়েছে শশাঙ্কের স্ত্রী। সে কী পরিশ্রম আর সে কী নিষ্ঠা বৃদ্ধ জীবনমশায়ের! নিজের হাতে ওষুধ তৈরি করেছেন। নিয়মিত একদিন অন্তর ভোরবেলা উঠে দু-মাইল পথ হেঁটে গিয়ে জীর্ণ ঘরখানির সামনে দাঁড়িয়ে ডাকতেন—মা!

মরি বষ্টুমি ঠিক উপস্থিত থাকত। হাসিমুখে বলত—আসুন বাবা।

—মা উঠেছেন?

—মা আপনার সেই ভোরে উঠে বসে আছেন। জপ সারা হয়ে গেল।

সাদা থান-কাপড়-পরা শীর্ণ ক্লান্তদৃষ্টি গৌরাঙ্গী মেয়েটি প্রসন্ন হেসে মাথায় একটু কাপড় টেনে দিয়ে অভ্যর্থনা করে বলত—কেন কষ্ট করে এলেন বাবা? ওষুধ পাঠিয়ে দিলেই হত। আমি ভালো আছি বাবা।

—ভালো তো থাকবেই মা। রোগ তোমার জট পাকিয়েছে কিন্তু কঠিন তো

নয়! তার উপর তোমার সহ্যগুণ, সেই জোরে শরীরের চেয়ে মন বেশী ভালো আছে। হাতটা যে দেখতে হবে। সেইজন্যে এলাম।

লজ্জিত হত মেয়েটি। মধ্যে মধ্যে বলত—আমাকে বাঁচাবার জন্যে এত কষ্ট কেন করছেন, আমি লজ্জা পাই। আমার জীবন যাবার নয়। আমি গেলে কষ্ট ভোগ করবে কে।

মশায় উত্তর দিয়েছিলেন—সুখদুঃখের সংসার মা। যত সুখ, তত দুঃখ। এই সইতেই জন্ম মা।

হেসে সে বলেছিল—তাই বটে বাবা, যত তেতো তত মিষ্টি। না পারা যায় গিলতে, না পারা যায় ওগরাতে।

—ঠিক বলেছ মা। আমাকে দেখো। তবু মা সংসারে মৃত্যুকামনা করতে নেই; আবার মরণকে ভয় করে পিছন ফিরে সংসার আঁকড়ে ধরে কাঁদতেও নেই। দুটোই পাপ।

—সেই পাপের ভয়েই তো বাবা। নইলে—।

মশায় একদিন বলেছিলেন—পাপ তোমার নেই মা। কিন্তু অন্যায় কিছু আছে। রাগ কোরো না আমার ওপর।

চমকে উঠেছিল মেয়েটি।—কী অন্যায় বাবা?

—মা, আত্মা—যাকে নিয়ে মানুষের এত, তিনি হলেন দেহাশ্রয়ী। দেহ নইলে তিনি নিরাশ্রয় নিরালম্ব—তাঁর আর কিছু থাকে না। সেই দেহকে একটু অযত্ন কর তুমি। যে মন্দিরে দেবতা থাকেন, সে মন্দিরের অযত্ন হলে দেবতা থাকবেন কী করে। দেহকে পীড়া দিয়ে তাঁকে অকালে চলে যেতে বাধ্য করলে—সেও যে এক ধরনের আত্মহত্যা হয়। শরীরের একটু যত্ন নিতে হবে।

শশাঙ্কের স্ত্রী সে কথা পালন করেছে।

কোনো কোনো দিন সকালে যেতে না পারলে, বৃদ্ধ মশায় দুপুরের রোদ মাথায় করেই গিয়েছেন।

শশাঙ্কের স্ত্রী সেরে উঠেছে। ভাইপোর ঘরে আবার ফিরে গিয়েছে। ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আগে ভাইপোটি পিসীকে শহরে নিয়ে গিয়ে এক্সরে করিয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তবে নিয়েছে। এক্সরেতে জীবনমশায়ের কথাই সত্য হয়েছে। আজও মধ্যে মধ্যে মরি বষ্টুমী ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ভিক্ষার পথে এসে 'জয় গোবিন্দ' বলে তাঁর কাছে দাঁড়ায়! ঝুলির ভিতর থেকে বের করে দেয় কিছু মিষ্টান্ন। অভয়া মা, কালীমায়ের প্রসাদ পাঠিয়েছেন বাবা!

আরও সত্য হয়েছে জীবনমশায়ের কথা। দাঁতু ঘোষাল মরেছে। হাসপাতাল

থেকে ভূতের ভয়ের জন্য দাঁতু জোর করে চলে এসেছিল। জুটেছিল শশীর সঙ্গে। কদিন পরেই বিপিনের শ্রাদ্ধ হল সমারোহের সঙ্গে। সেই শ্রাদ্ধে দাঁতু খেয়ে এল, সে খাওয়া বিস্ময়কর!

তারপরই সে পড়ল।

শেষ চিকিৎসা তার জীবনমশায়ই করেছেন। সে অন্য কাউকে ডাকেও নি। মশায়কেই ডেকেছিল। শশীই এসেছিল ডাকতে।

মশায়ের দুটি হাত ধরে কেঁদেছিল।

মশায় বলেছিলেন—আমি কী করব দাঁতু? কেই বা কী করবে? হাসপাতাল থেকে তুই শ্রাদ্ধের খাওয়ার লোভে পালিয়ে এলি?

দাঁতু অস্বীকার করে বলেছিল—গুরুর দিব্যি, না। ঈশ্বরের দিব্যি করে বলছি। ভূতের ভয়ে। হাসপাতালের ডাক্তারের বাড়িতে পর্যন্ত—

—দাঁতু! তিরস্কারের স্বরে মশায় বলে উঠছিলেন—দাঁতু!

—দাঁতু চুপ হয়ে গিয়েছিল এক মুহূর্তে। মশায় বলেছিলেন—সে তুই। ডাক্তারের রান্নাঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সে তুই ভূত সেজে মাংস চেয়েছিলি। আমি জানি। দোষ তোর নয়, এ লোভ তোর রিপু দাঁড়িয়েছে। তুই ছাড়তে পারবি নে। তোর ইতিহাস আমি জানি, তাই এত জোর করে বলেছিলাম—দাঁতু এতেই তোকে যেতে হবে। হাসপাতালের ডাক্তার জানে না তোর ইতিহাস, হয়তো আমার মত বিশ্বাসও করে না, তাই বলেছিল তোকে বাঁচাবে।

দাঁতু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছল।

মশায় বলেছিলেন—ভয় কী? মরবে তো সবাই একদিন। আমিও মরব। মানুষ জন্মায়—সে কী হবে, তার কত সুখ কত দুঃখ এ কেউ বলতে পারে না, সবই তার অনিশ্চিত, নিশ্চিত কেবল একটি কথা—সে মরবে একদিন। আর বয়স তো কম হল না। সাহস কর, ভগবানের নাম নে। মরণকে যত ভয় করবি তত কাঁদতে হবে। ভয় করিস নে, দেখবি মরণই তোর সত্যিকারের সুখ। এ ভাঙা জরা দেহ—এ দিয়ে করবি কী? পালটে ফেল। পালটে ফেল।

দাঁতু অনেকক্ষণ কেঁদে তারপর বলেছিল—এবার আমাকে বাঁচাও, আর লোভের খাওয়া খাব না আমি। দেখো।

মশায় হেসেছিলেন, বলেছিলেন—চেষ্টা আমি করব। তবে বলাই ভালো রে দাঁতু! দেহে আর তোর কিছু নাই। নাড়ীতে বলছে—

'—ছি—ছি—ছি—। ছি—ছি—ছি!'

মশায়ের কথায় মাঝখানেই দাঁতু চীৎকার করে উঠেছিল। মৃত্যুর সময়েও

মশায় উপস্থিত ছিলেন। প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞান ছিল দাঁতুর, শুধুই কেঁদেছিল, চোখ দিয়ে অনর্গল ধারে জল পড়েছিল। মশায় একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কী হচ্ছে তোর?

ঘাড় নেড়ে দাঁতু ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিল—জানি না! ভয় লাগছে।

সেই বহুকালের—সেই আদিকালের সেই পুরানো কথা। মহাভয়, মহাভয়! মহা অন্ধকার! মহাশূন্য! নিশ্বাস নেবার বায়ু নেই! দাঁড়াবার স্থান নাই! কিছু নাই! কেউ নাই—আমি নাই।

ক্ষণেকের জন্য মশায়কেও যেন তার ছোঁয়াচ লেগেছিল। গভীর স্বরে তিনি ডেকে উঠেছিলেন—পরমানন্দ মাধব হে। সেতাবও ছিল মশায়ের সঙ্গে। দাঁতু তারও পাঠশালার সহপাঠী। দেখতে গিয়েছিল। সেতাব মশায়ের হাতখানা চেপে ধরেছিল।

সেই অবধি জীবনের সময় ভালো চলেছে। উপার্জনও বেড়েছে। সেতাবের ধারণা, এই সীতা মেয়েটি এইসব দেখেশুনেই এমন করে আঁকড়ে ধরেছে মশায়কে, আলোকলতার মতো আকাশপথে এসে বুড়ো শালের মাথায় পড়ে তাকে ছেয়ে ফেলেছে, তার রস শোষণ করছে। এই কারণেই সেতাব সন্তুষ্ট নয়। সে বলে। আজও বললে—তবুও বলব জীবন, বাড়াবাড়ি লোকের চোখে ঠেকছে। কোথাকার কোন বংশের কী ধরনের মেয়ে, তার ঠিক নাই! আর তোর হল মশায়ের বংশ!

হেসে মশায় বললেন—মশায়ের বংশের অবস্থাটাও ওই মেয়েটির মতোই সেতাব। কী তফাত আছে বল? আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলেন।

কথা বন্ধ করে মশায় যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন—কে কাঁদছে নয়? সেতাব? কাঁদছে? হ্যাঁ। কার অসুখ ছিল? হ্যাঁ, কাঁদছেই তো!

মশায় উঠলেন। বললেন—ছক তোল সেতাব, একবার দেখি।

বৃদ্ধ সেতাব এসব বিষয়ে নিরাসক্তির কোটায় পৌঁছেছেন। তিনি আর একবার বললেন—কার কী হল? বলেই হুঁকোটা তুলে নিলেন।

—বোধ হয় মতি কর্মকারের বাড়িতে কারও কিছু হয়েছে। ওর মায়ের সেই ব্যাপার থেকে ওরাই শুধু আমাকে ডাকে না। কথায় কথায় হাসপাতালে ছোটে দেখি। অন্য কারও বাড়িতে অসুখ থাকলে অবশ্যই তিনি জানতেন।

মশায়ের তার জন্যে ক্ষোভ নাই। মতির উপর রাগ করেন না। তিনি জানেন—তাঁর চেয়ে কেউ ভালো জানে না যে, তারা যে তাঁকে ডাকে না, আসে না—

সেটা অবিশ্বাসের জন্য নয়। ডাকে না লজ্জায়। মতির মা তাঁর নিদান ব্যর্থ করে বেঁচেছে সেই লজ্জায় তাঁকে ডাকতে পারে না। মতি পর্যন্ত তাঁর সামনে আসে না। আড়াল দিয়ে হাঁটে। কিন্তু হল কী?

মশায় তাড়াতাড়ি জুতো পরে বেরিয়ে পড়লেন। খানিকটা গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। মতির মা-ই কি তবে গেল? না—।

কান্না মতির বাড়িতেই বটে। কিন্তু সকলের কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে উঠছে মতির মায়ের কণ্ঠস্বর। ওরে বাবারে। আমার একি সর্বনাশ হল রে। তোমাকে আমি ছাড়ব নারে। তুমি আমার নাতিকে বাঁচিয়ে দিয়ে যাও। নইলে কেন তুমি আমাকে বাঁচালে রে? মশায় দ্রুত হেঁটে গিয়ে মতির বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

এই মুহূর্তেই হাসপাতালের ডাক্তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। মশায়ের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হয়ে গেল। পিছনে পিছনে বাড়ি থেকে পাগলিনীর মতো বেরিয়ে এল মতির মা। খুঁড়িয়ে চলেও ছুটে এসে সে হাসপাতালের ডাক্তারের সামনে দাঁড়াল।—না-না-না। তুমি বাঁচিয়ে দিয়ে যাও। বাঁচিয়ে দিয়ে যাও। পায়ের উপর আছড়ে পড়ল সে, হাসপাতালের ডাক্তার দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। বললেন—ছাড়ো ছাড়ো, পথ ছাড়ো।

চীৎকার করে উঠল মতির মা—তবে আমাকেও মেরে দিয়ে যাও। বিষ দাও। মরণের ওষুধ দাও।

জীবনমশায় গম্ভীর স্বরে বললেন—মতির মা!

মতির মা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে নতুন করে বিলাপ শুরু করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু জীবনমশায় সেই গম্ভীর কণ্ঠেই বললেন—ওঠো, চুপ করো। সবেরই একটা সীমা আছে। কিন্তু হল কী? কার অসুখ করেছিল?

চীৎকার করেই মতির মা কী বলতে গেল। মশায় বললেন—এমন করে নয় মতির মা—এমন করে নয়। ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরে বলো!

এবার হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—মতির বড় ছেলেটি মারা গেল।

—আঃ, ছি! ছি! ছি! মশায় বলে উঠলেন। বারো-তেরো বছরের যে—পাথরে গড়া ছেলের মতো শক্ত ছিল!—কী হয়েছিল?

—বোধহয় ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। মাত্র দুদিন জ্বর। হঠাৎ হার্টফেল করলে। ডাক্তার বলছিলেন, কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়ে আবার মতির মা চীৎকার করে আর্তনাদ করে উঠল—ওরে আমার সদল-বদল ছেলে রে, অসুরের কাঁড়ি সেই ছেলে আমার—।

বুক চাপড়াতে লাগল—মাথা ঠুকতে লাগল।—ওরে তুমি আমাকে কেন বাঁচালে রে? কেন বাঁচালে রে?

হাসপাতালের ডাক্তার বিব্রত হয়ে উঠলেন। ওদিকে তাঁর সাইকেল পাংচার হয়ে গেছে। চারপাশে লোক জমেছে। মৃদু গুঞ্জনে তারা বলছে—কি রকম? রোগ তাকতেই পারে নাই না কি?

জীবনমশায় ডাকলেন—মতি!

মতি দুই হাতে মাথা ধরে বসে ছিল। এবার সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল—ডাক্তার জেঠা, আপনাকে দেখালে হয়তো আমার—

জীবনমশায় বাধা দিয়ে বললেন—না। আমাকে দেখালেই বাঁচত কে বললে? সংসারে ডাক্তার-বৈদ্যতে রোগ সারাতে পারে, মৃত্যুরোগ সারাতে পারে না বাবা।

মতির মা আবার চীৎকার করে উঠল।—আমি কী করব গো? আমাকে বলে দাও!

—কী করবে? সহ্য করবে। সংসারে যখন বহু সংসার হয় তখন মুক্তি নিতে হয়—নয় সইতে হয়। সংসারে মৃত্যু অবিরাম। বিরাম নাই। মৃত্যুর কাছে বালক বৃদ্ধ নাই। কী করবে? সইতে হবে?

—আমাকে বাঁচালে কেন গো? আমাকে বাঁচালে কেন?

—এই শোক তোমার কপালে ছিল বলে। তাছাড়া তুমি বাঁচতে চেয়েছিলে মতির মা।

কে একজন বলে উঠল—এ তো চিরকালের নিয়ম গো। সংসারে প্রবীণ মানুষ মৃত্যুশয্যা পেতে যদি উঠে বসে, তবে সে শয্যেতে আর কাউকে শুতে হবে। মাশুল দিতে হবে।

নীরবে জীবনমশায় অগ্রসর হলেন, তাঁর সঙ্গে হাসপাতালের ডাক্তার। হঠাৎ তিনি বললেন—এখানে ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া তো এখন নাই, আমি সন্দেহ করি নি। আমাকে বলেও নি। আজ বললে—কয়েকদিন আগে মামার বাড়ি গিয়েছিল। সেখান থেকেই এনেছে।

জীবন ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—রোগীর রোগ-বর্ণনায় ভুল, চিকিৎসকের ভ্রান্তি, ওষুধ অপ্রাপ্তি, এসব মৃত্যু-রোগের উপসর্গ না হোক—হেতু। নইলে চিকিৎসা বিজ্ঞান—আমাদের বলে আয়ুর্বেদ পঞ্চম-বেদ। বিজ্ঞান বেদ, এ তো মিথ্যা নয়। মিথ্যা এমনি করেই হয়। মৃত্যু আসে। অবশ্য একালে রোগপরীক্ষার উন্নতি আরও হবে। তখনকার কথা বলতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি, ভ্রান্তি মানুষের হবেই।

একটু চুপ করে থেকে প্রদ্যোত বললে—নাড়ী দেখে আপনি বুঝতে পারতেন ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া ?

—এ ক্ষেত্রে হয়তো পারতাম না। পারলেও বাঁচাতে পারতাম না।

—ওটা ঠিক কথা নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ অচিকিৎসায় অকালে মরেছে।

—হ্যাঁ তা মরছে।

এরপর দুজনেই নীরবে পথ হাঁটতে লাগলেন। মশায় ভাবছিলেন ডাক্তারের কথাই। মরে অকালে, অচিকিৎসায় অনেক লোক মরে। এ স্বীকার আজ করতেই হবে।

হঠাৎ হাসপাতালের ডাক্তার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, কিন্তু মতির মাকে আজ আপনি যে কথাগুলি বললেন সে আমার বড় ভালো লাগল। ঠিক কথা মশায়, জীবনে যখন সময় আসে তখন মুক্তি নিতে হয়। আমার শাশুড়ীর দিদিমা আছেন। তিন কূলের সব গিয়েছে, কেবল তিনি আছেন। আমি গেলেই তিনি বলেন, তুমি তো ডাক্তার! আমার কান আর চোখ দুটো সারিয়ে দাও তো। এই মতির মা! আপনি ওকে যা বলেছিলেন—অপারেশন না হলে তাই হত। মরত বুড়ী। কিন্তু আপনি ওকে গঙ্গা-তীরে যেতে বলায় ওর সে কী কান্না তখন! আমার পায়ে ধরে বলে আমাকে বাঁচান। এ রোগে আমি মরতে পারব না। এ অপঘাত মৃত্যু। এতে মরে আমি শান্তি পাব না। আমার গতি হবে না।

—ওটা ছলনা ডাক্তারবাবু। মানুষ যেখানে অতি মায়ায় অতি মোহে বদ্ধ হয়, মৃত্যুভয়ে কাতর হয়, তখন নানা ছুতোয় বলে—আমি এই জন্যে বাঁচতে চাই, বাঁচাও আমাকে। মৃত্যুভয় যে মানুষের একটা বড় লজ্জা! তাই ঢাকে।

—ঠিক বলেছেন, এমনি কথাই আমাকে বলেছিল মতির মা। বলেছিল—আর সাধ আমার একটি আছে। বড় নাতির বউ দেখতে সাধ আছে।

মশায় একটু হাসলেন—মতির মা আবারও অসুখ করলে নতুন সাধের কথা বলে বাঁচবে। কিন্তু ছেলেটার যাওয়া বড় মর্মান্তিক। বড় সবল স্বাস্থ্য ছিল ছেলেটার! একজন বলশালী লোক হত। ইস্কুলে পড়ত; বাপের কামারশালে বাপকে সাহায্য করত; হাতুড়ি পিটত। ওকে দেখলেই মনে পড়ত মঙ্গলকাব্যের বালক কালকেতুকে।

অকালমৃত্যুর চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছু নাই। একে রোধ করাই এ সংসারে সবচেয়ে বড় কল্যাণ। সবচেয়ে সুখের। মৃত্যু এইখানেই মৃত্যু, বৃদ্ধ বয়সে সে অমৃত!

হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—আজকের কথা চিরদিন মনে থাকবে আমার। আমি বড় বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম।

—না—না—না। আপনি কেন বিব্রত হবেন? আপনি তো চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। আপনি কী করবেন?

হাসপাতালের সামনে এসে পড়েছিলেন তাঁরা। ডাক্তারের চাকর ভিতর থেকে ছুটে এসে ফটকটি খুলে দিলে। ডাক্তারের স্ত্রী বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে। বোধ করি সবিস্ময়ে দেখছে। দূরে হাতপাতালের কাছাকাছি ছোট কোয়ার্টারটির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সীতা। সেও দেখছে।

ডাক্তার আহ্বান জানালে—আসুন। একটু বসবেন না? অনেকবারই এসেছেন হাসপাতালে, এখনও আসেন; কদ্রুকে দেখে যান। আমি কখনও ডাকি নি, একটু বসবেন না আজ আমার বাসায়?

মশায় হাত জোড় করে বললেন—আজ নয় ডাক্তারবাবু। আসব অন্যদিন।

প্রদ্যোত একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বললে—আপনার কাছে হয়তো আমায় ত্রুটি হয়ে থাকবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সে আমি ইচ্ছে করে করি নি। আপনার চিকিৎসাপদ্ধতি আর আমার পদ্ধতিতে অনেক প্রভেদ। আমার মত ছেড়ে আপনার মতে আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। তাতে আমাকে বিব্রত হতে হয়। আমার চিকিৎসা করা চলে না। তবে হ্যাঁ—মতির মায়ের নিদান হাঁকার কথা শুনে আর ওর সেই কান্না দেখে আমার রাগ হয়েছিল। আজ অবশ্য দেখলাম—মতির মা মরলেই ওর পক্ষে ভালো হত। কিন্তু আমরা তো ঠিক ওই চোখে দেখি না।

হেসে মশায় বললেন—জানি। আমরা সেকালে ওই চোখেই দেখতাম। বিশেষ করে পরিণত বয়সের রোগী হলে, আর রোগ কঠিন হলে রোগের যন্ত্রণা উপশমের চেষ্টাই করতাম, মৃত্যুর সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম না। বলে দিতাম, ইঙ্গিতেও বলতাম, স্পষ্ট করে বলতাম, আর কেন? অনেক দেখলে, অনেক ভোগ করলে, এইবার মাটির সংসার থেকে চোখ ফিরিয়ে উপরের দিকে তাকাও। সাধারণ মানুষ আকাশের নীলের মধ্যে তো ধরবার কিছু পায় না, তাই বলতাম তীর্থস্থলে যাও, সেখানকার দেবতার মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকিয়ে বসে থাক। তবে অবশ্য যে প্রবীণ, যে বৃদ্ধ বয়সেও বহুজনের আশ্রয়, বহুকর্মের কর্মী, তাকে আর বাঁচাতে মরণের সঙ্গে লড়ি নি? লড়েছি।

প্রদ্যোত ডাক্তার বললে—অন্যদিন হলে তর্ক করতাম। আজ করব না। আমার নিজেরই দিদিশাশুড়ীর কথা বললাম। আমরাই বলি, বুড়ী গেলেই খালাস পায়। সেও পায়—হয়তো আমরাও পাই।

মশায় বললেন—তা হয় বৈ কি। ওটা আবার সংসারের আর একদিক। সুস্থ জীবন—রঙে রসে ভরপুর জীবন জীর্ণ বস্তুকে সহ্য করবে কেমন করে?

প্রদ্যোত বললে—কয়েকটা কেসেই আমি আপনাকে হাত দেখতে দিই নি। আমার ভয় হত, আপনি কী পাবেন—কী বলে দেবেন। আপনার হাত দেখাকে আমার সময় সময় ভয় লাগে। বিশেষ করে অহি সরকারের নাতির অসুখে।

—ও আপনি অদ্ভুত বাঁচিয়েছেন। অদ্ভুত চিকিৎসা করেছেন। আমি প্রথম নাড়ীতে মৃত্যুর যেন পায়ের সাড়া পেয়েছিলাম। আমি বারবার হাত দেখেছিলাম কেন জানেন? মৃত্যুকে পিছন হঠে চলে যেতে দেখলাম!

অবাক হয়ে প্রদ্যোত তাকিয়ে রইল মশায়ের মুখের দিকে। কথাটা সে জানে না নয়—কিন্তু সে কথাকে এইভাবে সে প্রকাশ করত না, এমন করে সে অনুভব করে না।

—আজ চলি তা হলে।

—আর একটা কথা। রানা পাঠকের কথা।

—রানা বাঁচবে না ডাক্তারবাবু। রানা সে কথা জানে। সে এক অদ্ভুত মানুষ। সে তো ভয় করে না মরতে। আপনাদের এখনকার অদ্ভুত চিকিৎসায় বাঁচতে পারত। কিন্তু সে বলে কী জানেন—ভালো হলেও সে-আমি আর হব না। অক্ষমের শামিল হয়ে বাঁচতে হবে, লোকে ভয়ে পাশে বসবে না। ছেলেপিলে ভয় করবে। সে বাঁচা বাঁচতে এত কষ্ট, এত খরচ করব কেন? তার চেয়ে যা-হয় আপনি করুন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন—আর তো রানা আমাকেও দেখায় না! ওষুধপত্র সব ছেড়ে দিয়েছে সে। এখন দেবস্থানের ওষুধ খাচ্ছে।

মশায় ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফিরলেন। রানাকে যদি বাঁচাতে পারতেন।

রানাকে সারাতে পারত প্রদ্যোতরা। হ্যাঁ, পারত। তাঁদের চিকিৎসাও ছিল —কিন্তু সে চিকিৎসার তাঁর আয়োজন নাই। আর এতখানি শক্তিও ছিল না; না—ছিল না।

এ চিকিৎসা-শাস্ত্র বিপুল গতিবেগে এগিয়ে চলেছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র খুলে দিয়েছে দিব্যদৃষ্টি। বীজাণুর পর বীজাণু আবিষ্কৃত হচ্ছে। রোগোৎপত্তির ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আজ সবই প্রায় আগন্তুক ব্যাধির পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেল! সবের মূলেই বীজাণু। বীজাণু, জীবাণু, কৃমিজাতীয় সূক্ষ্মকীট— তারপরে আছে ভাইরাস। খাদ্যে জলে বাতাসে তাদের সঞ্চরণ। মানুষের দেহে

তাদের প্রবল বিস্তার। তাঁদের শাস্ত্রে পড়েছিলেন--দক্ষযজ্ঞে রুদ্রমূর্তি শিবের ক্রোধ নিঃশেষে হয়েছিল জ্বরের সৃষ্টি ; নানান আকার, নানা প্রকার ; আচার্যেরা তাদের প্রকৃতি নির্ণয় করে নামকরণ করেছিলেন। চন্দ্র দেবতার উপর দক্ষ প্রজাপতির অভিশাপ থেকে যক্ষ্মার উৎপত্তি হয়েছিল। অতিরমণ দোষই যক্ষার আক্রমণের বড় কারণ বলে ধরতেন। আজ, খাদ্যাভাব যক্ষ্মার প্রধান কারণ। প্রতিটি জ্বরের কারণ আজ ওরা অণুবীক্ষণে প্রত্যক্ষ করছে। কত নূতন জ্বর! এই তো কালাজ্বর ধরা পড়ল তাঁর আমলেই।

কালাজ্বরের ওষুধ ব্রহ্মচারী সাহেবের ইনজেকশন। প্রন্টুসিল, সালফাগ্রুপ, তারপর পেনিসিলিন, টেরামাইসিন, ওষুধের পর নতুন ওষুধ। শুনছিলেন সেদিন হরেনের কাছে। পেনিসিলিন চোখে দেখেছেন। বাকিগুলি দেখেন নি। আরও কত ওষুধ বেরিয়েছে—তিনি হয়তো শোনেন নি। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি দিয়ে চিকিৎসা।

রক্ত, পুঁজ-থুথু, মল-মূত্র, চামড়া-পরীক্ষা।

ব্লাডপ্রেসার পরীক্ষা।

এক্স-রে পরীক্ষা। যক্ষ্মায় আক্রান্ত শ্বাসযন্ত্র চোখে দেখা যায়। তেমনি ওষুধ।

টি-বিতে স্ট্রেপ্টোমাইসিন শক্তিশালী ওষুধ! স্ট্রেপ্টোমাইসিন ছাড়াও পি-এ-এস বলে একটা ওষুধ বেরিয়েছে বলে শুনেছেন। দুটোর একসঙ্গে ব্যবহারে না কি আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। এ ছাড়া—অস্ত্র-চিকিৎসার কথা শুনেছেন।

অকস্মাৎ একটা পুরনো কথা মনে পড়ে গেল।

গুরু রঙলালের কাছে কলেরার প্রেসক্রিপশন আনতে গিয়ে—মৃত্যুভয়ত্রস্ত মানুষদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন—মৃত্যু যেন দু-হাত বাড়িয়ে উন্মাদিনীর মতো ভয়ঙ্করী মূর্তিতে তাড়া করে ছুটেছে ; মানুষ পালাচ্ছে ; আগুনলাগা বনের পশুর মতো দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটেছে।

রঙলাল ডাক্তার বলেছিলেন—শুধু পালানোটাই চোখে পড়ছে তোমার ; মানুষ তার সঙ্গে অবিরাম লড়াই করছে দেখছ না? পিছু হঠেই আসছে সে চিরকাল—কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে আসে নি। নূতন নূতন অস্ত্রকে উদ্ভাবন করছে, আবিষ্কার করছে। সে চেষ্টার তো বিরাম নাই তার। মৃত্যুকে রোধ করা যাবে না, মৃত্যু থাকবেই। কিন্তু রোগ নিবারণ সে করবেই। পরিণত বয়সে যোগীর মতো মানুষ দেহত্যাগ করবে। চিকিৎসকের কাছে এসেই বলবে—আর না ; ছুটি চাই। ঘুমুতে চাই। পুট মী টু স্লীপ প্লীজ!

জীবন সেদিন মনে মনে বলেছিল—হ্যাঁ। নিদ্রা নয়, মহানিদ্রা।

ছত্রিশ

অপ্রত্যাশিত না হলেও সংবাদটা এল যেন হঠাৎ। আরও মাস খানেক পর। বৈশাখের শেষ সপ্তাহে।

রানা পাঠক মরেছে।

সংবাদটা নিয়ে এল কিশোর। কিশোর গিয়েছিল সেখানে। রানাই তাকে সংবাদ পাঠিয়েছিল। নবগ্রামের জেলেরা গিয়েছিল নদীতে মাছ ধরতে, তাদেরই একজনকে বলেছিল—কিশোরবাবুকে একবার আসবার জন্যে বলিস। আমি বোধ হয় আর দু-একদিন আছি, বুঝলি!

শেষ কিছুদিন রানা গ্রাম ছেড়ে নদীর ঘাটে একখানা কুঁড়ে তৈরি করে সেইখানেই থাকত। নদীর ঘাট, নদীর জলকর তার ইজারা নেওয়া ছিল। নদীর ঘাটটি তার অত্যন্ত প্রিয় স্থানও ছিল। ওই নদীর ঘাটেই সে জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ উল্লাস ভোগ করেছে। নদীতে ঝাঁপ খেয়ে পড়ে সাঁতার কেটেছে, রাত্রে খেয়াঘাটের চালায় অথবা নৌকায় বসে মদ্যপান করেছে, নারী নিয়ে উল্লাস করেছে, খাওয়া-দাওয়া অনেক কিছু করেছে। আবার বসে মোটা গলায় প্রাণ খুলে কালীনাম করেছে। ইদানীং সে সন্ন্যাসী হয়েছিল। ওখানে সন্ন্যাসীর মতোই বাস করত। গেরুয়া কাপড় পরত, দাড়ি-গোঁফ রেখেছিল, খুব আচারেই থাকত। দেবস্থানের ওষুধই ব্যবহার করত। কিন্তু রানার গোঁড়ামি, রানার বিশ্বাস অদ্ভুত। ওকে টলানো যায় না। মৃত্যুশয্যাতেও স্বীকার করে নাই। বলেছে, এই আমার অদৃষ্ট, তার দেবতা কী করবে?

কিশোরকেই বলেছে। কিশোর যখন পৌঁছেছিল, তখন তার শেষ অবস্থা! ঘণ্টা ছয়েক বেঁচেছিল। কিশোর ডাক্তার-বৈদ্য ডাকতে চেয়েছিল—তারই উত্তরে ওই কথা বলে বলেছিল, ডাক্তার-বদ্যির জন্যে তোমাকে ডাকি নাই কিশোরবাবু। শোনো, তোমাকে যার জন্যে ডেকেছি। মনে হচ্ছে, আজই হয়তো মরব। বড় জোর কাল। এখন রাত্রে একজন লোক চাই, কাছে থাকবে। জল চাইলে জল দেবে আর এই শেয়াল এলে তাড়াবে। বুঝেছ, নদীর ধারের মড়াখেকো শেয়াল তো, বেটারা ভারি হিংস্র। আজ দিন দু-তিন থেকে ওরা আশেপাশে ঘুরছে রাত্রে। তক্তাতে লাঠি ঠুকে, ধমক দিয়ে কালও তাড়িয়েছি। আজ আর পারব না। তা ছাড়া—।

বলতে গিয়ে থেমে রানা একটু হেসেছিল। হেসে বলেছিল—মরণের আগে

সব আসে তো। ভয় রানা পাবে না। তা পাবে না। ক্ষমতা থাকলে বলতাম —আয়রে বাবা, লড়ি এক হাত। তা ক্ষমতা নাই। একজন লোক থাকলে ভালো হয়। এই এক নম্বর। দু নম্বর হল—মরে গেলে দেহটার একটা ব্যবস্থা চাই। গাঁয়ের লোক ভয়ে যক্ষ্মারোগীর দেহ ছোঁবে না। তার একটা ব্যবস্থা কোরো। তিন নম্বর হল, ছেলে-মেয়ে। মা-মরা ছেলে—বাবাও যাবে। তুমি এখানকার ভালো লোক, ক্ষমতাও রাখ, পার তো ওদের দেখো একটু। আর চার নম্বর হল—মশায় আমার কাছে চিকিৎসার দরুন কিছু পাবে। তা মশায়কে বোলো—ওটা আমাকে মাফ দিতে। ব্যস।

বিনয়ের দোকানে বসে শুনলেন মশায়। শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। দু ফোঁটা জল তাঁর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে; দীর্ঘ দাড়ির মধ্যে পড়ে হারিয়ে গেল শিবের জটার গঙ্গার মতো। অনেকক্ষণ পর তিনি ডেকে উঠলেন —গোবিন্দ! গোবিন্দ!

ডাক শুনেই মশায় বুঝতে পারলেন—মরি বোষ্টুমী এসেছে। কিন্তু এই অবেলায়? মরি সাধারণত আসে সকালে; ভিক্ষেয় বের হয়ে তাঁর বাড়িতে আরোগ্য-নিকেতনে এসে অভয়ার পাঠানো প্রসাদী মিষ্টান্ন তাঁকে দিয়ে ভিক্ষায় বেরিয়ে যায়। অবেলায় এই সন্ধ্যায় বিনয়ের দোকানে সে কোথা থেকে এল? অভয়ার কি আবার অসুখ করেছে? রানার শেষকৃত্য করে ক্লান্ত কিশোর ওপাশের চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে গিয়েছে। মশায় নির্জন অবসরে নিজের নাড়ী ধরে বসে ছিলেন। ওটা একটা অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গিয়েছে। মরির কণ্ঠস্বর শুনে তিনি হাত ছেড়ে দিয়ে ডাকলেন—মরি!

—প্রণাম বাবা!

—তুই এই অসময়ে?

মরি হেসে বললে—আজ ফিরবার পথে বাবা। ঝুলি থেকে পাঁচটি আম বের করে নামিয়ে দিলে।

হেসে বললে—মায়ের গাছের আম প্রথম পেকেছে। মা-কালীর জন্যে 'সন্ধাগে' কটি তুলে রেখে পাঁচটি আপনার তরে দিয়ে বললে—দিয়ে এসো মরি। তা আজ আবার আমাদের গুপীনাথপুরে আখড়াতে অষ্টপ্রহরের ধুলোট ছিল। বৈষ্ণবসেবার রান্নাবান্নার কাজ করে হাত ধন্যি করতে গিয়েছিলাম। ফল জিনিস তো 'দিবসের' মধ্যে নষ্ট হবে না; বরং মজে মিষ্ট হবে, খাবার উপযুক্ত হবে।

বোষ্টুমী মরিদের কথাবার্তার এই ধরনটি আজ বিরল হয়ে এসেছে; কথার ও

কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা মাধুর্য চিরকালই দুর্লভ ; মরির মধ্যে দুই-ই আছে ; মশায় ভারি তৃপ্তি পান।

মরি বললে—সেখানু থেকেই ফিরছি। সায়ংকালে আজকাল আপনি এইখানে অধিষ্ঠান করেন আমি জানি তো! তাই এইখানে দিয়ে গেলাম।

আঁটির গাছের দেশী আম। কিন্তু শ্রদ্ধার ও কৃতজ্ঞতার মিষ্টতায় ও মাধুর্যে অমৃতফল। মুহূর্ত-পূর্বের বৈরাগ্য-গৈরিক উদাসীন পৃথিবী যেন এক মুহূর্তে গাঢ় মমতার সবুজে কোমল হয়ে উঠল।

মরি বললে—আর-একটি কথা বলেছেন মা।

—কী কথা?

—এই জৈষ্ঠি মাসে মায়ের সাবিত্রী চতুকদশীর ব্রেতো। সেদিন আপনাকে নেমতন্ন করেছে।

মনে পড়ে গেল, শশাঙ্কের মৃত্যু ধ্রুব জেনে তিনি অভয়াকে নিমন্ত্রণ করে পরিপাটি করে আমিষ খাওয়াতে চেয়েছিলেন। মনে পড়ল, গলির মুখে প্রদীপ হাতে ধরে দাঁড়ানো অভয়ার সেই ছবি ; আলোর ছটা পড়েছে সিঁথির সিঁদুরের উপর, চোখের তারা দুটির মধ্যে ভাসছে তার প্রতিবিম্ব! শিউরে উঠলেন মশায়! চোখ বুজলেন তিনি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সাবিত্রী চতুর্দশীর ব্রতের খাওয়ান রাত্রে। এই বুড়ো বয়সে রাত্রে তো যেতে পারব না মরি!

মরি বললে—সেকথা আমি বলেছিলাম বাবামশায়। তা অভয়া মা বললে—তা তো বুঝি মরি, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে হয়। তুই বলে একবার দেখিস! আর একটি কথা বলেছে!

—বলো।

—কিছু মাছের জন্যে বলেছেন। এবারে ওদের পুকুরে মাছ একেবারে নাই।

মশায় খুশী হয়ে উঠলেন—মাছ! মাছ চেয়েছে অভয়া? তা দেব। পাঠিয়ে দেব।

—আম কটি কিন্তু খাবেন বাবা!

—নিশ্চয় খাব।

পৃথিবীকে মধুর করে দিয়ে চলে গেল মরি।

আবার তিনি ডাকলেন মরিকে—মরি। ওরে মরি!

—বাবা! ফিরল মরি।

—বলিস আমি যাব। সাবিত্রীব্রতে যাব। চলে যাব, ইন্দিরকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাব।

পৃথিবীতে আজ সব সঙ্কোচ ঘুচে গিয়েছে, সব তিক্ততা মুছে গিয়েছে। তিনি যাবেন।

* * *

মনের মধ্যে গান গুনগুন করছিল। নাম গান। রাত বেশ হয়েছে। নবগ্রামের লেনদেনের বাজারের আলোগুলোও ঝিমিয়ে পড়েছে। লণ্ঠনের কাচে কালি পড়েছে, পলতেতে মামড়ি জলেছে। শিখাগুলো কোনোটা দুভাগ হয়ে জলছে, কোনোটার একটা কোণ ধোঁয়াটে শিখা তুলে লম্বা হয়ে উঠেছে। ডেলাইট পেট্রোম্যাক্সগুলোরও সেই দশা, ম্যান্টেল লালচে হয়েছে, খানিকটা বা কালো, কোনোটা বা মধ্যে মধ্যে দপদপ করছে! অধিকাংশ ক্যাশবাক্সে চাবি পড়েছে; বাক্সের উপর খেরোবাঁধা খাতাগুলো থাকবন্দী সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কেউ কেউ জল ছিটিয়ে ধুনো দিচ্ছে, তালাচাবি হাতে লোক দাঁড়িয়ে আছে, দোকান বন্ধ করবে। ধ্বজু দত্তের বড় দোকান—ওখানে এখনো থাকবন্দী সিকি-আধুলি সাজানো রয়েছে, নোটের থাক গুনতি হচ্ছে। দোকানটার পাশে একটা খোলা জায়গায় খানকয়েক গোরুর গাড়ি আঁট লাগিয়েছে, গাড়ির তলায় খড় বিছিয়ে বিছানা পেতেছে। চৌমাথার মোড়ে চায়ের দোকানটায় এখনও জন চারেক আড্ডা জমাতে বসে আছে। ওপাশে সাধুখাঁদের নূতন একতলা বাড়িটার বারান্দায় চারুবাবু আর প্রদ্যোত বসে রয়েছে। এইটেই ডাক্তারদের কো-অপারেটিভ মেডিক্যাল স্টোর্স। এদের হ্যাজাক-আলো নতুন, এখনও সমান তেজে জলছে।

প্রদ্যোত ডাক্তার কবে ফিরল?

সেই মতির ছেলের মৃত্যুর পর প্রদ্যোত হঠাৎ ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক কলকাতা চলে গিয়েছিল। লোকে গুজব করেছিল—"প্রদ্যোত ডাক্তার মতির ছেলের মৃত্যুর ওই ব্যাপারটায় মনে মনে খুব ঘা খেয়েছে। সেই লজ্জায় এখান থেকে ট্রান্সফারের জন্য চেষ্টা করতে ছুটি নিয়ে কলকাতা চলে গেল।"

সীতা বলেছিলেন—না। উনি কলকাতায় গেলেন এখানকার ক্লিনিকের জন্যে। বিপিনবাবু পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গেলেন, ওই টাকাটা গভর্নমেন্টের হাতে দিয়ে, আরও কিছু স্যাংশন করিয়ে যাতে তাড়াতাড়ি হয় তারই চেষ্টা করতে গিয়েছেন। কলকাতার অ্যাসেম্বলির কোনো মেম্বারকে ধরে চীফ মিনিস্টার ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করবেন। বলে গেছেন—অন্তত যে টাকাটা হাতে পেয়েছেন তা দিয়ে যতটুকু হয়—সে সব কিনে তিনি ফিরবেন।

প্রদ্যোত ডাক্তার শক্ত লোক; তা হলে সে যন্ত্রপাতি নিয়েই ফিরেছে।

সীতা আরও বলেছিল—তবে ডাক্তারবাবু 'মনমরা' একটু হয়েছেন বটে।

আপনাকে উনি মুখে যাই বলে থাকুন—মনে মনে আপনার ওপর বেশ চটেছেন।

তাই কি? সে কথা মশায়ের ঠিক মনে হয় না। সীতার কথায় কঠিন প্রতিবাদ করতে পারেন নি কিন্তু মিষ্টি মৃদু প্রতিবাদ করেছেন। বলছেন—না—না। তুমি ভাই, ভুল করেছ।

সীতা ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ করেছে—উহুঁ। ভদ্রলোককে আপনি ঠিক জানেন না দাদু। একটি কথা ভুলে যান না উনি। আর অত্যন্ত 'হামবড়া' লোক! এখানকার কোনো ডাক্তারকেই ভালো বলেন না উনি। আপনাকে আমি দাদু বলি, আপনার বাড়ি আসি বলে আমার উপরেও মনে মনে চটা।

দুঃখ পেয়েছিলেন শুনে।

একটি অতি সাধারণ মেয়ে—তার জীবনের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ, শুধু কৃতজ্ঞ এইটুকু মাত্র। এর জন্যে রাগ? সামান্য মানুষ! তার কৃতজ্ঞতা—তার প্রশংসা—তার কতটুকু মূল্য? তবে বিচিত্র! কতকাল আগে ওর নিতান্ত শৈশবে মেয়েটিকে বাঁচিয়েছিলেন। সে কথা তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছিলেন। মনে করিয়ে দিয়েছিল ওই মেয়েটিই।

উনিশশো তিরিশ সাল। এখানকার সবরেজেষ্ট্রি আপিসে এসেছিল এক হেড-ক্লার্ক। রামলোচন সরকার। একমাত্র বিধবা মেয়ে, স্ত্রী আর বিধবা মেয়ের কোলে একটি শিশু মেয়ে নিয়ে এসে মশায়দের গ্রামেই বাসা নিয়েছিল। এখানে ছিল মাত্র মাস আষ্টেক। ওর মা—সরকারের বিধবা মেয়েটির খুব অসুখ নিয়েই এসেছিল। বাঁচবে বলে কেউ আশা করে নি, মশায়ই চিকিৎসা করে বাঁচিয়েছিলেন। এ মেয়েটি তখন কঙ্কালসার শিশু। একত্রিশ সালের আশ্বিনে যে মারাত্মক ম্যালেরিয়ায় শিশুমড়ক হয়েছিল সেই ম্যালেরিয়ায় এ মেয়েটিও যায়-যায় হয়, তাকেও তিনিই নাকি বাঁচিয়েছিলেন। সেদিন বাড়িতে এসে পরিচয় দিয়ে ও যখন এসব কথা বললে তখনও তিনি চিনতে পারেন নি—চিনেছিলেন আতর-বউ। বললেন—সেই হাড়জিরজিরে মেয়েটা তুই? এমন হয়েছিস? আমি যে তোকে কত কোলে করে তেল মাখিয়ে রোদে ভেজেছি। তখন তাঁর ধীরে ধীরে মনে পড়ছিল। অত্যন্ত মধুর মনে হয়েছিল। অকস্মাৎ যেন রৌদ্রদগ্ধ আকাশ থেকে একবিন্দু মধু ছিটিয়ে দিয়েছিলেন বিধাতা। পৃথিবীতে এ দুর্লভ কিন্তু মূল্য তো এর কিছু নাই! মধ্যে মধ্যে মনে হয় চিকিৎসক-জীবনে নিদান হাঁকার পাওনা বিধাতা মিটিয়েছেন—শশাঙ্কের বউয়ের অভিশাপে, আর মানুষ বাঁচানোর পাওনা মিটিয়েছেন এই সীতা মেয়েটির কৃতজ্ঞতায়। মেয়েটার জ্ঞানও ছিল না তখন, মায়ের কাছে শুনে মনে রেখেছে।

—মশায় নাকি ?

আলোকোজ্জ্বল চৌমাথাটায় আত্মগোপন করে যাওয়া যায় না। চারুবাবু ডাক্তার দেখতে পেয়েছেন। দাঁড়াতে হল। মশায় ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—হ্যাঁ। বসে আছেন? তারপর প্রদ্যোতবাবু, কবে ফিরলেন ? নমস্কার !

প্রতিনমস্কার করে প্রদ্যোত বললে—আজ চার দিন হয়ে গেল।

—চার দিন ? তা হবে। আজ কয়েক দিনই সীতা আসে নি। দেখা হয়নি।

—একবার আসুন গো এখানে। আপনার জন্যেই আমরা বসে আছি। ডাকলেন চারুবাবু।

—আমার জন্যে ?

শঙ্কিত হলেন মশায়। আবার কোন অভিযোগ? কী হল? কী করেছেন তিনি? মনের মধ্যে অনেক সন্ধান করলেন। কই কারুর নিদান তো তিনি হাঁকেন নি। তবে কি রানার কথা? এঁরা কি বলবেন যে তিনি আশা দেন নি বলেই হতাশাতে রানা দেবস্থলে চিকিৎসার নামে অচিকিৎসায় মারা গেল? অথবা বলবেন—দেবস্থলে যেতে তিনিই তাকে উৎসাহিত করেছিলেন ?

চারুবাবু বললেন—প্রদ্যোতবাবুর স্ত্রীর জ্বর। একবার দেখতে হবে।

—প্রদ্যোতবাবুর স্ত্রীর জ্বর, আমাকে দেখতে হবে ?

—হ্যাঁ। কলকাতা থেকেই জ্বর নিয়ে এসেছেন। জ্বরটা যেন কেমন লাগছে—। এন্টারিক তো বটেই। টাইফয়েডের লক্ষণ রয়েছে। আর চার-দিন না গেলে তো রক্তপরীক্ষায় ধরা পড়বে না! আপনি একবার নাড়ীটা দেখুন। টাইফয়েড হলে খুব ভিরুলেন্ট টাইপ; চারদিন আজ, ফার্স্ট উইক—এরই মধ্যে জ্বর তিন ছাড়াচ্ছে। প্রদ্যোতবাবু আমাকে ডেকেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে বলতে আমি পারব না। আপনি পারেন। নাড়ী দেখে আপনি পারেন—সে আমি উঁচু গলা করে বলি। ওঁকেও বলেছি। প্রদ্যোতকে দেখিয়ে দিলেন চারুবাবু।

এতক্ষণে প্রদ্যোত কথা বললে—ডায়োগনসিস আপনার অদ্ভুত। আপনি শুধু বলে দেবেন টাইফয়েড কি না!

একটু হেসে মুখ তুলে ওদের দিকে তাকালেন, এতক্ষণ মাটির দিকেই তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। মুখ তুলে প্রদ্যোতের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন —চলুন।

লাবণ্যবতী দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি নেতিয়ে পড়েছে। মুখখানি জ্বরোত্তাপে ঈষৎ রক্তাভ এবং ভারী হয়ে উঠেছে। ভ্রমরের মতো কোঁকড়ানো রুক্ষ চুল বালিশের

নীচে খোলা রয়েছে, কপালের উপর কতকগুলি উড়ছে। কপালে জলের পটি রয়েছে। চোখ বুজে শুয়ে আছে। স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। ঘরে একটি বিচিত্র গন্ধ উঠছে। ধূপকাঠি, অডিকোলন, ফিনাইল, ওষুধ—এই সবের একটা মিশ্রিত গন্ধ। মাথার শিয়রে বসে রয়েছে নার্স। সীতা! হ্যাঁ, সীতাই বসে রয়েছে।

বাবা তাঁর নাড়ী-পরীক্ষা বিদ্যার গুরু। তাঁকে স্মরণ করে তিনি মেয়েটির হাতখানি তুলে নিলেন। সেখানি রেখে আর একখানি। সেখানিও পরীক্ষা করে রেখে দিলেন। জ্বর অনেকটা—সাড়ে তিনের বেশী মনে হচ্ছে। চারের কাছে।

সীতা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রতীক্ষা করছে কী বলবেন। প্রদ্যোত ডাক্তার স্ত্রীর মাথার কাছে ঝুঁকে মৃদুস্বরে সস্নেহে ডাকলেন—মঞ্জু।

ভুরু দুটি ঈষৎ উপরের দিকে তুলে চোখ বুজে মেয়েটি সাড়া দিল—উঁ।

—এখানকার জীবনমশায় এসেছেন তোমাকে দেখতে।

মেয়েটি চোখ খুললে, বড় বড় দুটি চোখ, এদিক থেকে ওদিক চোখ বুলিয়ে মশায়কে দেখে আবার চোখ বন্ধ করলে।

প্রদ্যোত ডাক্তার বললেন—তোমার জিভটা দেখাও তো!

মেয়েটি জিভ দেখালে।

চারুবাবু সীতাকে বললেন—থার্মোমিটার দাও।

জীবনমশায় বললেন—থাক। এর আগে কত ছিল?

ডাক্তার একখানা খাতা এনে চোখের সামনে ধরলেন। একশো তিন পয়েণ্ট চার।

মশায় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন—আর কিছু বেড়েছে। আধ ডিগ্রী।

প্রদ্যোত এসে তাঁর কাছে দাঁড়াল, মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে—টাইফয়েড?

জীবনমশায় একটু দ্বিধা করলেন। বললেন—আজ ঠিক বলতে পারব না। কাল সকালে দেখে বলব। আজ আমার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে।

—কিন্তু আমি যে ক্লোরোমাইসেটিন দেবো ভাবছি। প্রথম সপ্তাহে জ্বর—বলেই ঘরের দিকে ফিরে বললেন—সীতা, কত দেখলে জ্বর?

সীতা থার্মোমিটার হাতে বেরিয়ে এল, প্রদ্যোত ডাক্তারের হাতে দিয়ে নীরবেই চলে গেল। কিন্তু একটি স্মিতহাস্যে মুখখানি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কারণ থার্মোমিটারে কালো দাগটি একশো চারের দাগের এক সুতো পিছনে এসে থেমে রয়েছে। প্রদ্যোত ডাক্তার দেখে বললে—চারই বটে।

জীবনমশায় বললেন—আর আজ বাড়বে না। আমি কাল সকালেই আসব।

—আমি ক্লোরোমাইসেটিন আনিয়েছি! আজ দিতে পারলে—

—কাল। কাল সকালে। এ রোগে আট ঘণ্টায় কিছু যাবে আসবে না। আর—হাসলেন জীবনমশায়।—রাগ করবেন না তো?

—না। বলুন।

—আপনি উতলা হয়েছেন। আপনার চিকিৎসা করা তো উচিত হবে না।

—নাঃ! আমি ঠিক আছি। আর আমি তো চিকিৎসা করছি না। চারুবাবু চিকিৎসা করছেন।

* * *

পরদিন সকালে জীবনমশায় নাড়ী ধরে দীর্ঘ সময় প্রায় ধ্যানস্থের মতো বসে রইলেন।

সকালবেলা। প্রসন্ন সূর্যালোকে ঘর ভরে উঠেছে। দরজা জানালা খোলা, ঘরখানিকে ইতিমধ্যেই জীবাণুনাশক ওষুধ-মেশানো জল দিয়ে ধুয়ে মুছে ফেলা হয়েছে। এক কোণে ধূপকাঠি জ্বলছে। বিছানা চাদর পরিচ্ছন্ন। খাটের পাশে টি-পয়ের ওপর ওষুধের শিশি, ফীডিং কাপ, কয়েকটা কমলালেবু, টেম্পারেচার চার্ট। রোগিণী এখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ। জ্বর কমেছে। ঠোঁট দুটি শুকিয়ে রয়েছে। আচ্ছন্ন ভাবটা কম। তবু চোখ বুঁজেই রয়েছে। মধ্যে মধ্যে মেলছে, কিন্তু আবার নেমে পড়ছে চোখের পাতা। কপালে এখন জলের পটি নাই, কপাল মুখ রক্তাভ শুষ্ক। পরিপূর্ণ আলোর প্রসন্নতা এবং বৈশাখের প্রভাতের স্নিগ্ধতার মধ্যেও রোগিণীর যেন স্বস্তি নাই, মধ্যে মধ্যে নাক খুঁটছে।

নাড়ীর গতি তিনি অনুভব করলেন, ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল:

মন্দং মন্দং শিথিলং শিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলং বা—

অতি মন্থর ভারাক্রান্ত পদক্ষেপ স্খলদগতিতে চলছে—অসহায় আকুলতার প্রকাশ রয়েছে তার মধ্যে। যেন—যেন ব্যাকুল জীবনস্পন্দন ত্রস্ত হয়ে কোনো আশ্রয় খুঁজছে। সান্নিপাতিক জ্বরের সমস্ত লক্ষণ সুপরিস্ফুট। ত্রিদোষের প্রকোপ তীব্র। মনে হচ্ছে।—যাক সে কথা। জীবনমশায় চোখ খুলে তাকালেন হাসপাতালের ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার তাঁরই মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন। সন্তর্পণে জীবনমশায় হাতখানি নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। চাকর দাঁড়িয়ে ছিল সাবান জল তোয়ালে নিয়ে। হাত ধুয়ে মশায় তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে বললেন· রোগ টাইফয়েড। নিঃসন্দেহে টাইফয়েডের চিকিৎসা চলতে পারে।

হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—সন্দেহ আমারও হয়েছিল। কিন্তু মঞ্জুই আমাকে ধোঁকা ধরিয়েছে; আমরা নিয়মিতভাবে টাইফয়েডের টিকে নিয়ে থাকি।

চার মাস আগে ও একবার কলকাতা গিয়েছিল। ছিল মাসখানেক। এই সময়েই আমাদের নতুন ইনঅকুলেশনের সময়টা পার হয়েছে। আমি এখানে ইনঅকুলেশন নিয়ে ওকে লিখেছিলাম—কলকাতায় রয়েছে, নিশ্চয় যেন টি-এ-বি নেবে। ও লিখেছিল—নিলাম। আমি বিশ্বাস করেছিলাম। এখানে ফিরলে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম—ভ্যাকসিন নিয়েছ? বলেছিল—নিয়েছি। এবার জ্বর হতে প্রথম দিন থেকেই জিজ্ঞাসা করেছি—ভ্যাকসিন নিয়েছিলে তো? ও বলেছে—নিয়েছি। আজ সকালে স্বীকার করলে, নেয় নি। আমি বললাম—মশায় আমাকে বলে গেছেন টাইফয়েড। তখন বললে—না, নিই নি। যাক এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ক্লোরোমাইসেটিন দেব। চারুবাবু, হরেনবাবু দুইজনেই আসছেন। ওঁরা আসুন—একবার জিজ্ঞেস করে নিই।

সীতা এসে ঘরে ঢুকল। সে স্নান করে সঞ্জীবিত হয়ে এসেছে যেন। সে বড় প্রসন্ন আজ। বোধ করি, প্রদ্যোত ডাক্তারের এই স্বীকৃতিতে সে উল্লসিত হয়ে উঠেছে।

চারুবাবুরা এসে পৌঁছুলেন। মশায়কে দেখে বললেন—ব্যস, প্রদ্যোতবাবু, উনি বলছেন তো! তা হলে দিন ক্লোরোমাইসেটিন। নিশ্চিন্তে দিয়ে দিন।

ক্লোরোমাইসেটিন। নূতন যুগের আবিষ্কার। এ না কি অদ্ভুত ওষুধ।

দুঃসাধ্য টাইফয়েড; সাক্ষাৎ মৃত্যু-সহচরী সান্নিপাতি; তার গতিবেগ বর্ষার পাহাড়িয়া নদীর প্রচণ্ড বন্যার মতো—যাকে ফেরানো যায় না, বাঁধা যায় না। আপন বেগে প্রবাহিত হয়ে বন্যার মতই নিজেকে নিঃশেষ করে তবে ক্ষান্ত হয়। সেই শেষ হওয়ার পর যদি জীবন থাকে তো রোগী বাঁচে। তাও বাঁচে বন্যাপ্লাবনে মাটি-খুলে-যাওয়া, সমস্ত উর্বরাশক্তি ধুয়ে রিক্ত-হয়ে-যাওয়া পুষ্পোদ্যানের মতো। শীর্ণ-ঊষর ভূমিখণ্ডের মতো তার অবস্থা হয়।

ব্রজলালবাবুর দৌহিত্রের টাইফয়েডে ব্যাকটিরিওফাজ দেখেছিলেন। সে ক্ষেত্রে কাজ করে নাই। কিন্তু পরে ফাজ ব্যবহারে ফল দেখেছেন। ক্লোরোমাইসেটিন না কি অমোঘ। সান্নিপাতাশ্রয়ী মৃত্যুকে না কি তর্জনীহেলনে অগ্রগমনে নিষেধ করবার মতো শক্তিশালিনী। বৃদ্ধ জীবনমশায় বসে রইলেন উদগ্রীব হয়ে, তিনি দেখবেন। শিশি তিনি দেখেছেন—বিনয়ের ওখানে আছে কয়েক শিশি। তিন শিশি বোধ হয়। একটা কেসে ওই তিন শিশিই যথেষ্ট। কাল থেকেই না কি জ্বর কমবে। তৃতীয় দিনে জ্বর ছাড়বে। বিস্ময় বই কি!

প্রদ্যোত ডাক্তার ডাকলেন—মঞ্জু! মঞ্জু! হাঁ করো। ট্যাবলেট।

সীতা জল তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে মুখে জল ঢেলে দিলে। চারুবাবু ট্যাবলেটটা মুখে ফেলে দিলেন।

সন্ধ্যায় আবার গেলেন জীবনমশায়। নাড়ী ধরে দেখলেন জর বেড়েছে। আজ বোধ হয় সাড়ে চার—মাথার শিয়রে বসে আছে আজ অন্য নার্স। সীতাকে বোধ হয় ছুটি দিয়েছে।

পরদিন সকালেও জর কমল না। আগের দিনের থেকে বেশী।

রোগীর আচ্ছন্নতাও বেশী। পেটের ফাঁপ বেশী।

তৃতীয় দিন। আজ জর উপশম হওয়ার কথা। ছাড়ার কথা। কিন্তু কোথায়? মশায় গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন—কই, ভেষজের ক্রিয়া কই?

হাসপাতালের ডাক্তার—চারুবাবু, হরেন সকলেই চিন্তিত হয়ে উঠলেন—তাই তো! তবে কী—?

জীবনমশায় দৃঢ়স্বরে বললেন—রোগ টাইফয়েড। নাড়ীতে রোগ অত্যন্ত প্রবল। এইটুকু আমি বলতে পারি।

প্রৌঢ় চারুবাবু অল্পতেই ভড়কান, এবং অল্পেই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। তিনি দমে গেছেন।—তাই তো। সংসারে মুনিরও মতিভ্রম হয় যে!

জীবনমশায় দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়লেন—না! ভ্রম তাঁর হয় নি।

প্রদ্যোত ডাক্তারের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল। বললেন—আবার ক্লোরোমাইসেটিন দিন চারুবাবু। নিজের হাতে খুললেন শিশি। তুলে দিলেন তাঁর হাতে।

সন্ধ্যায় জীবনমশায় দেখলেন প্রদ্যোত ডাক্তার বারান্দায় দু হাতে দুটো রগ ধরে বসে আছেন। রোগিণীর মাথার শিয়রে বসে সীতা। সীতাই বললে—রক্তদাস্ত হয়েছে। জর সমান।

জীবনমশায় আজ নিজেই ঘরে ঢুকে রোগীর পাশে বসে হাত তুলে নিলেন। বেরিয়ে এসে প্রদ্যোতের কাঁধের উপর হাত রাখলেন।

প্রদ্যোত মুখ তুললেন—মশায়?

—হ্যাঁ। আপনি মুষড়ে পড়বেন না। রক্তদাস্ত হোক। এ রোগে ও তো হয়। এবং হয়েও বাঁচে। রোগীর নাড়ী আমি ভালো দেখলাম। ত্রিদোষ-প্রকোপের মাত্রা কমেছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমার ভুল হয় নি।

ডাক্তার স্থির দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জীবনমশায় বললেন—আমি আপনাকে মিথ্যা প্রবোধ দিই নি।

দীর্ঘক্ষণ বসে রইলেন তিনি।

স্টেশন থেকে একখানা গোরুর গাড়ি এসে ঢুকল। দুটি মহিলা নামলেন। দুজনেই বিধবা, একজন অতিবৃদ্ধা। ডাক্তার এগিয়ে গেলেন।—মা!

—মঞ্জু কেমন আছে বাবা?

—অসুখেই আছে। কিন্তু—ওঁকে আনলেন কেন? ডাক্তার বিরক্ত হয়েছেন। বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করে কথাটা বললেন!

—কোথায় ফেলে দেব বাবা? ও তো আমায় ছাড়বে না।

—কিন্তু কোথায় ওঁকে রাখি? কী করি?

—একপাশে থাকবে পড়ে। এখন আর উপদ্রব করে না। কেমন হয়ে গেছে কিছুদিন থেকে। চুপ করেই থাকে। নইলে আনতাম না।

—আসুন।

জীবনমশায়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে ডাক্তার বললেন—বসুন ডাক্তারবাবু, যাবেন না। আমি আসছি। ইনিই আমার শাশুড়ীর সেই দিদিমা। এই রোগের ঝঞ্চাটের উপর উনি হবেন বড় ঝঞ্চাট।

বসে রইলেন জীবন ডাক্তার।

বৈশাখের আকাশ। গতকাল দুপুরের দিকে সামান্য একটু ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। আকাশে আজ ধূলিমালিন্য নাই। নক্ষত্রমালা আজ ঝলমল করছে। সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন জীবনমশায়। এমন অবস্থায় মন যেন ফাঁকা হয়ে যায়। কোনো কিছুতেই দৃষ্টি আবদ্ধ করে না রাখলে মন ছুটতে শুরু করবে। কী করলে কী হবে? হাজার প্রশ্ন জাগবে। কোথায় কী হল? কোন ত্রুটি? জীবন হাঁপিয়ে উঠবে। ছুটতে পারে না তবু ছুটবে—ছুটতে হবে।

আকাশের ঝলমলানির মধ্যে মন হারিয়ে যাবার সুযোগ পেয়ে বেঁচেছে।

—মাঃ! মাঃ!

—এই যে মা! মঞ্জু! আমি এসেছি মা।

—মাঃ!

—কী বলছিস? কোথায় যন্ত্রণা? কী হচ্ছে? মঞ্জু?

—অ্যাঃ! মাঃ!

—কী বলছিস?

—বাবাঃ। আঁ!

জীবনমশায় হাসলেন।

মা! মা বলছেন—এই যে আমি। তবু রোগী ডাকছে—হয়তো বা পাশ ফিরে

শুয়ে ডাকছে—মা মা! সুদীর্ঘ চিকিৎসকের জীবনে এ কত দেখে এলেন। হায়রে মানুষ! সে মা কি তুমি? সে মা—আরোগ্যরূপিণী যিনি—তিনি। তাঁর সর্বাঙ্গে অমৃত—তাঁর স্পর্শে স্নিগ্ধ হবে রোগীর দেহের রোগজর্জরতা; উত্তাপ কমে আসবে; অশান্ত অধীরতা শান্ত হয়ে আসবে; আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে জাগবে চৈতন্য; জীবকোষে-কোষে জীবনবহ্নির দাবদাহের প্রজ্বলন সংবৃত হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে জ্বলবে প্রদীপের মতো। সকলযন্ত্রণাহরা সর্বসন্তাপহরা আরোগ্যরূপিণী তিনিই মা; কে তিনি জানেন না। কিন্তু তিনি অমৃতরূপিণী; অভয়া; মৃত্যু তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নমস্কার করে করে চলে যায়। মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হলেন মশায়। মনে হল মৃত্যু এসে যেন দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। কোনো কোণে সে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে রয়েছে! রোগিণী বোধকরি তারই আভাস অনুভব করে ডাকছে সেই অমৃত-রূপিণীকে। সতর্ক হয়ে তিনি রোগিণীর দিকে চেয়ে রইলেন।

সাঁইত্রিশ

পরের দিন সকালে।

জীবনমশায় আরোগ্য-নিকেতনের দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাসপাতালের ডাক্তারের বাড়ি যাবেন। হঠাৎ প্রদ্যোত ডাক্তার নিজেই সাইকেল চড়ে এসে রোয়াকে পা দিয়েই সাইকেলটার গতিরোধ করলেন; নামলেন না। হাঁপাচ্ছেন।

—মশায়, আজ জ্বর নাইন্টিনাইনে নেমেছে।

—নেমেছে?

—হ্যাঁ। নাইন্টিনাইন পয়েন্ট দুই। ভোরবেলা থেকেই মঞ্জু কথা বলছে—সহজ কথা। বলছে ভালো আছি।

—ভগবানের দয়া আর আপনার অদ্ভুত সাহস, আর দৃঢ়তা!

তরুণ ডাক্তারটি কোনো প্রতিবাদ করলেন না এ প্রশংসায়। নিঃসঙ্কোচে হাসিমুখে গ্রহণ করলেন, শুধু বললেন—আপনার নাড়ীজ্ঞানের সাহায্য না পেলে এতটা সাহস পেতাম না মশায়। আচ্ছা আমি যাই। মনের খুশিতে ছুটে এসেছি।

ঘুরল সাইকেল; ডাক্তার দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। সকালের বাতাসে তার রুক্ষ চুলগুলি উড়ছে।

পরমানন্দ মাধব! পরমানন্দ মাধব হে! পরমানন্দ—! কলিটা অসমাপ্ত রেখেই ডাক্তার একসঙ্গে হাসলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ সুখীদের মধ্যে এই লোকটি একজন। ওই মেয়েটিকে সে জীবন ভরে পেয়েছে। ছেলেটি আর মেয়েটিতে মিলে মানস সরোবর।

কিশোর সেদিন বলেছিল—এই পাওয়াই শ্রেষ্ঠ পাওয়া। এ পাওয়া যে পায়—তার সব পাওয়া হয়ে যাবে ডাক্তারবাবু। সৃষ্টি হয় মানস সরোবরের।

কিশোরকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বিয়ে করছ শুনলাম, কিন্তু কী হল?

সে বলেছিল—ভয় হল মশায়!

—বিয়ে করলে বউ পাওয়া যায় মশায়, কিন্তু যা পাওয়ার জন্যে বিয়ে করে মানুষ—তা পাওয়া যায় না। নারী আর প্রকৃতি ও দুই সত্যই এক। দুদিন পরেই বুকে পা দিয়ে দলে আপনার পথে চলে যায়। কখন নিজের মুণ্ডু কেটে নিজেই রক্তস্নান করে, কখন নিজে স্বামীকে গ্রাস করে ধূমাবতী সাজে, কখনও আবার নিজের বাপের মুখে স্বামীনিন্দা শুনে দেহত্যাগ করে। কদাচিৎ পুরুষের প্রেমে পূর্ণ পরিতৃপ্তিতে শান্ত অচঞ্চল হয়ে ধরা দেয়। যাদের ভাগ্যে এই পাওয়া ঘটে, তাদের আর কিছু প্রয়োজন নাই। প্রতিষ্ঠা প্রশংসা সাম্রাজ্য—এমন কি মুক্তিও না। এর চেয়ে বড় পাওয়া আর নাই। এ কেউ পায় না। ভয়ে পা বাড়িয়ে পিছিয়ে নিলাম। কে জানে—কী ফাঁকি আছে আমাদের দুজনের মধ্যে। ফাঁক থাকলে তো রক্ষে নাই। নারী তখন নদীর মতো ছুটবে আর আমি তীরের মতো বাহু বাড়িয়ে সাগরের কুল পর্যন্ত ছুটেও তাকে পাব না। ও থাকে বাহুবন্ধনের মধ্যে, ধরা পড়লেই ওরা মানস সরোবর।

কথাটা সত্য! ভুল নাই। মনে মনে বার বার বললেন জীবনমশায়। হাসপাতালের ডাক্তারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে, সন্ধ্যাবেলায় আরও ভালো করে এই সত্যটি অনুভব করলেন। সন্ধ্যার দিকে রোগিণীর জ্বর ধীরে ধীরে ছেড়ে এসেছে এখন।

সীতা স্মিত মুখ ডাক্তার-গৃহিণীর মুখখানি মুছিয়ে দিয়ে বললে—যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।

—তোমার খুব খাটতে হয়েছে, না? শীর্ণ হাসি ফুটে উঠল ডাক্তারের বউয়ের মুখে।

ডাক্তার ছেলেমানুষের মতো ছুটে গিয়ে কম্পাউণ্ডারকে বলে এলেন। নার্সদের ওদিকে গেলেন। হাসপাতালের রান্নাশালার ঝাড়ুদার মতিয়া জমাদারকে বলে এলেন—ওরে জ্বর ছেড়ে গেছে। জীবনমশায়ের উপস্থিতিও ভুলে গেছেন ডাক্তার।

রোগীর ঘরে ডাক্তারের শাশুড়ী প্রবেশ করলেন—যে ভয় তুই ধরিয়েছিলি মঞ্জু! সে কী বলব!

—কে জানে! তিন-চার দিনের কথা আমার কিছুই মনে নেই।

—থাকবে কি? একেবারে বেহুঁশ। মা—মা বলে চেঁচিয়েছিস, আমি ডাকলাম—এই যে আমি। তা একবার ফিরেও তাকালি না।

—তুমি কবে কখন এসেছ—আমি কিছুই জানি না।

—তোর এই অবস্থা, ওদিকে জামাইয়ের সে কী মুখ! মুখ দেখে আমার কান্না উপে গেল। মনে হল মঞ্জুর যদি কিছু হয় তবে জামাই আমার পাগল হয়ে যাবে।

—পাগল হত না তবে সন্ন্যাসী হত, নয়তো আত্মহত্যা করত।

জীবনমশায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনশ্চক্ষে দেখলেন—রোগিণীর শীর্ণ ক্লান্ত শুষ্ক অধরে স্মিত হাস্যরেখা ফুটে উঠেছে, কৃষ্ণাচতুর্দশীর শেষ রাত্রের এককলা চন্দ্রোদয়ের মত সে হাসির রূপ। এবং মেয়েটি এই হাসিতে কোনো লজ্জা অনুভব করছে না। সগৌরবে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে পুষ্পবিকাশের মতোই অকুণ্ঠ প্রকাশে হাসিমুখে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

পরমানন্দ মাধব হে!

ডাক্তার ফিরছেন। পদক্ষেপে উল্লাস ফুটে উঠছে।

—ধরা! ধরিত্রী! শুনছিস?

ডাক্তারের শাশুড়ীকে ডাকছেন তাঁর সঙ্গের সেই মেয়েটি। এই কদিনই এই কণ্ঠস্বর তিনি শুনেছেন। ভিতরের দিকে বারান্দা থেকে এই ডাক ডাকেন। আবছা চোখেও পড়ছে—একটি দীর্ঘাঙ্গী প্রৌঢ়া বিধবা শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে চুপ করে বসে থাকেন। গালে একটি হাত, মাটির উপরে একটি হাত, বসেই থাকেন। মধ্যে মধ্যে ডাকেন—ধরা, ধরিত্রী!

এদিক থেকে সাড়া দিত না কেউ—রোগীর শিয়রে বসে সাড়াই বা দেবে কী করে? চুপ করে যেতেন ভদ্রমহিলা। মহিলাটিকে দেখে মনে হয় একদিন জীবনে তাঁর জীবনমহিমা ছিল। কিছুক্ষণ পর আবার ডাকতেন—ধরা! ধরিত্রী! অ-ধরিত্রী! হ্যাঁ লা, মেয়ে তোর রয়েছে কেমন? বল? ঘরে ঢুকতে বারণ করেছিস—ঢুকি নে। তবু খবরটা বল।

সাড়া এতেই বা কে দেবে? তিনি চুপ করতেন।

আজও সেই তিনিই ডাকছেন। সেই ডাক। আজ ধরিত্রী সাড়া দিলেন—বলো! কী চাই?

—কী চাইব? হ্যাঁ লা তুই নাতনী—মেয়ের মেয়ে, মঞ্জু তোর মেয়ে, তার এখানে এসেছি—সেই তো বড় লজ্জা! এর পর আবার চাইব কী?

—তবে? কী বলছ?

—বলছি, মঞ্জু তো ভালো রয়েছে—একবার যাই না ওঘরে, ওকে দেখি! চোখে তো দেখব না, একবার মুখে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

—একটু অডিকলন মাখবে না? এ কণ্ঠস্বর মঞ্জুর। সে হেসে উঠল, দুর্বল কিন্তু সশব্দ হাসি।

—তা ভাই দিস যদি মাখব। কদিন এখানে এসেছি—মাথায় তেল দিই নি। নারকেল তেল দেয় নামিয়ে। ও তো ভাই মাখতে পারি নে, কী করব। রুক্ষু মাথাতেই চান করি। অডিকলন নয়, একটু গন্ধতেল দিস।

—চুপ করো, জামাই আসছেন—দিদিমা চুপ করো।

ডাক্তার আসছেন—মঞ্জুর মা দেখতে পেয়েছেন। তিনি সতর্ক করে দিচ্ছেন বৃদ্ধাকে।

একটু বেদনা অনুভব না করে পারলেন না জীবনমশায়।

—কই তোর জামাই, কই? একবার ডেকে দেনা আমার কাছে। আমি আজ না হয় পথের ধুলোর অধম হয়েছি, ঘরে গেলে ঘর নোংরা হয়, ছুঁলে হাত ময়লা হয়। কিন্তু চিরদিন তো এমন ছিলাম না! আমারও রূপ যৌবন ছিল। আদর সম্ভ্রম ছিল। তার উপর আমি মঞ্জুর মায়ের মায়ের মা। সেদিক থেকেও তো আমার সঙ্গে কথা বলতে হয়!

—কী? কী বলছেন? ডাক্তার শুনতে পেয়েছেন কথাগুলি। বারান্দায় উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। এ অবস্থায় মঞ্জুর মায়েরও দিদিমাকে সাবধান করার উপায় ছিল না। ডাক্তারের মন পরম প্রসন্নতায় ভরা। তিনি হেসেই উত্তর দিলেন—নিশ্চয়; কথা বলব বৈ-কি। আপনি গুরুজন। তবে মঞ্জুর অসুখ নিয়ে—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ ভাই। তা বটে। যে লজ্জা, যে ভয় হয়েছিল আমার। ভেবেছি—কেন এলাম? আমি সর্বস্বখাগী। স্বামী খেয়েছি, তাকে খেয়ে গেলাম মেয়ের ঘরে, সেখানে মেয়েকে খেলাম। তোমার শাশুড়ীকে মানুষ করলাম—সেই জামাইয়ের ঘর, তার অন্ন খেয়ে। মেয়ের সতীন এল—তার কথা শুনে সেখানে রইলাম; তার-পর ধরার বিয়ে হল। ধরার বাড়ি এলাম, ধরা বিধবা হল আবার এখানে—এখানে কেন এলাম? তা যার জন্যে এসেছি—সে জান তো? আমার চোখ দুটি ভালো করে দাও। বড় ডাক্তার তুমি!

—আচ্ছা, আচ্ছা। কালই আমি ওষুধ দোব।

—ওষুধ নয়, অপারেশন করে দাও।

—অপারেশন কি হবে? ছানি তো না?

—উঁহু, অপারেশন না করলে ভালো হবে না। অপারেশন করলেই ভালো হবে! কতজনের ভালো হল।

—আচ্ছা, দেখব কাল ভালো করে! তা হলে আমি বাইরে যাই! আপনার কোনো কষ্ট-টষ্ট হচ্ছে না তো?

—হচ্ছে ভাই। মাথায় একটু ভালো তেল চাই। আর কাপড়গুলি বড় পুরনো হয়েছে।

ঘরের ভিতর থেকে ডাক্তারের লজ্জিতা শাশুড়ী বললেন—করবে কী? উপায় কী বল? কাপড়ের কণ্টোল—বিশ্বসুদ্ধ লোক কাপড়ের অভাবে ছেঁড়া পরে দিন কাটাচ্ছে।

—তা বটে, তা বটে ভাই। তবু মঞ্জুর দুখানা আধপুরনো শাড়ি দিস। তাই পরব।

মঞ্জু হেসে উঠল।—রঙীন ডুরে শাড়ি—

—তাই পরব। তবু ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো কাপড় পরতে পারি না।

ডাক্তার বারান্দায় জীবনমশায়কে দেখে একটু লজ্জা পেলেন। তাঁর মনেই ছিল না জীবনমশায়ের অস্তিত্বের কথা। মনের উল্লাসে ভুলেই গেছেন।

—আমার দেরী হয়ে গেল মশায়।

—তা হোক।

—ও ভাই—ও মঞ্জুর বর! শুনছ!

কী বিপদ! প্রদ্যোত ডাক্তার এবার বিরক্ত হয়ে উঠল। হয়তো বা ওই মহিলাটির কথা জীবনমশায় শুনেছেন বুঝে মনে মনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। মহিলাটির উপর তো বটেই—হয়তো জীবনমশায়ের উপরেও বিরক্ত হয়েছে। জীবনমশায়ের শোনা উচিত হয় নি, চলে যাওয়া উচিত ছিল।

জীবনমশায় বললেন—আমি আজ যাই।

—বসবেন না একটু?

—না, আবার কাল আসব।

—আচ্ছা। মঞ্জু যেদিন পথ্য পাবে সেদিন একটা খাওয়া-দাওয়া করব।

—বেশ তো।

—পথ্যের দিন নির্ণয় কিন্তু আপনি করবেন। ক্লোরোমাইসেটিনে জ্বর ছাড়ে

কিন্তু আবার রিল্যাপ্স করার একটা ভয় আছে। আপনি যেদিন বলবেন নাড়ী নির্দোষ হয়েছে—এবার পথ্য দেওয়া যেতে পারে, তখন দেব। রক্তদাস্ত যখন হয়েছে, তখন ইনটেস্টাইনে পারফোরেশন হয়েছে নিশ্চয়। পথ্য খুব হিসেব করে দিতে হবে।

ওদিকে সর্বরিক্ত দীনাতিদীন মহিলাটি ডেকেই চলেছেন—অ-ভাই! শুনছ! একটু অপেক্ষা করে আবার ডাকছেন—মঞ্জুর বর! আবার ডাকছেন—অ ডাক্তার সায়েব।

মঞ্জুর মা একবার চাপা গলায় বললেন—থামো দিদিমা। কথা বলছেন জামাই মশায়ের সঙ্গে।

—মশায়ের সঙ্গে? সে কে?

—যিনি খুব ভালো নাড়ী দেখেন, এখানকার প্রবীণ বৈদ্য। চুপ করলেন মঞ্জুর মা।

—তা—। বলেই স্তব্ধ হয়ে যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন বৃদ্ধা।

কয়েক মুহূর্ত পর হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন এবং ডাকলেন—ধরা, কথা শেষ হল? আমি একটা কথা বলছিলাম।

এবার প্রদ্যোত ডাক্তার বোধ হয় খেপে উঠবে। মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে—বলেছি তো কাল চোখ কেটে দেব। যা হয় হবে আপনার।

—না। তা বলি নি ভাই।

—তবে? কাপড়? তাও এনে দেব।

—না—না।

—তবে কী?

—ওই যে মশায় নাকি—যিনি নাড়ী দেখেন ভালো—

হ্যাঁ—তিনি কী করবেন? তিনি তো অপারেশন করেন না!

—না—না। তাঁকে একবার হাত দেখাব।

—হাতে কী হল আবার? বেশ তো শক্ত রয়েছেন। এখন তো কোনো অসুখ নেই।

—অসুখ অনেক আমার, তোমরা ধরতে পার না। ওই সব পুরনো লোক ঠিক ধরতে পারবে। তুমি ওকে বলেই দেখো না। তোমাদের কাছে তো আমি নগণ্যি লোক। ওঁকে বলো—কাঁদীর জমিদার অমুক বোসের স্ত্রী। অমুক বোসকে চেনে না—এমন লোক এ চাকলায় নাই। তা ছাড়া এসব তো তোমাদেরই জমিদারি ছিল গো। বলে দেখো, কত খাতির করে দেখবে। তা ছাড়া আমার বাবা—ওঁর—।

প্রদ্যোত এবার ধৈর্য হারিয়ে সত্যসত্যই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, কিন্তু কী বলবে খুঁজে পেলে না। মশায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

মঞ্জুর মা বৃদ্ধার হাত ধরে চাপা দিয়ে বললে—দিদিমা—চুপ করো। দিদিমা।

মশায় বাইরে থেকে ডাকলেন—প্রদ্যোতবাবু!

প্রদ্যোত বেরিয়ে এল, এবং সর্বাগ্রে হাতজোড় করে বললে—আপনি কিছু মনে করবেন না ওঁর কথায়! উনি সেই সেকালের জমিদারের বউ। মাথা খারাপ হয়ে গেছে—

হেসে বাধা দিয়ে মশায় বললেন—না—না—না। আপনি এমন সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেন? উনি হাত দেখাতে চাচ্ছেন—চলুন হাত দেখি। দেখলেই তো খুশী হবেন। কাঁদীর কাদের বাড়ির বউ? কার স্ত্রী?

ভূপেন বোস। লোকে বলত ভূপী বোস। যত অমিতাচারী তত অমিতব্যয়ী—সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন, তবু মদ ছাড়তে পারেন নি।

—হাত দেখাব, শুনেছি নাকি হাত দেখে নিদান হাঁকতে পারেন। কবে মরব। সেইটে জানব। তুমি ওঁকে বলো, মঞ্জরী—মঞ্জরীর হাত দেখতে হবে। ওঁর মাস্টারের মেয়ে মঞ্জরী আমি। কাঁদীর অমুক বসুর স্ত্রী মঞ্জরী। উনি চিনবেন।

জ্যৈষ্ঠ রাত্রির রুক্ষ নির্মেঘ নক্ষত্র-ঝলমল আকাশ অকস্মাৎ কোমল নীলাভ দীপ্তিতে ভরে গিয়ে একটা উল্কা খসে গেল বুঝি। জীবনমশায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

—মঞ্জরী!

হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—চিনতেন তাঁকে?

—চিনি খুব চিনি। আপনার আপত্তি না থাকলে ওঁকে আমি দেখব!

—বেশ তো! আজই দেখবেন!

—ক্ষতি কী! দেখি।

প্রদ্যোত বললে—বহু রোগ ওঁর শরীরে। স্বামীই দিয়ে গেছেন অনেক বিষ। বললাম তো তাঁর কথা। আর আপনিও জানেন বলছেন।

—জানি।

—তাঁর অমিতাচারের বিষ আছে রক্তে। নিজের রসনার লোভের ফলে—স্টমাক-ইন্টেস্টাইন হয়েছে ব্যাধিগ্রস্থ, পুষ্টির অভাবে দেহকোষ হয়েছে দুর্বল। মনের অশান্তি—তাও ক্রিয়া করেছে। চোখ গেছে। কানেও একটু খাটো। কোলাইটিস লেগেই আছে, শীতে হাঁপানি হয়, শিরঃপীড়া আছে, মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়। আশ্চর্য শক্ত দেহ, সব সহ্য করেই বেঁচে রয়েছেন। চুরি করে খান—।

থেমে গেল ডাক্তার। মনে হল আর বলা অন্যায় হবে।

মঞ্জরী চুরি করে খায়, চুরি করে গন্ধদ্রব্য মাখে, হাতে অনুভব করে যার হোক খরখরে দেখে পরিচ্ছন্ন বুঝে কাপড় টেনে নিয়ে পরে।

সে সব তথ্য এ কদিন ওঁদের কথাবার্তা থেকে জেনেছেন।

মশায় প্রদ্যোত ডাক্তারকে বললেন—চলুন।

প্রদ্যোত বলল—সেদিন ওঁকে আমি মতির মায়ের গল্প বলেছি। আপনি যা বলেছিলেন—তাও বলেছি, কিন্তু কাকে বললাম—কে শুনবে? বললেন—মঞ্জুর একটি ছেলে দেখি—তারপর ভাই, তারপর। আর মরলেই তো ফুরিয়ে গেল ভাই।

* * *

মঞ্জরীর সামনে দাঁড়িয়ে মশায় কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন; কপালে সারি সারি রেখা জেগে উঠল, চোখে ফুটে উঠল অদ্ভুত দৃষ্টি! পকেট থেকে চশমা বের করে চোখে পরলেন তিনি। ভালো করে দেখলেন। দূর থেকে কয়েকদিনই বৃদ্ধাকে দেখেছেন তিনি, আজ চশমা চোখে কাছ থেকে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। পেলেন না; কোথাও তার বিন্দুমাত্র অবশেষ নাই।

—দেখি আপনার হাতখানি।

জর লেগেই আছে নাড়ীতে। ব্যাধিজর্জর অভ্যন্তর। উদ্বেগকাতর চিত্ত। নাড়ীর স্পন্দনে স্পন্দনে বলছে। দেহকোষে-কোষে, আকাশের নক্ষত্রমালার মতো যে জীবনশিখাগুলি অহরহ প্রাণদেবতার আরতি করে জ্বলে, প্রাণকে মধুময় উত্তাপে অভিষিক্ত করে জাগ্রত করে রাখে জীবদেহে, সেগুলি স্তিমিত-দ্যুতি, অনেকগুলি নিভেই গিয়েছে। প্রাণদেবতার চারিদিকে ছায়া জেগে উঠছে, ছায়ায় হিম স্পর্শ ছড়াচ্ছে; শেষ সীমারেখায় উপনীত হতে আর অল্প পথই বাকি। নাড়ীর স্পন্দনে জাগে যে জীবনসঙ্গীত তা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে বিলম্বিত ছন্দে সমাপ্তির অবিলম্বতা ঘোষণা করছে।

হাতখানি নামিয়ে রেখে বললেন—ও হাতখানি দেখি।

সেই একই কথা—একই ছন্দ একই ধ্বনি।

—কী দেখলেন গো? চোখ-কান পাব? ভালো করতে পারবেন?

—না।

—মাথার যন্ত্রণা? শিরঃপীড়া?

—ভালো হবে না, তবে এখন অনেক ভালো ওষুধ উঠেছে খাবেন, যন্ত্রণা কমে যাবে। আমি একটা টোটকা বলে দেব—ব্যবহার করলে কমবে খানিকটা, তবে একেবারে ভালো হবে না।

—পেটের গোলমাল ?

—ওই তো আপনার আসল রোগ।

—ভালো করে দেন।

—ভালো ?

—হ্যাঁ! মঞ্জুর একটি খোকা দেখি!

—জন্মান্তরে তো বিশ্বাস করেন! মঞ্জুর কোলে খুকী হয়ে আপনিই ফিরে আসবেন, সে তো আরও ভালো হবে।

একটু চুপ করে থেকে বৃদ্ধা বললেন—তা হলে এবারের মতো যেতে বলছেন! আর বাঁচব না ? কিন্তু—! কিন্তু ভারি যে ভয় লাগে গো!

—ভয় কিসের ? এ তো মুক্তি।

—মুক্তি ?

—হ্যাঁ। তা ছাড়া আর কী? সেখানে আপনার স্বামী, মা, বাপ, ভাই, মেয়ে, জামাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন।

বৃদ্ধার মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। দৃষ্টিহীন চোখে সামনের দিকে চেয়ে আত্মমগ্ন হয়ে বসে রইলেন।

মশায় উঠলেন। বৃদ্ধা সচেতন হয়ে উঠলেন চেয়ার ঠেলার শব্দে। বললে—তা হলে আমাকে যেতে হবে বলছেন ? কতদিনের মধ্যে যেতে হবে ?

প্রদ্যোত ডাক্তারের অস্তিত্ব ভুলে গেলেন জীবনমশায়, নিদান সম্পর্কে তার আপত্তির কথাও তাঁর মনে হল না, তিনি আবার একবার বসে—বৃদ্ধার হাতখানি ধরে ভালো করে দেখে বললেন, তিন মাস থেকে ছ মাস। এর মধ্যেই মুক্তি পাবেন আপনি। তবে একালের ওষুধ খেলে হয়তো আরও কিছুদিন দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে। একালের ওষুধ বড় শক্তিশালী।

—নাঃ। তা আর খাব না। আপনি আমাকে ভালো কথা মনে করে দিয়েছেন—তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। যত শীগগির মুক্তি আসে ততই ভালো। এই কথাটি কেউ এমন করে আমাকে বলে নাই! ওঃ কতকাল তারা আমার পথ চেয়ে আছে! আর আমি—।

বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল। দৃষ্টিহীন চোখ দুটি নির্নিমেষ হয়ে গেল। এবার জল গড়াবে।

মশায় নীরবে উঠে বেরিয়ে এলেন।

চোখ ফিরিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে গিয়ে তিনি চমকে গেলেন ; সামনের আয়নাতে তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব পড়েছে। শুভ্রকেশ, রেখাঙ্কিত ললাট, পাণ্ডুর মুখ,

এক স্থবির দাঁড়িয়ে আছে। মনে পড়ে গেল একটি কথা। তাঁর বাবার কথা। বলেছিলেন—জন্মমাত্রেই মৃত্যু সঙ্গ নেয়; দিনে দিনে সে বাড়ে, সে বৃদ্ধির মধ্যেই সে তার ক্ষয়ের ক্রিয়া করে যায়, ঠেলে নিয়ে যায় তার পথে; জীবন-যুদ্ধ করে মানুষ যেদিন ক্লান্ত হয়—সেদিন আসে জরা তারপর আসে শেষ। বলতে গেলে আজকের আমি জন্মাই সূর্যোদয়ে, মরি নিদ্রার সঙ্গে দিনান্তে রাত্রির অন্ধকারে, আবার জন্মাই নূতন প্রভাতে জন্মান্তরে।

প্রদ্যোত ডাক্তার মশায়ের এই নিবিষ্ট একাগ্র দৃষ্টিতে দেখা দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। চেয়ারখানা একটু সরিয়ে দিয়ে বললেন—বসুন।

মহাশয়ের রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাসটি এতক্ষণে ঝরে পড়ল। তিনি মুখ ফিরিয়ে চেয়ারখানা দেখে নিয়ে বসলেন—কী কষ্ট আপনার?

বৃদ্ধা বললেন—আপনি জীবনমশায়? নবগ্রাম দেবীপুরের জীবন দত্ত? আমি মঞ্জরী। কাঁদীর বঙ্কিমের বোন, মাস্টার নবকৃষ্ণ সিংহীর মেয়ে।

একটু হেসে মশায় বললেন—হ্যাঁ! শুনেই চিনেছি আমি। অনেক কালের কথা, আবছা আবছা মনে পড়ে।

—ঠিক বলেছেন। আবছা আবছা। সব ঝাপসা। এখানে এসে শুনি জীবনমশায়, জীবনমশায়। নবগ্রাম, নবগ্রাম। মনে হয় চেনা-চেনা। নাম শোনা। তারপরেতে, আপনার কথা শুনে—ওই ঝোঁক দিয়ে কথা বলা শুনে মনে হল আপনিই তিনি। তাঁরাও তো মশায় ছিলেন। বাড়িও নবগ্রামে ছিল। তা মাথার গোলমাল তো, এই মনে পড়ে, আবার গোলমাল হয়ে যায়! শেষে বলি, তিনিই হোন আর যিনিই হোন, এত বড় বৈদ্য—হাতটা দেখাই না কেন—যদি ভালো হই!

হাসপাতাল থেকেই বেরিয়ে এলেন তিনি। প্রদ্যোত ডাক্তার ফটকের মুখ পর্যন্ত এসেছিল, সে বললে মশায় এই আপনাদের নিদান হাঁকা?

জীবনমশায় শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তার দিকে, কথাটা তাঁর মাথায় ঢুকল না। প্রদ্যোত বললে— এ আপনার কাছে আমার শিখতে ইচ্ছে করছে।

মশায়ের মনের মধ্যে ঘুরছিল সেই পিঙ্গলবর্ণা কন্যার কথা। পিঙ্গলবর্ণা, পিঙ্গলকেশিনী, পিঙ্গলচক্ষু কন্যা—কৌষেয়বাসিনী, সর্বাঙ্গে পদ্মবীজের ভূষণ; অন্ধ বধির! অহরহই সে সঙ্গে রয়েছে, কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো। শ্রমের সঙ্গে বিশ্রামের মতো, শব্দের সঙ্গে স্তব্ধতার মতো; সঙ্গীতের সঙ্গে সমাপ্তির মতো; গতির সঙ্গে পতনের মতো, চেতনার সঙ্গে নিদ্রার মতো। মৃত্যুদূত তাঁর কাছে

পৌঁছে দেয়, অন্ধবধির কন্যা, অমৃতস্পর্শ বুলিয়ে দেন তার সর্বাগ্রে। অনন্ত অতলান্ত শান্তিতে জীবন জুড়িয়ে যায়। তেমনি করে জুড়িয়ে যায় যেন মঞ্জরী। মৃত্যুদূত সে যেন আসে ভূপীর রূপ ধরে।

পরমানন্দ মাধব! তোমার মাধুরীতে সৃষ্টিতে ছড়ানো মধু, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত।

নিজের হাতখানা ধরলেন। রক্তস্রোত আজ দ্রুত চলেছে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়েছে। দেহের রোমকূপের মুখগুলি স্বেদাক্ত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল এমন উত্তেজনা তিনি অনুভব করেন নি। তিনি কী—তাঁর কী? কিন্তু তাঁর মৃত্যুদূত কোনরূপে আসবে? মঞ্জরী নয়। মঞ্জরী জীবনে ভ্রান্তি। মিথ্যা। আতর-বউয়ের রূপে? তাঁর বাবা জগৎমশায়ের রূপ ধরে? গুরু রঙলালের মূর্তিতে? অথবা নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়ে সে থাকবে—তাকে দেখা যাবেনা? সে বনবিহারী?

—কে?

আরোগ্য-নিকেতনের সামনে এসে পড়েছিলেন তিনি। একটি আলো জ্বলছে। কে বসে রয়েছে। ভ্রূকুঞ্চিত করে তিনি প্রশ্ন করলেন—কে?

—মশায় বাবা! আমি প্রভু, আমি 'মরি'।

মরি বষ্টমী?—এত রাত্রে? কী রে মরি?

—আজ যে সাবিত্রীচতুর্দশী বাবা। অভয়া মা বললেন—কৃষাণ মান্দেরকে কী করে পাঠাব মরি? ওদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে তুমি যাও।

আজ সাবিত্রীচতুর্দশী। একদিন বৈধব্যের দুঃখ কল্পনা করে তিনি বাপের মতো স্নেহে অভয়াকে খাইয়েছিলেন, সে তাকে অভিসম্পাত দিয়েছিল। আজ অবৈধব্য ব্রত উপলক্ষে তাঁকে খাওয়াবে। কন্যার মতো শ্রদ্ধা করেই নিমন্ত্রণ করেছে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে তির্যক ভঙ্গিতে সেই অন্ধকারের মধ্যেই তিনি তাকালেন একবার। বোধ করি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলেন। আর-একবার বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের মণিবন্ধ চেপে ধরলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিলেন। বললেন—চল।

শেষ

চার মাস পর।

উনিশশো একান্ন সালের সেপ্টেম্বর মাস। আশ্বিন সন্ধ্যা। প্রদ্যোত ডাক্তার বাইরের বারান্দায় কলব্যাগ, ব্লাডপ্রেসার পরিমাপের যন্ত্র নিয়ে কলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। পাশে ছোট টুলের উপর চায়ের কাপ নামানো।

মঞ্জু ঘর থেকে বেরিয়ে এল, সেও বাইরে যাবে বোধ হয়। চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে সে বললে—এ কী, খেলে না চা?

—নাঃ। ভালো লাগল না।

—ভালো হয় নি? আমি তৈরি করে আনব?

—না ভালোই লাগছে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রদ্যোত বললে—শেষটায় ভদ্রলোকের সঙ্গে এমন জড়িয়ে গেলাম! তোমার অসুখের সময় সাহায্য সব ডাক্তারেই করেছিলেন, কিন্তু মশায়ের সাহায্যের চেয়ে ভালোবাসা বড়।

একটু চুপ করে বোধ করি ভেবে বললে—ওটা বোধ হয় প্রবীণের ধর্ম। আমরা পারি না। বয়স না হলে হয় না। কিন্তু—।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে—কিন্তু তুমি আজই এলে, এই ঘণ্টা খানেক আগে ট্রেন থেকে নেমেছ, আজ তুমি না গেলেই পারতে। শরীর তোমার এখনও ঠিক সুস্থ হয় নি।

অসুখের পর মঞ্জুকে চেঞ্জে পাঠিয়েছিলেন। আজই মঞ্জু বিকেলের ট্রেনে ফিরেছে।

মশায়ের অসুখ; প্রদ্যোত দেখতে যাচ্ছে শুনে সেও যাবে বলে তৈরি হয়েছে। মশায়ের অসুখ; আজ চার মাসই তিনি অসুস্থ। মধ্যে মধ্যে শয্যাশায়ী হয়েছেন; আজ তিন দিন অসুখ বেশী। রোগ রক্তের চাপ, ব্লাডপ্রেসার; আক্রমণ হৃৎপিণ্ডে; করোনারি থ্রম্বসিস।

মঞ্জু বললে—না—না। আমার কিছু হবে না। আমার শরীর ঠিক আছে।

—ঠিক আছে? হাসলে প্রদ্যোত।—মনের ইমোশনে বোঝা যায় না। প্রথম অসুখের খবর পেয়ে যখন মশায়কে দেখতে গেলাম, তখন মশায় যন্ত্রণার মধ্যেও হেসে বলেছিলেন—স্নেহ, দয়া, ভালোবাসা কোনো কিছুরই আতিশয্য সে ক্ষমা করে না ডাক্তারবাবু। পাপ পুণ্য যার জন্যেই হোক জীবনের উপর পীড়ন করলেই

সেই ছিদ্রে তার দূত এসে দেহে আশ্রয় নেয়! আমারও নিয়েছে। কাল খুব দূরে নয় ডাক্তারবাবু।

বাঁ হাতে নিজের ডান হাতের মণিবন্ধ ধরে নাড়ী অনুভব করে হেসে বলেছিলেন —মনে হচ্ছে, গ্রামের বাইরে—গ্রামে ঢুকবার মুখে সে পদার্পণ করেছে। গ্রামে ঢুকছে।

সেদিন মনের অবস্থা ছিল বিচিত্র!

মঞ্জুরীকে দেখে বেরিয়ে যখন এসেছিলেন তখন তাঁর বৃদ্ধ দেহের শিরায় উপশিরায় রক্তস্রোত দ্রুতবেগে বইছিল।

মন তখন এক বিচিত্র উপলব্ধির আস্বাদ অনুভব করেছে! সে এক আশ্চর্য উল্লাস!

তার উপর হাসপাতালের ফটকে প্রদ্যোত তাঁকে বলেছিল—এই আপনাদের নিদান হাঁকা? এ যে শিখতে ইচ্ছে করছে!

বাড়ি ফিরবার পথে মনে হয়েছিল—সেই অন্ধকারের মধ্যে তিনি আরণ্য গজের মতো বেরিয়ে পড়েন মৃত্যুগহ্বরের সন্ধানে। জনহীন দিকহারা প্রান্তর খাঁ-খাঁ করছে অথবা গভীর নিবিড় মহা অরণ্য থমথম করছে; অসংখ্যকোটি ঝিল্লীর ঐকতান ধ্বনিত হচ্ছে; মনে হচ্ছে মৃত্যুর মহাশূন্যতার মধ্য দিয়ে জীবনপ্রবাহ চলেছে জন্মজন্মান্তরে; সেইখানে উল্লাসধ্বনি করে সেই মহাগহ্বরে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন নবজন্মের আশায়। নিজের নাড়ী ধরে পথ হেঁটেছিলেন, কিন্তু আনন্দের আবেশে অনুভূতিযোগ স্থির হয় নি। বাড়িতে গিয়ে মরি বষ্টুমীকে দেখে তারই সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন অভয়ার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

আতর-বউ বারণ করেছিলেন, কিন্তু শোনেন নি। শুধু তাই নয়, আতর-বউয়ের কথায় দুরন্ত ক্রোধে তিনি যে চীৎকার করেছিলেন—সে চীৎকার আজও মশায়ের নিজের কানের পাশে বাজছে। জীবনে এমন চীৎকার তিনি কখনও কোনোদিন করেন নি।

আতর-বউই প্রথম ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিল—এই বয়সে, এই রাত্রে নিমন্ত্রণ খেতে চলেছ! এমন অভর পেট তোমার; বনবিহারীকে খেয়ে ভরে নি?

মুহূর্তে প্রচণ্ড চীৎকারে রাত্রির আকাশ চমকে উঠেছিল—তিনি চীৎকার করে উঠেছিলেন—আতর ব-উ—!

মরি বষ্টুমী চমকে উঠেছিল, সঙ্গের লোকটার হাত থেকে লণ্ঠনটা পড়ে দপ করে নিভে গিয়েছিল।

অভয়া অন্ধকারের মধ্যে দাওয়ার উপর তাঁর প্রতীক্ষাতেই দাঁড়িয়েছিল।

সারাটা দিন নিরম্বু উপবাসিনী, কুশাগ্রে জল পর্যন্ত খায় নি। কালও অর্ধ উপবাস; নিজের ঘরের গাছের ফল আর মধু খেয়ে থাকবে। আগামী জন্মে পাবে অবৈধব্য ফল। যতদিন সে জীবিত থাকবে ততদিন মৃত্যু ওর স্বামীর সান্নিধ্যে আসতে পারবে না। সাক্ষাৎ মৃত্যুবহ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেও মৃত্যুকে ফিরে যেতে হবে। অভয়ার এ জন্মের এই ব্রতচারণের পুণ্যফলের প্রভাবে। সাবিত্রী করেছিলেন এই ব্রত। সত্যবানের প্রাণ গ্রহণ করে মৃত্যুর অধিপতি চলেছিলেন মৃত্যুপুরীর মুখে। অপার্থিব পথ পার্থিব রহস্যলোক সেখানে। পার্থিব দৃষ্টি সেখানে অন্ধ। কিন্তু এই ব্রতপালনের পুণ্যে সাবিত্রী মৃত্যুপতিকে অনুসরণ করেছিলেন; এই পুণ্যবলে মৃত্যুপতিকে পরাভূত করে ফিরিয়ে এনেছিলেন স্বামীর জীবন। সাবিত্রীর কাহিনী সত্য কিনা, এই ব্রত করে আজও এমন ভাগ্য হয়েছে কি হয় নি এ বিচার কেউ করে নি; আবহমান কাল গভীর বিশ্বাসে এই ব্রত করে এসেছে এদেশের মেয়েরা। অভয়ার উপবাসশীর্ণ মুখে সেই বিশ্বাসের গাঢ়তম ছাপ দেখেছিলেন। তাঁকে দেখে অভয়ার মুখে শুক্লা প্রতিপদের ক্ষীণ চন্দ্রলেখার মতো একটি বিশীর্ণ হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। দেখে মশায়ের মন থেকে ক্রোধের অস্বস্তির রেশ নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল; আশ্বিনের পূর্ণিমার নির্মেঘ আকাশের মতো সারা মনটা ঝলমল করে উঠেছিল। মনে মনে বলেছিলেন—চিকিৎসক হিসেবে আমি জানি, মৃত্যু পাপের বিচার করে না, পুণ্যের করে না; সে আসে ক্ষয়ের পথে, ক্ষয় যেখানে প্রবল সেখানে সে অপরাজেয়, সে ধ্রুব! তবু আজ আমি বারবার আশীর্বাদ করছি, এ সত্য হোক, এ সত্য হোক, পরজন্মে তোমার স্বামীর জীবনে ক্ষয় প্রবল হলেও যেন তোমার পুণ্যবলের কাছে মৃত্যু হার মানে।

তাঁর সামনে খাবারের থালা নামিয়ে দিয়ে অভয়া বলেছিল—আমার এ অনেক দিনের সাধ। প্রতিবার সাবিত্রী ব্রতের সময় মনে হয়েছে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়েও পূর্ণ হল না। আপনি খেলে তবে পূর্ণ হয়।

হেসে তিনি বলেছিলেন—পূর্ণ হোক মা এবার।

—আপনাকে কী দেব বলুন? আপনি তো রাত্রে শুনেছি দুধ আর ফল বা খই, এ ছাড়া খান না। তাই দি? দুধ, আম, কলা, এইসব আর মিষ্টি!

—তুমি যা দেবে মা, তাই খাব। তাই অমৃত!

—একখানা লুচি? একটু ঝোল? একটু তরকারি?

—যা তুমি নিজে হাতে রান্না করেছ তাই দাও।

সত্যই অমৃতের মতো মনে হয়েছিল। দীর্ঘদিন এমন প্রসন্ন রুচির সঙ্গে খান নি তিনি। খেয়ে উঠে মনে হয়েছিল খাওয়ার পরিমাণ যেন বেশী হয়ে গেল।

শেষ রাত্রে এইটুকু ছিদ্রপথে তার দূত এসে বুকের উপর চেপে বসল। বুকের মধ্যে মনে হল পাষাণভার চেপেছে; হৃৎপিণ্ড পরিত্রাহি আক্ষেপে মাথা কুটতে লাগল; মস্তিষ্কের স্নায়ু শিরা আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল, অনুভূতি একটা বিরাট শূন্যতার মধ্যে হারিয়ে গেল; শুধু জৈবিক অনুভবশক্তিটুকু নিজেকে প্রবুদ্ধ করে প্রাণপণে চীৎকার করে উঠল, যন্ত্রণাকাতর চীৎকার! একটা গোঙানি।

আতর-বউ ঘুমান নি। মনের আক্ষেপে সারাটা রাত্রিই তিনি চোখের জল ফেলেছেন নিঃশব্দে। মূহূর্তে তিনি উঠে আলোটা জোর করে দিয়ে তাঁর শিয়রে এসে বসেছিলেন। চিকিৎসকের পুত্রবধূ, চিকিৎসকের গৃহিণী, ছেলেও চিকিৎসক হয়েছিল, আতর-বউ বুকের উপর আছাড় খেয়ে পড়েন নি, বিহ্বল হয়ে কান্নাকাটি করেন নি; মাথায় মুখে চোখে জল দিয়ে বাতাস করে শুশ্রূষা করেছিলেন। অর্থহীন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মশায় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

আতর-বউ ইন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কিশোর এবং বিনয়ের কাছে, সেতাবকেও সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। কিশোর এবং বিনয়ই সংবাদ দিয়েছিল হরেনকে এবং প্রদ্যোতকে। তারা যখন এসেছিল তখন মশায় খানিকটা সুস্থ হয়েছেন।

রক্তের চাপ দুশো চল্লিশ; হৃৎপিণ্ডে আক্রমণ হয়েছে।

বিকেলবেলা মশায় বলেছিলেন ওই কথা।

পাপপুণ্যের বিচার মৃত্যুর কাছে নাই। বলেছিলেন, জলমগ্নকে উদ্ধার করতে গিয়ে তার পাকে জড়িয়ে পড়লেও মৃত্যু আসে, আবার কঠিন হিংসায় কাউকে ছুরি মারতে গিয়ে ছুরি খেলেও মৃত্যু আসে। ওখানে সে নির্বিকার।

নিজের নাড়ী ধরে বলেছিলেন—সে আসছে। মনে হচ্ছে গ্রামের বাইরে তার পায়ের শব্দ উঠছে; গ্রামে ঢুকবার মুখে ধর্মরাজ স্থানের বকুলতলায় বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। হেসেছিলেন একটু।

প্রদ্যোত বলেছিল, আপনাকে কিছু বলা আমার উচিত নয়, কিন্তু এটা ঠিক আপনার থ্রম্বসিস নয়, একটা স্প্যাজমের মতো। এ তো চলে যাচ্ছে। পার হয়ে যাবে।

দিন পনেরোর মধ্যে সুস্থ হয়েও উঠেছিলেন। তখন বলেছিলেন গঙ্গাতীরে যাবেন।

সে যাওয়া তাঁর হয় নি। নিজেই মত পরিবর্তন করেছিলেন। আতর-বউয়ের কথা ভেবে বলেছিলেন, না থাক। আতর-বউ একা পড়বে। ওর দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকবে না। এখানে আপনারা আছেন—দুঃখকষ্টের ভাগ নিচ্ছেন। সেখানে? কে নেবে ভাগ?

আতর-বউ একটি কথাও বলেন নি। তিনি যেন পাথর হয়ে গেছেন। বনবিহারীর স্ত্রী, তার ছেলে একবার এসেছিল, দেখে চলে গেল। মশায় প্রথম আক্রমণের পর সামলে উঠেছিলেন। উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন।

প্রদ্যোত বলেছিল, আমি বলেছিলাম, আপনি সেরে উঠবেন।

মশায় হেসেছিলেন। কোনো কথা বলেন নি।

প্রদ্যোত অনুযোগ করে বলেছিল—আমাদের কিন্তু একটা কথা বলবার আছে। আপনি নিজের নাড়ী বারবার দেখেন!

মশায় জবাব দিয়েছিলেন—সে আমি অনেকদিন থেকেই দেখি ডাক্তারবাবু।

—না। ওটা দেখতে পাবেন না।

হেসে মশায় বলেছিলেন—বহুলোকের নাড়ী দেখে তার মৃত্যুদিন বলে এলাম। নিজে যখন সুস্থ ছিলাম—তখন দেখেছি—তার হদিস পাবার জন্য। আর আজ যখন সে কাছে এল—তখন তার পায়ের শব্দ যাতে শুনতে না পাই, তার জন্যে তুলো গুঁজে কান বন্ধ করে বসে থাকব ডাক্তারবাবু?

প্রদ্যোত এ কথার জবাব দিতে পারে নি। মশায় আবার বলেছিলেন—মৃত্যুর জন্যে আমার আতঙ্ক নাই ডাক্তারবাবু। সুতরাং ওতে উদ্বেগের জন্যে আমার রক্তের চাপ বাড়বে না। তবে—।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তবে প্রথম দিন প্রস্তুত ছিলাম না তো; একেবারে অকস্মাৎ ঘুমের মধ্যে হৃৎপিণ্ডে আক্রমণ হল। তখন ভয় পেয়েছিলাম, একেবারে অসহায় শিশুর মতো আতঙ্কে চীৎকার করে উঠেছিলাম। মতির মাকে তিরস্কার করেছিলাম, কিন্তু ওর দোষ নেই। মৃত্যুভয়ের তুল্য ভয় নেই, মৃত্যুরোগের যন্ত্রণার তুল্য যন্ত্রণা নেই। কিন্তু সে ভয়কে পার হয়ে আজ কি আমি উটপাখির মতো বালির মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকব?

* * * *

তিন মাস পর দ্বিতীয় আক্রমণ হয়েছিল। আক্রমণের পূর্বদিন নিজেই বলেছিলেন—ডাক্তারবাবু, এইবার সে বকুলতলা থেকে বিশ্রাম সেরে উঠে দাঁড়াল।

কথাটা প্রদ্যোতের মনে ছিল না। তাই বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করেছিল, আজ্ঞে?

—আবার একটা ঝাপটা আসবে ডাক্তারবাবু। রক্তের চাপ বাড়বে।

—কই না তো। প্রেসার সেই একই আছে!

—বাড়বে নাড়ীতে বুঝতে পারছি আমি।

তাই বেড়েছিল। পরের দিন প্রেসারের গতি উর্ধ্বমুখী দেখা গিয়েছিল। সন্ধ্যাতে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। আজ চারদিন আগে হয়েছে তৃতীয় আক্রমণ।

প্রদ্যোত ডাক্তার বললে—কাল থেকে প্রায় ধ্যানে বসেছেন। চোখ বন্ধ করে আধশোয়া হয়ে বসে রয়েছেন। আমাকে বললেন—ঘুমের ওষুধ আমাকে দেবেন না, ঘুমের মধ্যে মরতে আমি চাই না। আমি সজ্ঞানে যেতে চাই।

মঞ্জু বললে—মায়ের দিদিমার মৃত্যুর খবরটা শুনেছেন? বলেছ?

—বলতে চেয়েছিলাম, উনি শোনেন নি। পত্রখানা পকেটে করেই নিয়ে গিয়েছিলাম। বললাম, আমার শাশুড়ীর সেই বুড়ীদিদিমা, কাঁদীর ভূপীবাবুর স্ত্রী, তাঁর হাত দেখে যে বলেছিলেন! উনি হাত নেড়ে বারণ করলেন। মৃদুস্বরে বললেন—ওসব থাক।

* * *

বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় মশায় চোখ বুঁজে অর্ধআচ্ছন্নের মতো পড়ে ছিলেন। মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন! সে আসছে তিনি জানেন। তার পায়ের ধ্বনি যেন তিনি শুনতে পেয়েছেন। সেই প্রথম আক্রমণের দিন থেকেই জানেন। কিন্তু তা তো নয়, শেষ মুহূর্তে সজ্ঞানে তার মুখোমুখি হতে চান। তার রূপ থাকলে তাকে তিনি দেখবেন; তার স্বর থাকলে সে কণ্ঠস্বর শুনবেন; তার গন্ধ থাকলে সে গন্ধ শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করবেন; তার স্পর্শ থাকলে সে স্পর্শ তিনি অনুভব করবেন। মধ্যে মধ্যে ঘনকুয়াশায় যেন সব ঢেকে যাচ্ছে। সব যেন হারিয়ে যাচ্ছে। অতীত, বর্তমান, স্মৃতি, আত্মপরিচয়, স্থান, কাল সব। আবার ফিরে আসছেন। চোখ চাইছেন। সে এল কি? এরা কারা? বহুদূরের অস্পষ্ট ছায়াছবির মতো এরা কারা?

অতি ক্ষীণভাবে ওদের স্বর যেন কানে আসছে। কী বলছে? কী?

—কী হচ্ছে?

মশায় ঘাড় নাড়লেন, জানি না। সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্বল দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে

এল। কিছু জানা যায় না। কিছু জানতে তিনি পারেন নি। ঘাড় নাড়তে নাড়তেই ক্লান্ত চোখের পাতা দুটি আবার নেমে এল। প্রদ্যোত দেখলে—প্রগাঢ় একটি শান্তির ছায়া শীর্ণ মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে।

মশায় কী দেখলেন—প্রদ্যোত বুঝতে পারলে না। তবে সে জানে মশায় কিছু দেখেন নি। পিঙ্গলকেশীর কল্পনাও আর তাঁর নেই। মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয়। শূন্য হয়ে আসছে সব।

সেই মুহূর্তেই আতর-বউ মশায়ের মুখখানি ধরে বললেন—ধ্যান সাঙ্গ হল? মাধবের চরণাশ্রয়ে শান্তি পেলে? আমি? আমাকে? আমাকে সঙ্গে নাও।

শান্ত আত্মসমর্পণের মতো তিনি স্বামীর বিছানায় লুটিয়ে পড়লেন।

সমাপ্ত